

CUK-H04796-23-P9345

বসন্ত

বসন্ত



ত্রিংশ বর্ষ

23

জ্যৈষ্ঠ • ১৩৩২



756
002/3

সূচী

756



পাদকীয়	৩-৪
নোৎপাদনের বিশেষ প্রকল্প (১৯৮৫-৯০)	৫-১০
লর কেন এত অপচয়	১১-১২
সুশীল কুমার বিশ্বাস খান ধানের চাষ	১৩-১৭
ক একটি গাছ ওরা (কবিতা)	১৯
অজিত কুমার মজুমদার পৈপের চাষ	২০-২৩
ময়ের কয়েকটি সবজি ও তার চাষ পদ্ধতি	২৫-২৭
স্বরবজ্ঞে আনারস চাষের উন্নত পদ্ধতি	২৮-২৯
গংবাদ-কৃষক প্রশিক্ষণ চলছে	৩০
মাষাট মাসে কৃষকের করণীয়	৩১

সম্পাদনা উপদেষ্টা পর্ব বিশ্বপদ মণ্ডল, কৃষি অধিকর্তা, পশ্চিমবঙ্গ ডঃ জ্যোতিরঞ্জন লাহিড়ী, অপর কৃষি অধিকর্তা (সাধারণ) ডঃ দেবপ্রভ মুখার্জী, অপর কৃষি অধিকর্তা (গবেষণা) বুর্জী মুখার্জী, মুখ্য কৃষি অধিকর্তা (সম্প্রসারণ) বি. পি. উকিল, উপ-সচিব (উন্নয়ন), কৃষি বিভাগ অমলেন্দু সরকার, মুখ্য প্রচার ও জনসংযোগ আধিকারিক, কৃষি অধিকার অমিয় কুমার মিত্র, জেলা কৃষি তথ্য আধিকারিক (সদর) স্বলেখা ঘোষ, সম্পাদিকা চিদানন্দ ঘোষাঙ্গী, সহ-সম্পাদক প্রধান সম্পাদক বিশ্বপদ মণ্ডল, কৃষি অধিকর্তা, পশ্চিমবঙ্গ
--

বহুকার

জ্যৈষ্ঠ-১৩৯২

কৃষি অধিকার (কৃষি তথ্য সংস্থা)

পঃ বঃ সরকার কর্তৃক প্রকাশিত ও প্রচারিত

09245

756
— .002/3

সম্পাদক



এ বছরের আমন চাষের মরসুম এসে গেল। এই জৈষ্ঠে কৃষকরা বীজতলার কাজ শুরু করবেন, কাজেই বীজ সংগ্রহ করতে এখন কৃষকরা খুবই ব্যস্ত। এখন মাটি, আবহাওয়া এবং জমির অবস্থান অনুযায়ী চাষের জন্য উপযুক্ত উন্নত জাতের অধিক ফলনশীল ধান বার হয়েছে। আপনাদের জমির উপযোগী বীজ নির্বাচন করে নিন। এইসব অধিক ফলনশীল জাতের ধান চাষ করে ফলন যে অনেক বাড়ানো যায় কৃষকরা তা ভাল করে জানেন। তাছাড়া সময়মত এইসব জাতের ধানের চাষ করলে পরবর্তী ফসল চাষের জন্যও যথেষ্ট সময় পাওয়া যায়।

ভাল ফলনের জন্য প্রথম কথাই হলো উন্নত জাতের বীজ ও সেই বীজ থেকে পুষ্ট ও সবল চারা তৈরি। পুষ্ট ও সবল চারা তৈরির জন্য বীজতলা উন্নত প্রণালী করা একান্ত দরকার। অর্থাৎ বীজতলায় বীজ শোধন করে বোনা ও নির্দিষ্ট পরিমাণ সার, সেচ দেওয়া এবং রোগপোকা দমনের ব্যবস্থা নেওয়া।

এ রাজ্যের বেশির ভাগ এলাকাতেই বৃষ্টির উপর নির্ভর করে বীজতলা তৈরি করতে হয়; ফলে বৃষ্টি শুরু হতে দেরী হলে বীজতলা তৈরী করতে দেরী হয়ে যায়। দেরীতে রোয়া করলে রোগপোকা আক্রমণের আশঙ্কা বাড়ে এবং ফলনও কমে যায়।

প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে বা অথবা কোন কারণে ঠিক সময়ে উপযুক্ত বয়সের চারা সংগ্রহ করার যাতে অসুবিধা না হয়, সেজন্য কৃষকদের যৌথভাবে বীজতলা করা দরকার। যেমন পুকুর, গভীর ও অগভীর, নলকূপ, কুয়ো বা নদী সেচ প্রকল্পের কাছাকাছি গ্রামের সব কৃষকরা এক লপে প্রয়োজনীয় চারা তৈরি করে নেন। একই এলাকাতে বিভিন্ন চাষী যদি একই জাতের ধানের চাষ করেন তাতে রোগ-পোকার আক্রমণ দমন করা সহজ হবে। বীজতলায় বীজ অবশ্যই দফায় দফায় ফেলাতে হবে। যাতে ঠিক সময়ে সবল ও পুষ্ট চারা কৃষক পেতে পারেন ও রোয়ার কাজ ঠিক সময়ে শুরু করতে পারেন।

এ বছর আমন ধানের লক্ষ্যসীমা ধরা হয়েছে ৬০ লক্ষ টন (চালের হিসাবে)। এই লক্ষ্যে পৌছাতে গেলে আমাদের রোয়ার কাজ শুধু ঠিক সময়ে শুরু করলেই হবে না; চারাও নিবিড় করে বুনতে হবে, যাতে গুছির সংখ্যা পরিমিত হয়। নিবিড় করে চারা বুনতে গেলে

যথেষ্ট পরিমাণ রোয়ার উপযোগী ঠিক বয়সের চারার প্রয়োজন। বীজতলা করার সময় সে বিষয়েও চিন্তা করে নিতে হবে।

প্রাকৃতিক দুর্যোগে কৃষকদের ক্ষতির হাত থেকে বাঁচানোর জন্য এ বছরও খরিস্ক মরশুমের আমন ধানের শস্যবীমা প্রকল্প নেওয়া হয়েছে। কৃষকরা অবশ্যই এর সুযোগ নেওয়ার চেষ্টা করবেন। এ বছর থেকে নির্বাচিত ৭০টি ব্লকে বিশেষ ধানোৎপাদন প্রকল্প নেওয়া হয়েছে। উদ্দেশ্য, উৎপাদন বৃদ্ধি। এই জ্যোত্স্ন আমন চাষের শুরু। এখন থেকেই তাই কৃষকদের তৎপর হতে হবে। প্রয়োজনীয় সাহায্য ও পরামর্শের জন্য কৃষি প্রযুক্তিবিদদের সঙ্গে যেন তাঁরা যোগাযোগ করেন।

ধানোৎপাদনের বিশেষ প্রকল্প (১৯৮৫-৯০)



সারা দেশের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ দ্বিতীয় ঘনবসতিপূর্ণ রাজ্য। ১৯৮১ সালের আদমশুমারী অনুসারে এই রাজ্যের লোকসংখ্যা ৫.৫ কোটি। যে হারে লোকসংখ্যা বাড়ছে তা হিসাব করে ১৯৯০ সালের মধ্যে এই সংখ্যা বেড়ে ৬.৬ কোটিতে দাঁড়াবে বলে অনুমান করা যাচ্ছে। এর ফলে খাদ্য-চাহিদা বৃদ্ধি পাবে এবং এই শতাব্দীর শেষে খাদ্যশস্যের প্রয়োজন ১১০ লক্ষ টনের মত হবে, বর্তমানে যেখানে বাৎসরিক গড় উৎপাদনের হার ৮০ লক্ষ টন।

এরাজ্যের ভৌগোলিক আয়তনের শতকরা ৬৩ ভাগ জমি বর্তমানে চাষের আওতায় রয়েছে। খাদ্যোৎপাদন বাড়ানোর জন্য চাষের জমির এলাকা আর বাড়ানোর বিশেষ কোন সুযোগ নেই। কাজেই এই বাড়তি প্রয়োজনীয় খাদ্যশস্য

হেক্টর প্রতি উৎপাদনের হার বাড়িয়ে করতে হবে। এরাজ্যের প্রধান খাদ্যশস্য হলো ধান, কাজেই ধানের উৎপাদন বাড়াতে গেলে ধানের উৎপাদিকা শক্তি বা হেক্টর প্রতি গড় ফলন বাড়াতেই হবে। অর্থাৎ একই জমি থেকে একই বৎসরে আরও বেশী ফসল উৎপন্ন করতে হবে। সপ্তম যোজনাকালে ধানোৎপাদনের এই বিশেষ কার্যসূচী পশ্চিমবঙ্গের পক্ষে তাই খুবই গুরুত্বপূর্ণ হবে।

প্রাকৃতিক আবহাওয়া ও জমির ব্যবহার

পশ্চিমবঙ্গের আবহাওয়া মোটামুটি উষ্ণ এবং আর্দ্র। গড় বৃষ্টিপাত শুকনো পশ্চিমাঞ্চলে ১২৫০ মি.মি. থেকে উত্তরের তরাই অঞ্চলে ৩০০০ মি.মি. এর মধ্যে থাকে। আর এই মৌসুমী বৃষ্টিপাত মোটামুটি সীমাবদ্ধ থাকে চারমাস

বস্তুকরা : জৈষ্ঠ : ১৩৯২

(জনের প্রথম থেকে অক্টোবরের প্রথম পর্যন্ত)।
কালবৈশাখী ও শীতের মরসুমের বা কিছু
বৃষ্টিপাত হয়ে থাকে তা এর মধ্যে আছে।
দাঙ্গিলিং এর পাহাড়ী অঞ্চল ছাড়া এরাজ্যের
আবহাওয়া মোটামুটি উষ্ণ এবং আর্দ্র। বর্ষার
মাসামাঝি থেকে কখনও কখনও খুব বেশি
বৃষ্টিপাত হয় এবং শীতকালে আরামদায়ক ঠাণ্ডা
থাকে। সমতল অঞ্চলে তাপমাত্রা গ্রীষ্মে
৪০°—৪২° সেন্টিগ্রেড থেকে শীতকালে ৬°—৮°
সে: গ্রে: এর মধ্যে ওঠানামা করে। শুকনো
পশ্চিমাঞ্চল ছাড়া এরাজ্যের বৃষ্টিপাতের মাত্রা
সর্বত্র মোটামুটি এক রকম। কেবল পশ্চিমাঞ্চলে
মৌসুমী বৃষ্টিপাতের খেয়ালীপনা কিছু বেশী
থাকে। শীত ও গ্রীষ্ম দুই ঋতুতেই এরাজ্যে
উজ্জল সূর্যালোক থাকে। তবে বর্ষার সময় মেঘের
জঘ্ন ততটা সূর্যালোক পাওয়া যায় না। এই
ধরনের আবহাওয়া সারা বছর ধরে ধান চাষের
পক্ষে খুবই উপযোগী, তবে শুখার সময় যদি
সেচের জলের সরবরাহের ব্যবস্থা থাকে।

আবহাওয়া বৃষ্টিপাত এবং মাটির অবস্থান
অনুযায়ী এরাজ্যকে মোটামুটি ছয়টি কৃষি
জলবায়ু অঞ্চলে ভাগ করা হয়। দাঙ্গিলিং এর
পাহাড়ী অঞ্চল ছাড়া অগ্রসব অঞ্চলে ধানই
প্রধান ফসল। এর মধ্যে আবার গঙ্গার
অববাহিকা অঞ্চল অর্থাৎ গঙ্গার উভয় দিক ধান
চাষের জঘ্ন সর্বোৎকৃষ্ট।

এরাজ্যের ভৌগোলিক এলাকার শতকরা
৬৩ ভাগ জমি চাষের আওতায় আসার ফলে
এ দেশের সমস্ত রাজ্যের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ সবচেয়ে
নিবিড় চাষযুক্ত রাজ্য (সর্বভারতীয় গড় শতকরা
যেখানে ৪৫ ভাগ।) বর্তমানে চাষের জমির

শতকরা মোট ৩০ ভাগ সেচ এলাকার অন্তর্ভুক্ত।
এই সেচের জল আসে প্রধানত: তিনটি বৃহৎ
সেচ প্রকল্প যথা দামোদর, ময়ূরাক্ষী ও কংসাবতী
থেকে ও ৩০০০ গভীর নলকূপ, ৩০০০ নদীজল
উত্তোলন প্রকল্প এবং দু'লক্ষ অগভীর নলকূপ
থেকে। এরাজ্যে চাষের নিবিড়তা শতকরা
১৪০ ভাগ। গ্রাম ও নীট কৃষি জমির পরিমাণ
যথাক্রমে ৭৮ ও ৫৫ লক্ষ হেক্টর। এর মধ্যে
ধানচাষের এলাকা সবচেয়ে বেশী। কৃষিজমির
শতকরা ৬৬ ভাগ অর্থাৎ ৫২ লক্ষ হেক্টর।
এর মধ্যে খরিফে ৪৮ লক্ষ হেক্টর ও রবিতে ৪ লক্ষ
হেক্টর। উত্তরবঙ্গের তিনতা ব্যারেজ প্রকল্পের
আংশিক ব্যবহার সপ্তম যোজ্ঞাকালে আরও
অধিক সংখ্যক গভীর নলকূপ, নদীজল উত্তোলন
প্রকল্প, অগভীর নলকূপ প্রভৃতি করা হলে
১৯৮৫—৯০ সালে এরাজ্যে সেচের অবস্থার আরও
অনেকটা উন্নতি হবে বলে আশা করা যায়।
সপ্তম যোজ্ঞার শেষের দিকে প্রায় শতকরা
৪০ ভাগ জমি সেচ আওতার মধ্যে আনা সম্ভব
হবে বলে ধরা হচ্ছে।

পশ্চিমবঙ্গকে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের স্থান
বলা যেতে পারে। কারণ শতকরা ৮৭ ভাগ
জমির আয়তন ২ হেক্টরের কম। (যেখানে
সর্বভারতীয় জমির গড় আয়তন ৭০ শতাংশ)।
এরাজ্যের কৃষকদের জমির গড় আয়তন
১ হেক্টরের মত, তাও আবার একলপ্তে নয়,
৮ থেকে ১০ খণ্ডে বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে
আছে। জমির ক্ষুদ্র আয়তন, খণ্ডিত অবস্থান
এবং আর্থিক অনটন এই সব ক্ষুদ্র চাষীদের চাষের
উন্নতির পথে প্রধান অন্তরায়। চাষের জঘ্ন
জলের একান্ত প্রয়োজন। কিন্তু বেশীর ভাগ জমির

চাষ বৃষ্টি নির্ভর। এইসব অন্তরায়ের জন্য উন্নত প্রযুক্তি ব্যবস্থাও দ্রুত সম্প্রসারণ করা সম্ভব হচ্ছে না।

উবুও এরাজ্যের কৃষকদের প্রাশংসা করতেই হবে। কারণ এইসব অন্তরায় সত্ত্বেও কৃষকদের আন্তরিক চেষ্টায় গত তিন দশকে এরাজ্যের খাদ্যোৎপাদন প্রায় দ্বিগুণ করা সম্ভব হয়েছে। শীতের মাসগুলিতে যখন আবহাওয়া চাষের খুবই অসুবিধা করেছে তখন যে ফলন পাওয়া গেছে তা সারা দেশের সর্বোচ্চ ফলনের সঙ্গে তুলনা করা চলে (হেক্টর প্রতি ২'৫ থেকে ৩'০ টন),

কিন্তু এরাজ্যের ধানের গড় উৎপাদন গত পাঁচ বছরে হেক্টরে ১'৩ টন। এইসব বাধাগুলি যদি অতিক্রম করা যায় তাহলে আগামী বছরগুলিতে ধানের উৎপাদন বাড়ানো সম্ভব হবে।

পশ্চিমবঙ্গে ধানোৎপাদনের বর্তমান অবস্থা
ধানই এরাজ্যের প্রধান ফসল, খরিফ ও রবি দুই মরসুমেই ধান উৎপন্ন হয়। গত পাঁচ বছরের (১৯৭৮-৮৪) ধানের গড় ফলন, তিনটি ধান মিলিয়ে (আউশ, আমন ও বোরো) (১৯৮২-৮৩ অব্যাবহিক বছর বলে বাদ দেওয়া হয়েছে) নীচে দেওয়া হলো।

শস্যের মরসুম	মোট গড় (লক্ষ হেক্টরে)	উৎপাদন (লক্ষ টন)	আনুমানিক ফলন টন/ হেক্টরে
১। আউশ (প্রাক-খরিফ)	৬'৭১	৬'০৮	০'৯
২। আমন (খরিফ)	৪০'৪২	৫১'৭৩	১'৩
৩। বোরো (রবি গ্রীষ্মকালীন)	৩'৭২	৯'৭৯	২'৬
মোট—	৫০'৮৫	৬৭'৬০	১'৩

প্রচণ্ড খরার বছর ১৯৮১-৮২ ও ১৯৮২-৮৩ সাল ছাড়া গত তিন দশকে ধানের মোট উৎপাদন এবং হেক্টর প্রতি ফলন দুইই ধীরে হলেও বেড়েছে। এই সময়ের মধ্যে ধানের গড় ফলন ৪২ লক্ষ টন থেকে ৬৬ লক্ষ টনে উঠেছে। অর্থাৎ ৩০ বছরে বৃদ্ধি শতকরা ৬০ ভাগ। গত ১৯৮৩-৮৪ সালে ধানের রেকর্ড ফলন হয় ৭৯'৪ লক্ষ টন, হেক্টর প্রতি গড় ফলন ছিল ১৪৭৮ কেজি। যা সর্বভারতীয় গড় ফলনের অনেক বেশী। ভারতবর্ষের মধ্যে ধানোৎপাদনে পশ্চিমবঙ্গের স্থান দ্বিতীয়। পশ্চিমবঙ্গে গ্রীষ্ম-

কালীন ধানের ফলন হেক্টর প্রতি ২'৫ থেকে ৩'০ টনে ঠানানো করে। এই ফলনের হার পাঞ্জাবের সঙ্গে তুলনা করা যায়।

১৯৫১-৫২ থেকে ১৯৮১-৮২ পর্যন্ত ধানের প্রতি পাঁচ বছরের উৎপাদন সারগী নং ১ এ দেওয়া হলো। তিনটি ধানের বর্তমান উৎপাদন পরিস্থিতি সংক্ষেপে নীচে আলোচনা করা হচ্ছে।

(ক) আউশ (প্রাক-খরিফ)

প্রাক-খরিফ ধান প্রধানতঃ উত্তরবঙ্গে এবং পূর্বাঞ্চলের জেলাগুলিতে যেখানে মাটিতে যথেষ্ট রস আছে এবং বেশ কিছু প্রাক মৌসুমী বৃষ্টিপাত

বহুধরা : জৈষ্ঠ : ১৩৯২

হয়ে থাকে। এই ধান প্রধানতঃ ছিটিয়ে বোনা হয় (বর্তমান এলাকা ৭ লক্ষ হেক্টর)। ফলন হার কম (৭—৯ টন হেক্টরে)। সে তুলনায় দক্ষিণাঞ্চলে রোয়া করে যে আউশ ধানের চাষ করা হয়ে থাকে তার উৎপাদন প্রায় দ্বিগুণ। মোট উৎপাদন বেশ কিছুটা বাড়ানো যায় যদি জলদি জাতের অধিক ফলনশীল ধান আরও বেশী জায়গায় রোয়া করে চাষ করা যায়, সেচের সুযোগ বাড়িয়ে, উন্নত চাষ পদ্ধতি অনুসরণ করে, আর বেশী সার ব্যবহার করে ও রোগপোকা দমনের ব্যবস্থা নিয়ে।

(খ) আমন (খরিক)

আমন ধান এ রাজ্যের প্রধান ফসল। শতকরা ৮০ ভাগ জমিতে এই ধানের চাষ হয়। উৎপাদনও মোট ধানের ৮০ ভাগ। বৃষ্টির জলে সারা পশ্চিমবঙ্গে এর চাষ হয়। এই ধানের উৎপাদনও বাড়ানো যায়। অঞ্চলভিত্তিক অধিক ফলনশীল জাতের চাষ করে, বিশেষ করে উচু ও মাঝারি-নিচু জমিতে। অধিক ফলনশীল জাতের ধানের এলাকা বর্তমান ৩০—৩৫ ভাগ থেকে ৫০ ভাগে বাড়িয়ে এবং পুরোটা রোয়া করে ও উন্নত চাষ পদ্ধতি অনুসরণের মাধ্যমে, যেমন সারি করে বোনা, বেশী সংখ্যক চারা রোয়া করে, সুখম সার ব্যবহার এবং রোগপোকা দমন ইত্যাদি ইত্যাদি প্রথা ও কার্যের মাধ্যমে।

(গ) বোরো

এই ধান এ রাজ্যে সবচেয়ে বেশী ফলন দেয়। কারণ আদর্শ অবস্থায়—যথা নিয়ন্ত্রিত সেচ, প্রচুর সূর্যালোক ও শুষ্ক আবহাওয়ায় এর চাষ হয়। একমাত্র বাধা সেচ। ধানে জলের

প্রয়োজন বেশী। শীতকালের ঠাণ্ডা ও শুষ্ক আবহাওয়ায় এই ধানের জন্ম জলের প্রয়োজন হয় ৪০ থেকে ৫০ ইঞ্চির মত। তবুও এই ধানের উৎপাদন এবং গড় ফলন বাড়ানোর সম্ভাবনা আছে। সেচ ব্যবস্থার সম্প্রসারণ এবং উন্নত চাষ পদ্ধতির প্রচলনের ফলে এই ধানের চাষ কৃষকদের মধ্যে ক্রমশঃ জনপ্রিয় হচ্ছে। কারণ এই ধানের চাষ খুবই অর্থকরী। বোরো ধান পুরোটা চাষ হয়, অধিক ফলনশীল জাতের এবং ঘাঁরা এই ধানের চাষ করছেন, তাঁরা চাষীদের মধ্যে সবচেয়ে প্রগতিশীল। এতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই যে এই ধানের গড় ফলন (২.৫ টন থেকে ৩ টন হেক্টরে) এই দেশের সর্বোচ্চ ফলনের মধ্যে পড়ে। এখন পর্যন্ত এই ধানের ফলন হেক্টরে ২.৫ টন থেকে ৩.০০ টন পর্যন্ত হয়ে থাকে। কিন্তু এই ফলন চেষ্টা করা গেলে হেক্টরে তিন টন পর্যন্ত বাড়ানো যেতে পারে।

(ঘ) প্রকল্প

ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধিতে প্রকল্প গ্রহণের একটি জোরালো ভূমিকা অবশ্যই রয়েছে।

আগামী বছরগুলিতে ধানের উৎপাদন বাড়ানোর জন্ম “বিশেষ ধানোৎপাদন প্রকল্প” প্রথম পর্যায়ে ৭০টি ব্লকে নেওয়া হচ্ছে। উদ্দেশ্য ১৯৯০ সালের মধ্যে বর্তমান উৎপাদন ৬৭.৬ লক্ষ টন থেকে বাড়িয়ে ৯৩ লক্ষ টন করা হবে। অর্থাৎ পাঁচ বছরে উৎপাদন বাড়ানোর হার ধরা যাচ্ছে শতকরা ৩৭ ভাগ। অবশ্য লক্ষ্যমাত্রা খুবই উচুতে ধরা হয়েছে কারণ সাধারণতঃ ধানের উৎপাদন শতকরা ১২ ভাগ বৃদ্ধি হয়ে থাকে।

বছর : ১৯৬২

বর্ধিত মাত্রা নিরূপণ

খণ্ড	পাঁচ বছরের গড়		লক্ষ্যমাত্রা		বর্ধিত উৎপাদন (আনুমানিক)
	উৎপাদন (লক্ষ টন)	হেক্টর প্রতি উৎপাদনের হার	১৯৮৯-১৯৯০ উৎপাদন (লক্ষ টন)	হেক্টর প্রতি উৎপাদন	
খনিজ					
১। আউশ ও আমল	৫৭'৮০	১'২০	৭৮'০০	১'৬০	৩৫%
২। রবি বোরো	৯'৮০	২'৬০	১৫'০০	২'৯০	৬৩%
মোট	৬৭'৬০	১'৩০	৯৩'০০	১'৭০	৩৭%

বিশেষ ঐক্যের জন্ত নির্বাচিত ৭০টি ব্লকের তালিকা নীচে দেওয়া হলো। উৎপাদন এবং হেক্টর প্রতি ফলন বৃদ্ধির জন্ত যে লক্ষ্যমাত্রা নির্দিষ্ট করা হয়েছে তা কার্যকরী করার জন্ত যে ব্যবস্থা নেওয়া হবে সে সম্বন্ধে পরের সংখ্যায় আলোচনা করা হবে।

নির্বাচিত ব্লকের নাম

জেলা	ব্লকের সংখ্যা	ব্লকের নাম	জেলা	ব্লকের সংখ্যা	ব্লকের নাম
১। দার্জিলিং	—	—	৬। মুর্শিদাবাদ	৬	কান্দি, বারগুয়ান, সাগরদিঘি, খরগ্রাম, নবগ্রাম এবং ভরতপুর-২
২। জলপাইগুড়ি	২	ধূপগুড়ি, ফলাকাটা	৭। নদীয়া	৪	কৃষ্ণনগর-১, হাঁসখালি, কালিগঞ্জ এবং চাকদা
৩। কোচবিহার	৪	কোচবিহার-১, দিনহাটা-২, মাথাভাঙ্গা-১, মেথলীগঞ্জ	৮। ২৪ পরগণা (উত্তর)	৪	বাগদা, দেগড়া, বাহুরিয়া এবং হাবড়া-২
৪। পশ্চিম- দিনাজপুর	৩	বাগুড়া, এবং বংশীহারি এবং কুমারগঞ্জ	৯। ২৪ পরগণা (দক্ষিণ)	৪	কাকদ্বীপ, ফলতা, বারুইপুর ও ভাঙ্গর-২
৫। মালদা	২	গাজোল ও চাটোজ-২			

বছর : জ্যৈষ্ঠ : ১৩২২

জেলা	ক্রকের সংখ্যা	ক্রকের নাম	জেলা	ক্রকের সংখ্যা	ক্রকের নাম
১০। হাওড়া	২	শ্রামপুর-১, উদয়নারায়নপুর	১৪। বাঁকুড়া	৬	সোনাখুঁচী, ইন্দ্রাল, রাইপুর-২ সিমলাপাল,
১১। হুগলী	৪	আরামবাগ, ধনিয়াখালি			তালডাঙ্গা, কোতোয়ালপুর
১২। বর্ধমান	৮	পাণ্ডুয়া ও বলাগড় ভাতার, মঙ্গলকোট, মন্তেশ্বর, খণ্ডকোষ, বর্ধমান, গলসি-২, জামালপুর, রায়না-২	১৫। পুকলিয়া	২	কাশিপুর ও বড়বাঁজার
১৩। বীরভূম	৭	রামপুরহাট-১ ও ২, ময়ূরেশ্বর-১, সাঁইখিয়া, সিউড়ি-২, মহম্মদবাজার, বোলপুর	১৬। মেদিনীপুর (পশ্চিম)	৬	দেবরা, পিংশা, সবং, নারায়নগড়, কেশপুর, দাতন
			১৭। মেদিনীপুর (পূর্ব)	৬	দাসপুর-১, পটাশপুর, পাঁশকুড়া-১, পাঁশকুড়া-২, তমলুক-১, এগরা-১

সারণী-১

পঃ বলে ধানের উৎপাদন ও বর্জন হার

উৎপাদন হাজার টনে পাঁচ বছরের গড়—১৯৫১-৫২—১৯৮০-৮১

পাঁচ বছর	মোট ধান	বর্জিত হার, গত পাঁচ বছরের মোট ধানের গড় উৎপাদন
(ক) ১৯৫১-৫২ থেকে ১৯৫৫-৫৬	৪,১৭৬'৯	
(খ) ১৯৫৬-৫৭ থেকে ১৯৬০-৬১	৪,৫১৯'৫	+ ৮'২০
(গ) ১৯৬১-৬২ থেকে ১৯৬৫-৬৬	৫,০৩৯'৪	+ ১১'১৬
(ঘ) ১৯৬৬-৬৭ " ১৯৭০-৭১	৫,৬০১'৬	+ ১১'১৬
(ঙ) ১৯৭১-৭২ " ১৯৭৫-৭৬	৬,২০৬'৫	+ ১২'২৩
(চ) ১৯৭৬-৭৭ থেকে ১৯৮০-৮১	৬,৬৯৪'৫	+ ৬'৪৯
(ছ) ১৯৮১-৮২	৫,৮০২'৬	- ১২'০৭ (over ৫)
(জ) ১৯৮২-৮৩	৪,৯৪৯'০	- ২৪'৫০ (")
(ঝ) ১৯৮৩-৮৪	৭,৯৪০'০	+ ১৮'৬০ (")

জলের কেন এত অপচয়

হুশীল কুমার বিশ্বাস

আধুনিক চাহের উপকরণগুলির মধ্যে উন্নত বীজ, সার, জল, কীটনাশক ওষুধ ও কৃষিপ্রযুক্তি প্রধান। এরমধ্যে জলের স্থান সর্বাগ্রে। কারণ জল ছাড়া অগ্র উপকরণ প্রয়োগ সম্ভব নয়। এই জল বৃষ্টির জলই হোক বা সেচের থেকেই আহুক। তবে সেচের জলও আসে পরোক্ষভাবে বৃষ্টির জল থেকেই।

বৃষ্টির জল কতটা পাওয়া যায়? পুরোনো হিসাবে দেখা যায় ভারতবর্ষে এক বছরে যে বৃষ্টি হয় তার জলের পরিমাণ ৩০০০ মিলিয়ন একর ফুট। অর্থাৎ সারা বছরের বৃষ্টির জল জমা করলে ৩০০০ মিলিয়ন একর জমির উপর এক ফুট উচু জল দাঁড়াবে। এত জল তবু কেন জলের অভাবে ফসল মার খায়? পরিসংখ্যানে দেখা যায় ৩০০০ মিলিয়ন একর ফুট জলের ১০০০ মিলিয়ন একর ফুট জল বাষ্পাকারে বাষ্পমণ্ডলে চলে যায়। বাকী ২০০০ মিলিয়ন একর ফুট জলের ৬৫০ মিলিয়ন একর ফুট জল মাটির ভিতর শোষিত হয়। বাকী ১৩৫০ মিলিয়ন একর ফুট জল মাটির ওপর দিয়ে নদী খাল বিলের মাধ্যমে প্রবাহিত হয়। প্রবাহিত জলের মাত্র ৪৫০ মিলিয়ন একর ফুট সেচের কাজে ব্যবহার হতে পারে।

কৃষি উন্নয়ন আধিকারিক, কাটোয়া ১নং ব্লক, বর্ণমান।

মাটির ভেতর শোষিত ৬৫০ মিলিয়ন একর ফুট জলের ৩৫০ মিলিয়ন একর ফুট জল মাটির উপরের স্তরে আবদ্ধ হয়ে যায়। উদ্ভিদ শিকড়ের সাহায্যে তা গ্রহণ করে। বাকী ৩০০ মিলিয়ন একর ফুট জল মাটির গভীরে চুইয়ে অপ্রবেশ্য শিলার ওপর জমা হয়ে ভূনিম্নস্থ জলতলের পরিমাণ নিয়ন্ত্রিত করে। কিন্তু পর পর কয়েক বছর যদি বৃষ্টি কম হয়—তাহলে ভূনিম্নস্থ জলতলের পরিমাণ কমে যায়। এর ফলে নলকূপের জলের যোগানে ঘাটতি হয়।

পশ্চিমবঙ্গের ৭৮ লক্ষ হেক্টর আবাদি জমির মধ্যে সম্ভাব্য সেচ এলাকা ধরা হয়েছে ৬৭'১০ লক্ষ হেক্টর। অর্থাৎ আবাদি জমির ৭৮% জমিতে সেচ সম্প্রসারণ সম্ভব। এর মধ্যে ভূনিম্নস্থ জল থেকে ২৫ লক্ষ হেক্টর ও প্রবাহিত জল থেকে ৩৬'১০ লক্ষ হেক্টর জমিতে সেচ সম্ভব। প্রবাহিত জলের উৎসের মধ্যে ৩২'১০ লক্ষ হেক্টর বৃহত্তর সেচ প্রকল্প ও ১৩ লক্ষ হেক্টর ক্ষুদ্র সেচ প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত ধরা হয়েছে। বাস্তবক্ষেত্রে ১৯৮০ সাল পর্যন্ত সর্বকম উৎস থেকে মাত্র ১২'৪৫ লক্ষ হেক্টর আবাদি জমি সেচের আওতায় আনা সম্ভব হয়েছে। অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গের মোট আবাদি জমির শতকরা

বছর : জ্যৈষ্ঠ : ১৩৯২

২৫'১৬ ভাগ বা লক্ষ্যমাত্রার এক তৃতীয়াংশ মাত্র।

শতকরা ৭৮ ভাগ জমিতে সেচের ব্যবস্থা করতে আমাদের এখনও অনেকদিন অপেক্ষা করতে হবে। কিন্তু ক্রমবর্ধমান খাতের চাহিদা মেটাতে উৎপাদনের গতি বাড়িয়ে যেতেই হবে। সেজন্য সীমিত প্রাপ্ত জলের স্মৃতি ব্যবস্থার দিকে কৃষকদের বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন। যেমন—

- ১। অল্প জলে চাষ করা যায় এমন ফসল বোনা।
- ২। স্বল্প মেয়াদি ফসল চাষ করে জলের খরচ বাঁচানো।

৩। সবি মরসুমে ডাল, তৈলবীজ, ও সবজি চাষের এলাকা বাড়ানো।

৪। কেবলমাত্র নিচু জমিতে বোঁয়ো ধানের চাষ ও কেবল স্বল্প মেয়াদি জাতের চাষ।

৫। ধানের জমিতে অতিরিক্ত জল না দেওয়া।

এই প্রসঙ্গে নয়াদিল্লীর ভারতীয় কৃষি গবেষণা সংস্থার একটি পরীক্ষা আমাদের বিশেষ অগ্রপ্রাণিত করবে। পরীক্ষাটি ছিল বোঁয়ো চাষে জমিতে জল ধরে রেখে চলতি পদ্ধতির চাষ ও অপর জমিতে সবসময় মাটি ভিজা ভিজা রেখে চাষ। পরীক্ষাটির ফল নিচে দেওয়া হল।

* চাষের বিবরণ	জমি ভিজে রেখে জমিতে জল ধরে রেখে	
	চাষ	চাষ
সেচের সংখ্যা	১০	৩২
সেচের খরচ	ট। ২০ × ১০ = ২০০.০০	২০ × ৩২ = ট। ৬৪০.০০
চাষের মোট খরচ	ট। ১৫২৪.০০	১২৮৮.০০
ফলন (হেক্টরে)	৫০.৮১ কুইন্টাল	৫৩.৭৩ কুইন্টাল
বিক্রিত ফসলের মূল্য	ট।: ২৮৬৬.০০	ট।: ৩০০৫.০০
নীট লাভ	ট।: ১৩২৪.০০	ট।: ১০১৭.০০
প্রতি কুইন্টাল ধানের উৎপাদন ব্যয়	ট।: ৩০.৩০	ট।: ৩৬.৯০

উপরের পরীক্ষায় স্পষ্টভাবে দেখা যায় মাটি ভিজা অবস্থায় চাষ করলে ফলন সামান্য কম হলেও নীট লাভ বেশী পাওয়া যায়, উপরন্তু প্রতি কুইন্টালে উৎপাদন ব্যয় কম থাকে। উদ্ভূত জলে তিনগুণ বেশী জমিতে সেচ দেওয়া সম্ভব হবে, উৎপাদন ও শ্রমদিবস বাড়বে।

অতএব সীমিত জলের বিজ্ঞান ভিত্তিক প্রয়োগ ও অপচয় বা মাত্রাতিরিক্ত খরচ বন্ধ করে ফসল উৎপাদনের দিকে এগুতে হবে।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

- ১। ইনডিয়ান ফার্মিং ১৯৭৩ (বা ও মহাপাত্র) আই এ আর আই ন: দিল্লী।

আমন ধান চাষের সময় তো এগিয়ে আসছে। আমন চাষই এ রাজ্যের প্রধান চাষ। এ রাজ্যের জমির অবস্থান, আবহাওয়া, বৃষ্টিপাত সব অঞ্চলে সমান নয়। সেজষ্ঠ জমির অবস্থান, সেচের সুযোগ-সুবিধা ইত্যাদি অনুযায়ী কোথায় কোন জাতের ধানের চাষ করলে ভাল ফলন পাওয়া যেতে পারে সে সম্বন্ধে গত সংখ্যায় আলোচনা করা হয়েছে। এখন বীজতলা তৈরির সময়। জমি নির্বাচন করে বীজতলা তৈরি করুন।

জমি নির্বাচন

আমন মরসুমে বেলে দো-আঁশ থেকে এঁটেল জমি চাষের পক্ষে উপযুক্ত। যদিও অধিকাংশ এলাকায় বৃষ্টির উপর নির্ভর করে আউশ ও আমন ধানের চাষ করা হয় তবু সেচ ও জল নিকাশের ব্যবস্থা থাকলে ফসল ভাল হয়।

বীজের হার

এক একর জমি রোয়ার উপযোগী চারা বা

আমন ধানের চাষ



বহুজন্ম : জ্যৈষ্ঠ : ১৩২২

বিছন তৈরি করতে সরু জাতের ধানের বীজ লাগবে ১৫—১৮ কেজি, মাঝারি জাতের ১৮—২১ কেজি এবং মোটা জাতের ২১—২৪ কেজি।

বীজ শোধন

সরাসরি বোনার আগে বা শুকনো বীজ-তলায় বীজ ফেলার আগে প্রতি কেজি বীজের সঙ্গে ৩ গ্রাম শুকনো গুঁড়ো ইথাইল মারকিউরিক ক্লোরাইড বা ফিনাইল মারকিউরিক এ্যাসিটেট মিশিয়ে বীজ শোধন করুন।

কাদানো বীজতলার বীজ শোধনের জন্য প্রতি ১৫ লিটার জলে ১৫ গ্রাম মিথেনাক্সি মারকিউরিক ক্লোরাইড বা ফিনাইল মারকিউরিক এ্যাসিটেট মিশিয়ে তাতে এক কেজি বীজ ৮—১০ ঘণ্টা ডুবিয়ে রাখুন।

বীজ বোনার উপযুক্ত সময়

সরাসরি বোনার সময় চৈত্র—জ্যৈষ্ঠ এবং বীজতলায় বোনার সময় জ্যৈষ্ঠ—আষাঢ় চারা তৈরি।

এক একর জমি রোয়ার উপযোগী চারা তৈরি করতে ১০ শতক বা ৬ কাঠা জমিতে বীজতলা তৈরি করুন। অতিরিক্ত নোনা মাটি বীজতলার উপযুক্ত নয়। নিড়ান দেওয়া, ওষুধ ছোটানো, সেচ ও সার দেওয়া প্রভৃতি কাজের সুবিধার জন্য সমগ্র বীজতলাটিকে ১'২০ মিটার (৪ ফুট) চওড়া খণ্ডে ভাগ করে নিন। প্রতি খণ্ডের চারপাশে ৩০ সে.মি. (১ ফুট) চওড়া ও ১০ সে.মি. (৪ ইঞ্চি) গভীর নালা খুঁড়ুন।

বীজতলায় সার

প্রতি দশ শতক বীজতলায় প্রাথমিক

মাত্রায় সার লাগবে গোবর বা কম্পোষ্ট ১ টন, নাইট্রোজেন ২ কেজি, ফসফেট ২ কেজি ও পটাশ ২ কেজি। বৃষ্টির উপর নির্ভর করে শুকনো বীজতলা তৈরী করলে প্রাথমিক মাত্রায় নাইট্রোজেন না দিয়ে চারা তোলার ৭—১০ দিন আগে জমিতে রস থাকলে প্রয়োজবোধে ২ কেজি নাইট্রোজেন চাপান সার হিসাবে দেবেন।

বীজতলায় পরিচর্যা ও সেচ

শুকনো বীজতলায় বীজ বুনলে বীজ ফেলার পর হালকাভাবে পাটা চালিয়ে বা মই দিয়ে বীজগুলি ঢেকে দিন। বৃষ্টি না হলে মাঝে মাঝে বীজতলায় হালকা সেচ দেবেন।

কাদানো বীজতলায় বীজ ফেলার ২—৩ ঘণ্টা পরে বীজতলা ডুবিয়ে সেচ দিন এবং ২৪ ঘণ্টা জল ধরে রাখুন। পরে কেবল নালায় রেখে বাকী জল বের করে দিন। চারা বড় হতেই বীজতলায় জলের মাত্রা বাড়ান।

বীজতলায় ওষুধ

চারা তোলার ৪—৫ দিন আগে প্রতি লিটার জলে ৫ মি. লি. ফসফোমিডন ৮৫% বা ১ মি. লি. ক্লোরপাইরিফস ২০ ইসি স্প্রে করুন। টুংরো রোগ বা ভেঁপু পোকা-উপদ্রুত এলাকায় চারার বয়স ১০ দিন হলে দানাদার ওষুধ প্রতি ১০ শতকে ৫০০ গ্রাম ফোরোট ১০ জি বা ১৫ কেজি কার্বোফুরান ৩ জি ব্যবহার করতে হবে। ওষুধ শুকনো ছড়াতে হবে এবং ব্যবহারের সময় বীজতলায় ২'৫—৫ সেমি (১—২ ইঞ্চি) জল ৫—৭ দিন ধরে রাখতে হবে।

ঝলসা ও বাদামী দাগ রোগ দমনের জন্ত নীচে বলা ওষুধ স্ত্রে করুন :

ওষুধের নাম	প্রতি লিটার জলে ওষুধের পরিমাণ
রোগ নাশক	
হিনো-সান	১ মি: লি:
ম্যানকোজেব (যেমন ডাইথেন এম ৪৫ ইত্যাদি)	২৫ গ্রাম
জিনেব (যেমন ডাইথেন জেড-৭৮, হেক্সাথেন, ইউনিজেব ইত্যাদি)	২৫ "
কিটাজিন ৪৮ ই-সি	১ মি: লি:
কুমান এল	৩ "

যৌথ বীজতলা

এ রাজ্যে বেশীর ভাগ এলাকাতেই বৃষ্টির উপর নির্ভর করে আউশ ও আমনের বীজতলা তৈরী করতে হয়। ফলে, বৃষ্টি শুরু হতে দেরী হলে বীজতলা তৈরী করতে দেরী হয়ে যায়। ঐ অবস্থায় হঠাৎ বর্ষা শুরু হয়ে গেলে বা ক্যানালের জল পাওয়া গেলেও চারা ছোট থাকায় রোয়ার কাজ পিছিয়ে দিতে হয়। দেরীতে রোয়ার ফলে ধানে রোগ-পোকার আক্রমণের আশঙ্কা বাড়িয়ে, আবার ফলনও কমে যায়।

এই অবস্থার প্রতিকারের সহজ উপায় হচ্ছে পুকুর, গভীর ও অগভীর নলকূপ, কুয়ো বা নদীসেচ প্রকল্পের ধারে কাছে গ্রামের সব কৃষকের প্রয়োজনীয় চারা এক লগুে তৈরী করা। ক্যানালের জল পাওয়ার বা সম্ভাব্য বর্ষা নামার তিন-চার সপ্তাহ আগে যৌথ বীজতলায় বীজ ফেলতে পারলে যথা সময়ে চারা রোয়া যাবে। তাছাড়া এক লগুে চারা তৈরী করার ফলে

বীজতলায় রোগ ও কীটশত্রু প্রতিরোধ করা সহজ হবে, বীজতলায় অত্যন্ত পরিচর্যাও সহজে করা যাবে।

খরা বা বহুজন্মিত পরিস্থিতি মোকা-বিলার জন্ত এক সঙ্গে বীজ না ফেলে দফায় দফায় বীজতলায় বীজ ফেলুন।

জমি তৈরী

বোনা আমনের জন্ত তিন-চার বার লাঙ্গল ও মই দিয়ে মাটি খুরঝুরে করুন এবং ভালভাবে আগাছা বেছে ফেলুন।

রোয়া আমন চাষের জন্ত বারো-পনেরো সে: মি: (পাঁচ-ছয় ইঞ্চি) গভীর করে মোলায়েম কাদা করুন, একতাল ধুলায় ছবার ও কাদায় তিন-চার বার চাষ ও মই দিন। শেষবার চাষ দেবার আগে জমিতে ৫-৬ দিন জল দাঁড় করিয়ে রেখে মাটি পচিয়ে নিন এবং চাষ দেবার পর মই দিয়ে জমি সমান করে দিন।

সার প্রয়োগ

জমিতে সবুজ সার করলে মাটির উর্বরতা

বঙ্গদ্রা : জ্যৈষ্ঠ : ১৩৯২

বাড়বে। সবুজ সার করা সম্ভব না হ'লে জমি তৈরির সময় একর প্রতি ৮—১০ গাড়া গোবর সার বা কম্পোস্ট দিন। জৈব সার ছাড়াও এ সময় প্রাথমিক মাত্রায় রাসায়নিক সারের পরিমাণ ঠিক করে নেওয়াই সব থেকে

ভাল। কারণ, এতে সারের অপচয় কম হয়, আবার, কম সার প্রয়োগে ফসলের ক্ষতিও এড়ানো যায়।

জমির মাটি পরীক্ষা করানো সম্ভব না হ'লে নীচের তালিকা অনুযায়ী সার দিন।

		সারের পরিমাণ (একর প্রতি কেজিতে)			
মরসুম	ধানের জাত	শেষ চাষের আগে		চাপান সার	
		নাইট্রোজেন ফসফেট পটাশ		(নাইট্রোজেন)	
আমন (১) অধিক ফলনশীল					
	(ক) জলদি	৫	১০	১০	১৫ দিন পরে ১০
	(১০০—১২০ দিন)			৩০—৪০	” ” ৫
	(খ) মাঝারি	৬	১২	১২	১৫ ” ” ১২
	(১২০—১৩০ দিন)			৪০—৪৫	” ” ৬
	(গ) মাঝারি নাবি ও	১২	১২	১২	
	নাবি			৫৫—৬০	” ” ১২
	(২) দেশী উন্নত	৮	৮	৮	থোড় আসার সময় ৮

প্রাথমিক সার জৈব সারের সঙ্গে মিশিয়ে দিলে রাসায়নিক সারের উৎকর্ষতা বাড়ে। মনে রাখবেন বেশী উর্বর জমিতে কাদা করার সময় প্রাথমিক মাত্রায় নাইট্রোজেন না দিলেও চলে। পুরো নাইট্রোজেন সার পাশ-কাঠি ছাড়ার সময় ও থোড় আসার সময় চাপান হিসাবে দেবেন। হালকা মাটিতে চাপান সার ১০—১৫ দিন অন্তর ৩ বার দেওয়া ভাল। ইউরিয়া সার ৫—১০ গুণ মাটির সঙ্গে মিশিয়ে রেখে জারিয়ে নিয়ে চাপান সার হিসাবে দিলে বেশী কাজ করে। ঝাঁরা প্রাথমিক মাত্রার সার দিতে পারবেন না তাঁরা চাপান সার হিসাবে প্রতি দফায়

অন্ততঃ ৮ কেজি হিসাবে নাইট্রোজেন দেবেন।

বীজ বোনা ও চারা রোয়া

জলদি ও মাঝারি জাতের আমনের চারা ২০ সে.মি. (৮ ইঞ্চি) × ১০—১৫ সে.মি. (৪—৬ ইঞ্চি) দূরত্বে এবং নাবি জাতের ২৩ সে.মি. (৯ ইঞ্চি) × ২৩ সে.মি. (৯ ইঞ্চি) দূরত্বে লাগাবেন।

অনেক সময় জমিতে চারার সংখ্যা কম থাকায় ধানের ফলন কম হয়। সাধারণতঃ প্রতি গুছিতে ৩—৪টি চারা থাকা দরকার; কিন্তু জলের চাপ বেশী হলে বা চারার বয়স বেশী হলে অথবা নোনা জমিতে প্রতি গুছিতে ৭—৮টি চারা থাকা দরকার, এসব ক্ষেত্রে

বাড়তি বীজতলার প্রয়োজন হয়। তাই প্রতি হাতে অন্ততঃ ৪টি গুছি রোয়া উচিত যাতে জমিতে যথেষ্ট সংখ্যক চারা জন্মায়। রোয়ার শেষে জমির এক কোণে কিছু বাড়তি চারা রেখে দেওয়া ভাল যাতে কোন জায়গায় চারা মরে গেলে সেই ফাঁক পূরণের জন্ত ঐ চারা ব্যবহার করা যায়।

আষাঢ় থেকে শ্রাবণের মধ্যে চারা রোয়ার কাজ শেষ করুন। চারার বয়স জলদি জাতের বেলায় ৩ সপ্তাহ, মাঝারি জাতের বেলায় ৪ সপ্তাহ ও নাবি জাতের বেলায় ৫ সপ্তাহ হওয়াই ভাল।

চারায় মোটামুটি ৫—৬টি পাতা হলেই রোয়ার উপযুক্ত হবে। চারা ৫ সে. মি. (২ ইঞ্চি) এর বেশি গভীরে রোয়া উচিত নয়। কারণ বেশী গভীরে রুইলে পাশকাটির সংখ্যা কমে যায়। এবং এর ফলে ফলনও কম হয়।

খরিফ মরসুমে আউশ বা পাট কাটার পর অথবা খরা বা বহার জন্ত নির্দিষ্ট সময়ের পরেও ধানের চাষ করতে হ'লে ভাজ মংসের মাঝামাঝি পর্যন্ত রক্তা, পলম-৫৭৯, আই-

আর ২০ ও ৩৬, আই-ই-টি ২৮১৫ (শস্যপ্রী) এবং আশ্বিন মাস পর্যন্ত আছড়া, এন-সি ৬৭৮ ও ১২৮১ এবং ও-সি ১৩৯৩ প্রভৃতি রোয়া ভাল। এন-সি ৬৭৮ ও ১২৮১ এবং ও-সি ১৩৯৩ এর বেলায় ১০ সপ্তাহ বয়সের চারাও রোয়া চলে।

সেচ

আমনের চারা রোয়ার সময় জমিতে ছিপছিপে জল থাকলেই ভাল। চারা রোয়ার পর থেকে ধান কাটার ১০—১৫ দিন আগে পর্যন্ত জমিতে ২ ই. সে. মি. (১ ইঞ্চি) পরিমাণ জল রাখুন।

নিড়ান ও আগাছা দমন

আমনের জমিতে চারা রোয়ার ১০ দিন ও ২০ দিন পরে ছবার 'নিড়ান যন্ত্র' দিয়ে বা হাত দিয়ে আগাছা তুলে ফেলুন ও মাটি ঘেঁটে দিন।

নীচু জমিতে শ্যাওলা ও ব্যাঝির উপদ্রব দমনের জন্ত একরে ৫—৬ কেজি তুঁতে বা ৩ কেজি অল্প তামাঘটিত ওষুধ গুঁড়ো করে মাটির সঙ্গে ভালভাবে ঘেঁটে মিশিয়ে ব্যবহার করুন।



উন্নত প্রথায় ধান চাষ করে আগামী খরিফে আমন ধানের ফলন বাড়ান।

- ১) উন্নত জাতের আমন ধানের বীজ বপন করুন। উচু, মাঝারি, মাঝারি-উচু ও নীচু জমির জন্য উপযুক্ত অধিক ফলনশীল জাতের বীজ নির্বাচন করে নিন।
- ২) বীজতলায় উপযুক্ত পরিচর্যা করুন :

বীজতলায় উপযুক্ত পরিমাণে রাসায়নিক সার ও কীটনাশক ঔষধ প্রয়োগ করুন—

সার—নাইট্রোজেন	২ কেজি	
ফসফেট	২ কেজি	প্রতি দশ শতক বীজতলায়
পটাশ	২ কেজি	

কীটনাশক ঔষধ—যে কোন দানাদার অথবা সর্বাঙ্গবাহী ঔষধ চারার
বয়স ১২—১৫ দিন হ'লে একবার বীজতলায়
প্রয়োগ করুন।

- ৩) সঠিক সময়ে ও সঠিক পরিমাণে রাসায়নিক সার ধানের জমিতে প্রয়োগ করুন :

প্রাথমিক সার (কেজি) চাপান সার (নাইট্রোজেন)

না: ফ: প:

এলদি জাতে (একর প্রতি)	৫	১০	১০	১০ কেজি রোয়ার ১৫ দিন পর।
				৫ কেজি রোয়ার ৩০—৪০ দিন পর।
মাঝারি ও নাবি জাতে (একর প্রতি)	৬	১২	১২	১২ কেজি রোয়ার ১৫ দিন পর।
				৬ কেজি রোয়ার ৪০—৪৫ দিন পর।
স্থানীয় জাতে (একর প্রতি)	৮	৮	৮	৮ কেজি খোড় আসার আগে

- ৪) আপনার ফসলকে সময়মত ঔষধ প্রয়োগে রোগ ও পোকাকার হাত থেকে রক্ষা করুন :

বিস্তারিত জ্ঞান লাভের জন্য আমাদের প্রকল্পকর্মী বা স্থানীয় কৃষিকর্মীদের সঙ্গে
যোগাযোগ করুন।

🏢 ভারত-জার্মান সার প্রশিক্ষণ প্রকল্প

১২বি, রাসেল ষ্ট্রিট, কলিকাতা-৭০০০৭১, ফোন : ২১-২৬৩২-৩৪

“এক একটি গাছ ওরা” / অজিত কুমার মজুমদার

এক একটি গাছ ওরা গাছ নয় সত্যদ্রষ্টা মহর্ষির উত্তরসূরী
ভেঙ্গে না ওদের ধ্যান-জীবন জিজ্ঞাসা-স্ববহৎ পূর্ণতার পথ,
আবার উন্নত হবে এ ভারত মহৎ ভারতে বনছায়ে বেদমন্ত্র পড়ি
একটু থামো না বন্ধু ! আনতে দাও শাখায় শাখায় ছুতন শপথ ।

আজিকার রক্তাক্ত অরণ্যের মাঝে ঋষিআত্মা কাঁদে ;
একবার কান পাত হে বন্ধু, ভয়ে ভীতা বনানী হৃদয়ে,
যেখানে তোমার নিষ্ঠুর খেলা অহরহ উত্তরণে বাধ সাধে,
সবুজের রাজ্য রাজধানী গড়ে তুলিবার অবাক বিস্ময়ে ।

থামাও থামাও বন্ধু ছুই হাতে ধরা ঐ শোণিত কুঠার—
অত্যাচারে অরণ্যের কোর না মরুভূমি, হতে দাও সবুজ পারাবার,
এবার বাঁচতে দাও সবাকার মতো, ছুঁতে দাও অভ্রংলিহ আকাশ মিনার
এখানে ফসিল হয়ে আছে ‘যাজ্ঞবল্ক্য মৈত্রেয়ীর পুণ্য শুদ্ধাচার ।’

এখানে নির্বিকল্প আনন্দের মাঝে “আমি”টারে জেনেছে তাপস,
স্ববাচার হোমাচার চারিবেদ একনিষ্ঠ সাধনে ভজনে—
এখানে “ঈশ্বর” এসে প্রতিদিন দাঁড়ায়েছে চোখ মেলে বিভোল বিবশ,
বাঁধা পড়িয়াছে অরণ্যের ছায়াকুঞ্জে মাটি আলিনায় মধু তপোবনে ।

পেঁপে একটি অর্থকরী ফল। স্বাদে, গন্ধে উপাদেয় এবং স্বাস্থ্যকর ফল। পেঁপেতে শতকরা হিসাবে মোটামুটিভাবে জলীয় অংশ ৮৯.৬ ভাগ, শর্করা ৯.৫ ভাগ, প্রোটিন ০.৫ ভাগ, স্নেহ পদার্থ ০.১ ভাগ, খনিজ পদার্থ—লৌহ, ক্যালসিয়াম, ফসফরাস ইত্যাদি মিলে ০.৮২ ভাগ আছে। পেঁপেতে প্রচুর ভিটামিন এছাড়াও ভিটামিন বি, সি ইত্যাদিও আছে।

পেঁপের চাষ অতি সহজেই করা যায়। অল্প সময়ে ফল ধরে। ফলন হয় প্রচুর, আয়ও বেশী। তাই এ ফলের চাষ বাড়ানো বিশেষভাবে প্রয়োজন। অল্প জায়গা লাগে বলে বাড়ীর সংলগ্ন স্থানে সবজি ও ফল হিসাবে এর চাষ করা যায়।

জলবায়ু

প্রধানতঃ গরম ও আর্দ্র জলবায়ু অঞ্চলেই ভাল হয়। নাতিশীতোষ্ণ জলবায়ু অঞ্চলেও এর চাষ হতে পারে। পেঁপে গাছ খুব পলকা, তাই যেখানে খুব ঝড় হয়, সে জায়গায় বাপকভাবে চাষ করা ঠিক নয়।

জমি ও মাটি

জলনিকাশী ব্যবস্থায়ুক্ত উঁচু জমি পেঁপে চাষের উপযুক্ত। উর্বর দো-আঁশ, বেলে দো-আঁশ মাটি পেঁপে চাষের পক্ষে ভাল। পেঁপের শেকড় শাঁসাল, পলকা আর স্পঞ্জের মত। তাই গোড়ায় জল জমলে বা মাটি বেশী সময়ের জন্য আর্দ্র থাকলে অথবা মাটিতে বায়ু চলাচল ঠিকমত না হলে শেকড় সহজেই পচে যেতে পারে। অনেক সময় গোড়াও পচে যায়। তাই জমি নির্বাচনের দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখতে হবে।

উন্নত জাত

ফলন বাড়ানোর প্রধান ও প্রথম হাতিয়ার



পেঁপের চাষ

হচ্ছে উন্নত জাত। পশ্চিমবঙ্গের উপযুক্ত জাতগুলি হোল :

(ক) ওয়াশিংটন : গাছ মাঝারি লম্বা। ফলের গড় ওজন দুই থেকে আড়াই কেজি। শাঁসের রং হলদে কমলা।

(খ) কুর্গ হানি ডিউ : গাছ মাঝারি বেঁটে। ফলের গড় ওজন দুই থেকে আড়াই কেজি। নীচ থেকেই ফল ধরে। এ জাতের প্রায় সব গাছই উভলিঙ্গ। তবে কখনো কখনো স্ত্রী গাছও হয়। পুরুষ গাছ সাধারণতঃ হয় না।

(গ) কোয়েম্বাটুর ১ ও ২ (কো-১, কো-২) : গাছ মাঝারি লম্বা। ফলের আকার গোল ও মাঝারি, গড় ওজন প্রায় দেড় কেজি।

(ঘ) সোলো : হাওয়াইতে উদ্ভাবিত জাত। এদেশের জলবায়ুতে ভালই ফলে। গাছ লম্বা। ফলের আকার ছোট, গড় ওজন ৫০০ গ্রাম থেকে এক কেজি। শাঁস খুব পুরু। সানরাইজ সোলোর শাঁসের রং হালকা কুমকুমের মত আর ওয়েমানেলা সোলোর শাঁসের রং গাঢ় কমলা। ফল অনেক দিন পর্যন্ত রাখা যায়।

পেপের বংশ বিস্তার বীজ থেকেই হয়। সুতরাং ভাল ফলন সম্বন্ধে নিশ্চিত হবার জ্ঞান বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান বা কৃষি বীজ খামার থেকে বীজ সংগ্রহ করা উচিত।

চারি তৈরী

বীজতলায় চারা তৈরীর জ্ঞান জলসেচ ও জলনিকাশী ব্যবস্থায়ুক্ত এবং যথেষ্ট আলো বাতাস পায় এমন উঁচু জমি বেছে নিন। বীজ বোনার দুমাস আগে বীজতলার জমি তৈরী করুন। ভালভাবে চাষ দিয়ে মাটিকে রোদ ও বাতাস খাইয়ে নিন। বীজ বোনার আগে ৫-৬ বার চাষ

দিয়ে ও বার দুই মই দিয়ে জমি ভালভাবে খুরখুরে করে নিন। পরে ছোট ছোট খণ্ডে ভাগ করুন। যথাযথ পরিচর্যার সুবিধার জ্ঞান প্রতি খণ্ডে বীজতলা ৪ ফুট চওড়া ও ২৫ ফুট লম্বা হওয়া বাঞ্ছনীয়। পাশাপাশি দুটি বীজতলার মাঝে দেড় থেকে দু ফুট জায়গা রাখা দরকার। এতে জল নিকাশের ও অগ্নাজ্ঞান পরিচর্যার সুবিধা হয়। প্রতি খণ্ড বীজতলায় (১০০ বর্গফুট) ২ বুড়ি পাতাপচা সার, ৫০০ গ্রাম সুপার ফসফেট ও ২৫০ গ্রাম মিউরিয়েট অফ পটাশ ভালভাবে মিশিয়ে দিন। বোনার আগে অবশ্যই বীজ শোধন করে নিন। বীজ দুই ইঞ্চি দূরে দূরে সারি করে ১ ইঞ্চি দূরে দূরে বুনুন। বীজ যেন মাটির আধ ইঞ্চির মত নীচে থাকে। বোনার পর বীজগুলি খুরখুরে পাতাপচা সার দিয়ে ঢেকে দিন। রোদ জলে যাতে ক্ষতি না হয় তার জ্ঞান বীজতলার ওপর ছাউনি করে দিন। মাঝে মাঝে প্রয়োজন বোধে ছাউনি খুলে দিন। এতে চারা শক্ত ও সবল হবে। মাটির রস বুঝে সকালে অথবা বিকেলে বারি দিয়ে জল দিন।

মূল জমি তৈরী

জমিতে ৫-৬ বার চাষ দিয়ে ও বার দুই মই দিয়ে জমি বেশ ভালভাবে তৈরী করুন। সেচ, জল নিকাশ এবং পরিচর্যার জ্ঞান জমিকে কয়েকটি অংশে ভাগ করে নিন।

চারি লাগাবার দূরত্ব

গাছের দূরত্ব জমির উর্বরতা এবং স্থানীয় আবহাওয়ার ওপর অনেকটা নির্ভর করে। যেসব এলাকায় গ্রীষ্মের তাপ বেশী সে সব এলাকায় দূরত্ব কমিয়ে ঘন করে লাগান দরকার। তা না হলে রোদের তাতে ফল ঝলসে যাওয়ার ভয় থাকে—

বসুন্ধরা : জ্যৈষ্ঠ : ১৩৯২

গাছ ঘন করে লাগালে আগাছাও কম হয়। বেশী উর্বর জমিতে গাছের দূরত্ব বেশী রাখা যায়। সাধারণতঃ সারি থেকে সারির দূরত্ব ৫—৬ ফুট এবং সারির মধ্যে গাছ থেকে গাছের দূরত্ব ৫—৬ ফুট রাখা চলে। এতে একরে ১২০০ থেকে ১৭৫০টি মাদা হতে পারে। প্রতি মাদায় ২—৩টি করে চারা লাগান।

সার

চারা বসাবার আগে প্রতি মাদায় ১০ কেজি পচা গোবর সার, ৮০ গ্রাম ইউরিয়া, ২৫০ গ্রাম সুপার ফসফেট ও ৮০ গ্রাম মিউরিয়েট অফ পটাশ দিন। চারা লাগাবার ছ মাস পর পর এই পরিমাণ সারই প্রতি গাছে প্রয়োগ করবেন।

সার শেকড়ের কাছে, গাছের গুঁড়ির থেকে ৬—৭ ইঞ্চি ছেড়ে চারদিকে গোল করে ছড়িয়ে মাটির সাথে মিশিয়ে দিন। সারের পরই প্রয়োজনমত হালকা সেচ দিন।

পরিচর্যা

যথাযথ পরিচর্যায় পৈপের ফলন অনেক বাড়ে। জমিতে আগাছা যাতে না জন্মায় সেদিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখুন। পৈপে চারা লাগাবার তিন সপ্তাহ পরে একবার এবং একমাস পর আর একবার হালকা করে কুপিয়ে আগাছা তুলে ফেলবেন। মাটির রস বুঝে সেচ দিন। সাধারণতঃ শীতকালে দিন দশেক পর একবার আর গ্রীষ্মের সময় প্রতি সপ্তাহে একবার করে সেচ দেওয়ার প্রয়োজন হতে পারে। গাছের গোড়ায় যাতে জল না জমে সেদিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখুন। চারা লাগাবার ৪—৫ সপ্তাহ পরেই ফুলের কুঁড়ি আসতে আরম্ভ করে। এই সময়ই পুরুষ বা স্ত্রী গাছ চেনা যায়। ঠিকমত পরাগ সংযোগের

জন্ম বাগানে শতকরা ১০টি পুরুষ গাছ রাখা প্রয়োজন। প্রতি মাদায় একটি সবল গাছ রেখে অপ্রয়োজনীয় চারা তুলে ফেলুন। কোন কোন গাছে কাণ্ডের অল্প জায়গার মধ্যে অনেক ফল ধরে। ফলের আকার ও ঠিকমত বাড়বার প্রয়োজনে ছোট অবস্থাতেই মাঝখান থেকে কাঁচা ফল ভেজে পাতলা করে দিন।

রোগ-পোকা দমন

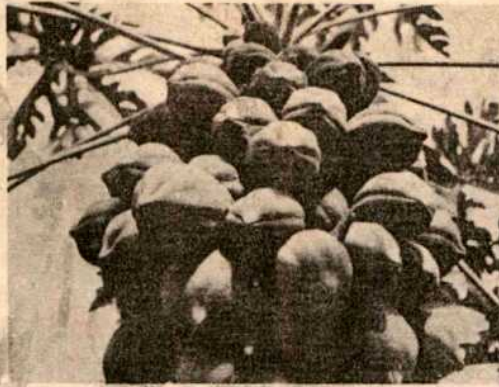
পোকার উপজব বড় একটা হয় না। তবে, গ্রীষ্মের সময় কখনো লাল মাকড়ের আক্রমণ দেখা যায়। পাতার নীচে এরা আশ্রয় নেয় এবং পাতার রস শুষে খায়। পাতা হলদেটে হয়ে যায়। এই পোকার আক্রমণ দেখলে প্রতিকার হিসাবে প্রতি লিটার জলে ২ গ্রাম সাল্টাফ অথবা ২ মিলিলিটার কেলথেন মিশিয়ে পাতার নীচে ও উপরে ভালভাবে ১৫ দিন পর পর ছ'বার স্প্রে করুন। ওষুধ গোলা জলের পরিমাণ আক্রান্ত গাছের সংখ্যার ওপর নির্ভর করে।

চারা চলে পড়া রোগ

বীজতলা বা হাপরে এ রোগের প্রাদুর্ভাব হয়। স্যাঁতসেঁতে জমি, খুব ঘন বোনা, খুব বেশী পরিমাণে হাপরে সেচ দেওয়া বা জমি ও বীজ শোধন না করে বোনার জন্ম এ রোগ হতে পারে। আক্রান্ত চারা গোড়া থেকে বেকে চলে পড়ে। ৪—৫ দিন পর পর একবার করে প্রতি লিটার জলে এক গ্রাম ডাইকোলাটান মিশিয়ে স্প্রে করুন।

গোড়া পচা রোগ

রোগের আক্রমণে আক্রান্ত গাছের গোড়ায় প্রায় মাটির কাছাকাছি, জল বসার মত দাগ দেখা যায়। ক্রমে ক্রমে জায়গাটি পচে যায়, রস



বহুধরা : জ্যৈষ্ঠ : ১৩৯২

গড়াতে থাকে ও হুর্গন্ধ বার হতে থাকে। গোড়ার চারধারও পচে যায়। অনেক সময় গোড়া থেকে ভেঙ্গে যায়। স্যাঁতসেঁতে জমি বা জল নিকাশের ভাল বন্দোবস্তের অভাবে এ রোগের আক্রমণ হয়। প্রতিকার হিসাবে প্রথমাবস্থায় আক্রান্ত জায়গা পাতলা করে চোঁছে ফেলে বোর্দো পেণ্ট অথবা ব্লাইটক্স অল্প জলে কাদা কাদা করে গুলে লাগালে এ রোগের প্রকোপ কমান যায়।

এ্যানথ্রাকনোজ

এই রোগ ফলে ও কাণ্ডে দেখা যায়। প্রথমে রোদের তাপ লাগলে এ রোগের প্রকোপ বেশী হয়। গাছের পাতা কম থাকলে বা গাছের দূরত্ব বেশী হলে ফলে ও কাণ্ডে রোদের তাপ লাগার সম্ভাবনা বেশী থাকে। আক্রান্ত ফলে প্রথমে হালকা হলদে রঙের দাগ দেখা দেয়। ঐ দাগ আস্তে আস্তে বড় হয়ে ছড়িয়ে পড়ে। ক্রমে আক্রান্ত অংশ নরম হয় ও প্রথমে বাদামি ও পরে কাল রঙে পরিণত হয়। কাণ্ডে ও যেদিকে বেশী রোদ লাগে সেখানে ঝলসানো দাগ দেখা দেয়। যেসব এলাকায় এ রোগের প্রকোপ বেশী সেখানে গাছের দূরত্ব কমিয়ে ঘন ঘন লাগান দরকার যাতে ফলে ও গাছের

গুঁড়িতে সূর্যের প্রখর তাপ না লাগে। ফল বস্তা দিয়ে ঢেকে দিয়েও উপকার পাওয়া যায়। আক্রমণের প্রথমাবস্থায় ডায়থেন জেড-৭৮ স্প্রে করলে উপকার হয়। প্রতি লিটার জলে আড়াই গ্রাম হিসাবে এই ঔষধ মেশান।

কুটে রোগ

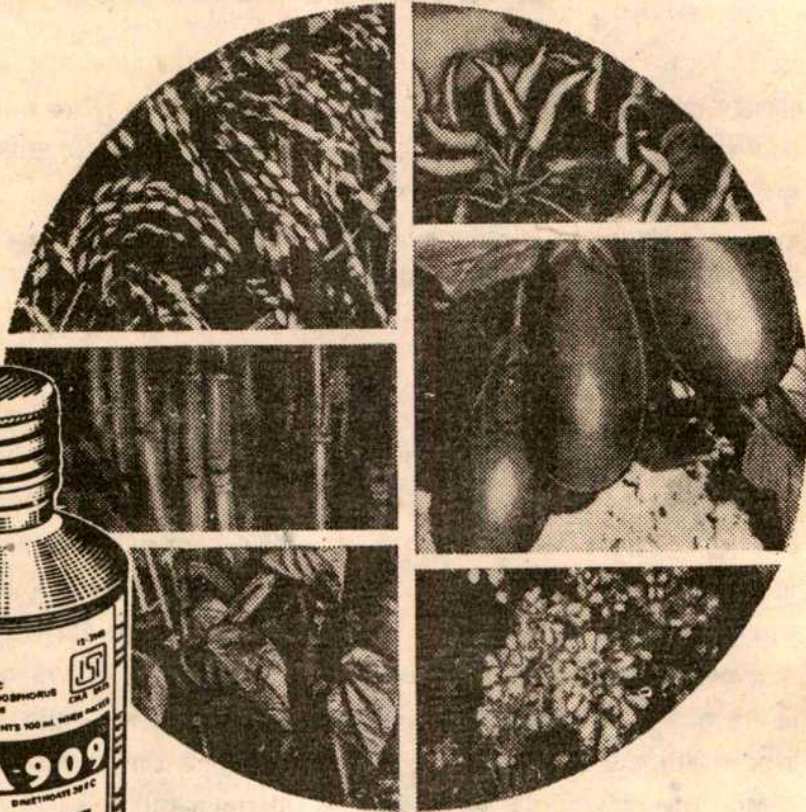
এটি একটি মারাত্মক ব্যাধি। রোগের আক্রমণে আক্রান্ত গাছের পাতা ঠিকমত বাড়তে পারে না। পাতা ছোট ও ভারী হয়ে কুঁকড়ে যায়। পাতার সবুজ অংশ নষ্ট হয়ে হলদে ছোপ ছোপ নক্সা কাটা দাগ পড়ে, গাছের বাড় কমে যায়। নতুন পাতা সময় সময় মাথার ওপরে কুঁটির মত হয়ে থোকা বেঁধে যায়। ফলের ওপরও ছোপ ছোপ দাগ পড়ে আকারও এবড়ো থেবড়ো হয়ে যায়। ক্রমে ক্রমে মাথার দিক থেকে আরম্ভ করে গোটা গাছ শুকিয়ে মরে যায়। এই রোগ একপ্রকার জীব পোকের সাহায্যে সংক্রামিত হয়।

বাগানে আক্রান্ত গাছ শেকড় সমেত তুলে পুড়িয়ে ফেলুন। রোগের প্রকোপ বেশি দেখলে ওই জমিতে ২-১ বছর পেঁপে চাষ বন্ধ রাখুন।

পোকার যম... খরচ কম

তার-৯০৯

শক্তিশালী মিটমাশক ওষধ



পোকার হাত থেকে ফসল বাঁচান

তার-৯০৯ ডাইনোথোয়েট ৩০% ই.সি. ব্যবহার করুন
প্রস্তুতকারক :

শ' ওয়ালেস এণ্ড কোং লিঃ

৪, ব্যাঙ্কাল স্ট্রিট,
কলিকাতা : ৭০০ ০০৬



শ' ওয়ালেস উৎপাদন

গ্রীষ্মের কয়েকটি সবজি ও তার চাষ পদ্ধতি

গ্রীষ্মকালে যেসব সবজির চাষ করা হয় তার মধ্যে ঢেঁড়স, লঙ্কা, শশা, ঝিঙ্গে, লাউ, করলা ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। এইসব সবজির ভাল ফলনের জন্য উন্নত বীজ ও পরিচর্যা প্রয়োজন। এখানে উপরিউক্ত সবজিগুলির চাষ পদ্ধতি সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো।

জাত

ঢেঁড়স—পুসা সাওয়ানী।

লঙ্কা—সূর্যমুখী, জি-৩, এন,পি-৪৬এ, পাটনাই।

শশা—কৃষ্ণনগর সিলেকশন।

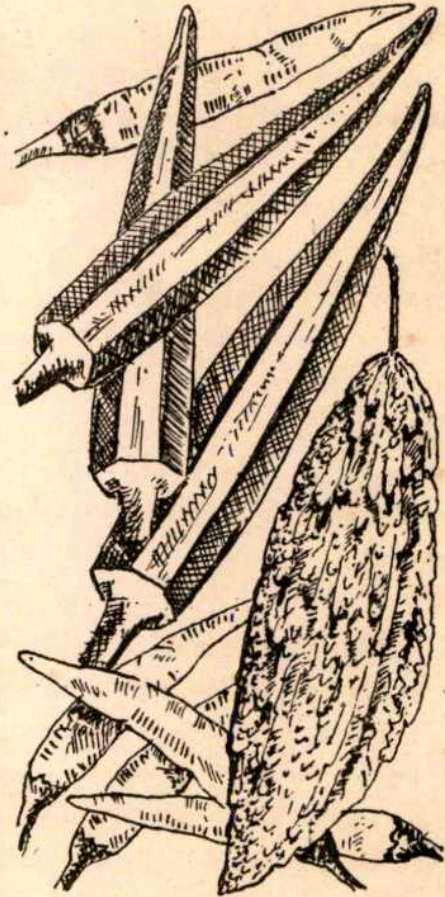
ঝিঙ্গে—পুসা নগধার ও সতপুটিয়া।

লাউ—পুসা সামার প্রলিফিক লঙ, পুসা সামার প্রলিফিক রাউণ্ড।

করলা—পুসা দো মোম্বমী।

বপন পদ্ধতি

ঢেঁড়স নির্দিষ্ট দূরত্বে একটি করে চারা রেখে ও শশা, ঝিঙ্গে, করলা, লাউ ইত্যাদি মাদা প্রতি ছুটি করে নীরোগ ও পুষ্ট চারা রেখে বাকীগুলি তুলে ফেলতে হবে। চারা ৫-৭ সে,মি, লম্বা হলে তখন পাতলা করে দিতে হবে।



বসুন্ধরা : জ্যৈষ্ঠ : ১৩৯২

গাছের ভাল বৃদ্ধির জন্ত গোড়ার মাটি কুপিয়ে আলগা করে দিতে হবে। এতে আগাছা দমন হবে ও মাটিতে রস সংরক্ষণ করা যাবে। লতানো সবজির ক্ষেত্রে ২-৩ বার আগাছা নিড়িয়ে দিলে ভাল হয়। গাছ লতিয়ে জমিতে ছড়িয়ে পড়লে আগাছা নিড়ানোর দরকার হয় না। বড় আগাছা হয়ে গেলে তা টেনে তুলে ফেলে দিলেই চলে। যে সমস্ত সবজি গাছের শেকড় মাটির খুব গভীরে যায় না, সেসব ক্ষেত্রে মাটি খুব হালকাভাবে কুপিয়ে দিতে হবে।

সেচ

গ্রীষ্মের সবজিতে সেচের কিছু প্রয়োজন হয়। বীজ বোনা বা চারা রোয়ার পরেই হালকাভাবে সেচ দিতে হবে। তারপর মাটিতে রসের অবস্থা বুঝে মাঝে মাঝে সেচ দিলে ভাল।

সার

ভাল ফলনের জন্ত গাছে সার দেওয়া প্রয়োজন। তবে সার সব সময়েই মাটি পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে দেওয়া উচিত। তাতে সারের অপচয় হয় না এবং চাষীর অর্থ খরচ হয় না। বিভিন্ন সবজিতে কখন কতটা সার দেবেন সে সম্বন্ধে নীচে মোটামুটিভাবে আলোচনা করা হলো।

টেঁড়স

নাইট্রোজেন হেক্টর প্রতি ২৫ কেজি জমি তৈরির সময়। চাপান হিসাবে ১২৫ কেজি করে ছ বারে, বীজ বোনার ৩ সপ্তাহ পরে ও বীজ বোনার ৫ সপ্তাহ পরে। কম্পোষ্ট বা গোবর সার (হেক্টরে) ১৫ টন জমি তৈরির সময়। তাছাড়া ফসফেট ও পটাশ (হেক্টরে) ২৫ কেজি করে জমি তৈরির সময়।

লঙ্কা

জমি তৈরির সময় (হেক্টর প্রতি) কম্পোষ্ট বা গোবর সার ১৫ টন, নাইট্রোজেন ৩৫ কেজি, ফসফেট ৩৫ কেজি ও পটাশ ৩৫ কেজি।

লাউ, খাশা, বিড়ে, করলা

জমি তৈরির সময় (হেক্টর প্রতি) কম্পোষ্ট বা গোবর সার ১৫ টন, নাইট্রোজেন, ফসফেট ও পটাশ ৩০ কেজি করে প্রয়োগ করতে হবে।

সবজির ভাল ফলনের পথে সবচেয়ে বড় বাধা রোগ ও পোকার আক্রমণ।

টেঁড়সের পোকা সম্বন্ধে প্রথমেই বলি, ফল ও ডাঁটা ছিন্নকারী পোকা। এই পোকার কীড়া গাছের কচি ডগা ও ফল ছিন্ন করে ফলের ক্ষতি করে। আক্রান্ত গাছের ডগা ও ফলগুলি তুলে নষ্ট করে ফেলতে হবে। এরপর ১ মিলিলিটার ডাইক্লোরভস্ যেমন মুলতান-৭৬ অথবা ম্যালাথিয়ন যেমন সাইথিয়ন ৫০ ই,সি ২ মিলিলিটার প্রতি লিটার জলে মিশিয়ে ভালভাবে গাছে স্প্রে করতে হবে।

জেসিড, এই পোকা টেঁড়স গাছের পাতার নীচের দিকে থাকে ও পাতার রস চুষে খায়। পাতা কুকড়ে ও পাতার কিনারা ঝলসে যায়। প্রতিকারের জন্ত ডাইক্লোরোভস্ (মুলতান) ১ মি,লি, অথবা ম্যালাথিয়ন ২ মি,লি, অথবা ডাইমেথোয়েট (রোগর) ১ মি,লি, হিসাবে প্রতি লিটার জলে মিশিয়ে গাছের পাতার উপরে ও নীচে ভালভাবে স্প্রে করতে হবে।

রোগ

পাতার নঙ্গা রোগ বা সাহেব রোগ। (ভাইরাস ঘটিত) সাদা মাছির মত ছোট ছোট পোকা। এই পোকা ভাইরাস বা রোগ

জীবাণুর বাহক।

এই রোগের আক্রমণের ফলে গাছের পাতা হলদে হয়ে যায়। পাতায় হলদে সবুজ নক্সা দেখা যায়। পাতা কিছুটা মোটা হয় এবং কঁকড়ে যায় ও শিরাগুলি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। রোগের প্রকোপ যখন বেশী হয় তখন ফলগুলিও হলদেটে ও অসম আকৃতির হয়ে যায়। ফলনও কমে যায়। রোগাক্রান্ত গাছ দেখামাত্র পুড়িয়ে ফেলা উচিত। এর আক্রমণ একেবারে বন্ধ না করা গেলেও এই ভাইরাসের বাহক পোক-গুলিকে দমন করে এই রোগের প্রকোপ কমান যায়। প্রতিষেধক হিসেবে ম্যালাথিয়ন যেমন সাইথিয়ন-৫০ ই,সি প্রতি লিটার জলে ২ মি,লি, হিসাবে মিশিয়ে গাছের পাতার উপরে ও নীচে ভালভাবে স্প্রে করলে এই আক্রমণ কমান যায়।

লক্ষ্য

পোকা

চোষী পোকা, এক ধরনের ছোট হলুদ রঙের পোকা। এরা পাতার রস চুষে খায়। ফলে পাতা শুকিয়ে কঁকড়ে যায়। এরা কুটে রোগের জীবাণু বহন করে ও কুটে রোগ ছড়ায়। প্রতিকারের জন্য ডাইমেথোয়েট যেমন রোগের ৩০ ই,সি অথবা মিথাইল ডেমিটন যেমন মেটাসিস্টক্স-২৫ ই,সি ১৫ মি,লি, হিসাবে অথবা ম্যালাথিয়ন বা সাইথিয়ন ৫০ ই,সি ২ মি,লি, হিসাবে মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে।

রোগ

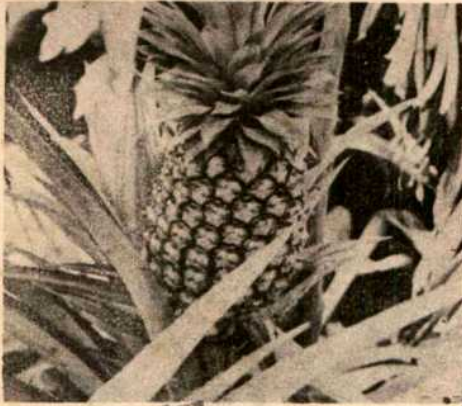
ফল পচা রোগ, এটি এক রকম ছত্রাক বটিত রোগ। আক্রান্ত গাছের পাতায় এবং ফলে গাঢ় বাদামী রঙের দাগ দেখা যায়। পরে এই দাগগুলি মিশে গিয়ে বড় হয়ে যায়। ফল কঁকড়ে, শুকিয়ে গিয়ে অপরিণত অবস্থায় ঝরে যায়। সাধারণতঃ আধপাকা ফলে এই রোগের আক্রমণ দেখা যায়, এই রোগ প্রতিরোধ করতে হলে বীজ বোনার আগে শোধন করে নিতে হবে। আক্রান্ত গাছে ক্যাপটাক যথা ক্যাপটান বা ব্যাভিষ্টিন এক গ্রাম প্রতি লিটার জলে মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে।

লাউ, বিঙ্গে, শশা ইত্যাদি

রোগ

পাউডার রোগ বা সাদা গুঁড়া রোগ।

এর আক্রমণে প্রথমে পুরনো পাতার উপরি-ভাগে গোলাকৃতি পাউডারের দাগ পড়ে ধীরে ধীরে সমস্ত পাতাতে ছড়িয়ে পড়ে। আক্রান্ত পাতা ঝরে পড়ে যায়। ধীরে ধীরে পাউডারের গুঁড়োর মত সাদা দাগ পাতার উপরের দিক থেকে নীচের দিকে ছড়িয়ে পড়ে। এইভাবে সমস্ত গাছই আক্রান্ত হয়। অপেক্ষাকৃত শুকনো আবহাওয়ায় এই রোগের প্রাদুর্ভাব বেশী হয়। আক্রান্ত গাছে সালফেক্স ০.২৫ শতাংশ বা ব্যাভিষ্টিন ০.১ শতাংশ স্প্রে করলে ফল ভাল পাওয়া যায়।



পশ্চিমবঙ্গে আনারস চাষের গুরুত্ব বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিশেষ করে হিমালয়ের পাদদেশে, দার্জিলিং এর শিলিগুড়ি জেলায়, পশ্চিম দিনাজপুরের ইসলামপুর এলাকায় এবং জলপাইগুড়ির পশ্চিম এলাকায় এর চাষ বৃদ্ধি পাচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গে প্রায় ৮০০০ হেক্টর জমিতে বছরে প্রায় ২০০০০০ টন আনারস উৎপন্ন হয়। কিন্তু এই উৎপাদন কম।

১৯৭৫ থেকে ১৯৮২ সাল পর্যন্ত বিধান চন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের জলপাইগুড়ি জেলার মোহিতনগর এবং ময়নাগুড়ির আনারস গবেষণা কেন্দ্রে অনুসন্ধানের ফলে উত্তরবঙ্গে আনারসের উৎপাদন বৃদ্ধি বিষয়ে কিছু খবর পাওয়া গেছে।

জাত—উত্তরবঙ্গে ‘কিউ’ জাতের আনারস

খুব জনপ্রিয়। ব্যবসায়িক ভিত্তিতে চাষের বিশেষ উপযোগী কারণ এই আনারস ক্যানিং শিল্পের উপযোগী। এই জাতের অগ্র গুণগুলির মধ্যে চোখগুলির অগভীরতা, বৃহৎ আকার (১’৮০ থেকে ২’০ কেজি ওজন), হালকা হলুদ রঙের তন্তু-বিহীন রসাল খাড়াংশ, সুগন্ধ এবং রোগ পোকার আক্রমণ সহনশীলতা বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

উপযুক্ত তেউড় নির্বাচন : গবেষণায় দেখা গেছে কাগুজ তেউড় এবং বৃন্তজ তেউড় ৪৭৮ থেকে ৪৮২ দিনে পরিণত হয় এবং ৮৬’৮% কাগুজ তেউড়, ৮০’৫% বৃন্তজ তেউড় এবং ৬৪’১% মুকুট তেউড়ে ফুল আসে। বৃন্তজ তেউড় থেকে হওয়া আনারস সবচেয়ে ভারী ও বড় হয়। উৎপাদনও বেশী হয়। লাগাবার সময় বৃন্তজ

উত্তর বঙ্গে আনারস চাষের উন্নত পদ্ধতি

তেউড় যত বড় এবং ভারী হয় ততই গাছে ভাড়াভাড়া ফুল হয়। ফলের ওজন বেশী হয়, গুণগত উৎকর্ষ বাড়ে, ফল বেশী মিষ্টি হয়। ৪০০ থেকে ৪৫০ গ্রাম ওজনের বৃন্তজ তেউড় থেকে এসব ফুল পাওয়া যায়। তেউড় লাগাবার আগে ১৪ দিন ছায়ায় রেখে লাগালে ফলের ওজন ও ফলন বৃদ্ধি পায়।

তেউড়ের ঘনত্ব : উত্তরবঙ্গে প্রচলিত পদ্ধতিতে হেক্টরে ১৫,০০০—২০,০০০ তেউড় লাগান হয়। তবে উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য তেউড়ের ঘনত্ব বাড়াতে হবে। উত্তরবঙ্গে সারা বছর ভাল বৃষ্টি হয় বলে ঘন করে তেউড় লাগাবার সুবিধা আছে। তবে বেশী ঘন হলে ফলের আকার ছোট হয়।

ভাই ফ্রেতার কথা মনে রেখে গবেষণা দ্বারা উপযুক্ত আকারের আনারসের জন্ম এবং অধিক উৎপাদনের জন্ম হেক্টরে ৬৪,০০০ তেউড় ২৫ X ৩৫ X ৯০ সে.মি. ব্যবধানে লাগাবার সুপারিশ করা হয়েছে। উপরিউক্ত ঘনত্বে চারা বসালে ৯৭—১০০ টন আনারসের ফলন পাওয়া যাবে।

সার প্রয়োগে আনারস ভাল হয়। উত্তর-বঙ্গের কৃষি আবহাওয়ার জন্য হেক্টর প্রতি ৪০০ কেজি নাইট্রোজেন, ২০০ কেজি ফসফরাস এবং ৪০০ কেজি পটাশ ৬৪,০০০ তেউড়ের ঘনত্বে প্রয়োগ করার সুপারিশ করা হয়েছে। সার ফলে হেক্টরে ১১২.৪ টন আনারস পাওয়া গেছে যেখানে এই পরিমাণ সার প্রয়োগ না করে হেক্টরে ৮৪.০ টন উৎপাদন পাওয়া যায়। অর্ধেক নাইট্রোজেন এবং সমস্ত ফসফরাস ও পটাশ - নের মধ্যে তেউড় লাগাবার ৩ মাস

পর মাটি চাপান দেবার সময় প্রয়োগ করতে হবে। বাকি নাইট্রোজেন ছই ভাগে তেউড় লাগাবার ৬ মাস ও ১১ মাসে প্রয়োগ করতে হবে। এ্যামোনিয়ম সালফেট এবং সুপার ফসফেট অগ্ৰাঙ্গ সারের চেয়ে বেশী উপযুক্ত।

পরীক্ষায় দেখা গেছে হেক্টরে ২.৫ কেজি ম্যাগনেসিয়াম সালফেট এবং ১.৫ কেজি বোরাক্স মাটিতে প্রয়োগে গাছে ৮-৯ দিন আগে ফুল আসে। হেক্টরে ৫ কেজি ম্যাগনেসিয়াম সালফেট এবং ৩ কেজি বোরাক্স মাটিতে প্রয়োগ করলে ৬৪,০০০ তেউড়ের ঘনত্বে ভাল ফলন পাওয়া যায়।

সারা বছর ধরে বাজারে আনারস সরবরাহ করতে হলে রাসায়নিক প্রয়োগে ফুল আসার সময় নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। গবেষণায় দেখা গেছে যে, বছরের বিভিন্ন সময়ে আনারস বসিয়ে এবং সময়মত উপযুক্ত রাসায়নিক প্রয়োগ করে সারা বছর ধরে আনারস পাওয়া যায়। এতে শ্রমিকদের কাজ দেওয়ারও সুবিধা হয়। শ্রাবণ থেকে অগ্রহায়ণ মাস পর্যন্ত কিছুদিন পরে পরে চারা লাগান। চারা লাগানোর ১১ মাস পরে গাছে অন্ততঃ ৪০ থেকে ৫০টি পাতা হলে রাসায়নিক প্রয়োগ করুন। প্রতি ৪ লিটার জলে ৮০ গ্রাম হিসাবে ক্যালসিয়াম কার্বাইড অথবা ১ মিলিলিটার হিসাবে ইথারল মিশিয়ে সন্ধার সময় প্রতিটি গাছের মাথখানে ৫০ মিলি-লিটার হিসাবে ঢেলে দিন। এতে অল্পদিন পরেই গাছে ফুল আসবে। ইথারল ফুল আসার ৬০ দিন পর প্রয়োগ করলে হেক্টরে ১০.৪ টন মত ফলন বৃদ্ধি পায়।

[ভারতীয় কৃষি অনুসন্ধান পরিষদের সৌজন্যে]

সংবাদ

কৃষক প্রশিক্ষণ চলছে

খাদ্যশস্যের উৎপাদন বাড়াতে গেলে উন্নত চাষ পদ্ধতি অনুসরণ করা একান্তই প্রয়োজন। যেসব প্রগতিশীল কৃষক উন্নত চাষ পদ্ধতি অনুসরণ করছেন তাঁরা ইতিমধ্যেই তাঁদের জমির উৎপাদন হার বাড়াতে সক্ষম হয়েছেন। আরও বেশী সংখ্যক কৃষক যাতে উন্নত চাষ পদ্ধতি অনুসরণ করে তাদের জমির ফলন বাড়াতে পারেন সেজন্য সরকার থেকে কৃষক প্রশিক্ষণ কার্যসূচী নেওয়া হয়েছে। এই কৃষক প্রশিক্ষণ নিয়মিতভাবে দেওয়া হয়ে থাকে। এই ধরনের একটি প্রশিক্ষণ শিবির ডায়মণ্ডহারবার ১নং ব্লকে সম্প্রতি অনুষ্ঠিত হলো। শিবিরটি পরিচালনা করলেন জেলা প্রশিক্ষণ আধিকারিক। অগ্রাঙ্ক কৃষি বিশেষজ্ঞ যথা কৃষি উন্নয়ন আধিকারিক, কৃষিবিদ প্রভৃতিরও উপস্থিতি ছিলেন। ২০ জনের মত কৃষক উপস্থিত ছিলেন। আলোচনার বিষয় ছিল মাটি পরীক্ষার গুরুত্ব, খরিয় চাষের প্রস্তুতি, তাছাড়া গ্রীষ্মকালীন সবজি চাষ, সঠিক পদ্ধতিতে বীজ

বপন এবং সঠিক পদ্ধতিতে পরিচর্যা ও চাপান সার প্রয়োগ। কৃষকরা তাঁদের নানা সমস্যার কথা তুলে ধরেন। উপস্থিত কৃষি বিশেষজ্ঞরা সেইসব সমস্যার মোকাবিলার পথনির্দেশ দেন।

পুরুষদের উন্নত চাষ পদ্ধতি সম্বন্ধে যেমন শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে গ্রামের মহিলাদেরও কৃষি সংক্রান্ত নানা বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া হয়ে থাকে। তাছাড়া খাদ্য সংরক্ষণ বিষয়ে তাঁদের বিশেষ শিক্ষা দেওয়া হয়। উক্ত ২৪ পরগণার গোসাবা ব্লকের মন্ডথপুর হাইস্কুলে তিনদিনের একটি কৃষক প্রশিক্ষণ শিবির খোলা হয়। সুন্দরবন অঞ্চলে স্বল্প জলে অর্থনৈতিক ফসলের চাষ হিসাবে বিভিন্ন ফসলের চাষ ও পরিচর্যা বিষয়ে প্রমোত্তরের মাধ্যমে আলোচনা করা হয়। মহিলা সমিতির সভ্যাদের শিক্ষণের জন্য একদিন নির্দিষ্ট ছিল। গৃহে খাদ্যশস্য সংরক্ষণ বিষয়ে মহিলাদের শিক্ষা দেওয়া হয়। তাছাড়া কাঁচা আমের নানা ব্যবহার ও সংরক্ষণ সম্বন্ধেও হাতে কলমে শিক্ষা দেওয়া হয়।



আষাঢ় মাসে কৃষকের করণীয়

আষাঢ় বৃষ্টির মাস। এই বৃষ্টির জলের সুযোগ নিয়ে এ রাজ্যের প্রধান ফসল আমন ধানের চাষ শুরু হয়। আউশের চাষ ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গেছে।

আউশ

যারা আউশের চাষ করছেন তাঁদের এখন পরিচর্যার কাজ। অধিক ফলনশীল বোনা আউশ বোনার ১৫ ও ৩০ দিন পরে ৭ কেজি করে এবং ৪০—৪৫ দিন পরে ৬ কেজি এবং রোয়া ধানে ১৫—১৬ দিন পরে ১২ কেজি ও ২৫—৩০ দিন পরে ৬ কেজি নাইট্রোজেন দিন। দেশী উন্নত জাতে ১৫—১৬ এবং ৩০ দিন পরে ৫ কেজি করে নাইট্রোজেন দিন।

আমন

রোয়ার কাজ শুরু করুন। জলদি ও মাঝারি জাতের চারা ২০ সে.মি. (৮ ইঞ্চি) $\times$ ১০—১৫ সে.মি. (৪—৬ ইঞ্চি) দূরত্বে ৫ সে.মি. (২ ইঞ্চি) গভীরে লাগান।

পাট

এই মাসে পাটের পরিচর্যা ও রোগ পোকা দমনের ব্যবস্থা করুন। রোগের প্রকোপ অনুযায়ী ওষুধ ছোটানোর ব্যবস্থা নিতে হবে।

ফুল আসার পর ওষুধ দেবেন না। প্রয়োজন মত চাপান সার দিন।

চীনাবাদাম

এ মাসে চীনাবাদাম চাষ শুরু করুন। ভাল জাত টি-এম-ভি ২ (জলদি) এবং টি-এম-ভি ৭, জে-১১, পেলাচি-১ (নাবি) ও এ-কে ১২-২৪। জমি তৈরির সময় একর প্রতি ৮—১০ গাড়ী গোবর বা কম্পোস্ট সার এবং শেষ চাষের আগে ৬ কেজি নাইট্রোজেন, ১২ কেজি ফসফেট ও ১৮ কেজি পটাশ দিন।

ডালশস্ত্র

ডালশস্ত্রের মধ্যে অড়হর বোনার পক্ষে এ মাস ভাল সময়। যারা বুনতে চান তাঁদের জন্ম বলছি এর ভাল জাত বি-৭, বি-৫১৭ ও সি-১১। জমি তৈরির সময় একর প্রতি ৮ কেজি নাইট্রোজেন ও ১৬ কেজি ফসফেট দিন। বীজ ৬০ সে.মি. $\times$ ৩০ সে.মি. (২' $\times$ ১') দূরত্বে বুনুন।

শাকসবজি

ঢাড়াঁস, বরবটি, কুমড়া, ঝিঙ্গে, করলা, চালকুমড়া, শশা প্রভৃতি বিভিন্ন গ্রীষ্মকালীন সবজির বীজ বুনুন।

কৃষিক্রান্ত

নিয়মান্বলী

পত্রিকায় প্রকাশিতব্য বিষয়বস্তু : কৃষি বিষয়ক পরিকল্পনার তথ্য, গবেষণার ফলাফল সহজে জাতব্য তথ্যাদি, প্রবন্ধ, ছোটগল্প, নাটিকা, সাক্ষাৎকার, নমুনা, কবিতা, প্রযুক্তিগত সমস্যা ও সমাধানের সুপারিশ, প্রয়োজন, কৃষি সম্পর্কীয় সরকারী নীতি, প্রকল্প-পরিচিতি ও কাজের অগ্রগতি, কৃষি যন্ত্রপাতি, সেচ ও বিদ্যুতের ব্যবহারগত সমস্যা ও সুপারিশ, শস্য ও ফসল সংরক্ষণ, সমন্বয় ও কৃষিক্ষেত্র, কৃষি বিপণন, বিভিন্ন জেলার কৃষকদের অভিজ্ঞতার সংবাদ ও রচনা, কৃষকদের স্থানীয় এবং সমষ্টিগত অভাব-অসুবিধার কথা, পশুপক্ষী পালন, মৎস্যচাষ, বনসম্পদ সংরক্ষণ, ভূমি সংরক্ষণ ও সদ্যাবহার, ভূমিসংস্কার-গত রচনা ও সংবাদ, গার্হস্থ্যবিজ্ঞান, সমাজ শিক্ষা ও উন্নয়ন, কৃষিভিত্তিক কুটির ও ক্ষুদ্রশিল্প, গ্রামীণ অর্থনীতি ও কর্ম-সংস্থানের সমস্যাদি এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ে রেখাচিত্র, আলোকচিত্র, চিত্রকলা ইত্যাদি।

রচনার জন্য সম্মানমূল্য : কেবল নিম্নবর্ণিত ধরনের মৌলিক রচনার জন্য (প্রকাশিত হবার পর) নিম্নলিখিত হারে সম্মানমূল্য দেওয়া হবে : (ক) উচ্চমানের কৃষি প্রযুক্তিগত (টেকনিক্যাল) প্রবন্ধ : ৭৫ টাকা, (খ) সাধারণ কৃষি প্রযুক্তিগত (টেকনিক্যাল) প্রবন্ধ : ৫০ টাকা, (গ) সাধারণ কৃষি বিষয়ক প্রবন্ধ/কৃষি বিষয়ক নাটিকা : ৪০ টাকা, (ঘ) সাধারণ প্রবন্ধ ও ছোটগল্প : ৪০ টাকা, (ঙ) কবিতা (প্রকৃতি ও গ্রাম প্রাসঙ্গিক) : ২৫ টাকা।

রচনা ফুলফেপ কাগজের এক পৃষ্ঠার (মোট ১৫০০ শব্দের অনধিক) কালি দিয়ে স্পষ্ট বাংলা অক্ষরে লিখে সম্পাদিকার ঠিকানায় (সম্পাদিকা, বসুন্ধরা, অফসেট প্রেস, ৪২ গ্রাহামস্ রোড, কলিকাতা-৪০) পাঠাতে হবে। রচনার দুইকপি পাঠান বান্ধনীয়। যথাযথ মূল্যের ডাকটিকিট দেওয়া না থাকলে অমনোনীত রচনা ফেরৎ পাঠান হবে না।

গ্রাহক হবার নিয়ম : যে কোন আসে বসুন্ধরার গ্রাহক হওয়া যায়। কিন্তু বাংলা সনের বৈশাখ থেকে চৈত্র পর্যন্ত এক বছরের কম সময়ের জন্য গ্রাহক করা হয় না। মাসিক সংখ্যার প্রতি কপির মূল্য ২৫ পয়সা। অগ্রিম এককালীন প্রদেয় বার্ষিক চাঁদার হার ৩০০ টাকা। চাঁদার টাকা “কৃষি অধিকর্তা পশ্চিমবঙ্গ”-এর নামে লেখা রেখাঙ্কিত (ক্রসড) পোল্টাল অর্ডার অথবা রেখাঙ্কিত চেক-এর মাধ্যমে সম্পাদিক, বসুন্ধরা, অফসেট প্রেস, ৪২, গ্রাহামস্ রোড, কলিকাতা-৭০০০৪০-এ পাঠাতে হবে।

বিজ্ঞাপনের হার : প্রথম প্রচ্ছদের জন্য এবং অর্ধ পৃষ্ঠার কম কোন বিজ্ঞাপন নেওয়া হবে না। প্রচ্ছদ (৪র্থ কভার) : ৫০০ টাকা, প্রচ্ছদ (২য়/৩য় কভার) : ৪০০ টাকা, সাধারণ পূর্ণ পৃষ্ঠা : ৩০০ টাকা, সাধারণ অর্ধ পৃষ্ঠা : ২০০ টাকা। বার্ষিক চুক্তিবদ্ধ বিজ্ঞাপনের অগ্রিম প্রদেয় মোট মূল্যের উপর ২০ শতাংশ হারে এবং ‘আই-ই-এন্-এস’ দ্বারা যৌক্তিক এজেন্সীকে বিজ্ঞাপনের মোট মূল্যের উপর ১৫ শতাংশ হারে কমিশন দেওয়া হয়।

ইহা একটি কৃষি-সম্পর্কিত ব্যবসায় এবং গ্রামীণ সমস্যা ও উন্নয়নমূলক যে কোন বিজ্ঞাপন (সরকারী নীতির পরিপন্থী নয়) প্রচারের কার্যকরী ও উপযুক্ত মাধ্যম। সরকারী, বিধিবদ্ধ/স্বয়ংশাসিত সংস্থা অথবা বেসরকারী প্রতিষ্ঠান, ব্যক্তি, সমন্বয় প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি সকলেই এই পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিতে পারেন।

কমিশন এজেন্ট : কলিকাতাসহ বিভিন্ন জেলায় একাধিক বিক্রয়কারী এজেন্সী তালিকাভুক্ত করা হয়। ১০০ কপির কমে এজেন্সী দেওয়া হয় না। এজেন্সীগুলিকে ২০ শতাংশ হারে কমিশন দেওয়া হয়। এজেন্সীকে অর্ডার দেওয়া কপির মোট মূল্যের টাকা (২০% কমিশন বাদে) অগ্রিম আদায় দিতে হয়।



সপ্তম পঞ্চবার্ষিক যোজনার ব্যাপক প্রস্তুতি

উন্নত মানের বীজ উৎপাদন ও সরবরাহের কাজে
পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বীজ নিগম-এর সম্প্রসারিত কার্যক্রম

উন্নত মানের বীজ উৎপাদন ও সরবরাহ কার্যক্রমে (পাট, ধান, গম, ডালশস্য এবং তৈলবীজ)	বর্তমান পরিস্থিতি (১৯৮৪-৮৫) ৩০০০ মেঃ টন	৭ম যোজনার লক্ষ্যমাত্রা (১৯৮৯-৯০) ১৫,০০০ মেঃ টন
--	--	---

পশ্চিমবঙ্গের জলবায়ু মাটির উপযোগী এ রাজ্যেই উৎপাদিত
উন্নত মানের শংসিত বীজ ব্যবহার করুন
ফলন বাড়ান : আয় বাড়ান

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বীজ নিগম লিঃ-এর জেলা দপ্তর

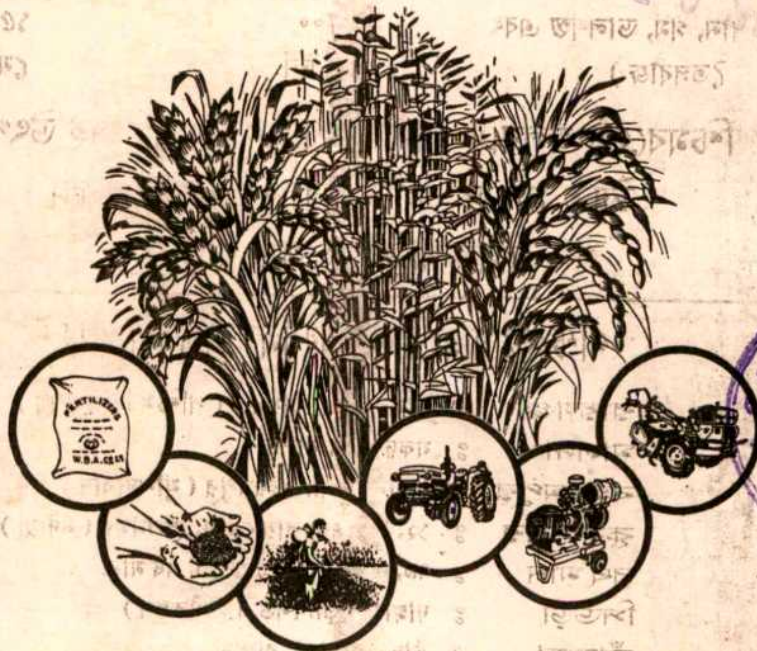
ব্রাহ্মপুঞ্জ	ঃ উকিলপাড়া, রায়গঞ্জ (পশ্চিম দিনাজপুর)
মালদা	ঃ মকদমপুর, মালদা
বহরমপুর	ঃ পঞ্চাননতলা, বহরমপুর (মুর্শিদাবাদ)
কৃষ্ণনগর	ঃ ১২, ডি. এন. রায় রোড, কৃষ্ণনগর (নদীয়া)
বর্ধমান	ঃ ৭৯, এন. এন. বসু রোড, বর্ধমান
সিউড়ী	ঃ দাঙ্গালপাড়া, সিউড়ী (বীরভূম)
বাঁকুড়া	ঃ চাঁদমারীডাঙ্গা, বাঁকুড়া
মেদিনীপুর	ঃ ৩৫/১, অরবিন্দনগর, নরমপুর, মেদিনীপুর

সদর দপ্তর :

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বীজ নিগম লিঃ

৪, গঙ্গাধর বাবু লেন (৬ষ্ঠ তল), কলিকাতা-৭০০০১২

GREEN REVOLUTION— our aim in West Bengal



Green Revolution is our aim. The object is to modernise farming in the State. And Agro-Industries Corporation is lending a helping hand to achieve the goal. The Corporation has been supplying modern implements like Tractors, Sprayers, Threshers and Pump-sets to the farmers on hire or on hire-purchase basis.

The Corporation also supplies quality seeds, fertilisers and pesticides.

Agro-Industries Corporation also provides custom

service for cultivation of cotton/groundnut and for Small Farmers Development Agency and Marginal Farmers & Agricultural Labourers Development Project Schemes.

The Corporation has another role too—to create employment opportunities for Engineering graduates/diploma holders and Agricultural graduates in different Agro-Service centres in this State.

**Hand in hand with farmers—
Agro-Industries Corporation**

West Bengal Agro-Industries Corporation Limited

(West Bengal Govt, Undertaking)

23B, Netaji Subhas Road, (3rd Floor), Calcutta-700 001

Telegram : AGRINPUT

Telephone : 22-2314 / 23-3192

বসুন্ধরা

সপ্তমিশ্র বর্ষ

আষাঢ় • শ্রাবণ • ১৩৩২





সপ্তম পঞ্চবার্ষিক যোজনার ব্যাপক প্রস্তুতি

উন্নত মানের বীজ উৎপাদন ও সরবরাহের কাজে
পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বীজ নিগম-এর সম্প্রসারিত কার্যক্রম

উন্নত মানের বীজ উৎপাদন ও সরবরাহ কার্যক্রমে (পাট, ধান, গম, ডালশস্য এবং তৈলবীজ)	বর্তমান পরিস্থিতি (১৯৮৪-৮৫) ৩০০০ মেঃ টন	৭ম যোজনার লক্ষ্যমাত্রা (১৯৮৯-৯০) ১৫,০০০ মেঃ টন
--	--	---

পশ্চিমবঙ্গের জলবায়ু মাটির উপযোগী এ রাজ্যেই উৎপাদিত
উন্নত মানের শংসিত বীজ ব্যবহার করুন
ফলন বাড়ান : আয় বাড়ান

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বীজ নিগম লিঃ-এর জেলা দপ্তর

রাঙ্গগঞ্জ	ঃ উকিলপাড়া, রাঙ্গগঞ্জ (পশ্চিম দিনাজপুর)
মালদা	ঃ মকদমপুর, মালদা
বহরমপুর	ঃ পঞ্চাননতলা, বহরমপুর (মুর্শিদাবাদ)
কৃষ্ণনগর	ঃ ১২, ডি. এন. রায় রোড, কৃষ্ণনগর (নদীয়া)
বর্ধমান	ঃ ৭৯, এন. এন. বসু রোড, বর্ধমান
সিউড়ী	ঃ দাঙ্গালপাড়া, সিউড়ী (বীরভূম)
বাঁকুড়া	ঃ চাঁদমারীডাঙ্গা, বাঁকুড়া
মেদিনীপুর	ঃ ৩৫/১, অরবিন্দনগর, নরমপুর, মেদিনীপুর

সদর দপ্তর ৪

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বীজ নিগম লিঃ

৪, গঙ্গাধর বাবু লেন (৬ষ্ঠ তল), কলিকাতা-৭০০০১২

সূচী

সম্পাদকীয়	৩-৪
অম্বুবাটা ও কৃষিকেন্দ্রিক সংস্কৃতি ...	৫-৬
অধ্যাপক ডঃ গোপেন্দ্র মুখোপাধ্যায়	
বৃক্ষ রোপণ করে ভূমির নালীক্ষয় রোধ	৭-১০
অনাদি নাথ পাণ্ডা	
ঢারা তৈরী পশ্চিমবাংলার	
একটি সম্ভাবনাময় কৃষিশিল্প ...	১১-১৫
ডঃ রাধাগোবিন্দ মাইতি	
অধিক ফলনশীল জাতের বেগুন	১৬-১৯
শচীন্দ্রনাথ দাস ও	
মোঃ আজিজুল হক	
আমি আলো জ্বালতে পারতাম ...	২০-২৩
সাক্ষাৎকার : চিদানন্দ গোস্বামী	
পশ্চিমবঙ্গে বিভিন্ন অঞ্চলে ধানের কিছু	
নতুন রোগ ও তার প্রতিকার	২৪-২৬
ডঃ ভরতেন্দ্র দেবশর্মা	
সপ্তম যোজনাকালে পশ্চিমবঙ্গে	
ধাত্তোৎপাদন বৃদ্ধির সম্ভাবনা ...	২৭-৩৬
বিষ্ণুপদ মণ্ডল	
ধাত্তোৎপাদনের বিশেষ প্রকল্প	
১৯৮৫-৯০ (কার্যধারা) ...	৩৭-৪১
ভাদ্র মাসে কৃষকের করণীয় ...	৪২

সম্পাদনা উপদেষ্টা পর্বদ

বিষ্ণুপদ মণ্ডল, কৃষি অধিকর্তা, পশ্চিমবঙ্গ
ডঃ জ্যোতিরঞ্জন লাহিড়ী, অপর কৃষি অধিকর্তা

(সাধারণ)

ডঃ দেবব্রত মুখার্জী, অপর কৃষি অধিকর্তা

(গবেষণা)

মুর্জী মুখার্জী, মুখ্য কৃষি অধিকর্তা (সম্প্রসারণ)
জ্যোতির্ময় বোস, উপ-সচিব (উন্নয়ন), কৃষি বিভাগ

অমলেন্দু সরকার, মুখ্য প্রচার ও জনসংযোগ

আধিকারিক, কৃষি অধিকার

অমিয় কুমার মিত্র, জেলা কৃষি তথ্য আধিকারিক
(সদর)

স্বলেখা ঘোষ, সম্পাদিকা

চিদানন্দ গোস্বামী, সহ-সম্পাদক

প্রধান সম্পাদক

বিষ্ণুপদ মণ্ডল, কৃষি অধিকর্তা, পশ্চিমবঙ্গ

বসুন্ধরা

আষাঢ়-শ্রাবণ-১৩৯২

কৃষি অধিকার (কৃষি তথ্য সংস্থা)

পঃ বঃ সরকার কর্তৃক প্রকাশিত ও প্রচারিত

**উন্নত প্রথায় আমন ধানের চাষ করে
অধিক ফলন ও বাড়তি লাভ সুনিশ্চিত করুন।**

- জমির অবস্থান অনুযায়ী অধিক ফলনশীল বা উন্নত জাতের ধানের চারা লাগান।
- সময়মত ঠিক বয়সের চারা লাগান।
- চারা তোলার আগে বীজতলায় ৭-৮ দিন আগে কীটনাশক ওষুধ বীজতলায় দিন ও চারাগুলি সুস্থ রাখুন।

আমন ধানের জাত	শেষ চাষের আগে (একর প্রতি কেজি)			চাপান সার (নাইট্রোজেন) — (একর প্রতি কেজিতে)	
	নাইট্রোজেন ফসফেট পটাশ				
অধিক ফলনশীল					
(ক) জলদি	৫	১০	১০	১০	রোয়ার ১৫ দিন পরে
(১০০—১২০ দিন)				৫	” ৩০—৪০ ” ”
(খ) মাঝারি	৬	১২	১২	১২	” ১৫ ” ”
(১২০—১৩০ দিন)				৬	” ৪০—৪৫ ” ”
(গ) মাঝারি নাবি ও নাবি	১২	১২	১২	১২	” ৫৫—৬০ ” ”
(ঘ) দেশী উন্নত	৮	৮	৮	৮	খোড় আসার আগে

- সময়মত নিড়ান দিন ও রোগ পোকাকার আক্রমণ থেকে ধানের গাছগুলিকে রক্ষা করুন।

বিস্তৃত বিবরণের জন্য আমাদের প্রকল্পকর্মী / কৃষিকর্মীদের সংগে যোগাযোগ করুন :

ভারত-জার্মান সার প্রশিক্ষণ প্রকল্প

১২বি, রাসেল স্ট্রিট, কলিকাতা-৭০০০৭১, ফোন : ২১-২৬৩২-৩৪

সম্পাদক



অনিবার্য কারণে এ বছর আষাঢ় ও শ্রাবণ সংখ্যা যুক্তভাবে প্রকাশিত হলো। পরবর্তী মাসিক সংখ্যাগুলি যাতে সময়মত প্রকাশ করা যায় সেজন্য এই সাময়িক ব্যবস্থা নেওয়া হলো। আশা করি এজন্য গ্রাহক, কৃষক এবং পৃষ্ঠপোষকদের সহানুভূতি থেকে আমরা বঞ্চিত হবো না। এই যুক্ত সংখ্যায় দু মাসের প্রয়োজনীয় তথ্য যতটা সম্ভব সংযোজন করার চেষ্টা করা হয়েছে এবং এজন্য এই যুক্ত সংখ্যাটি কিছু বর্ধিত আকারে প্রকাশ করা হলো।

চাষবাসের কথায় আসি। এখন এ রাজ্যের প্রধান ফসল আমন ধান চাষের মরসুম। চারা রোয়ার কাজ শুরু হয়েছে। ভাল ফলনের জন্য আষাঢ় থেকে শ্রাবণের মধ্যে রোয়ার কাজ শেষ করা দরকার। ধান যেহেতু এ রাজ্যের প্রধান ফসল, তাই এর ভাল ফলনের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয় যথেষ্ট। বিগত পর পর দুটি বছরেই এ রাজ্যে ধানের ফলন ভাল হয়েছে। এ বছরও যাতে ফলনের পরিমাণ অব্যাহত থাকে তারজন্য আমাদের চেষ্টা করতে হবে। এ বছর আমন ধানের লক্ষ্যসীমা ৬৩ লক্ষ টন (চালের হিসাবে) ধরা হয়েছে। এ লক্ষ্যে পৌঁছাতে গেলে এখন থেকে আমাদের তৎপর হতে হবে।

আমন মরসুমে অধিক ফলনশীল জাতের ধানের চাষ আগের তুলনায় বেড়েছে। ভাল ফলনের জন্য ধান রোয়ার সময় কতগুলি বিষয়ের উপর গুরুত্ব দিলে ফলন অনেক ভাল পাওয়া যাবে। যেমন চারা রোয়ার সময় মনে রাখতে হবে চারার বয়স যেন কোনমতেই বেশী না হয়। চারার বয়স জলদি জাতের বেলায় ৩ সপ্তাহ, মাঝারি জাতের বেলায় ৪ সপ্তাহ ও নাবি জাতের বেলায় ৫ সপ্তাহ হওয়াই ভাল। চারায় মোটামুটি ৫-৬টি পাতা হলেই রোয়ার উপযুক্ত হবে। শুধু ঠিক বয়সের চারা হলেই হবে না, সতেজ ও নীরোগ চারা ভাল ফলনের জন্য একান্ত প্রয়োজন। রোয়ার সময় প্রতি গুছিতে চারার সংখ্যা যেন কম না হয়। প্রতি হাতে অন্ততঃ চারটি গুছি রোয়া উচিত যাতে জমিতে যথেষ্ট সংখ্যক চারা জন্মায়।

ভারপরই হলো সারের ব্যবহার। ভাল ফলনের জন্য সারের ব্যবহার সম্বন্ধে বিশেষ যত্ন নেওয়া দরকার। কোন সার কখন কতটা দিতে হবে সে সম্বন্ধে কৃষকরা যেন কৃষি বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে পরামর্শ করেন। কারণ সারের ব্যবহার যদি ঠিকমত সময়ে এবং সঠিক

পরিমাণে করা যায় তাহলে ভাল ফলনের আশা অনেকটা উজ্জ্বল হয়।

বর্তমানে লক্ষ্য করা যাচ্ছে কীট ও রোগের আক্রমণ ভাল ফলনের পথে বড় অন্তরায় হয়ে দাঁড়াচ্ছে। রোগ ও কীটশত্রুর আক্রমণে ফসলের অনেক সময় দারুণ ক্ষতি হয়। সেজন্য প্রতিরোধ ব্যবস্থার উপর জোর দেওয়া ভাল। তাতে খরচ ও ক্ষতি দুই এর হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। তবে রোগ ও পোকাকার আক্রমণ হলে যদি সঠিক সময়ে তা দমনের ব্যবস্থা নেওয়া হয় তাহলেও ক্ষতির হাত থেকে ফসল বাঁচানো সহজ হয়। এ সম্বন্ধে কৃষকরা যেন কৃষি বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে পরামর্শ করেন।

আমন ধানের চাষ প্রধানতঃ বৃষ্টি-নির্ভর। প্রাকৃতিক পরিবেশ অমুকূল থাকা এই ধানের ভাল ফলনের জন্য একান্ত প্রয়োজন। ধানের মোট উৎপাদন আমাদের বাড়িতে হবে। এ বছর প্রাকৃতিক অবস্থা এখনও অমুকূল। কৃষকরা রোয়ার কাজ শেষ করে যত্ন ও তদারকির মাধ্যমে উৎপাদন বাড়িয়ে তুলুন। উন্নত প্রযুক্তির ব্যবহারে এবং কৃষি প্রযুক্তিবিদদের সহায়তায় এবং কৃষকদের সক্রিয় চেষ্টায় তা করা নিশ্চয়ই সম্ভব হবে।

অম্বুবাচী ও কৃষিকেন্দ্রিক মনস্কৃতি

কৃষিকে কেন্দ্র করে না হলেও বাংলার অনেক উৎসবই কৃষির সঙ্গে অঙ্গবিস্তর সম্পর্ক রাখে। নবান্ন, রথ, হালফিলের বনমহোৎসব প্রভৃতির সঙ্গে মাটির, শস্যের ও বৃক্ষের যোগ আছে। কিন্তু হলকর্ষণের সঙ্গে যে উৎসবের অঙ্গাদী সম্পর্ক রয়েছে—তা হ'ল অম্বুবাচী উৎসব। অম্বুবাচীর প্রবৃত্তি হয় ৭ই আষাঢ়। লোকপ্রবাদে বলা হ'য়েছে,

“নেইকো চাষার পুঁজিপাতি।

সাতই আষাঢ় অম্বুবাতি ॥

অম্বুবাচীর দিনটি কৃষিকার্য আরম্ভের শুভদিন হিসেবে পরিগণিত। অম্বুবাচীর তিনদিন জমিতে লাঙ্গল দেওয়া এবং বীজবপন নিষিদ্ধ। লোকবিশ্বাস যে, এ সময়ে ধরিত্রীদেবী ঋতুমতী হন। ধরিত্রীই হ'লেন কৃষির উৎপাদিকা। রজঃস্থলা অবস্থায় নারীতে গর্ভাধানও শাস্ত্র-বিরুদ্ধ। কৃষকের দৃষ্টিতে কর্ষণ ও প্রজনন অভিন্ন ব্যাপার। কৃষিতত্ত্বে যুগল দেবতারূপে সূর্য ও পৃথিবী (পিতৃদেবতা ও মাতৃদেবতা) উপাস্ত। উপরিভাগ থেকে সূর্য বারিবর্ষণ করেন, প্রদান করেন প্রয়োজনীয় উত্তাপ। 'লাঙ্গল'

অধ্যাপক ডক্টর গোপেন্দ্র মুখোপাধ্যায়

বস্তুত: প্রজনন-দণ্ডের প্রতীক। 'লিঙ্গ' ও 'লাঙ্গল' দুটিই অস্ট্রিক শব্দ এবং এ দুয়ের মূল এক। বারিবর্ষণ এবং উত্তাপের সার্থক সমীকরণে পৃথিবী হন সার্বিক পরিতৃপ্তা। আর লাঙ্গল, বারিবর্ষণ, উত্তাপ ইত্যাদির সঙ্গত মিলনের ফলশ্রুতিই হ'ল পৃথিবীর কোলে কচিশস্য।

অম্বুবাচীতে হলকর্ষণ নিষিদ্ধ কেন, এ বিষয়ে বাস্তবায়ুগ ব্যাখ্যা দিয়েছেন স্বামী সোমেশ্বরানন্দ তাঁর গ্রন্থে, “অম্বুবাচীর তিনদিন জমিতে হলকর্ষণ নিষেধ। কেন? বর্ষার শুরুতে এই অম্বুবাচী। গ্রীষ্মের দাবদাহে মাঠ শুকনো, চাষবাসের অমুপযোগী। বৃষ্টি আসার সাথে সাথেই কৃষক লাঙ্গল নিয়ে মাঠে নেমে পড়তে চায়। কিন্তু দেখা দেয় দুটি সমস্যা। কয়েক-দিন বৃষ্টি পড়ে মাঠ নরম না হ'লে বলদ ৫

বহুধরা : আষাঢ়-শ্রাবণ : ১৩৯২

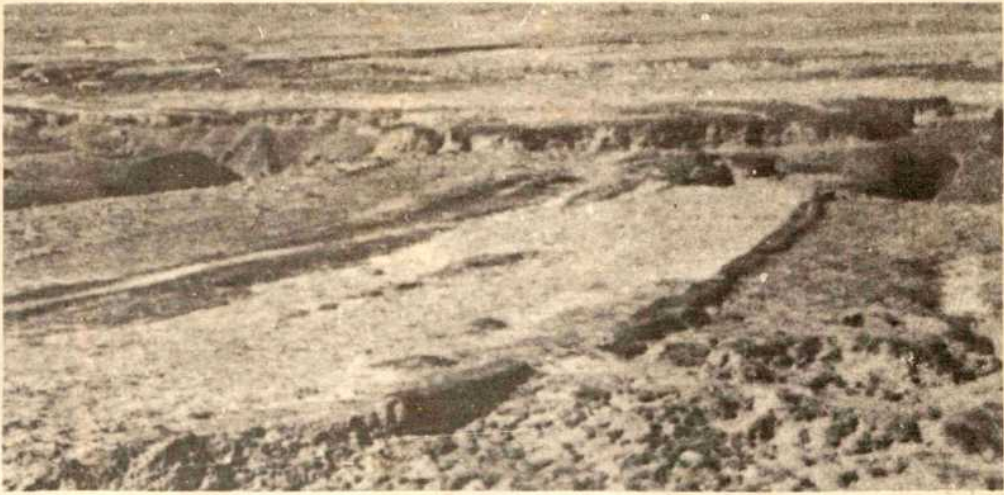
কৃষক উভয়েরই কষ্ট লাঙ্গল চালাতে। তাছাড়া বর্ষার সাথে সাথে বৃষ্টির জল মাটিতে ঢুকলে গর্ত থেকে সাপ বেরিয়ে আসে। এই ছুটি সমস্তার নিরাকরণে নিয়ম হ'ল অম্বুবাচী উপলক্ষ্যে তিনদিন মাঠে হলকর্ষণ নিষেধ। এটিকে আইনের মর্যাদা দেবার জ্ঞান ধর্মীয় কাহিনী যুক্ত হ'ল—এই তিনদিন পৃথিবীমাতা রজঃস্রাবা থাকেন, এজ্ঞা হলকর্ষণ করে তাকে কষ্ট দেওয়া উচিত নয়।” (ঋগ্বেদ : ‘ধর্ম, কুসংস্কার ও লোকাচার’— পৃ: ৩৯)। বস্তুত: অম্বুবাচীর সময়েই পৃথিবী বীজধারণের ও তাকে লালন পালনের উপযোগী হ'য়ে ওঠে। সে কারণে অম্বুবাচীর অব্যবহিত পরেই কৃষকগণ জমিতে চাষ দেয়, সেখানে বীজতলা তৈরী করে, আমন ধানের বপন কার্যে আত্মনিয়োগ ক'রে থাকে।

অম্বু (জল)—বচ্ (বলা)+ই কর্তৃ, বিকল্পে ঙ্রপ্=অম্বুবাচী। ‘পৃথিবী যখন জলের ভাষায় কথা কয়’ (রবীন্দ্রনাথ)। আসলে এ সময় থেকেই বর্ষার সূচনা হ'য়ে থাকে। জলাগমনের বার্তা বহন ক'রে আনে বলেই এর নাম অম্বুবাচী। বর্ষার আগমন-বার্তায় কৃষককুল পুলকিত হয়, তিনদিন তারা ‘বর্ষামঙ্গল’ উৎসবে মাতে, ছুটি নেয় চাষের কাজ থেকে। এ কারণেই বন্ধ থাকে হলকর্ষণ, বীজবপন ও আত্মবিক্ষিপ্ত কৃষিকেন্দ্রিক কৃত্যাদি।

জ্যোতির্বিদগণের মতে, অম্বুবাচীর বিষয়টি

বৃষ্টি ও কৃষিজ্যোতিষের অন্তর্গত। আষাঢ় মাসে মিথুনরাশিস্থ সূর্য যখন আর্দ্রানক্ষত্রের প্রথমপাদ ভোগ করেন। এই স্থিতিকাল তিনদিন কুড়ি দণ্ড। সূর্য প্রাতি মাসে ছুটি পূর্ণ নক্ষত্র একপাদ ভোগ ক'রে থাকেন। বৈশাখ মাসে অশ্বিনী এবং ভরণী এই দুটি পূর্ণ নক্ষত্র ও কৃত্তিকার একপাদ, জ্যৈষ্ঠ মাসে কৃত্তিকার শেষ তিনপাদ, সম্পূর্ণ রোহিণী ও মৃগশিরার দুইপাদ, আষাঢ় মাসের প্রথম ছদিন চল্লিশদণ্ডে মৃগশিরার শেষ দুইপাদ ভোগ ক'রে থাকেন। তারপরে যে তিনদিন কুড়ি দণ্ড সূর্য আর্দ্রানক্ষত্রের প্রথমপাদে থাকেন তারই নাম অম্বুবাচী। এ সময়ে পৃথিবী ভিতরে ভিতরে রজঃস্রাবা হন অর্থাৎ বারিবর্ষণের ফলে ধরিত্রী রসযুক্তা হ'য়ে বীজকে অংকুরিত করার ব্যাপারে যথোপযোগিনী হন। আগামী বছরের ফসল ধারণ করার পক্ষে মাটি উপযুক্ত হ'য়ে ওঠে।

অম্বুবাচী উৎসব উপলক্ষ্যে বর্ধমান জেলার খণ্ডঘোষ থানাস্থগত ‘বোঁয়াই’ গ্রামে ‘বসন্তচণ্ডীর’ থানে প্রচুর যাত্ হয়। এই উৎসবকে কেন্দ্র ক'রে বিরাট মেলা বসে এ সময়ে। ঐ দেবীর বিশেষ পূজাও অহুষ্ঠিত হয়। অম্বুবাচীর সময় পর্যাপ্ত বারিপাত হ'তে দেখা যায়। অম্বুবাচীর তিনটি দিন ত্রতী ও ত্রতিনীরা ফলমূল আহাঙ্গাদির দ্বারা অতি নিষ্ঠার সঙ্গে এই তিথি উদ্‌যাপন করে থাকেন।



বৃক্ষ রোপন করে ভূমির নালীক্ষয় রোধ

অনাদি নাথ পাণ্ডা

বৃক্ষ রোপণ করে ভূমির নালীক্ষয় রোধের কথা আজ দীর্ঘ দিন ধরে আলোচনা চলছে ও বাস্তবে রূপ দেওয়ার কথাও চিন্তা করা হচ্ছে। উত্তরপ্রদেশ, পাঞ্জাব ও হিমাচলপ্রদেশে আগেই এই প্রকল্পের কাজ শুরু করা হয়েছে। এবং এর প্রত্যক্ষ ফলও দেখা গেছে। আজ আমাদের দেশে যে ব্যাপক ভূমিক্ষয় সমস্যা দেখা দিয়েছে তাতে মনে হয় বৃক্ষ রোপণ করে ভূমিক্ষয় রোধ করা একটি অতি সহজ ও স্মৃষ্ণ পন্থা। এই সহজ পন্থাকে অনুসরণ করে পুরুলিয়া জেলাতে বৃক্ষ রোপণ প্রকল্পকে বাস্তবে রূপ দিয়ে কম খরচে ভূমির নালীক্ষয় রোধের একটি স্মৃষ্ণ প্রতিকারের উপায় পাওয়া গিয়েছে।

কৃষি উন্নয়ন আধিকারিক (ভূমি সংরক্ষণ), পুরুলিয়া (সম্প্রসারণ)।

এ জেলার ভূমি যেহেতু ঢাল-যুক্ত ও মাটির গ্রন্থন হাল্কা এবং আচ্ছাদনহীন তাই এখানে বৃষ্টির জলের ঢলের দ্বারা ক্রমাগত ক্ষয় হওয়ার ফলে জমিতে অসংখ্য ছোট, বড় ও গভীর নালী তৈরী হয়। এই সব জমিতে ফসলের চাষ সম্ভব হয় না, ফলে এ সব জমি অবহেলায় ও অযত্নে পড়ে থাকার জন্য ভূমিক্ষয়ের তীব্রতা ক্রমে আরো বাড়ছে। ভূমি সংরক্ষণ প্রকল্পের কাজ এই সব এলাকায় চলছে কিন্তু এই অসংখ্য ছোট, বড় ও গভীর নালীক্ষয় এলাকাগুলি মাটির বাঁধ বা পাকা বাঁধ দিয়ে প্রতিকার করা প্রচুর ব্যয়-সাপেক্ষ কাজ। তাই সহজ উপায় হিসাবে কম খরচে বৃক্ষ রোপণ করে নালীক্ষয়

বহুধর : আষাঢ়-শ্রাবণ : ১৩৯২

রোধ করার চেষ্টা চলছে।

যে সব নালীক্ষয় জনিত জমি ফসল চাষের উপযুক্ত নয় এমন সব জমিতে যদি বৃক্ষ রোপণ করে নালীক্ষয় রোধের একটা স্মৃষ্টি প্রতিকার করা যায় তাহলে কম খরচে অনায়াসেই বহু নালীক্ষয়-কবলিত জমি ক্ষয়ের হাত থেকে রক্ষা পাবে। এ ছাড়া কম আয়াসে কৃষকের একটা বাড়তি আয়ও হবে। কৃষক তার প্রয়োজনীয় জ্বালানী কাঠ, গো-খাড়া, কৃষিযন্ত্রপাতি ও গৃহ নির্মাণের কাঠ এই সব বৃক্ষ থেকে সংগ্রহ করতে পারবে। তাই বৃক্ষ রোপণ করে নালীক্ষয়ের একটা স্মৃষ্টি প্রতিকার ও তার প্রত্যক্ষ ফল লাভের আশায় ১৯৭৯-৮০ সালে পুর্নালিয়া জেলার 'হুড়া' ব্লকের অন্তর্গত জবড়রা ক্ষুদ্র অববাহিকাতে একটি দীর্ঘ গভীর সম্মীর্ণ নালীতে বৃক্ষ রোপণ করা হয় স্থানীয় কৃষক ও গ্রাম পঞ্চায়েতের সহযোগিতায়। এই নালীর যে পরিমাণ জমি ফসল চাষের উপযুক্ত নয় সেই পরিমাণ জমি বৃক্ষ রোপণ করার জন্য নেওয়া হয়। এই জমির মোট পরিমাণ এক হেক্টরের মত।

প্রকল্পটির কাজের বিবরণ

প্রথমে নালীর উপরের অংশে একটি মাটির ছোট বাঁধ করে ও ঘাসের আচ্ছাদন দিয়ে নালী তৈরী করে জলের ঢলের গতি পরিবর্তন করা হয়। এবং মাটিতে জলীয় অংশ সংরক্ষণের জন্য ২'৫০ মিটার অন্তর অন্তর ষ্ট্যাগার্ড পিট খনন করা হয়, পরে নালীর মাথায়, ছপাশে ও নালীগর্ভে বিভিন্ন জাতের গাছ লাগানো হয়।

যেমন :—

১। নালীর মাথায়—শিমূল, সুবাবুল ও আকাশমণি।

২। নালীর ছপাশে—আকাশমণি, ঘোড়া-নিম, করক ও শিল্প।

৩। নালীগর্ভে—বাঁশ ও শিল্প।

এ ছাড়া জলের ঢলের গতি নিয়ন্ত্রণ করার জন্য আইপোমিয়া, ভেরেণ্ডা ও নিশিদ্ধা নালীতে আড়াআড়িভাবে লাগানো হয়।

প্রকল্পটির লক্ষণীয় প্রত্যক্ষ ফল

(১) প্রকল্পটি করার ফলে নগ্ন আচ্ছাদনহীন নালীক্ষয় জনিত অগভীর হাঙ্গা কাঁকুরে মাটিযুক্ত টাঁড় বা উচ্চভূমিতে একটি সবুজের আবরণ তৈরী হয়েছে।

(২) এই জমিতে গাছ লাগানোর ফলে বৃষ্টির ফোঁটাগুলি সরাসরি প্রচণ্ড বেগে মাটিতে আঘাত করতে পারছে না। কারণ বৃষ্টির ফোঁটাগুলি প্রথমে গাছের পাতার উপর পড়ছে। ফলে তার প্রচণ্ড গতি নিয়ন্ত্রিত হয়ে পরে আস্তে আস্তে মাটিতে পড়ছে। মাটির পর্দা-আকারে ক্ষয় এবং ছোট ছোট নালীক্ষয় ক্রমে বন্ধ হয়ে আসছে।

(৩) নালীগর্ভে বাঁশ, ভেরেণ্ডা, আইপো-মিয়া, নিশিদ্ধা ইত্যাদি আড়াআড়িভাবে লাগানোর ফলে এই সব গাছ নালী দিয়ে প্রবল বেগে নেমে আসা জলের ঢলের গতি নিয়ন্ত্রিত করছে। এবং জলের ঢলের ক্ষয় ও বহন ক্ষমতা কমেছে। এর ফলে নালীর উপরের অংশ থেকে জলের ঢলের সাথে বয়ে আনা পলি, বালি ও কাঁকর ক্রমশঃ এই নালীগর্ভেই জমছে। ক্রমে এই গভীর নালী অগভীর নালীতে রূপান্তরিত হতে চলেছে।

(৪) নালীর উপরের অংশে গাছ লাগানোর ফলে নালীটি আর বাড়তে পারছে না। কারণ

গাছের শিকড় নালী তৈরীর একটা বাধা স্বরূপ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এবং নালীটির দু' পাশে এঁ একই অবস্থা।

(৫) যে নালী একদিন শুকনো বালি ও কঁাকরে ভর্তি ছিল সেখানে এখন বিশেষ করে নালীর নীচের অংশে বৎসরের সব সময়েই জলীয়

অংশ দেখতে পাওয়া যায়।

(৬) পূর্বে নালী দিয়ে জলের ঢল পলি ও বালি বহন করে আনতো বলে জলের রং ঘোলাটে ছিল কিন্তু প্রকল্পটি করার ২-৩ বৎসর পর নালী দিয়ে পরিষ্কার স্বচ্ছ জল নেমে আসতে দেখা যায়।

প্রকল্পের রূপায়ণ বাবদ ব্যয় :

কাজের বিবরণ

খরচের পরিমাণ (টাকা)

(১) মাটির কাজ

৩'X১'X২' মাপের ৫৫০টি স্ট্যাগার্ড পিট খনন ও নালীর মাথায় জলের ঢলের গতি পরিবর্তন করার জন্য মোট মাটির পরিমাণ ৫০০০ ঘন ফুট (প্রতি হাজার ঘন ফুট মাটির জন্য ৬৮ টাকা করে)

৩৬০

(২) নালীগর্ভে লাগানো ২৫টি বাঁশের দাম

(প্রতিটি বাঁশের দাম ৫ টাকা হিসাবে)

১২৫

(৩) চারাগাছ

শিশু, আকাশমণি, করঞ্চ, শিমূল, ঘোড়ানিম (মোট ২০০০টি)
ভেরেণ্ডা, নিশিদ্ধা, আইপোমিয়া ইত্যাদি

বন বিভাগের বীজতলা ও আশপাশের গ্রাম থেকে স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েত ও চাষীদের মাধ্যমে সংগ্রহ করা হয়েছে।

(৪) রাসায়নিক সার

সুফলা ২০ : ২০ : ০—এক কুইন্টাল
(প্রতি কুইন্টাল ২১০ টাকা হিসাবে)

২১০

(৫) গাছ লাগানো, ছোট ছোট গর্ত খোঁড়া ও

জল দেওয়া বাবদ মজুরি খরচ

৩০০

(৬) অচ্যাপ্ত খরচ

৯০

(৭) পঞ্চবর্তী পরিচর্যা

৫০০

মোট টাকার পরিমাণ

১,৫৮৫

বসুন্ধরা : আষাঢ়-শ্রাবণ : ১৩৯২

প্রকল্পটির ব্যয় ও লাভের তথ্য ও অনুপাত

১) এক হেক্টরে বৃক্ষ রোপণ বাবদ মোট ব্যয়	১৫৮৫'০০ টাকা
২) ১০ বছর পর এক হেক্টর জমিতে অল্পমিত কাঠের উৎপাদন ১০০০ কুইন্টাল ধরে নিয়ে কুইন্টাল প্রতি ২০ টাকা হিসেবে মোট আয়	২০০০০'০০ টাকা
৩) অবহেলিত ও নালীক্ষয় রোগাক্রান্ত টাঁড় জমি থেকে কৃষকের বাৎসরিক বাড়তি আয়	১৮৪১'০০ টাকা
৪) এক হেক্টর জমি থেকে মোট লাভ	২১৮৪১'০০ টাকা
৫) এক হেক্টর জমি থেকে নীট লাভ	২০২৫৬'০০ টাকা
৬) ব্যয় ও লাভের অনুপাত	১ : ১১'৭

এই প্রকল্পটিকে আরো কম খরচে করা যেতে পারে, যদি স্থানীয় গাছগাছড়া দিয়ে তৈরী করা যায়। প্রকল্পটি করার ফলে স্থানীয় কৃষকদের মধ্যে নালীক্ষয় এলাকাগুলিতে বৃক্ষ রোপণ করার একটা আগ্রহ জাগিয়ে তুলেছে। তাঁরা এখন ঐসব অনাবাদি ও ভূমিক্ষয়জনিত জমিতে বৃক্ষ রোপণের মাধ্যমে ভূমিক্ষয় রোধ করতে শুরু করেছেন। আলকড়ি গ্রামের কিঙ্কর মাহাত ও অজিত মাহাত প্রায় ৩ থেকে ৪ একর জমির উপর বৃক্ষ রোপণের কাজ ১৯৮২-৮৩ সালে শেষ করেছেন। এ ছাড়া ১৯৮৪-৮৫ সালে প্রায় ১২০০ মত বিভিন্ন ফলের গাছ লাগিয়েছেন। এবং নুতনডি গ্রামের বেশ কয়েকজন কৃষক তাঁদের ঐ নালীক্ষয় এলাকা-গুলিতে বৃক্ষ রোপণের কাজ শুরু করেছেন। আকাশমনি, শিশু ও ইউক্যালিপটাস, প্রভৃতি গাছের চারা তাঁরা রোপণ করেছেন। কিন্তু এ বৎসর তাঁরা কিছু গো-খাত্তের গাছ ও কিছু দামী আসবাবপত্র ও গৃহনির্মাণের পক্ষে উপযুক্ত

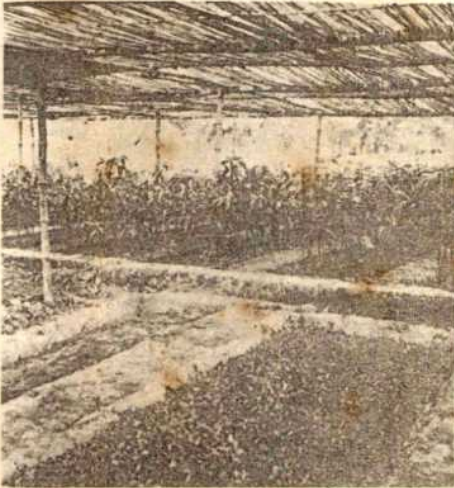
গাছের চারা রোপণ করবেন স্থির করেছেন।

পুকুরিয়া জেলাতে বৃক্ষ রোপণের প্রয়োজন আছে। এখানে বেশীর ভাগ জমিই হোল টাঁড় বা উচু জমি। ঐসব জমি ফসল চাষের উপযুক্ত নয় সুতরাং স্বযোগও অনেক। কৃষি বিভাগের ভূমি সংরক্ষণ শাখা থেকেও চেষ্টা চলছে। এ ছাড়া যে-সকল জমি ফসল চাষের উপযুক্ত নয় এখন ওইসব ভূমিক্ষয় জনিত জমিতে কৃষি বিভাগের ভূমি সংরক্ষণ শাখা দ্বারা চালের আড়াআড়ি বাঁধ দিয়ে বন বিভাগের মাধ্যমে সমাজভিত্তিক বনস্বজনের প্রয়াস চলছে। এ ব্যাপারে ভূমি সংরক্ষণ শাখার পরামর্শ অনুযায়ী চায়ীরা নিজেরাই স্থানীয় বন বিভাগের সাথে যোগাযোগ করে নিজ নিজ জমিতে বৃক্ষ রোপণের কাজ শুরু করেছেন।

গত ১৯৮৪-৮৫ সালে এরূপ বেশ কিছু পরিমাণ জমিতে সমাজভিত্তিক বনস্বজন করা হয়েছে। ১৯৮৫-৮৬ সালে তা দ্বিগুণ হবে বলে আশা করা যায়।

চারা যদি উন্নতমানের না হয় তবে যত্ন ও পরিচর্যা যতই ভাল মানের হোক না কেন ফসল লাভজনক হবে না। যত্ন ও পরিচর্যার ফলে গাছ ভাল হবে, ফলনও বাড়বে, কিন্তু ফসলের গুণগত মান উন্নত না হলে বাজারে তার দাম ও চাহিদা কোনটাই ভাল হবে না। তাই ভাল ফসলের জন্ম চাই ভাল চারা।

পশ্চিমবাংলায় বাৎসরিক কৃষি উৎপাদনের মোট মূল্য বর্তমানে তিন থেকে সাড়ে তিন হাজার কোটি টাকা। তার মধ্যে পাঁচ থেকে ছ'শ কোটি টাকা আসে উদ্ভানজাত ফসল থেকে। উদ্ভানজাত ফসল বলতে সাধারণতঃ বোখায় ফুল, ফল ও সবজিকে। এই ফুল, ফল ও সবজির জন্ম প্রয়োজনীয় চারার বেশীর ভাগ তৈরী হয় উদ্ভিদ-অঙ্গন অর্থাৎ নার্সারীতে। তাই এ রাজ্যের উদ্ভানজাত ফসলের উন্নতির জন্ম সর্বাগ্রে প্রয়োজন উদ্ভিদঅঙ্গনের উন্নয়ন।



চারা তৈরী পশ্চিম বাংলার একটি সম্ভাবনাময় কৃষিশিল্প

ডক্টর রাধাগোবিন্দ মাইতি

বিধানচল কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়।



পশ্চিমবাংলায় ছোট-বড় কত যে উদ্ভিদঅঙ্গন আছে তার কোন সঠিক হিসাব নাই। তবে সংখ্যাটা চার হাজারকেও ছাড়িয়ে যেতে পারে। শুধুমাত্র চব্বিশ পরগণা জেলার আমতলা অঞ্চলে বিষ্ণুপুর ব্লক-১, বিষ্ণুপুর ব্লক-২ এবং বজ্রবজ্র ব্লক-২ এলাকায় ছোট-বড় উদ্ভিদঅঙ্গনের সংখ্যা সাড়ে ছ'শ'র কাছাকাছি। কালিম্পং ও দার্জিলিং অঞ্চলেও প্রচুর আছে। দমদম থেকে রাজারহাট, শিখরপুর হয়ে ভাঙ্গড় যাওয়ার পথে পড়ে বহু উদ্ভিদঅঙ্গন। শুধুমাত্র শিখরপুর ও আশপাশের লাগাও গ্রামগুলিতে এর সংখ্যা শতখানেকের বেশী। রাজ্য জুড়ে এরকম উদ্ভিদ-অঙ্গন যত্রতত্র ছড়িয়ে আছে; তাদের জোট কোথাও বেশী, কোথাও কম।

ছ'-সাত একর আয়তনের উদ্ভিদঅঙ্গন ছ'-দশটা থাকলেও এরাজ্যের বেশীর ভাগ উদ্ভিদ-অঙ্গনই বেশ ছোট মাপের। তাদের গড় আয়তন এক একরের কাছাকাছি। এই হিসাব অনুসারে পশ্চিমবাংলার উদ্ভিদঅঙ্গনগুলির মোট আয়তন প্রায় ৪০০০ একর। পরিমাণটি সামান্য হলেও তাদের উৎপাদন মূল্য কম নয়। একটা ভাল উদ্ভিদঅঙ্গনে প্রতি একরে প্রতি বছর যে পরিমাণ চারা তৈরী হয় তার মোট মূল্য এক লক্ষ টাকা। ভালমন্দের গড় নিয়ে এই সংখ্যাকে পঞ্চাশ হাজার টাকায় নামিয়ে আনলেও এ রাজ্যে উৎপাদিত চারার বার্ষিক মোট মূল্য দাঁড়ায় কুড়ি কোটি টাকা।

পাতাল রেল বা দ্বিতীয় হুগলী সেতু নির্মাণ ব্যয়ের তুলনায় অংকটা অকিঞ্চিৎকর হলেও এই টাকা উপার্জনের বিনিময়ে অন্ততঃ কুড়ি হাজার পরিবারের ভাত-কাপড় ও সাংসারিক ব্যয়ের

সংস্থান হচ্ছে। এর মধ্যে প্রায় ষোল হাজার পরিবারের ভরণ-পোষণ হয় সরাসরি চারা উৎপাদনের মাধ্যমে। অগ্ররা জড়িত টব তৈরী, বুড়ি তৈরী, পরিবহন প্রভৃতি কাজে। প্রতিটি গ্রামীণ পরিবারের গড় লোকসংখ্যা ছ'জন করে ধরলে প্রায় সোয়া লক্ষ লোকের ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা হচ্ছে এই চারা তৈরীর ব্যবসা থেকে। এই বেকারীর যুগে কর্মহীনদের সমস্যা নিয়ে সারা দেশ যখন হিমসিম খাচ্ছে, তখন প্রায় বিনা সরকারী প্রচেষ্টায় এত লোকের কর্মসংস্থান একটি উল্লেখযোগ্য ব্যাপার নয় কি?

চারা উৎপাদন শিল্পের আর একটি দিকও আছে। এ রাজ্যে যত চারা উৎপন্ন হয়, তার প্রায় অর্ধেক চলে যায় ভিন্-রাজ্যে। তার বিনিময়ে পশ্চিমবাংলায় আসে প্রায় দশ কোটি টাকা।

পশ্চিমবাংলায় চারা তৈরী শিল্পের সম্ভাবনা ও সুযোগ

পশ্চিমবাংলার আবহাওয়া এমন যে উত্তরে দার্জিলিং-কালিম্পং এলাকায় শীতের ফল-ফুলের চারা যেমন সহজে তৈরী করা যায়, তেমনি এরাজ্যের সমভূমি অঞ্চলে তৈরী করা যায় উষ্ণ ও নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলের গাছপালার চারা। তাছাড়া কালিম্পন্ডের আবহাওয়ায় শীতের সবজি ও মরসুমী ফুলের বীজ তৈরীর উজ্জ্বল সম্ভাবনা আছে। পরীক্ষামূলকভাবে এখানে ফুলকপি, বাঁধাকপি, বীন প্রভৃতি সবজির বীজ সুন্দরভাবে উৎপাদন করা সম্ভব হয়েছে। এই সব ফসলের বীজের জন্ম এখন আমরা কুলু, কাটরাইন, মানালী, কান্দীর প্রভৃতি এলাকার মুখাপেক্ষী। আজ থেকে দু'দশক আগেও কুলু, কাটরাইন

প্রভৃতি এলাকায় শীতের সবজির বীজ তৈরীর ব্যাপারটা ছিল সাধারণের কাছে প্রায় অজানা। এই এলাকা যে এই ধরনের বীজ উৎপাদনের পক্ষে অত্যন্ত উপযোগী—তা ধরা পড়ে ভারতীয় কৃষি গবেষণা প্রতিষ্ঠানের অধিসূক্ষ্মানের ফলে। গবেষণালব্ধ পদ্ধতি ক্রমশঃ ছড়িয়ে দেওয়া হয় গ্রামের চাষীদের মধ্যে। একদিন যেসব ক্ষুদ্র চাষীর দিন গুজরাণ হ'ত অতি কষ্টে, আজ তারা বীজ উৎপাদন করে হয়ে গেছে সম্পন্ন গৃহস্থ। কালিম্পাং এলাকায় এই ধরনের কর্মসূচী হাতে নিলে ওখানকার গরীব চাষীদেরও ভাগ্য খুলে যেত এতদিনে। অথচ এমন জমিন রইল পতিত যা আবাদ করলে ফলত সোনা।

উদ্ভিদঅঙ্গনে চারা তৈরী করা হয় বীজ, ডাল-কলম, গুটি-কলম এবং জোড়-কলমের সাহায্যে। বীজ প্রধানতঃ উৎপন্ন হয় উদ্ভিদ-অঙ্গনের বাইরে, চাষীর মাঠে। তাই বীজের বিষয়ে আলোচনা থাক বর্তমান প্রবন্ধের বাইরে।

কড়া শীত এবং চড়া গরমের দিনগুলো বাদ দিয়ে বছরের বাকী মাসগুলি ডাল-কলম (Cutting) এবং গুটি-কলম (Layering) পদ্ধতিতে চারা তৈরীর উপযোগী সময়। উষ্ণ ও আর্দ্র আবহাওয়া এই দুই পদ্ধতিতে চারা তৈরীর পক্ষে বিশেষ সহায়ক। আম, সপেদা, কামরাঙ্গা প্রভৃতি গাছে জোড়-কলমের (Grafting) প্রকৃষ্ট সময় হল বর্ষাকাল। অনেক রাজ্যের তুলনায় পশ্চিমবাংলায় শীত ও গরমের তীব্রতা কম, বর্ষাকালও লম্বা। এজ্জা এখানে ডাল-কলম ও গুটি-কলমের সাহায্যে চারা তৈরী করা যায় অনেকদিন ধরে। জোড়-কলমের ক্ষেত্রেও খাটে একই কথা। এরাঙ্গ্যের মনোরম আবহাওয়ার

জ্জা চারা বাড়েও তাড়াতাড়ি; অথচ যত্ন লাগে অজ্জা রাজ্যের চেয়ে কম। তাই চারা তৈরীর খরচ অজ্জা জায়গার চেয়ে এখানে কম। প্রধানতঃ এই কারণে বাইরের রাজ্যে পশ্চিম-বাংলার চারার এত চাহিদা।

এমন অনেক গাছ আছে যার ফুল বা ফলের ফলন এরাঙ্গ্যে কম; অথচ তার চারা তৈরী হয় প্রধানতঃ এখানেই। বাগানবিলাসকে (Bougainvillea) উদাহরণ হিসাবে নেওয়া যেতে পারে। উত্তরপ্রদেশ, রাজস্থান, দিল্লী, পাঞ্জাব, মধ্যপ্রদেশ প্রভৃতি জায়গায় প্রায় পত্রহীন ডাল ভরে বাগানবিলাসে যে ফুল ফোটে, এরাঙ্গ্যের আর্দ্র আবহাওয়ায় তা বিরল। এই বিপুল পুষ্প-সম্ভারের প্রধান কারণ এই সব এলাকার শুকনো আবহাওয়া। অথচ ডাল-কলম বা গুটি-কলমের সাহায্যে এ ফুলের চারা তৈরী করতে যে আর্দ্র আবহাওয়ার প্রয়োজন তা এই সব অঞ্চলে কম। তাই এখানে বাগান-বিলাসের চারা তৈরীর জ্জা যত্ন ও খরচ লাগে বেশী।

পশ্চিমবাংলায় বর্ষাকালে জাত অধুসারে বাগানবিলাসের ডাল পুঁতে দিলে বা গুটি বেধে দিলে সহজে চারা তৈরী হয়ে যায়। সহজে তৈরী হয় বলে দামও কম। পাইকারী হায়ে কিনলে ডাল-কলম থেকে তৈরী বাগানবিলাসের একশ চারার দাম পড়ে ১০০ টাকা থেকে ১২০ টাকা। উত্তর ভারতে এগুলি বিক্রী হয় প্রতিটি পাঁচ টাকা বা তারও বেশী দামে। তাই এই অঞ্চলের উদ্ভিদঅঙ্গনের মালিকরা নিজেরা বাগানবিলাসের চারা তৈরী না করে এরাঙ্গ্য থেকে কিনে নিয়ে গিয়ে এখানে বিক্রী করেন।

বসুন্ধরা : আষাঢ়-শ্রাবণ : ১৩৯২

এই চারাই টবে বসিয়ে একটু বড় করে বিক্রী করলে তার দাম চড়ে যায় আট-দশ টাকায়। এইভাবে অজস্র পাম ও ঝাউয়ের চারা যায় উত্তর ভারতে এবং সর্পেদার চারা দক্ষিণ ভারতে। এই চাহিদা ক্রমশঃ বাড়ছে।

এরাজ্যে বছরে কত চারা বিক্রী হয় তার কোন হিসাব নাই। একটা ছোট্ট সমীক্ষার ফলাফল তুলে ধরলে এ বিষয়ে খানিকটা আলোকপাত হতে পারে।

১৯৮২ সালে গোবরডাঙ্গার রথের মেলায় চারা বিক্রীর যে সমীক্ষা গোবরডাঙ্গা রেনেসাঁস ইনস্টিটিউট করেছিলেন, তার থেকে দেখা যায়—রথ ও উণ্টোরথ মিলিয়ে মোট চারা বিক্রী হয়েছে ১৩,২৯৫; রথের মেলায় ৪৫৫১ এবং উণ্টোরথে বাকীগুলি। লক্ষ্য করার বিষয় রথের চেয়ে উণ্টোরথেই চারার বিক্রী বেশী—প্রায় দ্বিগুণ। এর কারণ উণ্টোরথেই চারা লাগানর ভাল আবহাওয়ার শেষ মরসুম। এর পরে চারা লাগালে সেগুলির বেঁচে থাকা ও ভবিষ্যৎ বৃদ্ধি ব্যাহত হবার সম্ভাবনা।

এই মেলায় বিক্রীত চারার মধ্যে ফুল, ফল, মসলা ও বড় গাছ—সবই আছে। ফলের মধ্যে সুপারি বিক্রী হয়েছে সবচেয়ে বেশী, অর্থাৎ ৪৬১৬; তারপর নারকেল—২৬১৫, লেবু—১২০৩, আম—১১৪০, লিচু—৭৫০, আমড়া—৫৯৭, জামরুল—৪৩৫, সপেদা—৩৫০, জলপাই—৩১২, পেয়ারা—২৫৫, আনারস—৫০, চালতা—১৯, গোলাপজাম—১৫, আমলকী—৫, কুল—২ এবং করমচা—২। সব মিলিয়ে ফলের চারার সংখ্যা—১২,৩৬৬। অর্থাৎ মেলায় যত গাছের চারা বিক্রী হয়েছে তার শতকরা ৯৩ ভাগেরও

বেশী ফলের।

ফলের মধ্যে পাতাবাহার বিক্রী হয়েছে সবচেয়ে বেশী ১৪৯, ঝাউ—১০২, গোলাপ—৭৫, রজন—৬০, কামিনী—২৪, গন্ধরাজ—২৪, বেলফুল—৮, চাইনিজ পাম—৬, স্থলপদ্ম—৪, রাধাচূড়া—৪, বাগানবিলাস—৪, কৃষ্ণচূড়া—২। সব মিলিয়ে বাহারী গাছের সংখ্যা—৪৬২।

মসলার গাছ বিক্রী হয়েছে—২১৪; এর মধ্যে তেজপাতাই বেশী—২০৩, দারুচিনি—১১। বড় গাছের চারার সংখ্যা খুবই কম; ইউক্যালিপটাস—৪ এবং মেহগিনী—২। এটাই স্বাভাবিক। কারণ গোবরডাঙ্গার মত উর্বরা এলাকায় একটা মেহগিনী বা ইউক্যালিপটাস লাগানর চেয়ে একটা আম বা নারকেল লাগান অনেক বেশী লাভজনক।

অগ্ন্যাগ্ন চারার সংখ্যা ২৪৭। এর মধ্যে কিছু কিছু কম নামী ফল, ফুল ও মসলার চারা আছে।

বিভিন্ন চারার বিক্রয়মূল্য ছিল—আম ৫'০০ থেকে ৬'৫০ টাকা; নারকেল—৪'৫০ থেকে ৬'০০ টাকা; লিচু—১'৫০ থেকে ২'০০ টাকা; গোলাপজাম, তেজপাতা, জলপাই, করমচা—২'০০ থেকে ৩'০০ টাকা; পেয়ারা, ঝাউ, আমড়া, গোলাপ, জামরুল, রজন, চালতা, কামিনী, মেহগিনী, গন্ধরাজ—১'৫০ থেকে ২'৫০ টাকা; ইউক্যালিপটাস—১'০০ থেকে ১'৫০ টাকা; সুপারি—৩০ পয়সা থেকে ৪০ পয়সা এবং সপেদা—৩'০০ থেকে ৪'৫০ টাকা। মোট দোকানের সংখ্যা—২৮।*

কিছুদিন হ'ল ছায়া-বিলাসী বাহারী গাছের (Shade-loving ornamental plants)

একটা বড় চাহিদা তৈরী হয়েছে ঘর সাজাবার প্রয়োজনে। এই ধরনের গাছ তৈরী করা হয় টবে। আজকাল বড় বড় শহর ভরে যাচ্ছে বহুতল বাড়িতে। এইসব বাড়ির ফ্ল্যাটের যারা মালিক, তাঁরা অর্থবান। দামী আসবাবপত্রের সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা ঘর সাজাতে ব্যবহার করেন বাহারী গাছ। শিক্ষাবিস্তার ও আর্থিক উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে অশুদের মধ্যেও এই শৌখিনতা ছড়িয়ে পড়ছে। বড় বড় নামী হোটেলের ঘর সাজাতে আজকাল বাহারী গাছ ব্যবহার হচ্ছে বহুল পরিমাণে। এটা হোটেল ব্যবসায়ের একটা প্রয়োজনীয় অঙ্গ হওয়ার জন্য এই ধরনের গাছের চড়া দাম এখানে কোন বাধার সৃষ্টি করে না।

বিদেশে—বিশেষতঃ অর্থবান আরবীয় দেশ-গুলিতে এই ধরনের গাছের প্রচুর চাহিদা। অবিস্বাস্য হলেও এটা সত্য ঘটনা যে বাঙ্গালোরের একটি উদ্ভিদঅঙ্গন প্রতি বছর বিদেশে রপ্তানী করেন দু' কোটি টাকারও বেশী বাহারী গাছ। এই উদ্ভিদঅঙ্গনের প্রায় বার-তের একর জায়গা কাচের ঘর দিয়ে ঢাকা। এই ঘরের ভিতর নিয়ন্ত্রিত আবহাওয়া ও মাটিতে তৈরী হয় ঘর সাজানর সুদৃশ্য, স্বাস্থ্যবান এই গাছগুলি। নিঃসন্দেহে এই উদ্ভিদঅঙ্গনটি ভারতে সর্বশ্রেষ্ঠ ও বৃহত্তম। এখানকার উৎপাদন প্রণালী এত নিখুঁত যে এক বয়সী এ্যারোকেরিয়া, ডিফেনবেকিয়া

প্রভৃতি গাছকে দেখলে মনে হবে সব একই রকম—যেন যান্ত্রিক উপায়ে তৈরী। পশ্চিম-বাংলার উদ্ভিদঅঙ্গনের মালিকদের এই পর্যায়ে পৌঁছতে হলে বহু মেহনত করতে হবে। তাঁদের উচিত বাঙ্গালোরে গিয়ে এই উন্নত উদ্ভিদ-অঙ্গনটির কার্যপ্রণালী দেখে আসা।

চারা তৈরীর আধুনিক কলা-কৌশল আবিষ্কারের ফলে আগের তুলনায় এখন অনেক সহজে, সস্তায় এবং অল্প সময়ে অনেক বেশী পরিমাণে চারা তৈরী করা সম্ভব। কৃত্রিম হরমোন, উদ্ভিদখাত্ত এবং ওষুধপত্র প্রয়োগের ফলে সুস্থ, সতেজ ও সুন্দর গাছ আগের তুলনায় অনেক কম সময়ে তৈরী করা যায়। কিন্তু এই সব বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অধিকাংশ লোকের কাছে অজানা। কারণ এগুলি সাধারণতঃ ইংরাজী ভাষায় লেখা। চারা তৈরীর কাজে নিযুক্ত অপেক্ষাকৃত অল্পশিক্ষিত লোকদের কাছে তাই এইসব তথ্য সহজে পৌঁছাতে পারে না। আনন্দের কথা, বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা, রেডিও এবং টেলিভিশনের মাধ্যমে এইসব আধুনিক পদ্ধতি জনপ্রিয় করার চেষ্টা হচ্ছে। এ বিষয়ে বাংলা ভাষায় লেখা বইও আজকাল পাওয়া যাচ্ছে। চারা তৈরীর আধুনিক কলাকৌশলের সুযোগ নিতে পারলে পশ্চিমবাংলায় চারা তৈরীর ব্যবসা একদিন শিল্পের পর্যায়ে উন্নীত হবে।

* সূত্র—বিতীয় রাজ্য মৌমাছি পালন সম্মেলন উপলক্ষে প্রকাশিত স্মারক সংখ্যা (২০ ও ২১ মার্চ, ১৯৮২)।

প্রকাশক—গোবরডাঙ্গা রেনেসাঁস ইন্সটিটিউট, পোঃ—খাঁইয়া, জেলা—২৪ পরগণা; শিন—৭৪০ ২৭০।

অধিক ফলশীল জাতের বেগুন

শচীন্দ্র চন্দ্র দাস ও মোঃ আজিজুল হক

কৃষ্ণনগর রাষ্ট্রীয় উদ্ভাৱন গবেষণা কেন্দ্রে গত ১০ বৎসর নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে, কয়েকটি নতুন জাতের বেগুন উদ্ভাবিত হয়েছে।

এই নতুন জাতগুলির বিশেষত্ব হ'ল—

১) এগুলি উচ্চফলশীল, ২) খুবই রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাসম্পন্ন। বিশেষ করে ফমোপ-সিস রোগ কম হয়, ৩) ফলে পোকাকার আক্রমণও কম হয়, ৪) বিশেষ করে হেক্টর প্রতি অশ্রাৱ বেগুনের তুলনায় দেড়গুণের বেশী গাছ লাগানো যায়। এতেও ফলন বাড়ে। এই জাতটির গাছ প্রায় ১৫০ সেমি উচু হয় এবং সোজাভাবে দাঁড়িয়ে থাকে। প্রতি গাছের জন্ম মাত্র ৫০ থেকে ৫৫ স্কোয়ার সেমি জায়গার প্রয়োজন হয়। এই জাতের বেগুনের ক্ষেতে পরিচর্যা খুবই ভালভাবে করা যায় এবং সহজে ফল কুড়ানো যায়। পরীক্ষা করে দেখা গেছে—ঘন করে গাছ লাগালে ফলের আকার ও রঙের কোন তারতম্য হয় না।

এই উন্নত জাতের বেগুন সম্বন্ধে এবার বিস্তারিত আলোচনা করা হচ্ছে।

জাত—কৃষ্ণনগর ২০। ১৬। ৩ (ছবি-৩)।

এই জাতটি রাজপুর সিলেকসন ও মেদিনীপুর লোকাল জাতের সংকর ঘটিয়ে উদ্ভাবিত হয়েছে।

সহকারী উদ্ভাবনবিদ ও ফিল্ড এগিষ্টেন্ট।

গাছ

এই জাতের বেগুনের গাছ আকারে অপেক্ষাকৃত ছোট। পাতার রং হালকা বেগুনী।

ফল

ফল দেখতে ডিম্বাকার ও সুন্দর বেগুনী রঙের। ফল আকারে মাঝারি অর্থাৎ ৫ থেকে ৬টি ফলের ওজন এক কেজি হয়।

ফলন

চার লাগানোর ৫৫ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে ফল তোলা যায়। হেক্টর প্রতি প্রায় ৪০০ কুইন্টাল ফলন পাওয়া যায়।

রোপণের সময়

আষাঢ় মাসে চারা তৈরী করে শ্রাবণ মাসে চারা ক্ষেতে লাগাতে হবে।

বীজের হার

হেক্টরে ২৫০ থেকে ৩০০ গ্রাম বীজ দরকার।

বীজ শোধন

পারাঘটিত ওষুধ যেমন প্যারাসন প্রতি কেজি বীজে ৩ গ্রাম হিসেবে দিয়ে বীজ শোধন করে নিতে হবে।

রোয়ার দূরত্ব

সারি থেকে সারির দূরত্ব দিতে হবে ৯০ সেমি। এবং গাছ থেকে গাছের দূরত্ব হবে

৭৫ সেমি। এতে হেক্টর প্রতি ১৪,৮১৪টি চারার প্রয়োজন হবে।

জাত—কৃষ্ণনগর ২৭।১।১ (ছবি-২)।

এই জাতটি উদ্ভাবিত হয়েছে লোকালবানপুর ও দিল্লির এস-৫০৫ জাতের সংকর মিলনে।

গাছ

এই জাতের গাছ বেশ উচু-লম্বা হয় এবং সোজাভাবে দাঁড়িয়ে থাকার ক্ষমতা রাখে। গাছ বেশ সুন্দর কাঁকড়া হয়। পাতা ও ছোট ছোট ডালগুলো উপর দিকে উঠে থাকে। প্রতি গাছের জন্ম ৫০ থেকে ৫৫ স্কোয়ার সেন্টিমিটার স্থান প্রয়োজন হয়। হেক্টর প্রতি ২২ হাজার থেকে ২৭ হাজার গাছ লাগানো যায়, যেখানে অস্বাভাবিক জাতের গাছ হেক্টর প্রতি ১৪ হাজার লাগানো হয়ে থাকে। হেক্টর প্রতি গাছ বেশী লাগালে ফলনও বেশী হয়।

ফল ও ফলন

ফল বেশ বড় ও লম্বা। প্রতিটি ফল প্রায় ৩০ সেমি লম্বা এবং ৪ বা ৫টি ফলের ওজন এক কেজি হয়। ফলের রং গাঢ় বেগুনী।

হেক্টর প্রতি ৪৫০ কুইন্টালের বেশী ফলন

পাওয়া যায়। চারা লাগানোর ৬০ দিন পর ফল তোলা যায়। ক্ষেত থেকে ৪-৫ মাস ফল কুড়ানো যায়।

রোপণের সময়

শ্রাবণ মাসে বীজ বুনে ভাদ্র মাসে ক্ষেত চারা রোপণ করার উপযুক্ত সময়।

বীজ শোধন

পারাবর্তিত ওষুধ যেমন প্যারাসন প্রতি কেজি বীজে ৩ গ্রাম হিসাবে মিশিয়ে বীজ শোধন করে নিতে হবে।

বীজের হার

হেক্টর প্রতি ৪০০ থেকে ৪৫০ গ্রাম বীজের প্রয়োজন হবে।

রোয়ার দূরত্ব

সারি থেকে সারির দূরত্ব হবে ৭৫ সেমি এবং গাছ থেকে গাছের দূরত্ব হবে ৬০ সেমি। এতে হেক্টর প্রতি ২২,২২২ চারার প্রয়োজন হবে। আর সারির দূরত্ব একই রেখে গাছ থেকে গাছের দূরত্ব ৪৫ সেমি রাখলে হেক্টর প্রতি গাছের প্রয়োজন হবে ২৭ হাজার।

এই নতুন বেগুনের জাতগুলো অস্বাভাবিক উন্নত



পাশাপাশি সারিতে লাগানো নতুন জাতের বেগুন গাছ বেঁচে আছে কিন্তু রোগাক্রান্ত গাছ মরে গেছে।

বসুন্ধরা : আষাঢ়-শ্রাবণ : ১৩৯২

জাতের বেগুনের সঙ্গে তুলনামূলকভাবে পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে, এই নতুন জাতগুলোর ফলন হেক্টর প্রতি অনেক বেশী হয় এবং ফমোপসিস রোগের আক্রমণও অনেক কম হয়। নীচের টেবিলে পরীক্ষার ফলাফল দেওয়া হয়েছে। এ ছাড়া এই নতুন জাতগুলো

এক সারিতে এবং ফমোপসিস রোগাক্রান্ত হয় এমন জাতের বেগুন (গ্রীন লং) আর এক সারি পাশাপাশি লাগিয়ে দেখা গেছে যে এই নতুন জাতগুলোর সব গাছই বেঁচে আছে আর রোগাক্রান্ত হয় এমন জাতগুলোর সব গাছই মরে গেছে (১নং ছবিতে দেখা যাচ্ছে)।

ক্রমিক নং	জাত	হেক্টর প্রতি ফলন (গড়) শতকরা ফমোপসিস (কুইন্টাল) রোগে আক্রান্ত গাছ
(১)	কৃষ্ণনগর-২৭।১।১	৪৫০ ৬%
(২)	কৃষ্ণনগর-২০।১৬।৩	৩৮০ ৮%
(৩)	পুষা ক্রান্তি	৩২০ ৫৬%
(৪)	কৃষ্ণনগর পারপল রাউণ্ড	৩০০ ৩১%
(৫)	কৃষ্ণনগর গ্রীন লং	১৭০ ৬৯%
(৬)	রাজপুর সিলেকশন	৩৩০ ১৬%

সার প্রয়োগ

জমি তৈরী করার সময় হেক্টর প্রতি গোবর বা কম্পোষ্ট সার ১৫ টন হিসাবে দিয়ে মাটির সঙ্গে ভালভাবে মিশিয়ে দিতে হবে। জমির শেষ চাষের আগে হেক্টর প্রতি ৬০ কেজি নাইট্রোজেন বা ১৩৫ কেজি ইউরিয়া, ৫০ কেজি ফসফেট বা ৩১২ কেজি সিঙ্গেল সুপার ফসফেট ও ৫০ কেজি পটাশ বা ৮৩ কেজি মিউরেট অফ পটাশ সার প্রয়োগ করে চাষ দিয়ে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিতে হবে এবং ৩৪ দিন পর ক্ষেতে চারা লাগাতে হবে।

চাপান সার

চারা লাগানোর চার সপ্তাহ পর হেক্টর প্রতি ৩২.৫ কেজি নাইট্রোজেন বা ৭৩ কেজি ইউরিয়া সার গাছের গোড়ার চারিদিকে ছড়িয়ে

দিয়ে নিড়েন দিয়ে গাছের গোড়ার মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিতে হবে, যদি পর্যাপ্ত পরিমাণ পচা গোবর বা কম্পোষ্ট সার প্রয়োগ না করে থাকেন। এই সময় হেক্টর প্রতি ৭-৮ কুইন্টাল খোল প্রয়োগ করে মাটির সঙ্গে ভালভাবে মিশিয়ে দিতে হবে এবং অল্প করে আল তুলে দিতে হবে এবং প্রয়োজন হলে সেচ প্রয়োগ করতে হবে।

চাপান সার (দ্বিতীয়বার)

চারা লাগানোর ৭৮ সপ্তাহ পর দ্বিতীয়বার চাপান সার প্রয়োগ করতে হবে। হেক্টর প্রতি ৩২.৫ কেজি নাইট্রোজেন বা ৭৩ কেজি ইউরিয়া সার গাছের গোড়ায় দিয়ে মাটির সঙ্গে ভালভাবে মিশিয়ে দিতে হবে। এবং গাছের গোড়ায় মাটি তুলে দিয়ে প্রয়োজনে সেচ দেবেন।



বাঁয়ে কৃষ্ণনগর ২৭/১/১ উন্নত
জাতের বেগুন। ডানে কৃষ্ণ-
নগর ২০/১৬/৩ অধিক ফলনশীল
জাতের বেগুন।

পরিচর্যা

বর্ষার শেষে ক্ষেতে চারা রোপণ করাতে এবং পর্যাপ্ত সার প্রয়োগের ফলে ক্ষেতে প্রচুর আগাছা জন্মাতে পারে। সেজন্য ১০ দিন পর পর ক্ষেতে নিড়েন দিয়ে আগাছা পরিকার করতে এবং গাছের গোড়ার মাটি আলগা করে দিতে হবে। এতে গাছ তাড়াতাড়ি বড় হবে।

পোকা দমন

বেগুনে অনেক রকম পোকার আক্রমণ হয়ে থাকে। বিশেষ করে বেগুনের মাজরা পোকা, মাকড় (মাইট), লাউ কুমড়োর লাল পোকা (এপিলেক্‌না), দয়ে পোকা বা নিউ-মাটোডের আক্রমণ দেখা যায়। এদের মধ্যে মাজরা পোকা ও লাল মাকড়ে গাছের ও ফলের বিশেষ ক্ষতি সাধন করে থাকে। প্রতিকার হিসেবে চারা তোলার আগে নার্সারীতে চারা-গুলোকে প্রতি লিটার জলে ২ গ্রাম করে সেভিন ৫০ শতাংশ বা মুভান বা ডিমেক্রন ১০০ শতাংশ প্রতি লিটার জলে ১ মিলি লিটার হিসেবে

মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে। চারা লাগানোর ৭ দিন পর পর ডিমেক্রন বা মুভান দিয়ে স্প্রে করতে হবে। এবং চারা লাগানোর একমাস পর প্রতি গাছে ১০ গ্রাম হিসেবে কার্বোফুরান বা ফিউরাডন দানাদার ৩ শতাংশ শক্তিসম্পন্ন ওষুধ গাছের গোড়ায় দিয়ে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিতে হবে। প্রয়োজন বুঝে সেচ প্রয়োগ করতে হবে। এতে গাছের দুই মাস বয়স পর্যন্ত আর ওষুধ প্রয়োগ করতে হবে না। গাছে ফল ধরতে আরম্ভ করলে আর ফিউরাডন ব্যবহার করা চলবে না। এই সময় দশদিন পর পর সেভিন ৫০ শতাংশ প্রতি লিটার জলে ২'৫ গ্রাম হিসাবে মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে। এছাড়া ডিমেক্রন ও মুভান ও ম্যালথিয়ন ইত্যাদি ওষুধও স্প্রে করা যেতে পারে।

মাকড়ের আক্রমণ দেখা দিলে মিট ৫০৫ বা কেলথেন প্রতি লিটার জলে ২ মিলিলিটার হিসাবে মিশিয়ে স্প্রে করলে সুফল পাওয়া যাবে। তারপর অন্তত সাতদিন বেগুন তোলা যাবে না।



(প্রথিতযশা কৃষিবৈজ্ঞানিক ডঃ শিবপ্রসাদ
বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি একান্ত সাক্ষাৎকার)

আমার বড় ক্ষোভ—বড় দুঃখ। পৃথিবীর
খরাপিড়িত এলাকার মানুষের কাছে আমি
আলো দেখাতে পারতাম আমার গবেষণার ফল
দিয়ে। সেটা পারলাম না। একটা বেদনা
ভারাক্রান্ত কণ্ঠে আপন মনে কথা বললেন
ডক্টর শিবপ্রসাদ ব্যানার্জি।

পড়ন্ত বেলার রোদদূর। চারিধারে গাছ-
গাছালী বাগান ফুল ফল পাতার ঝোপ। গাছ-
গাছালীর সবুজের ফ্রেমে আঁটা উঠানে বয়ো-
ভারাক্রান্ত কৃষি বৈজ্ঞানিক ডঃ বন্দ্যোপাধ্যায়ের
কুণ্ডিত মুখের ছবিটি তাকিয়ে তাকিয়ে দেখ-
ছিলাম। কৌকড়ানো একরাশ অগোছালো
রূপালী চুল। বুদ্ধিদীপ্ত চোখে আশী বছর
বয়সের জরার ষড়যন্ত্র এখনো ব্যর্থ। উন্নত
নাসিকা, শক্ত চোয়াল এবং সুন্দর দুটি চোখে
প্রতিভা এবং ব্যক্তিত্ব এখনো উজ্জল। সারা
জীবন শুধু কৃষিচর্চাই নয়, গভীরতর কৃষি ভাবনা,

সাক্ষাৎকার : চিদানন্দ গোস্বামী

আমি আঁচো
ইচ্ছাতে পরতাম

অভিনব পরীক্ষা-নিরীক্ষা, বৃক্ষলতা গুল্মাদির জগ্রে নিবিড় প্রেম আর নির্জন গাঁয়ের একান্তে একাকী একাকী বিচিত্র সৃষ্টি আর আবিষ্কারে একটা জীবন আজো স্পন্দিত। আমাকে ছোট গোলাপ বাগানটা দেখাতে দেখাতে ফুলে চুষন করলেন। কথা বলছেন অক্ষুট স্বরে ঠিক যেন কোনো স্বজন মানুষের সঙ্গে কথা বলছেন। একটা পোকাকে ফুলের পাপড়ি থেকে ফেলে দিয়ে বললেন, কিছু বলতে পারছ না! পোকারা জ্বালাতন করছিল?’

আমি জিজ্ঞেস করলাম, আপনি হুঃখ করছিলেন—খরাপীড়িত এলাকার জগ্রে কিছু করতে পারলেন না। আপনার ব্যর্থতার কারণ কি?

বললেন, ‘ব্যাপারটা ব্যবসায়িকভাবে চালাতে গিয়েছিলুম। কিন্তু ফর্মুলাটার কিপিং কোয়ালিটি বজায় থাকল না। সাত দিনের বেশি আমার আবিষ্কৃত সারটির গুণ থাকত না। একটা মিশ্র সার তৈরি করেছিলাম। জলে গুলে এই সার ব্যবহার করা হোত। যে সব গরীব চাষীর সেচের জল অত্যন্তই অল্প, চাষে জল দেবার সুযোগ খুবই কম, সেইসব অসহায় বিপন্ন কৃষকদের জগ্রেই ছিল আমার সার। আর এই সার ব্যবহারে খরার আক্রমণ ওদের একটুও ক্ষতি করতে পারত না। ওরা ছরস্তু ভালো ফসল পেত। বহু কৃষক এই সার ব্যবহারে সুফল পেয়েছে। কিন্তু—’ একটা হতাশার হাস পড়ল ডঃ ব্যানার্জীর।’

আবার বিস্তৃতভাবে বলতে শুরু করলেন। ‘আইরনের সঙ্গে বা ম্যাঙ্গানিজের সঙ্গে ফসফেট মিশ্রিত। ফলে অজব র্যোগ (Insoluble compound) হোত। ফলে গাছে শোষিত

হত না সেটা। সবচেয়ে ভালো হোত চাষীকে আমার ফর্মুলাটা বলে দিলেই। ওরা তৈরি করে সঙ্গে সঙ্গে ব্যবহার করলে কাজ হোত। কিন্তু আমি তৈরি করে দিলে ওষুধের স্থায়িত্ব থাকত না। স্থায়িত্বের জগ্রে আমার আরো গবেষণার আরো বিশেষ পরীক্ষার দরকার ছিল। তা পারিনি। হায়ার কেমিস্ট্রি বা উচ্চ রসায়ন বিভাগর জ্ঞান আমার আরো দরকার ছিল। এই সারে ব্যালেন্সড্ ডোজে এন পি কে মিশ্রণ এবং তার সঙ্গে সব ট্রেস্ এলিমেন্ট (বেশির ভাগই সালফেটের আকারে—ম্যাঙ্গানীজ সালফেট, আইরন সালফেট, ম্যাগনেসিয়াম সালফ্—পাতার ক্লোরোফিল বাড়াতো) সম মাত্রায় থাকত। আর অল্প মাত্রায় (কিলোতে ১ গ্রাম) থাকত বোরাক্স, জিঙ্ক সালফেট, কপার সালফেট, কখনো এ্যামোনিয়াম মলিবিডেট (ফুলকপির বেলায়)। নাইট্রোজেনও থাকত ইউরিয়ার আকারে। সুপার ফসফেট থাকত শতকরা ১৬ ভাগ। তাতে বাজারের কল্যাণে দুর্ভাগ্য-বশতঃ ভেজাল থাকত পাথরের গুঁড়ো, বালি ইত্যাদি। হ্যাঁ, পটাশের একটা সামান্য অংশ কখনো কখনো মিউরেট অব পটাশের আকারে দেয়া হোত।

‘জলে গুলে টাটকা ব্যবহার করতে হোত এই সার। কল্যাণপুর আর বাকুইপুরের ফলচাষীরা এর ব্যবহার করত। ব্যবহার করতে বনজগলীর কপিচাষীরা। কুমড়োর জগ্রেও ব্যবহার হোত। বোরোধান যখন শুকিয়ে গিয়ে ধানের শিষ আর বেরোত না, যখন মাটি খরাতে সবে ফাটতে শুরু করেছে, তখনো এই সার দিলে শিষ বেরুতো, ফলন পুরো হোত।

বসুন্ধরা : আষাঢ়-শ্রাবণ : ১৩৯২

এই সার ধানগাছে ধরতে চাইত না, পাতা থেকে সার পিছলে যেত। সেক্ষেত্রে স্প্রেয়ার এণ্ড স্টিকার (পেট্রোলিয়াম প্রোডাক্ট) খানিকটা মিশিয়ে দিলে কাজ হোত। নয়তো কাঁচা দুধও মিশিয়ে দিয়ে ফল পেতাম।

‘সার যা তৈরি করতাম, তা বাজারের ভেজাল জিনিস দিয়েই তৈরি হোত। সেজ্ঞে সার গুলে চাষীকে একটুকুণ বসিয়ে ছেকে দিতাম। তারপর সারের সঙ্গে নির্দিষ্ট পরিমাণ ঝোলাগুড় মিশিয়ে দিতাম। আমি বলতাম প্র্যান্ট হরমোন ব্যবহার করি। আসলে অ্যান্টিবায়োটিক (টেরামাইসিনের আকারে) মেশাতাম। আবার বেরিন-এর আকারেও মেশাতাম।

‘ট্রেস এলিমেন্ট এমন জিনিস, যা কম হলে কাজ হয় না, বেশি হলেও ক্ষতি হয়। কোনো বিশেষ অঞ্চলে এই ট্রেস এলিমেন্টের পরিমাণ কি হওয়া উচিত, তা পরীক্ষার সুযোগ আমার হয়নি। তাছাড়া কোন অঞ্চলের মাটির কতটা আর্দ্রতা বা শুষ্কতা এক্ষেত্রে কাজ করবে, তা জানার জ্ঞে পরীক্ষা চালানোও সম্ভব হয়নি। এগুলো ঠিকমতো হলে কত কৃষকের জীবন বাঁচত, ফসল বাঁচত, খরাকে কবজা করা যেত।

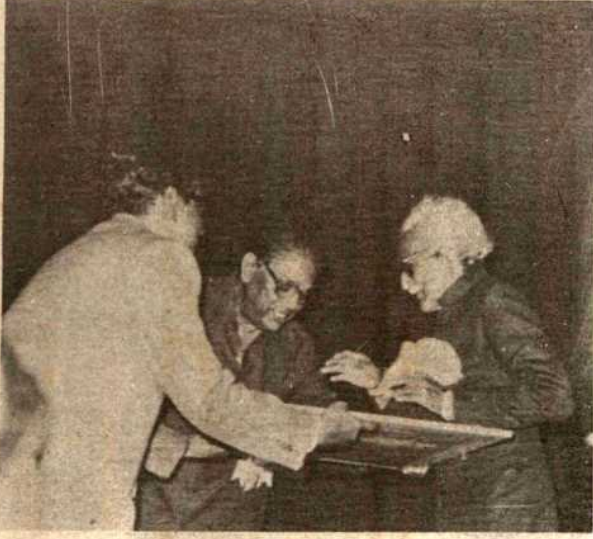
‘বারুইপুর কল্যাণপুরের ফল চাষী সবজি চাষীরা—সোনারপুরের বিডিও অফিসের কাছাকাছি ধানচাষীরা, যেমন কার্তিক দাস, মোহন দাস, ফণী বাগানী এরা ব্যবহার করে উপকার পেয়েছিল। হুগাঁপুরের বিজয় ঘোষ, অরবিন্দ ঘোষ উপকৃত হয়েছে। এই সার দিয়ে কড়াইশুঁটিতে ফল দেড় গুণ হয়েছে। আগা কেটে শাক বিক্রি করার পরেও ফের গাছ গজিয়ে পুরো ফলন দিয়েছে। সুবুদ্ধিপুত্রের

রমেন মুখার্জি ও তার আত্মীয় কৃষকরা তা প্রমাণ করেছেন। মালকের পাঁচুগোপাল মুখার্জি ক্রিসিস্টিমাম, ডালিয়া ও নানা সবজিতে ব্যবহার করে ফল পেয়েছেন।

‘লীলামোহন সিংহ রায় (তারকেশ্বরের কাছে) এগ্রি: হার্টিকালচারাল সোসাইটির ভাইস চেয়ারম্যান ছিলেন। জমিদার। তিনি নানা সিজন ফুলে ও গোলাপে ব্যবহার করে আশ্চর্য ফল পেয়ে আমাকে পুরস্কৃত করেন। তখন সোসাইটির সেক্রেটারী ছিলেন পারসি ল্যান্ডসটার। বিখ্যাত উদ্ভাবনবিদ অজয় রায়-চৌধুরীও (মিহিজামের গ্লোরি গার্ডেনসের মালিক) আমার সারে উপকার পেয়েছেন।

‘পাটক্ষেতে নিড়ানো হয়নি, জলে যাচ্ছে ক্ষেত। ছোট বড় গাছ হয়েছে। এই অবস্থায় বড় গাছগুলোতে ওপর থেকে এই সার ছিটোলে বড় গাছগুলো ঠিক থাকবে, ছোটগুলো মরে যাবে। এমনকি ঘাসও মরে যাবে, যদি ঘাসে ওষু না পড়ে। বাতাবী লেবুর একটা ডালে তিনবার দিলাম। সেই ডালে ফলের ওজন গড়ে ১২০০ গ্রাম। আর অন্য ডালে গড়ে ৭৫০ গ্রাম। এই সারে পেয়ারা গাছে ফুল জলদি আসে, পেয়ারার ওজনও বাড়ে। দীর্ঘদিন ধরে শশার গাছে ফল হয়, গাছ মরতে চায় না। শতকরা ৪০ ভাগ ফল বাড়ে। বীটে প্রথমদিকে এই সারে পাতা বাড়ে। দ্বিতীয় দফায় পাতা ও মূল বাড়ে। এবং তৃতীয় দফায় শুধু মূল বাড়ে। যে কোনো গাছে এই সার দিলে মূল গভীরে নামে—গাছ অনেকদিন টেকে—ফলন অনেকদিন দেয়।’

আমি প্রশ্ন করলাম, ‘এমন চমৎকার



রাজ্য কৃষি বিভাগের উদ্ভান
শাখার স্বর্ণ জয়ন্তী অহুষ্ঠানে
গুণী সম্বর্ধনায় কৃষি মন্ত্রী
মহোদয়ের কাছ থেকে অভি-
নন্দন পত্র নিচ্ছেন ডঃ ব্যানার্জী।
বাঁয়ে কৃষি অধিকর্তা বিষ্ণু মণ্ডল।

জিনিসের একটা উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ তৈরি করলেন না?’ তিনি বললেন, ‘কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের টি. কে. বসু বলেছিলেন, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার সার পরীক্ষা করতে হবে। কিন্তু তা আর হোল কই!’

জিজ্ঞেস করলাম, ‘ফুলের ওপরে আপনার কাক্সের কথা একটু বলবেন?’

বললেন, ‘আমার দশ রকমের গোলাপের জাত আমেরিকায় রেজিস্টার্ড হয়েছিল। এর মধ্যে একটির নাম ‘মরেনা’। ডাল কাটলেই গাছ হয়। সর্বদা ফুল দেয়। অগ্নি আকাশ প্রদীপ। খুব ভাল গন্ধ ছড়ায়। চিত্রভানু জাতটি গ্রীষ্ম, বর্ষা ভাল ফোটে। এটিও অমর। মেদিনীপুরের ক্লাওয়ার শোতে আমার ‘সুগন্ধী’ জাত প্রশংসা পেয়েছিল সবার। কিংসন গ্লোরী ১৯৩৫-এ সৃষ্টি করেছিলেন কোর্ডেস। এটি ওয়েস্ট জার্মানীর রোজ অব দি সেঞ্চুরী।

শতাব্দীর গোলাপ। ১০০ বছর ধরে এর প্রভু থাকতে পারত। কোনো নার্সারীতে আজ এটি পাওয়া যাবে না। পুরোনো বলে এর আভিজাত্যের দাম দেবার লোক নেই। লোকে নতুন চায়। আমার এই আনন্দ যে, আমার আবিষ্কৃত জাত আমেরিকার গোলাপের ইতিহাসে রেজিস্টার্ড হয়েছে। কিন্তু সেগুলো এখানে ছড়িয়ে দেবার সুযোগ আমার নেই।’

তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছিলাম এই বৃদ্ধ বৈজ্ঞানিকের অন্তর জুড়ে এখনো কত উৎসাহ, কত উদ্দীপনা, কত আশা, কত সৃষ্টি চিন্তা। দারিদ্র, বয়োভার, পারিপার্শ্বিক প্রতিকূলতার সঙ্গে বড় একা তিনি সংগ্রাম করে চলেছেন। তিনি আবার বললেন, ‘যদি আমার ফোলিয়ার ফিড্ বা তরল সারটি কেউ পরীক্ষা করে এই খরা-অভিশপ্ত দেশে কৃষকদের কাছে ছড়িয়ে দিতে পারত, তবে আমার এই জন্মটা সার্থক হতো।’

পশ্চিমবঙ্গে বিভিন্ন অঞ্চলে ধানের কিছু নতুন রোগ ও তাঁর প্রতিকার

ডঃ ভরতেন্দু দেবশর্মা

কৃষির উন্নতির সাথে সাথে বেড়েছে বিভিন্ন ফসলের চাষের সম্ভাবনা। বহুকালি, নিবিড় চাষ ইত্যাদি। ফলস্বরূপ ঘটছে সামগ্রিক ভাবে চাষের গুণগত ও পরিমাণগত পরিবর্তন। পরিবর্তন ঘটেছে কৃষির পরিবেশেরও। উন্নত ধান চাষের ক্ষেত্রে এই পরিবর্তন সাধারণভাবে যা চোখে পড়ে তা হোল বিভিন্ন উচ্চফলনশীল জাতের ব্যবহার ও নিবিড় চাষ। ফলে দেখা যায় নতুন রোগের সম্ভাবনা ও গুরুত্বহীন রোগের প্রাচুর্য বা অনেক সময় নতুন রোগ বলে মনে হয়।

ধানের সাধারণতঃ কয়েকটি রোগ যেমন ছত্রাকজনিত ঝলসা (Rice blast), খোলা পচা বা ধসা (Sheath blight), জীবাণুজনিত পাতা ধসা (Bacterial blight) এবং ভাইরাস বা কুটেজনিত রোগ (Tungro) যা আজ কৃষি সম্প্রসারণ কর্মী বা কৃষকদের অজানা নয়।

রোগতত্ত্ববিদ, কৃষি অধিকার, পঃ বঙ্গ।

সাম্প্রতিককালে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জায়গায় কিছু নতুন নতুন ধানের রোগ দেখা যাচ্ছে। এই নতুন রোগগুলির মধ্যে নিম্নোক্ত তিনটি রোগ উল্লেখযোগ্য : (১) শিকড়ে গুটি রোগ (Root Knot), (২) গোড়া পচা রোগ (Bakanac foot rot), (৩) খোলায় দাগ (Sheath blotch)

এছাড়া ধানের ভুসা রোগ (Kernel Smut) ও বাদামী দাগ রোগ (Glume blight) সম্প্রতি গুরুত্ব লাভ করেছে।

চাষের সঙ্গে যুক্ত সকলের এই রোগগুলির সঙ্গে পরিচিত হ'য়ে এদের প্রতিকার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। তাই রোগগুলির লক্ষণ ও প্রতিকারের উপায় নীচে দেওয়া হলো।

ধানের গোড়া পচা রোগ (Bakanac and foot rot)

গোড়া পচা নামের রোগটি অনেক আগের

থেকেই এই রাজ্যে আছে। আলোচ্য গোড়া পচা রোগটি পুরানোটির থেকে আলাদা। এই নতুন রোগটির প্রাচুর্য্য ভারতবর্ষের অগ্রাঙ্গ রাজ্যে আগে থেকে থাকলেও পশ্চিমবঙ্গে এই রোগ সম্প্রতি বিস্তার লাভ করেছে। এই রাজ্যে গোড়া পচা রোগ প্রথম দেখা যায় পশ্চিম দিনাজপুর জেলায় আজ থেকে কয়েক বছর আগে। বর্তমানে বর্ধমান ও ২৪ পরগণা (উত্তর ও দক্ষিণ) জেলাগুলিতেও এই রোগ দেখা যাচ্ছে। এই রোগে সকেট-৪, মোহন ও শস্যশ্রী জাতের ধান সবচেয়ে বেশী আক্রান্ত হচ্ছে। এই রোগের আক্রমণে ফসলের সমৃদ্ধি হয়। ২৪ পরগণা জেলার ভাঙ্গর অঞ্চলে কিছু ক্ষেতে শতকরা ৭০ থেকে ৮০টি ধানের গোছে এই রোগের আক্রমণ দেখা গেছে।

ছত্রাকজনিত এই গোড়া পচা রোগের আক্রমণে বীজতলায় ধানের চারা বা ক্ষেতের গাছ লম্বা হয়ে যায় এবং গাছের রঙ হলদেটে হয়। রোগের প্রকোপ বেশী হলে চারার গোছ মরে যায়। ফুল আসার পর ধানের শীষেও এই রোগের আক্রমণ হয়। প্রকোপ বেশী হলে ধানের বীজ লালচে রঙ ধারণ করে। রোগটি মূলতঃ বীজবাহী, রাজ্য কৃষি গবেষণাগারে রোগতত্ত্ব শাখায় প্রাথমিক কাজের ভিত্তিতে বলা যায় যে ক্যাপটান বা কারবেণ্ডাজিম দিয়ে বীজ শোধন করে এই রোগের আক্রমণ অনেকাংশে কমানো যায়।

ধানের শিকড়ে গুটি রোগ (Root Knot disease)

ধানের শিকড়ে গুটি রোগের প্রাচুর্য্য বর্তমানে পশ্চিম দিনাজপুর ও কোচবিহার

জেলায় দেখা যাচ্ছে। এই রোগটি নিমাতোড নামে এক ধরনের ক্ষুদ্র পরজীবী প্রাণীর আক্রমণে ঘটে থাকে। আক্রান্ত গাছ প্রথমে বেঁটে ও পরে হলদেটে দেখায়। এই রোগে আক্রান্ত গাছের শিকড়ে ছোট ছোট গুটি দেখা যায়। শিকড়ে গুটি রোগের প্রকোপ সাধারণতঃ ডাঙা জমিতে বোনা ধানে দেখা যায়। ডঃ অজিত পাল মহাশয়ের গবেষণালব্ধ ফলের ভিত্তিতে বলা যায় যে এই রোগটি যে জমিতে দেখা যায় সেখানে রোয়া করে চাষ করলে রোগের আক্রমণ কম হয়।

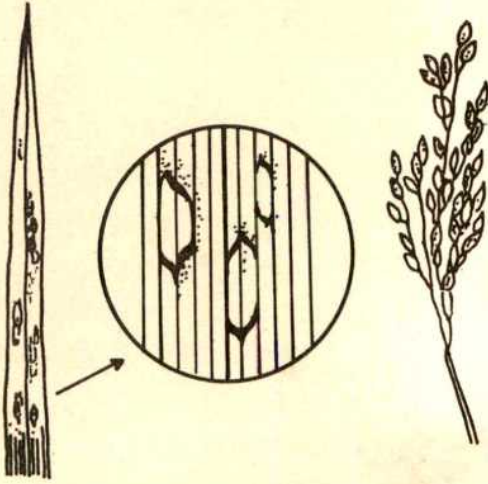
ধানের খোলায় দাগ রোগ (Sheath blotch)

সম্প্রতি এই রোগটির আক্রমণ চুঁচুড়া ধাত্য গবেষণা কেন্দ্রের রোগতত্ত্ব শাখার দৃষ্টিগোচর হয়। এটি একটি ছত্রাকজনিত রোগ এবং এই রোগের আক্রমণের ফলে ক্ষতির পরিমাণ কম হয়। এই রোগের আক্রমণ প্রধানতঃ দেখা যায় ধানগাছের খোলে এবং কখন কখন পাতায় বা ধানে। আক্রান্ত অংশে প্রথমে ছোট ছোট বাদামী রঙের দাগ দেখা যায় এবং পরবর্তীকালে এই দাগ এক ইঞ্চির মত লম্বা হয় এবং দাগের মাঝখানটা ধূসর রঙ ধারণ করে এবং আক্রান্ত স্থানে ছোট ছোট ফুটকির মত কালো কালো ছত্রাকের গুটি দেখা যায়।

ভুসা রোগ (Kernel Smut)

আমাদের রাজ্যে এই রোগের আবির্ভাব যদিও ১৯৪২ বলে ডঃ চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীশুবোধ সেনগুপ্ত মহাশয় প্রথম লিপিবদ্ধ করেন কিন্তু তখন এই রোগটি বিশেষ বিস্তারলাভ করেনি। ইদানীংকালে এই রোগটি বিশেষভাবে বীরভূম ও বর্ধমান জেলায় ব্যাপকভাবে দেখা যাচ্ছে। ভুসা





পাশে বাদামী দাগ
রোগের আক্রমণ
দেখানো হচ্ছে।

রোগ ধান পাকবার সময় চোখে পড়ে। এতে ধানের খোসা ফেটে অতি মিহি কালো রঙের গুঁড়ো বেরিয়ে আসে। অনেক সময় চালে কাপ্তে দাগ দেখা যায়। এই ধরনের রোগা-ক্রান্ত বীজের চারা বেঁটে হয়। এই রোগটি হলে ফুল অবস্থায় একপ্রকার ছত্রাকের আক্রমণ ঘটে এবং ধানের বীজে রোগের লক্ষণ দেখা দেয়। কিন্তু এখন পর্যন্ত যা কাজ হয়েছে তার ভিত্তিতে বলা যায় যে রোগটি বীজবাহী নয়। মাত্রাতিরিক্ত নাইট্রোজেন সার ব্যবহার করা ক্ষেতে এই রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা যায়। পরিমাণমত নাইট্রোজেন সার প্রয়োগে এই রোগের প্রকোপ কমে যায়।

ধানের রোগ পর্যবেক্ষণের সময় যা নজরে এসেছে এবং পরীক্ষাগারে পাঠানো নমুনার পরীক্ষার ভিত্তিতে বলা যায় যে ইদানীংকালে বিশেষ করে বোরো মরুত্মে ধানের শীষে বিভিন্ন ছত্রাকের আক্রমণ ঘটে থাকে এবং বিভিন্ন

আকারের বাদামী দাগ দেখা যায়। কখনও এই দাগের মাঝখানটা সাদাটে বা ধূসর রঙের হয়। অনেক সময় ধানের শীষটি গন্ধি পোকা আক্রান্ত শীষের মত দেখায়। আবার কখনও আংশিক / সম্পূর্ণ ধানের শীষটি চিটে হয়ে গিয়ে এক জটিলতার সৃষ্টি করে। আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় রোগের আক্রমণে শীষটি চিটে হয়ে গেছে, কিন্তু আসলে তা নয়। কোন রোগ নিরূপিত না হলে এই ধরনের লক্ষণ দেখা যায়। তার প্রধান কারণ, সুষম সারের ব্যবহারের অজ্ঞতা। বোরো ধানের শীষের ভ্রূণ স্ফীতির সময় নাইট্রোজেনযুক্ত সার চাপান দেওয়ার ফলে এই চিটে হবার সম্ভাবনা থাকে।

আজকের পরিবর্তনশীল চাষের পরিবেশে নতুন বা গুরুত্বহীন রোগের প্রাদুর্ভাবের সম্ভাবনা থাকে। এই ব্যাপারে ধানের রোগের পর্যবেক্ষণ ও রোগ নির্ণয়ের উপরে গুরুত্ব দিতে হবে, যাতে সময়মত প্রতিরোধ ব্যবস্থা নেয়া যায়।

পশ্চিমবঙ্গে ধানই সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ ফসল, যা ৫.২ মিলিয়ন হেক্টর জমিতে আউশ (মার্চ—সেপ্টেম্বর), আমন (জুন—ডিসেম্বর), এবং বোরো (নভেম্বর—মে) এই তিনটি প্রধান মরসুমে চাষ হয়ে থাকে। পশ্চিমবঙ্গ ভারতের দ্বিতীয় ঘন বসতিপূর্ণ রাজ্য, দেশের ভৌগোলিক এলাকার ২.৭ শতাংশ ভূমিতে দেশের মোট জনসংখ্যার ৮ শতাংশেরও বেশী লোকের ভরণপোষণ হয়। সমগ্র দেশের ধান উৎপাদনের মোট এলাকার শতকরা ১৪ ভাগ জমি থেকে সমগ্র দেশের মোট উৎপাদনের ১৫ ভাগ এখানে উৎপন্ন হয়। তা সত্ত্বেও নানা কারণে এ রাজ্যের গড় ফলন হার কম। আধুনিক প্রযুক্তিবিজ্ঞান প্রয়োগে তবুও এই বিশাল এলাকায় ধানের গড় উৎপাদন বাড়িয়ে তোলার যথেষ্ট সূযোগ রয়েছে। এখন চাষের জমি ক্রমশঃ সঙ্কুচিত হয়ে আসছে, এলাকা বাড়িয়ে উৎপাদন বাড়ানোর সম্ভাবনা নেই বললেই চলে। অতএব জমি এবং ফসলের উৎপাদন ক্ষমতা বাড়িয়ে মোট উৎপাদন বাড়াতে হবে।

কৃষি জলবায়ু অঞ্চল

পশ্চিমবঙ্গকে মোট ৬টি প্রধান কৃষি জলবায়ু অঞ্চলে ভাগ করা হয়েছে।

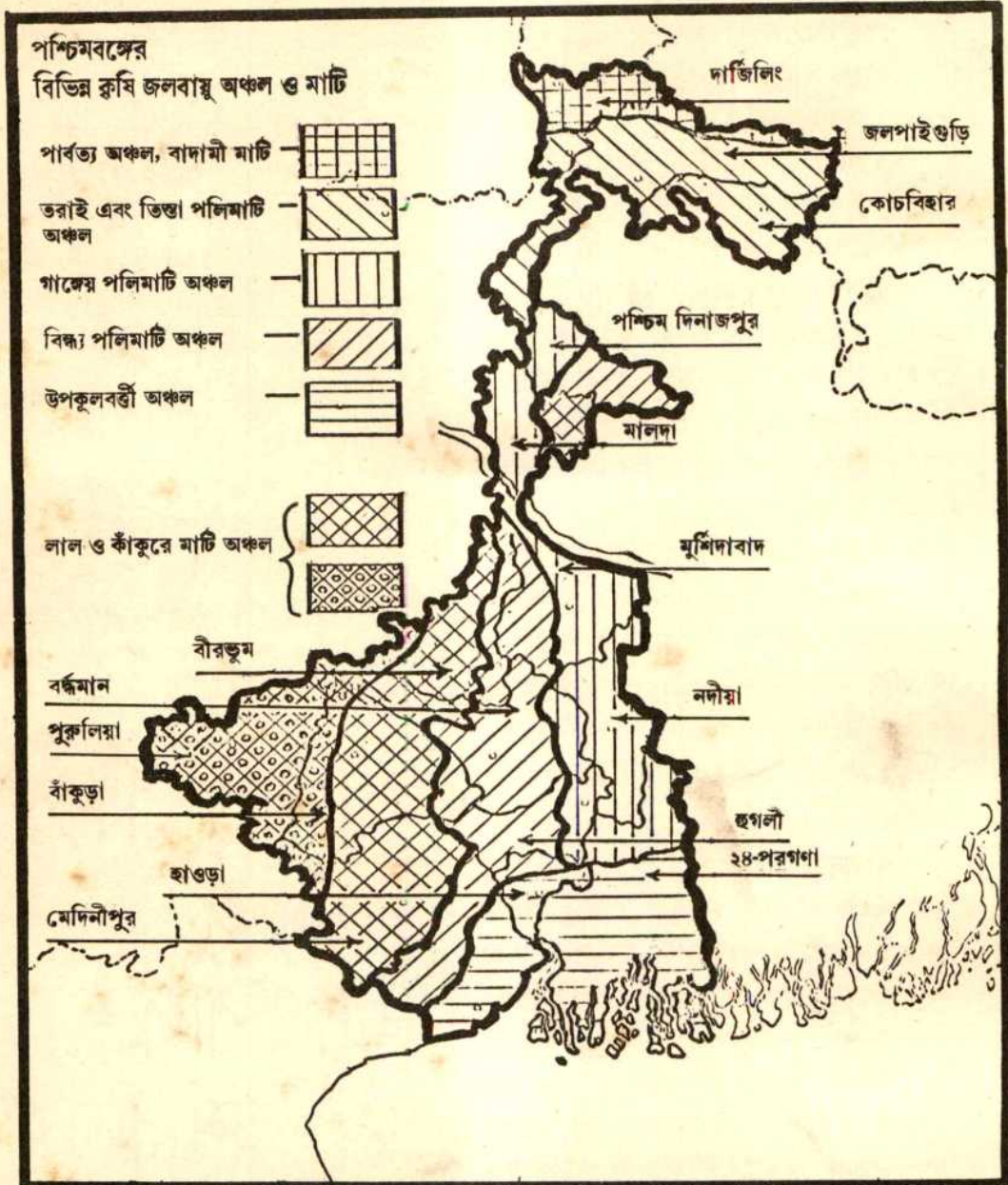
- ১) পার্বত্য অঞ্চল—দার্জিলিং জেলার পার্বত্য অঞ্চল যেখানে ১০৩৫ মিটার উচ্চতা পর্যন্ত ধান চাষ হয়।
- ২) তরাই অঞ্চল—হিমালয়ের পাদদেশ অঞ্চল অর্থাৎ কোচবিহার, জলপাইগুড়ি এবং দার্জিলিং জেলার সমভূমি অঞ্চল।
- ৩) গাঙ্গেয় সমতলভূমি অঞ্চল—পশ্চিম-

কৃষি অধিকর্তা, পশ্চিমবঙ্গ।



বিষ্ণুপদ মণ্ডল

সপ্তম বোডনোকালে
পশ্চিমবঙ্গে
ধানোৎপাদন
বৃদ্ধির সম্ভাবনা।



দিনাজপুর, মালদার পশ্চিমাংশ, মুর্শিদাবাদের পূর্বাংশ, নদীয়া ও উত্তর ২৪-পরগণা। এগুলি নতুন পলিমাটি অঞ্চলে পড়ে।

- ৪) মধ্যবর্তী বিস্তৃত পলিমাটি অঞ্চল বা পুরাতন পলিমাটি অঞ্চল—যেমন মুর্শিদাবাদের পশ্চিমাংশ, বর্ধমান, হুগলী, মেদিনীপুর জেলার মধ্যবর্তী অংশ।
- ৫) লাল ও কঁকুরে মাটি অঞ্চল—পুর্নুলিয়া, বাঁকুড়া, বীরভূম এবং বর্ধমান ও মেদিনীপুর জেলার পশ্চিমাংশ।
- ৬) উপকূলবর্তী ও নোনামাটি অঞ্চল—হাওড়া, ২৪-পরগণা ও মেদিনীপুরের দক্ষিণভাগ।

প্রত্যেকটি অঞ্চলেই আরও ধান উৎপাদনের সম্ভাবনা যেমন আছে আবার কিছু কিছু অসুবিধাও আছে। ধান উৎপাদনের পরিস্থিতি বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন রকম। জমির অবস্থান, মাটির প্রকার ভেদ ইত্যাদির জন্য চাষ পদ্ধতিও বিভিন্ন।

এ রাজ্যের বৃষ্টিপাত মূলতঃ দক্ষিণ পূর্ব মৌসুমী বায়ুর ওপর নির্ভরশীল। এই মৌসুমী বায়ুঘটিত বৃষ্টিপাত জুন থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত হয়ে থাকে। বৃষ্টিপাতের পরিমাণ নিম্ন হিমালয়ের পার্বত্য অঞ্চলে প্রায় ৩৫০০ মিলিমিটার থেকে পশ্চিমাঞ্চলে ১২৫০ মিলিমিটার পর্যন্ত হয়ে থাকে। এই পরিমাণ বৃষ্টির আবার শতকরা ৮০ ভাগ জুন থেকে সেপ্টেম্বরের মধ্যেই হয়ে থাকে। তাপমাত্রা শীত ও গ্রীষ্মে যথাক্রমে ৫° সেলসিয়াস (সর্বনিম্ন) এবং ৪২° সেলসিয়াস এর মধ্যে থাকে। ঝরিকের আশানুরূপ ফলনের

জন্য সূর্যালোক সব সময়ে পর্যাপ্ত থাকে না। কিন্তু বোরো মরশুমে তা অল্পকূল থাকে। সেচ ব্যবস্থা

রাজ্যের মোট চাষ এলাকার শতকরা প্রায় ৩০ ভাগ জমি সেচ পেয়ে থাকে তিনটি প্রধান সেচ প্রকল্প যথা ডি-ভি-সি, ময়ূরাক্ষী ও কংসা-বতীর মাধ্যমে এবং সেইসঙ্গে প্রায় ৩০০০ গভীর নলকূপ, ৩০০০ নদী থেকে জল উত্তোলন প্রকল্প এবং প্রায় ২,৫০,০০০ অগভীর নলকূপ থেকে। এছাড়া বড় বড় বিল, পুকুর ও খাল থেকেও কিছু কিছু জায়গায় সেচ দেওয়া হয়ে থাকে যার পরিমাণ খুব কম নয়।

ধানোৎপাদন ও শস্যের নিবিড়তা

এ রাজ্যের মোটামুটি শস্যের নিবিড়তা শতকরা ১৪৪ ভাগ। কিন্তু সেচপ্রাপ্ত এলাকার কোন কোন জায়গায় এই নিবিড়তা শতকরা ৩০০ ভাগেও পৌঁছেছে। প্রায় সমস্ত এলাকাতেই ধানই প্রধান ফসল। বেনীর ভাগ অঞ্চলে ধান এক ফসলী এবং কোথাও বা দু'ফসলী শস্য। ফসলের বৃদ্ধির সময়ে প্রাকৃতিক অবস্থার চূড়ান্ত তারতম্যের জন্য যেমন প্রতিকূল আবহাওয়া বিশেষ করে অর্ধ্রতা বা জলের পরিস্থিতির জন্য ধানের ফলন বেনীর ভাগ ক্ষেত্রেই আশানুরূপ হয় না।

ধানের বিভিন্ন জাতের পরিচয়

বিভিন্ন আঞ্চলিক অবস্থায় বিভিন্ন কৃষি জলবায়ুর উপযোগী অধিক ফলনশীল জাত এবং স্থানীয় উন্নত জাতের ধানের সুপারিশ রয়েছে। এ সম্পর্কে কাজ এগিয়ে চলেছে যাতে আরও কিছু নতুন জাত এই পঞ্জীতে সংযোজিত হতে পারে।

ধানের বিভিন্ন জাত

আউশ

এলাকা	উপযুক্ত জাত	স্থানীয়
	অধিক ফলনশীল	
১) খরা প্রবণ কাঁকুরে মাটি অঞ্চল : সমগ্র পুকুরিয়া ও বাঁকুড়া জেলা এবং মেদিনীপুর, বর্ধমান ও বীরভূমের পশ্চিমাঞ্চল।	বোনা ও রোয়ার উপযোগী : আই-ই-টি ৮২৬ ও ১৪৪৪ (রসি), পলমেন ৫৭৯ ও সি-আর ১২৬- ৪২-১। কেবল রোয়ার উপযোগী : রত্না, , সি-এন-এম-৬ (লক্ষ্মী) ও ২৫, আই-ই-টি ২২৩৩ ও ৪০৯৪ (ক্ষিতীশ); এবং আই-আর ৩৬।	ছলার
২) পলিমাটি অঞ্চল : মালদহ, মুর্শিদাবাদ, নদীয়া, ২৪ পরগণা, হাওড়া, হুগলী, পশ্চিম দিনাজপুর (ইসলামপুর মহকুমা বাদে) এবং বীরভূম, বর্ধমান ও মেদিনীপুর জেলার পূর্বাঞ্চল।	বোনা ও রোয়ার উপযোগী : পলমেন ৫৭৯, সি-এন-এম ২৫, সি-আর ১২৬-৪২-১, আই-ই- টি ২২৩৩ ও আই-আর ৩৬ ও ৫০। কেবল রোয়ার উপযোগী : রত্না, সি-এন-এম ৬ (লক্ষ্মী) এবং আই-ই-টি ১৪৪৪ (রসি) ও ৪০৯৪ (ক্ষিতীশ)।	ছলার ও এন-সি ১৬২৬।
৩) তরাই অঞ্চল : কোচবিহার, জলপাইগুড়ি, দার্জিলিং জেলার শিলিগুড়ি ও পঃ দিনাজপুর জেলার ইসলামপুর মহকুমা।	কেবল বোনার উপযোগী : আই-ই-টি ১৪৪৪ (রসি) ও ২২৩৩, পলমেন ৫৭৯ এবং সি-আর ১২৬-৪২-১।	ছলার ও এন-সি ১৬২৬।

আমন

এলাকা ও জমির অবস্থান	উপযুক্ত জাত	স্থানীয়
	অধিক ফলনশীল	
১) পাহাড়ী অঞ্চল : উচু	১৩০—১৪০ দিনে পাকে : (২০০০ ফুটের নীচে) আই-আর ৩৬ ও পলম্নন-৫৭৯। (২০০০—৪০০০ ফুটের মধ্যে) : কালিম্পাং-১ ও সি-আই ৫৩১০ (মুনাল)।	বাদকলমকাটি
২) তরাই অঞ্চল : উচু (৪" পর্যন্ত জল)	১০০—১২০ দিনে পাকে : পলম্নন-৫৭৯, আই-ই-টি ২২৩৩ ও ৪০৯৪ (ক্ষিত্রী) এবং আই-আর-৩৬।	বাদকলমকাটি ও চূর্ণকাটি
মাঝারি (৪"—৮" পর্যন্ত জল)	১২০—১৪০ দিনে পাকে : আই-ই-টি ২৮১৫ (শস্যজী), ২২৫৪ (প্রকাশ) ও ৬১৪১ (কৃষ্টি), আই-আর-২০ এবং সি-এন-বি-পি-২১৬।	পাটনাই-২৩ ও নাগরা।
মাঝারি নীচু (৮"—১২" জল)	১৪০—১৫০ দিনে পাকে : পঙ্কজ, সি-এন ৫৪০ (সুরেশ), মানসুরি এবং আই-ই-টি ৫৬৫৬ (স্বর্ণ)।	
৩) কাঁকুরে ও লালমাটি অঞ্চল : উচু (২" জল)	১০০—১১০ দিনে পাকে : আই-ই-টি ৮২৬ ও ১৪৪৪ (রসি) এবং সি-আর ১২৬-৪২-১।	বাদকলমকাটি ও চূর্ণকাটি।
মাঝারি (২"—৪" জল)	১১০—১২৫ দিনে পাকে : রত্না, পলম্নন-৫৭৯, আই-ই-টি-১৪৪৪ (রসি), ২২৩৩ ও ৪০৯৪, সি-এন-এম ৬ (লক্ষ্মী) ও ২৫ এবং আই-আর ৩৬ ও ৫০।	কলমা-২২২, ভাসামানিক, রূপশাল, রঘুশাল।

ନୀଚୁ (୫"—୮" ଜଳ)	୧୨୫—୧୫୦ ଦିନେ ପାକେ : ଆଇ-ଆର ୨୦ ଏବଂ ଆଇ-ଇ-ଟି- ୨୨୫୫ (ପ୍ରକାଶ), ୨୮୧୫ (ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ) ଓ ୬୧୫୧ (କୃଷ୍ଣ) । ୧୫୦ ଦିନେ ପାକେ : ପହଞ୍ଜ, ମାନ୍ସୁରି, ଆଇ-ଇ-ଟି ୫୬୫୬ (ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ) ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥ ।	ଭିଲକକାଚାରି ରଘୁଶାଳ ଓ ଏନ-ସି ୬୭୮ ।
(୫) ମାଲିମାଟି ଅଞ୍ଚଳ : ଉଚ୍ଚ (୨"—୫" ଜଳ)	୧୦୦—୧୨୦ ଦିନେ ପାକେ : ମଲମନ ୫୭୯, ରଞ୍ଜା, ସି-ଆର- ୧୨୬-୫୨-୧, ଆଇ-ଇ-ଟି ୧୫୫୫ (ରସି), ୨୨୭୭ ଓ ୫୦୯୫ ଏବଂ ଆଇ-ଆର ୭୬ ଓ ୫୦ ।	ବାଦକଲମକାଟି ଓ ଚୂର୍ଣ୍ଣକାଟି ।
ମାନ୍ସୁରି (୫"—୮" ଜଳ)	୧୨୦—୧୫୦ ଦିନେ ପାକେ : ଆଇ-ଆର ୨୦, ସି-ଏନ-ଏମ ୭୧, ଆଇ-ଇ-ଟି ୧୧୭୬, ୨୮୧୫ (ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ), ୨୨୫୫ (ପ୍ରକାଶ) ଓ ୬୧୫୧ (କୃଷ୍ଣ) ଏବଂ ସି-ଏନ-ବି-ପି ୨୧୭ ।	ନାଗରା ଭାସାମାନିକ, ରୁପଶାଳ, ଝିଞ୍ଜାଶାଳ, କଲମା-୨୨୨ ଓ ହୁସର ।
ମାନ୍ସୁରି ନୀଚୁ (୮"—୧୨" ଜଳ)	୧୫୦—୧୫୦ ଦିନେ ପାକେ : ପହଞ୍ଜ, ମାନ୍ସୁରି, ଆଇ-ଇ-ଟି ୫୬୫୬ (ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ), ସି-ଆର ୧୦୦୯ (ମାବିତ୍ରୀ) ଓ ୧୦୧୦ ଏବଂ ସି-ଏନ ୫୫୦ (ହୁରେଶ) ଏବଂ ସି-ଏନ-ଏମ ୫୭୯ (ବିରାଜ) ।	ପାଟନାହି-୨୭, ରଘୁଶାଳ ଓ ଏନ-ସି ୬୭୮ ।
ନୀଚୁ (୩" ଜଳ)	୧୫୦ ଦିନେ ପାକେ : ସି-ଏନ ୫୫୦ (ହୁରେଶ) ଏବଂ ସି-ଏନ-ଏମ ୫୭୯ (ବିରାଜ) ।	ଏନ-ସି ୧୨୮୧, ଓ-ସି ୧୭୯୭, ଭିଲକକାଚାରି, ଆଛଡା ଓ କୁମଡାଗୋଡା ।
ବେଶି ନୀଚୁ (୩" ଉପରେ ଜଳ ଜାମେ)		ଜଳାଧି-୧ ଓ ଜଳାଧି-୨ ।

৫) সমুদ্র উপকূল অঞ্চল : মাঝারি নীচু (৪"—১২" জল) নীচু (১"— জল)	১৩০—১৫০ দিনে পাকে : আই-ই-টি ১১৩৬, ২২৫৪ (প্রকাশ) আই-আর ২০, মাসুরি এবং সি-এন ৫৪০ (সুরেশ)। —	পাটনাই-২৩, রূপশাল ও সীতাশাল। এন-সি ১২৮১ ও ৬৭৮, ও-সি ১৩৯৩, তিলককাচারি, কুমড়াগোড়া।
৬) লবণাক্ত অঞ্চল :	—	পাটনাই-২৩ ও এস-আর ২৬বি।
৭) বহু প্রাচীর অঞ্চল :	—	এফ-আর ১৩এ ও ৪৩বি, আছড়া ও তিলককাচারি।

ধান উৎপাদনে প্রাকৃতিকতা

(ক) প্রাকৃতিক এবং পরিবেশগত

- ১। প্রাকৃতিক, জমির অবস্থান এবং মাটির প্রকারজনিত তারতম্য ;
- ২। অপ্রতিরোধ্য প্রাকৃতিক দুর্বিপাক—যথা বহু, খরা, ঘূর্ণিঝড়, শিলাবৃষ্টি ইত্যাদি।
- ৩। খরাপ্রবণ (১২ লক্ষ হেক্টর), সমুদ্রোপকূলের নীচু এবং লবণাক্ত অঞ্চল (৮ লক্ষ হেক্টর) এবং বহুপ্রবণ ও খুব নীচু এলাকায় (৫ লক্ষ হেক্টর) তুলনামূলকভাবে অল্প ও অনিশ্চিত উৎপাদন ;
- ৪। সেচের জল যোগানের অনিশ্চয়তা এবং অপ্রতুলতা ;
- ৫। বর্ষাকালে জল নিকাশী সুযোগ সুবিধার অভাব ;
- ৬। দূরাকালের সঙ্গে যোগাযোগ ব্যবস্থার অপ্রতুলতা ;

৭। গ্রামীণ বিদ্যুৎ সরবরাহের অনিশ্চয়তা (সেচ ও খামারের বিভিন্ন যন্ত্র চালানোর জন্য বিদ্যুৎ ও জ্বালানি তেল)

- ৮। খণ্ডে খণ্ডে বিভক্ত ছড়ানো জোত জমি।
- ৯। চাষের বিভিন্ন উপাদান যেমন সার, বীজ, শস্যরক্ষার রাসায়নিক ওষুধ, যন্ত্রপাতি প্রভৃতি সরবরাহের অপ্রতুলতা, অনিশ্চয়তা এবং চড়া দাম।

(খ) প্রযুক্তিগত

- ১। বিভিন্ন অঞ্চলভিত্তিক যেমন উঁচু খরাপ্রবণ সরাসরি বীজ বোনার জমির, নীচু বহুপ্রবণ এবং বেশী নীচু প্রভৃতি এলাকায় চাষে প্রযোজ্য এবং উপযুক্ত প্রযুক্তির উন্নয়ন করার আরও দরকার।
- ২। উৎপাদনের প্রধান উপাদান এলাকা উপযোগী জাতের বীজের অভাব রয়েছে ;

- ৩। যেসব প্রযুক্তিগত জ্ঞান ইতিমধ্যেই চালু আছে কৃষকদের মধ্যে তার সম্প্রসারণ ও ব্যবহারের গতি আশানুরূপ নয় ;
- ৪। উৎপাদনের নতুন প্রযুক্তিবিদ্যার সঙ্গে কৃষক ও কৃষিকর্মীদের যথেষ্ট পরিচিতির এখনও অভাব রয়েছে ;
- ৫। উৎপাদন এবং ফসল তোলার পরবর্তী প্রযুক্তির মধ্যে ভারসাম্যের অভাব ;
- ৬। নিম্ন উৎপাদন এলাকার দ্রুত প্রযুক্তি সম্প্রসারণের জন্য প্রদর্শনীক্ষেত্র বা কৃষিকর্ম বিষয়ক প্রকল্পের সংখ্যা আরও বাড়াতে হবে এবং
- ৭। কৃষক, কৃষি শ্রমিক ও মহিলা শ্রমিকদের মধ্যে সঠিক প্রযুক্তিগত জ্ঞান পৌঁছে দেবার জন্য প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা অনেক বেশী জোরদার করতে হবে ;
- ৮। সম্প্রসারণের জন্য উপযুক্ত কর্মীর অভাব।

(গ) অর্থনৈতিক এবং পরিকাঠামোগত

- ১। ক্ষুদ্র, প্রান্তিক ও ভাগচাষী এবং তাদের বিচ্ছিন্ন খণ্ডিত জমির প্রাধান্য ;
- ২। ঋণ ও বিপণনের জন্য যথাযথ সংস্থার অভাব, ফলে যথার্থ প্রয়োজনে ব্যাঙ্ক বা অর্থ সংস্থা থেকে ঋণ পাওয়ার অসুবিধা ;
- ৩। বিশেষ করে ফসল তোলার পর কৃষিপণ্যের নিম্ন বাজার দর ;
- ৪। দূর গ্রামাঞ্চলে বীজ, শস্তরক্ষার যন্ত্রাদি, রাসায়নিক সামগ্রী, সার, কৃষি যন্ত্রপাতি ও অগ্রাভুলতা এবং বিক্রির জন্য এগ্রো-সার্ভিস কেন্দ্রের অভাব ;

- ৫। উৎপাদিত ফসলের সংরক্ষণ ও বিপণনের বিশেষ অসুবিধা।

ধান উৎপাদনে সাফল্য

এই প্রতিকূল পটভূমির পরিপ্রেক্ষিতে পশ্চিমবঙ্গে ধান উৎপাদনের সাফল্যের পর্যালোচনা করা হচ্ছে।

প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি নিম্নরূপ

- ১। চালের উৎপাদনের পরিমাণ পর্যালোচনা করে ক্রমোন্নতির একটি ধারা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। ১৯৪৭-৪৮ সালে ৩৫'৬ লক্ষ টন থেকে ১৯৮৩-৮৪তে তা বেড়ে দাঁড়ায় ৭৯'৪ লক্ষ টন এবং ১৯৮৪-৮৫ সালে ৮০ লক্ষ টনেরও বেশী হবে বলে আশা করা যাচ্ছে।

ধানের উৎপাদন বাড়ানোর কার্যক্রম

পশ্চিমবঙ্গে ধানের ফলন বাড়ানোর কার্যসূচী স্থির করার জন্য নিম্নলিখিত বিষয়গুলির উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে :

- ক) কৃষি উপকরণ ব্যবহার পদ্ধতি—ঋণ খরচের উপকরণ এবং সেগুলির ব্যবহারিক পদ্ধতির সম্প্রসারণ। যেসব উপকরণে খরচ বেশী সেগুলি প্রয়োজন ভিত্তিক ব্যবহারের উপর গুরুত্ব দেওয়া।
- খ) প্রশিক্ষণ ও পরিদর্শন কর্মসূচীর মাধ্যমে গবেষণালব্ধ উন্নত প্রযুক্তিজ্ঞান গ্রহণ ও তা কার্যকরী করা সম্বন্ধে কৃষকদের মানসিকতার পরিবর্তন আনা।
- গ) পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বীজ নিগমের সহযোগিতায় উন্নত মানের বীজ উৎপাদন ও পরিবেশন।
- ঘ) আউশ ও আমন মরসুমে স্থানীয় অঞ্চলের উপযোগী জলদি জাতের

অধিক ফলনশীল ধানের চাষ করা এবং লক্ষ্য রাখা যাতে একই জমি থেকে একাধিক ফসল উৎপন্ন করা যায়।

- ঙ) কেন্দ্রীয় ও রাজ্য মিনিকিট কার্যসূচীর মাধ্যমে আধুনিক জাতের দ্রুত বিস্তার।
- চ) আধুনিক চাষে সার একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। তাই এর ব্যবহারে যেসব বিষয়ের উপর গুরুত্ব দেওয়া দরকার তা হ'ল দুর্গম এলাকায় সার পরিবহনে অহুদান দেওয়া, ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের সার ব্যবহার রীতি সম্বন্ধে বিশেষ সুপারিশ করা। মাটির উর্বরতা বৃদ্ধির জন্য জৈব এবং রাসায়নিক উপাদান ব্যবহার, অধিক সংখ্যক প্রদর্শনক্ষেত্রের মাধ্যমে কৃষকদের সার ব্যবহারে উৎসাহিত করা এবং সার দেওয়ার পদ্ধতি ও সময়ের গুরুত্ব দিয়ে সুখম সার ব্যবহারের সম্প্রসারণ করা।
- ছ) ক্ষুদ্র, প্রান্তিক কৃষক এবং ভাগচাষীদের ঋণদানের সুযোগ বাড়ানো।
- জ) প্রয়োজনভিত্তিক সুসংহত রোগ ও কীট দমন ব্যবস্থা।

গবেষণার ধারা

পশ্চিমবঙ্গে বর্তমানে ধান গবেষণা কার্যসূচীতে যেসব বিষয়ের উপর অগ্রাধিকার ও গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে তা নিম্নরূপ :

- ১। খরাপ্রবণ এবং বৃষ্টিনির্ভর এলাকার জন্য আরও ভাল জাতের ধান উদ্ভাবন।
- ২। জলমগ্ন নিচু জমির জন্য উন্নত জাত সৃষ্টি ও তার চাষ পদ্ধতি।
- ৩। সমান্তরাল জমি যেমন উত্তরবঙ্গের

তরাই অঞ্চল ও সমুদ্রোপকূলবর্তী লবণাক্ত অঞ্চলের জন্য ধানচাষের উন্নত চাষ পদ্ধতি।

- ৪। বিভিন্ন অঞ্চলের জন্য ধানকে কেন্দ্র করে শস্য পর্যায় নির্ণয় করা।
- ৫। ধান চাষে জৈব ও জীবাণুসারের ব্যবহার।
- ৬। প্রতিরোধ শক্তিসম্পন্ন জাতের চাষের প্রসার এবং কীটনাশকের প্রয়োজন-ভিত্তিক প্রয়োগের মাধ্যমে ধানের রোগ ও কীট দমন।

সপ্তম যোজনাকালে বিশেষ কার্যসূচী

এ রাজ্যে বর্তমানে উৎপাদিত ৬.৭৮ মিলিয়ন টন চাল থেকে ১৯৯০ সালের মধ্যে ৯.৩ মিলিয়ন টন চাল করার জন্য ৩৪১টি উন্নয়ন ব্লকের মধ্যে থেকে ৭০টি ব্লক বেছে নিয়ে একটি বিশেষ কার্যসূচী গ্রহণ করা হয়েছে, যার ফলে আগামী পাঁচ বছরের মধ্যে শতকরা ৩৭ ভাগ ফলন বৃদ্ধি আশা করা যাচ্ছে। কৃষিজমির পরিমাণ সীমিত। তাই মোট উৎপাদন এবং হেক্টর প্রতি ফলনের হার যেভাবে বাড়ানো যেতে পারে তা পরের পৃষ্ঠায় উল্লেখ করা হলো।



বস্তুকরা : আষাঢ়-শ্রাবণ : ১৩৯২

১৯৮৯-৯০ সালের লক্ষ্যমাত্রা					
পাঁচ বছরের গড় উৎপাদন মিলিয়ন টনে	গড় ফলনের হার হেক্টরে প্রতি কেজিতে	উৎপাদন মিলিয়নে	গড় ফলনের হার হে: প্রতি কেজিতে	উৎপাদন বৃদ্ধি শতকরা হারে	ফলনের হার বৃদ্ধি শতকরা হারে
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)
খরিফ					
আউশ					
ও					
আম্রন	৫.৭৮	১২০০	৭.৮	১৬০০	৩৫
বোরো	০.৯৮	২৬০০	১.৫	৩০০০	৫৩
মোট	৬.৭৬	১৩০০	৯.৩	১৭০০	৩৮

তিনটি মরসুমে ধানের মোট উৎপাদন এবং গড় ফলন বাড়ানোর জন্ত যে কার্যসূচী নেওয়া হয়েছে তার মধ্যে থাকবে বিভিন্ন এলাকার উপযোগী উন্নত জাতের বীজ, সুষম সার প্রয়োগ, ঋণের ব্যবস্থা এবং আধুনিক চাষ পদ্ধতি। এই

বিশেষ ধান উৎপাদন কার্যসূচী ছাড়াও যে ধান উৎপাদন করা হচ্ছে তার ফলনও যাতে বাড়ানো যায় সেজন্ত প্রশিক্ষণ ও পরিদর্শন কার্যসূচী আরও জোরদার করে তার জন্ত যে যে উপকরণ প্রয়োজন তারও সরবরাহের বন্দোবস্ত করতে হবে।

ধানের মোট উৎপাদন এবং গড় ফলন বাড়ার জন্য ৭০টি নির্বাচিত ব্লকে একটি বিশেষ ধান উৎপাদন প্রকল্প নেওয়া হয়েছে। এই প্রকল্প রূপায়ণের জন্য যে সব ব্যবস্থা নেওয়া হবে তা এখানে উল্লেখ করা হলো।

খরিফ ধান (আউশ ও আমন)

আগেই বলা হয়েছে যে বর্তমানে যে পরিমাণ জমিতে ধানের চাষ হচ্ছে তা বাড়ানোর সম্ভাবনা খুবই কম। ধানের মোট উৎপাদন বাড়াতে গেলে ধানের গড় ফলন বাড়ানো ছাড়া অন্য উপায় নাই। বর্তমানের হেক্টর প্রতি গড় ফলন ১'২ টনের জায়গায় বাড়িয়ে ১'৬ টন করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। তাতে পাঁচ বছরে শতকরা ৩৪'৫ ভাগ উৎপাদন বৃদ্ধি হবে। এই লক্ষ্যসীমা কার্যকরী করার জন্য নিম্নলিখিত

ব্যবস্থাগুলি নেওয়া হবে।

বীজ

নির্বাচিত ৭০টি ব্লকে প্রায় ১৩'৬ লক্ষ হেক্টর জমিতে খরিফ ধানের চাষ হবে। এই ব্লকগুলিতে কম দামে অথবা মিনিকিট হিসাবে ও যৌথ বীজতলা করার জন্য বীজ বিতরণের প্রকল্প নেওয়া হয়েছে। হেক্টরে ৫০ কেজি বীজের হার এবং বীজ পরিবর্ধনের হার শতকরা ২০ ভাগ হিসাবে ধরে আগামী পাঁচ বছরে বর্তমানের শতকরা ৩০ ভাগ থেকে বাড়িয়ে ৬০ ভাগ জমিতে উচ্চ ফলনশীল জাতের ধান চাষ করার লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করা হয়েছে।

সার

নির্বাচিত ব্লকগুলিতে সারের বন্টন ব্যবস্থা জোরদার করা হবে এবং সার রক্ষণের জন্য

ধানোৎপাদনের বিশেষ প্রকল্প-১৩৮৫-১০ (কার্যধারা)



বস্তুকরা : আষাঢ়-শ্রাবণ : ১৩৯২

আরও গুদামের ব্যবস্থা করা হবে। দূর এবং অগম্য জায়গাগুলিতেও যাতে সার যথেষ্ট পরিমাণে মজুত থাকে তার জন্য সরকারি ও বেসরকারি সার ডিলারদের উৎসাহ দেওয়ার ব্যবস্থা রাখা হবে।

ঋণ

প্রতি বছর ৭০টি ব্লকের জন্য আলাদা আলাদা করে প্রকল্প তৈরি করতে হবে যাতে প্রতিটি যোগ্য কৃষক সমবায় সংস্থা অথবা ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ পেতে পারে। এজন্য যেখানে প্রয়োজন হবে সেখানে নতুন পথও খুলতে হবে যাতে ঐসব ব্লকের কৃষকরা বর্তমানে সংস্থার মাধ্যমে যে শতকরা ২০ ভাগ ঋণ পাচ্ছে তার চেয়ে বেশী পেতে পারে। বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলিকেও দেয় ঋণের পরিমাণ বাড়ানোর জন্য অনুরোধ করা হবে।

সম্প্রসারণ

কৃষকদের কাছে যাতে আধুনিক প্রযুক্তি-জ্ঞান সময়মত পৌঁছে দেওয়া যায় তার জন্য সম্প্রসারণ কাজের প্রসারের প্রয়োজন। বর্তমানে ১৪০০ কৃষক পরিবার পিছু একজন করে যে কে.পি.এস. নিয়োগের ব্যবস্থা রয়েছে সে জায়গায় ৫০০ কৃষক পরিবার পিছু একজন করে কে.পি.এস. নিয়োগের কথা ভাবা হচ্ছে। এই নির্বাচিত ব্লকগুলিতে শুধু ধান উৎপাদন প্রকল্পের জন্য একজন করে কৃষি উন্নয়ন আধিকারিক নিয়োগ করার কথাও ভাবা হচ্ছে। শুধু ব্লক স্তরেই নয় মহকুমা, জেলা ও রাজ্য সদর দপ্তরেও আরও কর্মী নিয়োগের ব্যবস্থার দরকার হবে।

বোরো ধান

এই বিশেষ কার্যসূচীতে বোরো ধানের চাষ

এবং তার ফলন বৃদ্ধির উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হবে; কারণ বোরো ধান চাষে উন্নত কৃষি প্রযুক্তি প্রয়োগের ফল ভালভাবে পাওয়া যায়। ১৯৮৯-৯০ সালের মধ্যে তাই বোরো ধানের বর্তমান ৩.৭২ লক্ষ হেক্টর এলাকাকে বাড়িয়ে ৫.৫ লক্ষ হেক্টর করার কথা ভাবা হচ্ছে। এর ফলে আগামী ৫ বছরের মধ্যে বোরোর এলাকা ১.৭৮ লক্ষ হেক্টর বাড়বে। গড় ফলন ও মোট উৎপাদন বাড়ানোর জন্য নির্বাচিত ব্লকগুলিতে সেচের ব্যবস্থাও বাড়াতে হবে।

কৃষি উপকরণ ও ঋণদানের যে কার্যসূচী নেওয়া হবে তা বোরো চাষীদেরও উপকারে আসবে। আশা করা যায় যে এইসব ব্যবস্থা নেওয়ার ফলে আগামী পাঁচ বছরে বোরো ধানের উৎপাদন এবং গড় ফলন যথেষ্ট বৃদ্ধি পাবে। ফলনের হার হেক্টর প্রতি ২.৬ টন থেকে বেড়ে ২.৮০ টনে দাঁড়াবে। অর্থাৎ পাঁচ বছরে শতকরা ৬০ ভাগ উৎপাদন বৃদ্ধি ও শতকরা ৮ ভাগ হেক্টর প্রতি গড় ফলন হারের বৃদ্ধি ঘটবে।

কৃষি যন্ত্রপাতি

বর্তমানে চাষের কাজে কৃষি যন্ত্রপাতির ব্যবহার এ রাজ্যে খুবই সীমিত। আধুনিক কৃষি যন্ত্রপাতি কৃষকরা যাতে আরও বেশী ব্যবহার করতে পারেন সেজন্য ক্ষুদ্র, প্রান্তিক ও আদিবাসীদের শতকরা ৫০ ভাগ ভরতুকীতে কৃষি যন্ত্রপাতি দেওয়া হবে।

অর্থ বরাদ্দ

ধানের উৎপাদন বাড়ানোর জন্য ভারত সরকার পাইলট প্রজেক্টের অন্তর্গত প্রতিটি ব্লকের জন্য ১০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করেছেন। এই ৭০টি ব্লকে বিশেষ কার্যসূচী রূপায়িত করার জন্য

মোট খরচের দায় রাজ্য ও ভারত সরকার অর্ধেক করে ভাগ করে নেবেন (৫০ : ৫০ হিসাবে)। প্রতি বছর যদি ব্লক প্রতি ১০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ থাকে তাহলে মোট ৭ কোটি টাকার প্রয়োজন। এর মধ্যে প্রতি বছর কেন্দ্রীয় সরকারের অংশ হবে ৩ই কোটি ও রাজ্য সরকারের ৩ই কোটি টাকা।

ফলন বাড়ানোর অন্তরায়গুলির বিশ্লেষণ

এ রাজ্যে ধানের ফলন বাড়ানোর জন্ত অনেকগুলি বাধা রয়েছে তার মধ্যে বিভিন্ন অঞ্চলের কৃষি জলবায়ুর বিভিন্নতা। একদিকে অতি নীচু জমি যেমন সমুদ্রতট থেকে জলনিকাশী ব্যবস্থায়ুক্ত ১৪০০ মিটার উচ্চতায়, অন্যদিকে শুষ্ক রুক্ষ লাল কঁকুরে মাটি অঞ্চল এবং জলজমা নীচু জমিতে ধান চাষ হয়ে থাকে। মাটির বিভিন্ন অবস্থানেও ধান চাষ হয় যেমন উঁচু জমি যেখানে বীজ ছিটিয়ে বোনা হয় আবার নীচু যেখানে ৩ মিটার পর্যন্ত জল জমে এমন মাটিতে ধান চাষ হয়। বিভিন্ন জলবায়ু ও মাটির বিভিন্নতা ছাড়াও কিছু সংস্কারগত ও চাষ সংক্রান্ত সমস্যাও আছে যেগুলি অধিক উৎপাদনের ক্ষেত্রে সমস্যা সৃষ্টি করছে। সেগুলি আলোচনা করছি।

(১) জমির একত্রীকরণ

ক্রমাগত জমির খণ্ডীকরণ আধুনিক কৃষি পদ্ধতি অনুসরণের পক্ষে বড় বাধা। ফসলের মোট উৎপাদন এবং গড় ফলন বাড়ানোর জন্ত জমির একত্রীকরণ একান্ত প্রয়োজন। এটি কার্যকরী করতে হলে বিশেষ প্রশাসনিক ব্যবস্থা নেওয়া দরকার।

(২) ভূমি উন্নয়ন

কোন এলাকায় একই জমিতে বার বার চাষ

করা আবার অন্য এলাকায় ভূমিক্ষয় এসবের জন্ত মাটির উর্বরতা নষ্ট হয়। ভূমি উন্নয়ন, ভূমি সংরক্ষণ প্রভৃতির বিশেষ প্রয়োজন রয়েছে অনেক জায়গায়।

(৩) বীজ

বর্তমানে এ রাজ্যের মোট ৩০—৩৫ শতাংশ জমিতে অধিক ফলনশীল জাতের ধানের চাষ হচ্ছে। আমাদের নির্দিষ্ট লক্ষ্যসীমায় পৌঁছাতে গেলে ১৯৮৯-৯০ সালের মধ্যে তা বাড়িয়ে ৫০—৬০ শতাংশ জমিতে করতে হবে। নির্দিষ্ট লক্ষ্যমাত্রায় পৌঁছানো সম্ভব হবে না যদি অধিক ফলনশীল জাতের বীজ সহজে, সস্তায় এবং বিভিন্ন অঞ্চলের উপযোগী সরবরাহ করা না যায়। এজন্য বর্তমানে শতকরা ৫ পঁচ ভাগ উন্নত জাতের বীজের পরিবর্ধন হচ্ছে তা বাড়িয়ে সারা রাজ্যে শতকরা ২০ ভাগ করতে হবে।

(৪) সার

সারের ব্যবহার এ রাজ্যে ক্রমশঃ বাড়ছে এবং ১৯৮৪-৮৫ সালে হেক্টর প্রতি ৫২ কেজিতে তা পৌঁছেছে। কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির জন্ত সারের ব্যবহার যেহেতু অত্যন্ত মুখ্য প্রয়োজনীয় তাই হেক্টর প্রতি সারের ব্যবহার বাড়িয়ে সপ্তম যোজনার শেষে ৮০ কেজি করার লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করা হয়েছে। এই সারের বেশির ভাগই ধান চাষে ব্যবহৃত হবে।

(৫) শস্য রক্ষা

শস্য রক্ষার জন্ত প্রধান গুরুত্ব দেওয়া হবে বাধ্যতামূলকভাবে বীজ শোধন, বীজতলায় ওষুধ প্রয়োগ এবং রাজ্যের ব্যাপক অঞ্চলে স্রসংহত প্রয়োজনভিত্তিক রোগ ও কীট দমনের ব্যবস্থার ওপর।

(৬) কৃষি যন্ত্রপাতি

এ রাজ্যে বলদচালিত শক্তির অভাবের জন্য চাষের কাজে কৃষি যন্ত্রপাতির ব্যবহার এখনও তেমন প্রচলন হয়নি। যেভাবে জমি তৈরি করা হয় তা শস্যের ভাল বাড়ের পক্ষে যথেষ্ট নয়। সেজন্য অধিক সংখ্যক গ্র্যাঞ্জো সার্ভিস সেন্টার খোলার উপর গুরুত্ব দেওয়া হবে যাতে পাওয়ার টিলার, সিড্ ড্রেসার, নিড়ানী ও ধান মাড়াই যন্ত্রের ব্যবহারের সুবিধা দেওয়া যায়। তাছাড়া কৃষকদের এইসব কৃষি যন্ত্রপাতি প্রচুর পরিমাণে বর্তমান সহায়ক মূল্যে দেওয়া হবে।

(৭) সেচ ও জল নিষ্কাশন

পশ্চিমবঙ্গে উৎপাদন বৃদ্ধির অগ্রতম বাধা হলো সেচ ব্যবস্থা উন্নয়নের ধীর গতি। সপ্তম যোজনাকালের মধ্যে আরও পাঁচ লক্ষ হেক্টর জমিতে সেচ ব্যবস্থা সম্প্রসারিত করতে হবে। তা করা হবে প্রধানতঃ ক্ষুদ্র ও মাঝারি সেচ

ব্যবস্থার মাধ্যমে। খরিস্ক মরশুমের জমা জল নিষ্কাশনের ব্যবস্থার দিকেও দৃষ্টি দেওয়া হবে।

(৮) কৃষি ঋণ

সাম্প্রতিক যে পদ্ধতিতে কৃষি ঋণ দেওয়া হচ্ছে তাতে চাষের কাজে ব্যাঘাত হচ্ছে। এই পদ্ধতির পরিবর্তন একান্ত প্রয়োজন। সমবায় ও বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলির কৃষি ঋণ পদ্ধতির পরিবর্তন এমনভাবে করতে হবে যাতে কৃষকদের বর্তমানে দেয় শতকরা ২০ ভাগের জায়গায় শতকরা ৫০ ভাগ ঋণের চাহিদা মেটানো যায়।

(৯) সম্প্রসারণ

প্রশিক্ষণ ও পরিদর্শন কার্যসূচী রাজ্যের সর্বত্র আরও জোরদার করতে হবে বিশেষ করে প্রজেক্ট ব্লকগুলিতে।

প্রকল্পের রূপায়ণ

এই প্রকল্পটি কার্যকরী করার দায়িত্ব থাকবে একটি কমিটির উপর যাতে থাকবেন পঞ্চায়েত



ধানের ক্ষেতে ওষুধ দেয়া হচ্ছে
যথারীতি

নেতারা, কৃষকদের প্রতিনিধি, সম্প্রসারণ আধিকারিক, সমবায় কৃষি ঋণ সংস্থা, সেচ ও অগ্রাগ্র সংশ্লিষ্ট সংস্থার প্রতিনিধিরা। প্রতিটি প্রজেক্ট ব্লকে বিশেষ কোন অসুবিধা থাকলে তা দূর করার জন্য এই কমিটি অর্থ বরাদ্দ করবেন। জেলার কাজ তদারকি করার জন্য রাজ্যস্তরে একটি কমিটি থাকবে।

পাইলট প্রজেক্ট (১৯৮৪-৮৫) ও তার অগ্রগতি

এই বিশেষ কার্যসূচি বিষয়ে অভিজ্ঞতা লাভের জন্য ১৯৮৪-৮৫ সালে এ রাজ্যের দশটি নির্বাচিত ব্লকে এই কার্যসূচি চালু করা হয়। এই ব্লকগুলি মনোনীত করা হয় এ রাজ্যের বিভিন্ন কৃষি জলবায়ু অঞ্চলে এবং সেই ব্লকের কতটা জমিতে ধান চাষ হয় সেচপ্রাপ্ত এলাকা, অধিক ফলনশীল জাতের ধান চাষের সম্ভাবনা এবং প্রশাসনিক সুযোগ সুবিধা ইত্যাদির দিকে লক্ষ্য রেখে। বিভিন্ন জেলার ১০টি নির্বাচিত ব্লকগুলি হলো :

জেলা	ব্লক
(ক) কোচবিহার—	দিনহাটা-২
(খ) পঃ দিনাজপুর—	বালুরঘাট
(গ) মালদা—	গাজোল
(ঘ) মুর্শিদাবাদ—	বারওয়াণ
(ঙ) নদীয়া—	কালীগঞ্জ
(চ) বর্ধমান—	বর্ধমান

জেলা	ব্লক
(ছ) বীরভূম—	সিউড়ি-২
(জ) জুগলী—	পাণ্ডুয়া
(ঝ) বাঁকুড়া—	সোনাখুঁ
(ঞ) মেদিনীপুর (পশ্চিম)—	ডেবরা।

কার্যক্রম

উৎপাদন বাড়ানোর পথে যেসব বাধা আছে পাইলট প্রজেক্টে সেগুলি একসঙ্গে মোকাবিলা করা সম্ভব নয়। সেজন্য ভারত সরকার যে কার্যধারা নির্দেশ করে দিয়েছেন তার ভিত্তিতে ধানের উৎপাদন ও গড় ফলন বাড়ানোর জন্য কয়েকটি বিষয় এবছরে পাইলট প্রজেক্টে কাজের জন্য বেছে নেওয়া হয়েছে। কার্যসূচীর গুরুত্ব বিভিন্ন ব্লকে বিভিন্ন রকম দেওয়া হয়েছে। এই কার্যসূচীতে প্রধান গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে যোথ বীজতুল্য, সহায়ক মূল্যে বীজ বিতরণ, মিনিকিট বিতরণ, উন্নত চাষ পদ্ধতি, সারের ব্যবহার, শস্য রক্ষা, কৃষি যন্ত্রপাতির ব্যবহার ও কৃষি ঋণ।

গত খরিফ মরসুমে জুন-জুলাই মাসে বৃষ্টিপাত কিছু অনিয়মিত হয়েছিল। এরপর বৃষ্টি মোটামুটি ভাল হওয়ায় কৃষকরা এইসব নির্বাচিত ব্লকে উন্নত চাষ পদ্ধতি অনুসরণ করেন এবং খরিফ ফসলের ফলনও ভাল পাওয়া যায়। আশা করা যাচ্ছে প্রথম বছরে যে শতকরা ২০ ভাগ উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা নির্দিষ্ট করা আছে তা রূপায়িত করা সম্ভব হবে।

ভাদ্র মাসে কৃষকের করণীয়

আমন

আমন ধান রোয়ার কাজ শেষ হয়েছে। এখন প্রধান কাজ হলো ধানের ক্ষেতে পরিচর্যা করা। রোয়ার পর থেকে নিয়মিত ক্ষেত ঘুরে দেখুন রোগপোকা লেগেছে কিনা? শুধুমাত্র সন্দেহের বশবর্তী হয়ে কোনরকম কীটনাশক ব্যবহার না করাই ভাল।

রোগপোকার আক্রমণে ক্ষয়ক্ষতি কমানোর জন্য সময়মত ধানের চিটে বা বাদামী দাগ রোগ, মাজরা, শ্যামা, পামরি ও চুঙ্গি পোকার আক্রমণ সম্পর্কে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিন।

কীটনাশক ঝাঁরা ব্যবহার করবেন, তাঁরা এগুলির ব্যবহারে প্রয়োজনীয় সতর্কতা অবশ্যই পালন করবেন।

আলু

আগ্নিন মাসের শেষ থেকে জলদি জাতের

আলু কুফরি চন্দ্রমুখী ও কুফরি অলংকার বসানোর সময়। বীজের জন্ম চাষ করতে যাতে দেরী হয়ে না যায় সেজন্য এখনই বীজ সংগ্রহ করুন।

চিনাবাদাম

ঢলে পড়া রোগ এবং লাল শুঁয়োপোকার আক্রমণ দেখলে গাছে কিন্তু অবশ্যই প্রয়োজনীয় ওষুধ দিন।

শাকসবজি

জলদি বাঁধাকপি, নাবি ফুলকপি, ওলকপি, বেগুন, টমেটো, লঙ্কা প্রভৃতির চাষের জন্ম বীজতলা এখন থেকেই করতে শুরু করুন। ক্ষেতে যেসব সবজি এখন রয়েছে তার পরিচর্যা করুন এবং রোগপোকার আক্রমণ হলে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে কিন্তু ভুল করবেন না।

কৃষিক্রমাং

নিয়মান্বলী

পত্রিকায় প্রকাশিতব্য বিষয়বস্তু : কৃষি বিষয়ক পরিকল্পনার তথ্য, গবেষণার ফলাফল সম্বন্ধে তথ্যাদি, প্রবন্ধ, ছোটগল্প, নাটিকা, সাক্ষাৎকার, নক্সা, কবিতা, প্রযুক্তিগত সমস্যা ও সমাধানের সুপারিশ, প্রয়োত্তর, কৃষি সম্পর্কীয় সরকারী নীতি, প্রকল্প-পরিচিতি ও কাজের অগ্রগতি, কৃষি যন্ত্রপাতি, সেচ ও বিদ্যুতের ব্যবহারগত সমস্যা ও সুপারিশ, শস্য ও ফসল সংরক্ষণ, সমবায় ও কৃষিক্ষণ, কৃষি বিপন্ন, বিভিন্ন জেলার কৃষকদের অভিজ্ঞতার সংবাদ ও রচনা, কৃষকদের স্থানীয় এবং সমষ্টিগত অভাব-অসুবিধার কথা, পশুপক্ষী পালন, মৎস্যচাষ, বনসম্পদ সংরক্ষণ, ভূমি সংরক্ষণ ও সদ্যাবহার, ভূমিসংস্কার-গত রচনা ও সংবাদ, পাহাড়াবিজ্ঞান, সমাজ শিক্ষা ও উন্নয়ন, কৃষিভিত্তিক কৃষ্টির ও ক্ষুদ্রশিল্প, গ্রামীণ অর্থনীতি ও কর্ম-সংস্থানের সমস্যাদি এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ে রেখাচিত্র, আলোকচিত্র, চিত্রকলা ইত্যাদি।

রচনার জ্যোত্স্নানমূল্য : কেবল নিম্নবর্ণিত ধরনের মৌলিক রচনার জন্য (প্রকাশিত হবার পর) নিম্নলিখিত হারে সম্মানমূল্য দেওয়া হবে। (ক) উচ্চমানের কৃষি প্রযুক্তিগত (টেকনিক্যাল) প্রবন্ধ : ৭৫ টাকা, (খ) সাধারণ কৃষি প্রযুক্তিগত (টেকনিক্যাল) প্রবন্ধ : ৫০ টাকা, (গ) সাধারণ কৃষি বিষয়ক প্রবন্ধ/কৃষি বিষয়ক নাটিকা : ৪০ টাকা, (ঘ) সাধারণ প্রবন্ধ ও ছোটগল্প : ৪০ টাকা, (ঙ) কবিতা (প্রকৃতি ও গ্রাম প্রাসঙ্গিক) : ২৫ টাকা।

রচনা ফুলরেপ কাগজের এক পৃষ্ঠায় (মোট ১৫০০ শব্দের অনধিক) কালি দিয়ে স্পষ্ট বাংলা অক্ষরে লিখে সম্পাদিকার ঠিকানায় (সম্পাদিকা, বসুন্ধরা, অফসেট প্রেস, ৪২ গ্রাহামস্ রোড, কলিকাতা-৪০) পাঠাতে হবে। রচনার দুইকপি পাঠান বান্ধনীয়। যথাযথ মূল্যের ডাকটিকিট দেওয়া না থাকলে অমনোনীত রচনা ফেরৎ পাঠান হবে না।

গ্রাহক হবার নিয়ম : যে কোন মাসে বসুন্ধরার গ্রাহক হওয়া যায়। কিন্তু বাংলা সনের বৈশাখ থেকে চৈত্র পর্যন্ত এক বছরের কম সময়ের জন্য গ্রাহক করা হয় না। মাসিক সংস্কার প্রতি কপির মূল্য ২৫ পয়সা। অগ্রিম এককালীন প্রদেয় বার্ষিক চাঁদার হার ৩০০ টাকা। চাঁদার টাকা "কৃষি অধিকর্তা পশ্চিমবঙ্গ"-এর নামে লেখা রেখাঙ্কিত (ক্রেসড) পোস্টাল অর্ডার অথবা রেখাঙ্কিত চেক-এর মাধ্যমে সম্পাদিক, বসুন্ধরা, অফসেট প্রেস, ৪২, গ্রাহামস্ রোড, কলিকাতা-৭০০০৪০-এ পাঠাতে হবে।

বিজ্ঞাপনের হার : (প্রথম প্রচ্ছদের জন্য এবং অর্থ পৃষ্ঠার কম কোন বিজ্ঞাপন নেওয়া হবে না) : প্রচ্ছদ (৪র্থ ক্তার) : ৫০০ টাকা, প্রচ্ছদ (২য়/৩য় ক্তার) : ৪০০ টাকা, সাধারণ পূর্ণ পৃষ্ঠা : ৩০০ টাকা, সাধারণ অর্থ পৃষ্ঠা : ২০০ টাকা। বার্ষিক দুইবছর বিজ্ঞাপনের অগ্রিম প্রদেয় মোট মূল্যের উপর ২০ শতাংশ হারে এবং 'আই-ই-এন-এস' দ্বারা স্বীকৃত এজেন্সীকে বিজ্ঞাপনের মোট মূল্যের উপর ১৫ শতাংশ হারে কমিশন দেওয়া হয়।

ইহা একটি কৃষি-সম্পর্কিত ব্যবসায় এবং গ্রামীণ সমস্যা ও উন্নয়নমূলক যে কোন বিজ্ঞাপন (সরকারী নীতির পরিলক্ষ্য নয়) প্রচারের কার্যকরী ও উপযুক্ত মাধ্যম। সরকারী, বিধিবদ্ধ/অনন্যায়সিত সংস্থা অথবা বেসরকারী প্রতিষ্ঠান, ব্যক্তি, সমবায় প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি সকলেই এই পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিতে পারেন।

কমিশন এজেন্ট : কলিকাতাসহ বিভিন্ন জেলায় একাধিক বিক্রয়কারী এজেন্সী তালিকাভুক্ত করা হয়। ১০০ কপি কমে এজেন্সী দেওয়া হয় না। এজেন্সীগুলিকে ২০ শতাংশ হারে কমিশন দেওয়া হয়। এজেন্সীকে অর্ডার দেওয়া কপির মোট মূল্যের টাকা (২০%) কমিশন বাদে) অগ্রিম আদায় দিতে হয়।

GREEN REVOLUTION— our aim in West Bengal



Green Revolution is our aim. The object is to modernise farming in the State. And Agro-Industries Corporation is lending a helping hand to achieve the goal. The Corporation has been supplying modern implements like Tractors, Sprayers, Threshers and Pump-sets to the farmers on hire or on hire-purchase basis.

The Corporation also supplies quality seeds, fertilisers and pesticides.

Agro-Industries Corporation also provides custom

service for cultivation of cotton/groundnut and for Small Farmers Development Agency and Marginal Farmers & Agricultural Labourers Development Project Schemes.

The Corporation has another role too—to create employment opportunities for Engineering graduates/diploma holders and Agricultural graduates in different Agro-Service centres in this State.

**Hand in hand with farmers —
Agro-Industries Corporation**

West Bengal Agro-Industries Corporation Limited
(West Bengal Govt. Undertaking)

23B, Netaji Subhas Road, (3rd Floor), Calcutta-700 001

Telegram : AGRINPUT

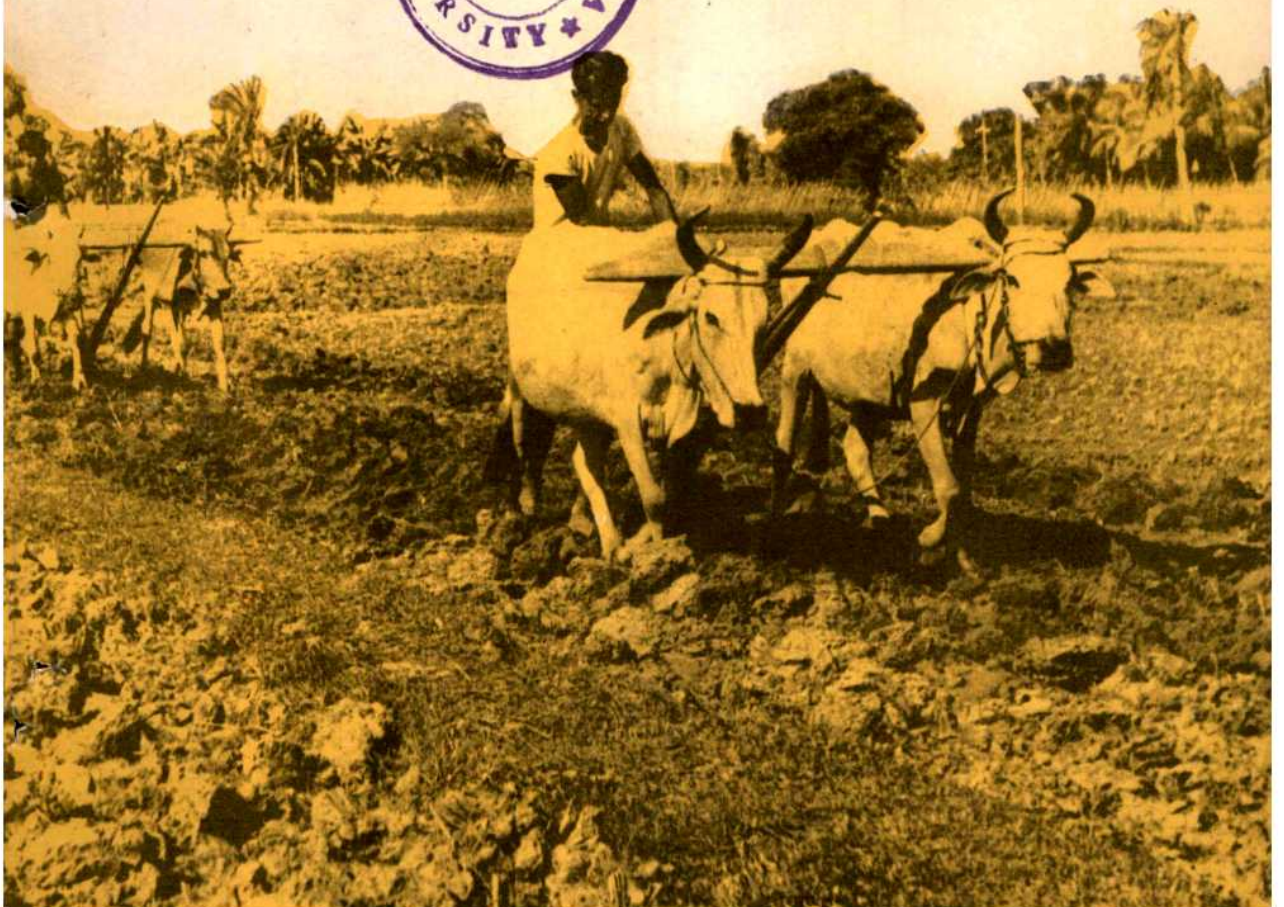
Telephone : 22-2314 / 23-3192

বসন্ধী বসন্ধী

সপ্তদ্বিংশ বর্ষ



ভাদ্র • ১৩৩২



সূচী

সম্পাদকীয়	...	৩-৪
প্রগতির পথে মহেশপুর গ্রাম	...	৫-৬
অরুণ কুমার মিত্র		
পার্শ্বনিয়াম বিবাক্ত আগাছা		
ও তার দমন	...	৭-৯
অধিক ফলনের অন্তরায়—		
ধানের কাঁটশঙ্ক দমনের উপায়	...	১০-১৩
দেবব্রত চট্টোপাধ্যায়		
পেয়ারার জেলি ঘরেই করুন	...	১৪-১৬
তিলক বন্দ্যোপাধ্যায়		
পশ্চিমবাংলায় কৃষি প্রগতির স্বার্থে		
চারা-শিল্পের উন্নতি চাই	...	১৭-২৩
ডঃ রাধাগোবিন্দ মাইতি		
ধানের কয়েকটি রোগ ও		
তার প্রতিকার	...	২৪-৩১
অনিমা পাল		
আশ্বিন মাসে কৃষকের করণীয়	...	৩২

সম্পাদনা উপদেষ্টা পর্বদ
বিক্রপদ মণ্ডল, কৃষি অধিকর্তা, পশ্চিমবঙ্গ
ডঃ জ্যোতিরঞ্জন লাহিড়ী, অপর কৃষি অধিকর্তা
(সাধারণ)
ডঃ দেবব্রত মুখার্জী, অপর কৃষি অধিকর্তা
(গবেষণা)
মুর্জী মুখার্জী, মুখ্য কৃষি অধিকর্তা (সম্প্রসারণ)
জ্যোতিরঞ্জন বোস, উপ-সচিব (উন্নয়ন), কৃষি বিভাগ
অমলেন্দু সরকার, মুখ্য প্রচার ও জনসংযোগ
আধিকারিক, কৃষি অধিকার
অমিয় কুমার মিত্র, জেলা কৃষি তথ্য আধিকারিক
(সদর)
মূললেখা ঘোষ, সম্পাদিকা
চিদানন্দ গোস্বামী, সহ-সম্পাদক
প্রধান সম্পাদক
বিক্রপদ মণ্ডল, কৃষি অধিকর্তা, পশ্চিমবঙ্গ

বহুসংস্করণ

ভাঙ্গ-১৩৯২

কৃষি অধিকার (কৃষি তথ্য সংস্থা)

পঃ বঃ সরকার কর্তৃক প্রকাশিত ও প্রচারিত

**উন্নত প্রথায় আমন ধানের চাষ ক'রে
অধিক ফলন ও বাড়তি লাভ সুনিশ্চিত করুন।**

- জমির অবস্থান অনুযায়ী অধিক ফলনশীল বা উন্নত জাতের ধানের চারা লাগান।
- সময়মত ঠিক বয়সের চারা লাগান।
- চারা তোলার আগে বীজতলায় ৭-৮ দিন আগে কীটনাশক ওষুধ বীজতলায় দিন ও চারাগুলি সুস্থ রাখুন।

আমন ধানের জাত	শেষ চাষের আগে (একর প্রতি কেজি)			চাপান সার (নাইট্রোজেন) — (একর প্রতি কেজিতে)	
	নাইট্রোজেন ফসফেট পটাশ				
অধিক ফলনশীল					
(ক) জলদি	৫	১০	১০	১০	রোয়ার ১৫ দিন পরে
(১০০—১২০ দিন)				৫	” ৩০—৪০ ” ”
(খ) মাঝারি	৬	১২	১২	১২	” ১৫ ” ”
(১২০—১৩০ দিন)				৬	” ৪০—৪৫ ” ”
(গ) মাঝারি নাবি ও নাবি	১২	১২	১২	১২	” ৫৫—৬০ ” ”
(ঘ) দেশী উন্নত	৮	৮	৮	৮	থোড় আসার আগে

- সময়মত নিড়ান দিন ও রোগ পোকের আক্রমণ থেকে ধানের গাছগুলিকে রক্ষা করুন।

বিস্তৃত বিবরণের জন্ত আমাদের প্রকল্পকর্মী / কৃষিকর্মীদের সংগে যোগাযোগ করুন :

ভারত-জার্মান সার প্রশিক্ষণ প্রকল্প

১২বি, রাসেল স্ট্রিট, কলিকাতা-৭০০০৭১, ফোন : ২১-২৬৩২-৩৪

সম্পাদক



এ রাজ্যের প্রধান ফসল আমন ধান। তাই স্বাভাবিক কারণেই এই ফসলটির চাষের উপর সবচেয়ে গুরুত্ব থাকে। কৃষক থেকে সরকার সকলেরই চেষ্টা থাকে এই ফসলটির ফলন যাতে ভাল হয়। আমন ধানের ফলনে অনিশ্চয়তা থাকে, কারণ এই ধানের চাষ বৃষ্টি-নির্ভর। মৌসুমী বৃষ্টিপাতের ব্যাপ্তি, সময় ও প্রয়োজন অনুযায়ী বৃষ্টির পরিমাণ এই ধানের চাষকে খুব প্রভাবিত করে। অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে যে আষাঢ় মাস থেকে আরম্ভ করে আশ্বিন মাসের শেষ পর্যন্ত বৃষ্টিপাতের পরিমাণ যদি ফসলের প্রয়োজন মত হয়, তাহলে আমন ধান চাষের জন্য উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি হয়।

লক্ষ্য করা গেছে এ রাজ্যে প্রায় প্রতি বছরই এই ধান অল্পবিস্তর প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের মুখে পড়ে। এ বছরও এর ব্যতিক্রম ঘটেনি। চাষের শুরুতেই বৃষ্টি এ বছর সব অঞ্চলে সমানভাবে হয়নি। অনেক জায়গায় বৃষ্টি দেবীতে নেমেছে। এর ফলে যেখানে বৃষ্টির সুবিধা কৃষকরা পেয়েছেন সেখানে রোয়ার কাজ সময়মত শেষ করেছেন। কিন্তু যেসব অঞ্চলে বৃষ্টি কিছু দেবীতে হয়েছে সেখানে রোয়ার কাজ শুরু করতে দেবী হয়েছে। দেবীতে বুনলে ফলন কম হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। তবে ফলন যাতে কম না হয় সেজন্য কিছু বিশেষ প্রযুক্তিগত ব্যবস্থা নেওয়া দরকার। যেমন যারা মাঝারি ও নারি জাতের চাষ করছেন তাঁদের রোয়া করার সময় প্রয়োজন মত সার প্রয়োগ করা একান্ত দরকার। তাছাড়া চারা ঘন করে রোয়া প্রয়োজন যাতে গুছির সংখ্যা বেশী হয়। এজন্য চারার যদি ঘাটতি পড়ে তাহলে এক মাস আগে রোয়া করা জমি থেকে রোয়া ভেঙ্গে সেই চারা লাগান।

সারের ব্যবহার যদি ঠিকমত সময়ে এবং সঠিক পরিমাণে করা যায় তাহলে ভাল ফলনের আশা অনেকটাই উজ্জ্বল হয়। তাই বিশেষ করে দেবীতে ধারা বুনছেন তাঁরা কি নার, কখন এবং কতটা দেবেন সে সম্বন্ধে যেন কৃষি বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে পরামর্শ করেন।

সারের ব্যবহার ছাড়া রোগ ও কীটশত্রুর আক্রমণ থেকে ফসলকে রক্ষা করার ব্যবস্থা নেওয়াও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এ বছর চাষের শুরুতেই কিছু কিছু জায়গায় পামরী পোকের আক্রমণ দেখা গেছে। যেসব জায়গায় পামরী পোকের আক্রমণ দেখা গেছে সেখানে

যৌথভাবে এলাকাভিত্তিক দমনের ব্যবস্থা নিতে হবে। তাছাড়া নিয়ামত ক্ষেত ঘুরে পোকা বা রোগের আক্রমণ হয়েছে কিনা তা দেখতে হবে। প্রয়োজন হলে উপযুক্ত ওষুধ প্রয়োগ করে তা দমনের ব্যবস্থা করতে হবে।

আমন ধানের জমিতে তদারকির কাজ যেমন চলবে, সেই সঙ্গে এখন থেকে আগামী রবি চাষের প্রস্তুতির প্রয়োজনও হবে। আলু, ডালশস্ত্র, তৈলবীজ ইত্যাদি চাষের ক্ষেত্রে এখন থেকে উন্নত জাতের বীজ ও কৃষি উপকরণ সংগ্রহ করার চেষ্টা করতে হবে। যাতে প্রয়োজনের সময় কৃষক তা ব্যবহার করতে পারেন।



অরুণ কুমার মিত্র

প্রগতির পথে মহেশপুর গ্রাম

শহর থেকে দূরে নয়, হুগলী জেলার এমনই একটি পল্লবসন আত্মকাননের ছায়ায় ঘেরা গ্রাম মহেশপুর। চুঁচুড়া রেল স্টেশন থেকে দূরত্ব বড় জোর ৩ কিলোমিটার। গাঁয়ের পাশ দিয়েই চলে গেছে পিচ ঢালা তারকেশ্বর রোড। সেই রাস্তা দিয়ে ১৭ ও ১৮ নম্বর বাস যাতায়াত করে পনের মিনিট পরপর। চুঁচুড়া স্টেশন থেকে রিক্সা করেও যাওয়া চলে মহেশপুরে।

কিন্তু তাতে কি হবে। প্রদীপের নীচে যেমন অন্ধকার, মহেশপুরও তেমনি শহরের কাছেই গ্রাম হয়েও ছিল সব দিক থেকে পিছিয়ে। এমনকি গাঁয়ে ঢোকান একমাত্র মাটির রাস্তাটিও ছিল উচু-নীচু, এবড়ো-থেবড়ো। বর্ষায় পায়ের গোছ ডোবা কাদা। কিন্তু গাঁয়ের মানুষের ভ্রূক্ষেপ ছিল না সে বিষয়ে। সবাই যে যার বিষয় কর্মে মস্ত হয়ে দিন কাটাতে। এই অবস্থার যে কোন উন্নতি হতে পারে সে বিষয়ে চিন্তাও কারও মনে আসতো না।

কিন্তু প্রথম গ্রামের তরুণ সমাজ এসব বিষয়ে যথেষ্ট সচেতন হয়ে উঠেছেন। গ্রাম ও গ্রামবাসীকে

এই দুঃসহ অবস্থা থেকে মুক্ত করতে এগিয়ে এলেন গ্রামেরই এক তরুণ যুবক—দুর্গাশঙ্কর মুখোপাধ্যায়। হুগলী জেলারই একটি কলেজের অধ্যাপক তিনি। প্রথমেই তিনি হাত দিলেন গ্রামের একমাত্র মাটির ঐ রাস্তাটির উন্নতির কাজে। রাস্তায় মাটি ফেলে উচু এবং সমতল করার কাজ শুরু করলেন। “আপনি আচারি ধর্ম অপারে শিখান” নীতিতে তিনি বিশ্বাসী। তাই কথায় সময় নষ্ট না করে একদিন নিজেই কোমর বেঁধে নেমে পড়লেন, ঝুড়ি কোদাল নিয়ে রাস্তায় মাটি দিতে। তাঁকে মাটি কেটে রাস্তায় ফেলতে দেখে, তাঁর বন্ধুরা যোগ দিলেন তাঁর সাথে। ক্রমে এগিয়ে এল গাঁয়ের ক্লাব প্রগতি সঙ্ঘের ছেলেরা। গ্রামের মেয়েরাও পিছিয়ে থাকতে রাজী নয়। তারা বলল, তোমরা মাটি কেটে ঝুড়িতে ভরে দাও, আমরা তা মাথায় করে বয়ে রাস্তায় ফেলি। গ্রামে তরুণ ছেলেমেয়েদের মধ্যে একটা আলোড়ন শুরু হলো। আজ সবার হাতে হাত মেলাতে হবে। গাঁয়ের ছেলেমেয়েরা কেউ দুপ করে বসে থাকতে চায় না, সবাই হাত

বহুক্ষর : ভাঙ্গ : ১৩৯২.

লাগালো গ্রাম গঠনের মহোৎসবে।

ক্রমে তৈরী হয়ে গেল রাস্তা। হোক তা মাটির, কিন্তু উচু এবং ঢালু। বর্ধায় এপ্রাস্থ থেকে ওপ্রাস্থে রিক্সা চলে যায় বিনা বাধায়। গাঁয়ের সবাই বলতে থাকে হাঁ, বাহাছর ছেলে বটে নিমাই (হুর্গাপ্রসাদের ডাকনাম)।

রাস্তা তৈরী করে গাঁয়ের লোকের আস্থা অর্জন করলেন হুর্গাপ্রসাদ। তারপর তিনি হাত দিলেন আর একটি মহৎ কঠিন কাজে। গাঁয়ের ক্লাব প্রগতি সম্ভব সভাপতি তিনি। কিন্তু গাঁয়ের আদিবাসী ও তপশিলী ছেলেরা ক্লাবের সভ্য হতে চায় না কেন? কি করে তাদের গাঁয়ের উন্নয়নমূলক কাজে উৎসাহিত করা যায়! তিনি ভালই জানেন যে, “পেটে খেলে পিঠে সয়”। সরকার ও স্থানীয় সুগন্ধা গ্রাম পঞ্চায়েতের সঙ্গে যোগাযোগ করে তিনি মেতে উঠলেন আই.আর.ডি.পি. বা সংহত গ্রামোন্নয়ন কর্মসূচী প্রকল্পের রূপায়ণে। আর্থিক সঙ্গতি বাড়াবার জন্ত গ্রামের ৭২ জনকে বিভিন্ন প্রকল্পে ঋণ দেওয়ার ব্যবস্থা করা হলো। কেউ নিলেন বুড়ি, কুলো, ডালা তৈরি করার জন্ত, কেউ উন্নত জাতের গরু কেনার জন্ত, কেউ বা নিলেন ভ্যান-রিক্সা কেনার জন্ত। আবার কিছু কিছু লোক নিলেন সবজির ব্যবসা করার জন্ত। দেখা গেল এক বৎসরের মধ্যে প্রায় বত্রিশ জন ঋণ শোধ করেও দিয়েছেন। মহেশপুরে আই.আর.ডি.পি. প্রকল্পের কাজ কেমন চলছে দেখার জন্ত ভারত সরকারের সিডিউল্ড কাষ্ট এণ্ড ট্রাইবস্ কমিশনের প্রতিনিধিরা এই বছরের ২৭শে মার্চ মহেশপুর গ্রামে আসেন এবং গ্রামের মানুষ ছোটো পয়সা উপার্জনের পথ পেয়েছে দেখে তাঁরা খুশী হন।

মহেশপুরবাসীরা এখানেই থেমে থাকেনি। আন্তর্জাতিক যুববর্ষে মহেশপুর গ্রামে কিছু করার জন্ত একদিন প্রস্তাব দিলেন চুঁচুড়া গ্রামসেবক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের পঞ্চায়েতের ইনস্ট্রাক্টর শিশির কুমার চক্রবর্তী। ট্রেনিং সেন্টারের এডাপটেড গ্রাম হিসাবে গৃহীত এই গ্রামটির ভারপ্রাপ্ত তিনি। ক্লাবের মিটিংএ শিশিরবাবুর প্রস্তাব নিয়ে সবাই আলোচনা করলেন। শেষে শিশিরবাবুকেই অনুরোধ করা হলো কিছু প্রকল্পের প্রস্তাব করার জন্ত। তিনি স্বল্প সঞ্চয় প্রকল্প চালু করার জন্ত বললেন। গ্রামের সকলে যাতে এই প্রকল্পের সামিল হন সেজন্ত অভিযান শুরু করে দিতে তিনি ক্লাবের সভ্যদের আহ্বান জানান। কথাটা ভাল লাগলো সকলেরই। কারণ সঞ্চয় করা ভাল এবং প্রয়োজনীয়ও বটে। অভ্যাসের অভাবে উপায় থাকলেও অনেকে সঞ্চয়ে উৎসাহ নেন না। ক্লাবের সদস্যরা গ্রামবাসীদের সঞ্চয়ে উৎসাহী করার জন্ত সচেষ্ট হলেন।

এই চেষ্টার ফলে গ্রামের একশ পনেরটি পরিবারের মধ্যে ১০৬টি পরিবার এই প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত হলেন। আদিবাসী ও তপশিলী জাতির ৩৮টি পরিবার স্বেচ্ছায় এগিয়ে এলো পোষ্ট অফিসে টাকা জমানোর প্রস্তাব নিয়ে। বিভিন্ন মূল্যের সঞ্চয় সার্টিফিকেট কিনল ৪০টি পরিবার। মার্চ মাসের প্রথম পক্ষের মধ্যে মোট ত্রিশ হাজার টাকা জমা পড়ল স্বল্প সঞ্চয় প্রকল্পে। স্বল্প সঞ্চয়ে হুগলী জেলার আদর্শ গ্রাম হিসাবে চিহ্নিত হলো মহেশপুর গ্রাম। গ্রামোন্নয়নমূলক নতুন আর কি প্রকল্প মহেশপুর গ্রামে চালু হবে তা জানার জন্ত অনেকেই আগ্রহী হয়ে উঠলেন।

পাথেনিয়াম বিস্তৃতি আগাছা ও তার দমন



পাথেনিয়াম একটি বিস্মৃতি আগাছা। এর বৈজ্ঞানিক নাম পাথেনিয়াম হিস্টেবোফোরাস। এই গাছের আদি বাসস্থান মধ্য ও দক্ষিণ আমেরিকা। আমদানি করা মাইলো দানার সঙ্গে এই আগাছা ভারতে এসেছে এবং ইতিমধ্যে সমগ্র মহারাষ্ট্র, কর্ণাটক, মধ্যপ্রদেশ, অন্ধ্রপ্রদেশ, তামিলনাড়ু, দিল্লী, জম্মু, উত্তরপ্রদেশ এবং বিহারে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছে।

পশ্চিমবাংলায় বড় বড় রেল ইয়ার্ডের ধারে, রেল লাইন ও জাতীয় সড়কের পাশে এমনকি কলকাতার মত শহরে মাঠে ময়দানে ও বাড়ীর আশে-পাশেও দেখা যাচ্ছে।

গাছের বিবরণ

শিরায়ুক্ত ও নরম কাণ্ডের বর্ষজীবী ৭০—১৩০ সেমি লম্বা ৪—৭ প্রধান শাখা ও বহু প্রশাখায়ুক্ত। পাতা ৭—১৫ সেমি লম্বা, পাতার কিনারা খাঁজ-যুক্ত, অনেকটা চন্দ্রমল্লিকা ফুল গাছের পাতার মত। সাদা ছোট ছোট ফুল, প্রায় আড়াই মাস ধরে ফুটে থাকে। বর্ষার আগে গাছ গজানোর এক মাসের মধ্যে ফুল ফুটে শুরু করে। গাছ চার মাস বেঁচে থাকে এবং একই গাছ থেকে বীজ মাটিতে পড়ে পুনরায় বহু গাছ জন্মায়। একটি গাছ থেকে ৪—৫ হাজার গাছ জন্মাতে পারে। বীজ খুব হালকা তাই বাতাস বা জলের সাহায্যে বয়ে গিয়ে নানা জায়গায় তাড়াতাড়ি ছড়িয়ে পড়ে।

বসুন্ধরা : ভাদ্র : ১৩৯২

অস্বাস্থ্যকর বিষাক্ত প্রতিক্রিয়া

পার্শ্বনিয়াম গাছের মধ্যে “সেসকুইটারপেন ল্যাকটোন পার্শ্বনিন” নামে যে পদার্থটি আছে, তা মানুষের পক্ষে মারাত্মক ক্ষতিকর। এই গাছের কোন অংশ শরীরের সংস্পর্শে এলে ভয়াবহ চর্মরোগ হয়। রক্তের সংস্পর্শে এলে একজ্জিমা বা চামড়ার ক্ষত হয়, তা সহজে সারে না। ফুলের রেণু অনেকদিন ধরে নিখাসের সঙ্গে শরীরে প্রবেশ করলে প্রথমে এ্যালার্জি ও পরে হাঁপানি হয়। এছাড়া আরও নানারকম বিষাক্ত পদার্থ এই গাছে আছে।

পরিবেশে বিষাক্ত প্রতিক্রিয়া

যদিও এখনও পর্যন্ত কৃষিজমিতে এই আগাছার প্রাচুর্য্যাব পশ্চিমবঙ্গে দেখা যায়নি তবু এসম্পর্কে আমাদের সজাগ থাকা দরকার। অগ্ন্যাগ্ন সব আগাছার মত এই আগাছা জমিতে ফসলের সঙ্গে খাওয়া, আলো, জল, বাতাস প্রভৃতি নিয়ে প্রতিযোগিতা করে ফসলের ক্ষতি সাধন করে। তাছাড়া এই গাছের দেহ নিঃসৃত, দেহ বোঁত এমনকি শুষ্ক দেহাংশ পচনকালে বিষাক্ত উপাদান আশপাশের গাছপালা ও ফসলের বাড়ি কমায় ও উৎপাদন হ্রাস করে।

প্রতিরোধ ব্যবস্থা

যান্ত্রিক পদ্ধতি : অল্প সংখ্যায় এই আগাছা দেখা গেলে, যাতে আর না ছড়ায় তার জন্য ফুল আসার আগেই উপড়ে নিয়ে শুকিয়ে পুড়িয়ে ফেলতে হবে। হাতে রবারের দস্তানা পরে বা পলিথিনের প্যাকেটে হাত ঢুকিয়ে এই আগাছা টেনে তুলতে হবে অগ্ন্যায় শরীরে বিষক্রিয়ার সম্ভাবনা থাকবে। আগাছার সংখ্যা খুব বেশী হলে কোদাল দিয়ে গাছ উপড়ে ফেলে ধ্বংস করা যায়।

রাসায়নিক পদ্ধতি : ১) প্রতি লিটার জলে ১৫০ গ্রাম খাবার লবণ মিশিয়ে আগাছার উপর ছিটিয়ে দিলে পার্শ্বনিয়াম আগাছা শুকিয়ে যায়। এ শুকনো ডালপালায় আগুন জালিয়ে অকৃষি জমিতে আগাছা দমন করা সহজ।

২) আগাছার ফুল ধারণ অবস্থায় ২, ৪-ডি ইথাইল এ্যাষ্টার ১.০ কেজি (অর্থাৎ ৩৬ শতাংশ সক্রিয় উপাদানের ৩.০ কেজি উইডেট) এবং ডাইকোয়াট ০.৫ কেজি (অর্থাৎ ৫০ শতাংশ সক্রিয় উপাদানের ১.০ কেজি রিগ্লোন) ৬০০ লিটার জলে গুলে প্রতি হেক্টর জমির আগাছার উপর ছিটিয়ে এদের দমন করা যায়।

৩) অকৃষি জমিতে আগাছার নির্গমন পরবর্তী (চারার অবস্থায়) ০.৮ কেজি ২, ৪-ডি সোডিয়াম লবণ এবং ০.৭ কেজি এম. এস. এম. এ. (অর্থাৎ

৮০ শতাংশ সক্রিয় উপাদানের ১'০ কেজি ফার্নোজোন ও ৩৫ শতাংশ সক্রিয় উপাদানের ২'০ কেজি আনসার ৫২৯) বা ২, ৪-ডি সোডিয়াম লবণ ৩'২—৪'০ কেজি ও প্যারাকোয়াট ০'৪—০'৫ কেজি (অর্থাৎ ফার্নোজোন ৪—৫ কেজি ও ২০ শতাংশ সক্রিয় উপাদানের ২'০—২'৫ কেজি ফার্নোজোন) ৬০০ লিটার জলে গুলে প্রতি হেক্টর আগাছার উপর ছিটিয়ে এদের দমন করা যায়। আগাছা নাশক ওষুধের মধ্যে আগাছার নির্গমন পরবর্তী ০'৮ কেজি ২, ৪-ডি ০'৫ কেজি প্যারাকোয়াট সক্রিয় উপাদান দ্বারা অল্প খরচে এই আগাছা সম্পূর্ণ দমন করা যায়।

(৪) যেসব অকৃষি জমিতে এই আগাছার উপজীব আগে হয়েছে তাই পরবর্তীকালে প্রাকৃতিক সম্বন্ধে সুনিশ্চিত সে সব স্থানে আগাছার প্রাক-নির্গমন এট্রাফিন ২—৪ কেজি (অর্থাৎ ৫০ শতাংশ সক্রিয় উপাদানের এট্রাফিন বা গোসাপ্রিম ৪—৮ কেজি) বা ক্লোরটলবন ১'৬—২'৪ কেজি (অর্থাৎ ৮০ শতাংশ সক্রিয় উপাদানের ২'৩ কেজি ডায়ুরন) বা বিউটাক্লোর ৩—৪ কেজি (অর্থাৎ ৫০ শতাংশ সক্রিয় উপাদানের ৬—৮ কেজি ম্যাচেটি) বা ২, ৪-ডি ডাইমিথাইল লবণ ৫—৬ কেজি (অর্থাৎ ৭২ শতাংশ সক্রিয় উপাদানের ৭—৮ কেজি উইডার ৯৬) ৬০০ লিটার জলে গুলে প্রতি হেক্টর জমিতে ছিটিয়ে ২০—১৫০ দিন এই আগাছা হতে মুক্ত পরিবেশ রক্ষা করা সম্ভব।

এছাড়া ডাইকোয়াট ০'৫ কেজি, এম. এস. এম. এ. ২'৫ কেজি, গ্রাইফসেট ০'৯ কেজি, পিক্লোরাম ১'৬১ কেজি, ২, ৪ ডি সোডিয়াম লবণ ২'০ কেজি, ২, ৪-ডি এমাইন লবণ ১'৫ কেজি, ডাইকোয়া ২'০ কেজি প্রভৃতি আগাছা-নাশক ওষুধ ৬০০ লিটার জলে গুলে প্রতি হেক্টর অকৃষি ও পতিত জমিতে ছিটিয়ে এই আগাছা দমন করা সম্ভব। অধিক পরিমাণে আগাছা উপজীব অকৃষি জমিতে আগাছানাশক ওষুধ প্রয়োগই স্বল্প ব্যয়ে ও স্বল্প পরিশ্রমে এই আগাছা দমনের উৎকৃষ্ট উপায়।

এ বিষাক্ত আগাছা যাতে রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে না পড়ে, তারজন্য সর্বস্তরের মানুষের সজাগ হওয়া একান্ত দরকার এবং হেসব এলাকায় ইতিমধ্যে এই আগাছা দেখা যাচ্ছে, সেখানকার সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের এই আগাছার সম্পূর্ণ বিনাশের জন্য জরুরী ভিত্তিতে ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন।



আমন ধান পশ্চিমবঙ্গের প্রধান ফসল এবং এই ধানের চাষ প্রধানতঃ বৃষ্টিনির্ভর। অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি এবং অনিয়মিত বৃষ্টি এবং আরও কিছু কিছু প্রতিকূল অবস্থার জন্য এই ফসলের চাষ অনেক সময় ব্যাহত হয় এবং আশঙ্করূপ উৎপাদন পাওয়া সম্ভব হয় না। বিভিন্ন প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে প্রথমেই মনে আসে বিভিন্ন রোগ ও পোকাকার আক্রমণের কথা। প্রতি বছরই আবহাওয়ার তারতম্য, বৃষ্টিপাতের অসম বন্টন এবং চাষ পদ্ধতির ত্রুটিবিচ্যুতির জন্য বিভিন্ন রকম রোগপোকাকার আক্রমণে ফসলের ক্ষতি হতে দেখা যায়। এই সমস্ত রোগ ও পোকাকার আক্রমণ থেকে আমন ধানের ক্ষয়ক্ষতি বিষয়ে প্রথম থেকেই সজাগ থাকা দরকার। এই প্রবন্ধে আমন ধানের ফলনের অন্তরায় হিসাবে বিভিন্ন কীটশত্রুর ভূমিকা এবং তাদের দমনের উপায়গুলি সংক্ষেপে বিশেষভাবে আলোচনা করা হচ্ছে।

অগ্রাঙ্ক ফসলের মতন আমন ধানেও বিভিন্ন প্রকার পোকাকার আক্রমণ দেখা যায়, এরা হচ্ছে
 ধান কৃষি অধিকর্তা (শত্রুরক্ষা)

অধিক ফলনের অন্তরায় - ধানের কীটশত্রু দমনের উপায়

দেবব্রত চট্টোপাধ্যায়

মাজরা পোকা, সবুজ শ্যামাপোকা, পামরী বা শাঁখী পোকা ও ভেঁপু পোকা ইত্যাদি। অগ্ন্যাগ্ন পোকা যেমন—দয়ে পোকা, পাতা মোড়ানো পোকা, গন্ধী পোকা, লেদা পোকা, ও নীষকাটি। লেদা পোকাকার আক্রমণও মাঝে মাঝে বিশেষ বিশেষ এলাকায় দেখা যায়। আর একটি বিশেষ ধরনের পোকাকার কথাও এখানে ব'লে রাখা দরকার, সেটি হ'চ্ছে বাদামী শোষক পোকা। কিছুদিন আগে পর্যন্ত এই পোকাকার আক্রমণ শুধুমাত্র বোরো ধানেই সীমাবদ্ধ ছিল, কিন্তু গত কয়েক বছরে বর্ধমান, হুগলী ও হাওড়া জেলার কোন কোন অঞ্চলে আমন ধানেও এই পোকাকার আক্রমণ লক্ষ্য করা যাচ্ছে। পোকা ও তার আক্রমণজনিত সমস্যার স্তূর্ধু সমাধানের জন্ত আমাদের প্রথম থেকেই সজাগ থাকতে হবে এবং জেনে রাখতে হবে কোন পোকাকার আক্রমণ ধানের কোন বিশেষ

অবস্থায় দেখা যায়, আক্রমণের লক্ষণগুলি কি, কোন ঔষধ প্রয়োগ করা দরকার এবং ঔষধ প্রয়োগে কি পদ্ধতি গ্রহণ করা দরকার। এই সমস্ত বিষয়গুলির ঠিকমত সমন্বয় ঘটাতে না পারলে অনেক সময় সমস্যার সমাধান করা সম্ভব হয় না এবং কৃষকের আর্থিক অপচয় হয়।

আলোচনার প্রথমমুহে বীজতলায় বীজ বপন ও তার পরিচর্যার কথায় আসা যাক। বীজতলার জন্ত উচু জায়গা নির্বাচন করা উচিত এবং বীজতলায় বীজ ফেলার পরে নীচে দেওয়া সুপারিশ অনুযায়ী ঔষধ প্রয়োগ করা দরকার। এর সুফল হিসাবে ধানের চারাগুলিকে বিভিন্ন পোকাকার প্রাথমিক আক্রমণ থেকে রক্ষা করা যাবে এবং রোয়ার জন্ত পুষ্ট চারা পাওয়া সম্ভব হবে। এই প্রক্রিয়ায় খরচ প্রায় ১০ ভাগের ১ ভাগ এবং রোয়ার পরে পোকাকার আক্রমণ রোধ করতে পারে চারা।

বীজতলায় ঔষধ প্রয়োগমাত্রা ও পদ্ধতি

ঔষধের নাম	প্রতি ১০ শতক জমির জন্ত ঔষধের পরিমাণ	প্রয়োগ বিধি
১। কার্বোফুরান ০জি (দানাদার)	১'৫ কেজি	মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিতে হবে। জমিতে ছিপছিপে জল থাকা প্রয়োজন।
২। ফোরেট ১০জি (দানাদার)	৫০০ গ্রাম	ঐ
৩। ডায়াজিনন ১০জি (দানাদার)	৫০০ গ্রাম	ঐ
৪। কুইনালফস্ ৮ জি (দানাদার)	১ কেজি	ঐ
৫। ফস্ফামিডন ৮৫% (তরল)	১৫ মিলি	৩০ লিটার জলে গুলে স্প্রেয়ারে প্রয়োগ করুন।
৬। ক্লোরোপাইরিফস্ ২০% (তরল)	৩০ মিলি	ঐ

বসুন্ধরা : ভাদ্র : ১৩৯২

বীজতলায় বীজ ফেলার ৭—১০ দিন পরে অথবা চারা তোলার ৭—১০ দিন আগে একবার পূর্বপৃষ্ঠায় লিখিত যে কোন একটি ঔষধ প্রয়োগ করা দরকার। যে সমস্ত অঞ্চলে ধানের টুংরো রোগের আক্রমণের প্রবণতা আছে সে সমস্ত অঞ্চলে কার্বোফুরান জাতীয় ঔষধ প্রয়োগ করলে সুফল পাওয়া যায়। পোকাকার আক্রমণের আশঙ্কা ও ক্ষতির হাত থেকে ফসলকে রক্ষা করতে হ'লে রোয়ার আগে এবং পরে কয়েকটি ব্যবস্থা গ্রহণ অপরিহার্য। যেমন :—

- ১। রোয়ার জমি কাদা করার আগে জমি ভাল-ভাবে পরিকার করে আগাছা ও ধানের মুড়ী ইত্যাদি মাটির সঙ্গে মিশিয়ে পচিয়ে ফেলা দরকার যাতে পোকাকার উৎস নষ্ট হ'য়ে যায়।
- ২। জমির আল ভালভাবে পরিকার রাখা দরকার।
- ৩। নিয়মিতভাবে জমি পরিদর্শন ও পর্যবেক্ষণ করা দরকার।
- ৪। ফসলের কোন রকম অস্বাভাবিক পরিবর্তন বা লক্ষণ দেখা গেলে বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
- ৫। রাসায়নিক ঔষধ প্রয়োগের আগে কোন

ঔষধের নাম

- ১। ফস্ফামিডন ৮৫%
- ২। মিথাইল প্যারাথিয়ন ৫০%
- ৩। ফেনথিয়ন ৫০%
- ৪। এণ্ডোসালফান ৩৫%
- ৫। বি, এইচ, সি ৫০% (জলে গোলা)
- ৬। ডায়াজিনন ২০%
- ৭। ক্লোরোপাইরিফস্ ২০%

পোকা অথবা রোগের আক্রমণ হ'য়েছে তা সুনির্দিষ্টভাবে জেনে নিতে হবে এবং সেই অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। আক্রমণ বেশী হ'লে তবেই ঔষধ প্রয়োগ করতে হবে।

৬। ঔষধ প্রয়োগ যেন সঠিক মাত্রায় ও সঠিক পদ্ধতিতে হয়।

পোকাকার উপদ্রব বেশী হ'লে উচু বা মাঝারী জমিতে যেখানে জলের চাপ কম সেখানে নীচের তালিকা অনুযায়ী যে কোন একটি দানাদার কীটনাশক ঔষধ ব্যবহার করা যেতে পারে।

ঔষধের নাম

ঔষধের পরিমাণ
(একর প্রতি)

- ১। কার্বোফুরান ৩ জি ১২ কেজি
- ২। ফোরেট ১০ জি ৪ কেজি
- ৩। কুইনালফস্ ৫ জি ৮ কেজি
- ৪। এণ্ডোসালফান ৪ জি ১০ কেজি
- ৫। ডায়াজিনন ১০ জি ৪ কেজি

দানাদার ঔষধ ছড়ানোর সময় জলের অভাব অথবা জলের চাপ বেশী থাকলে এবং চারার বয়স বেশী হ'লে নীচের সুপারিশমত তরল ঔষধ ব্যবহার করতে হবে।

লিটার প্রতি জলে

একর প্রতি

ঔষধের পরিমাণ

ঔষধের পরিমাণ

৩ মিলি

১৫০ মিলি

১ ”

৩০০ ”

১ ”

৩০০ ”

১৩ ”

৪৫০ ”

৫ গ্রাম

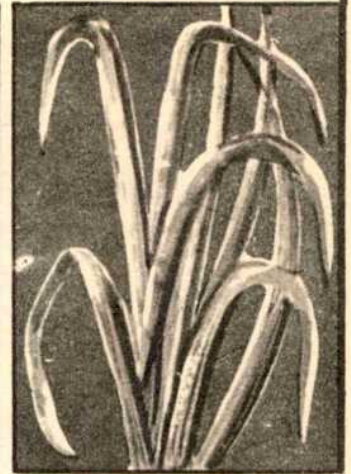
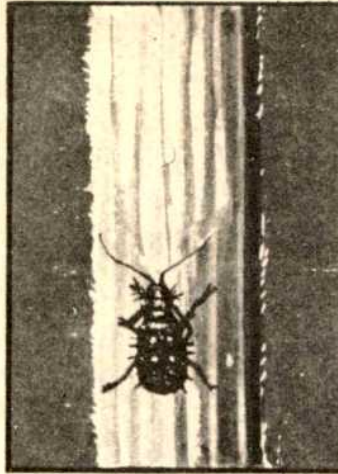
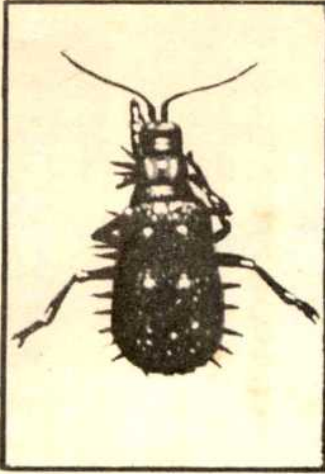
১৫ কেজি

২ মিলি

৬০০ মিলি

২ মিলি

৬০০ মিলি



পামরী পোকা এবং আক্রান্ত ধান গাছ

পামরী, চুঙ্গী, পাতা মোড়া, গন্ধী, লেদা ও শীষকাটা লেদা পোকা ইত্যাদির আক্রমণ দেখা গেলে একর প্রতি ১২ কেজি হারে বি, এইচ, সি, ১০% গুঁড়ো ছড়াতে হবে অথবা প্রতি লিটার জলে ৫ গ্রাম বি, এইচ, সি, ৫০% মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে। লেদা ও শীষকাটা লেদা পোকাকার জন্তু ডাইক্লোরোভস্ ৭৫% প্রতি লিটার জলে মিশিয়ে স্প্রে করলে সুফল পাওয়া যাবে।

লেদা পোকা ও শীষকাটা লেদা পোকাকার আক্রমণ উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতেই প্রায় প্রতি বছর লক্ষ্য করা যাচ্ছে। কাজেই উত্তরবঙ্গের কৃষকদের এই বিষয়ে সজাগ থাকা এবং প্রয়োজনে ব্যবস্থা গ্রহণ সুপারিশমত করা দরকার।

সব শেষে আমন ধানের নতুন শত্রু বাদামী শোষক পোকাকার আক্রমণ ও তার প্রতিকারের

উপায় সম্বন্ধে কয়েকটি কথা মনে রাখা দরকার। এই পোকা সাধারণতঃ ধানের ফুল আসার পরে দেখা যায় এবং খুব অল্প সময়ের মধ্যে বেশী ক্ষতি করার ক্ষমতা রাখে। সুতরাং ফুল আসার সময় থেকেই ফসলের ওপর নিয়মিত নজর রাখা দরকার এবং ঔষধ প্রয়োগও করা দরকার। এই পোকা সাধারণতঃ ধানের গোড়ায় থাকে এবং যেহেতু ফুল আসার পরই এই পোকা দেখা যায় সেইজন্তু এই পোকা দমনের জন্তু গুঁড়ো ঔষধ যেমন : বি, এইচ, সি, ১০%, কারবারিল-৫%, কুইনালফস্ ১.৫%, মিথাইল প্যারাথিয়ন-২% ব্যবহার করা দরকার। ৫০% জলে গোলা বি, এইচ, সি, অথবা কারবারিল ঔষধও প্রয়োগ করা যেতে পারে।

সদা সতর্কতা এবং সময়মত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারলে কীটশত্রুজনিত ক্ষতির হাত থেকে ফসল রক্ষা করা অসম্ভব নয়।

পেয়ারার জেলি ঘরেই করুন

তিলক বন্দ্যোপাধ্যায়

স্কোয়াশ, জ্যাম, জেলি, আচার, চাটনি, সস, মোরব্বা এসবই হ'ল ফল-সবজিজাত দ্রব্য। এগুলির পরিচিতি বর্তমানে আমাদের দৈনন্দিন প্রয়োজনের খুব কাছাকাছিই পৌঁছে গেছে। কারণ দ্রুতগতি আধুনিক জীবনযাত্রায় হাতের কাছে এমন তৈরী খাবারের চাহিদা আজ অপরিহার্য। তবে এগুলির বাজার-দর কিন্তু কম নয়। তাই সমাজের সকল স্তরে এসবের যথেষ্ট সমাদর থাকলেও জনপ্রিয় হয়ে উঠছে না।

অথচ আমরা অনেকেই জানি না যে ঘরেয়া সাধারণ সরঞ্জামের সাহায্যেই অতি সহজে একই মানের এসব দ্রব্য নিজেরাই কিন্তু তৈরি করে নিতে পারি এবং এক্ষেত্রে খরচ পড়ে অল্পরূপ দ্রব্যের বাজার-দরের অর্ধেকেরও কম। উদাহরণ হিসাবে পেয়ারার জেলির ঘরেয়া উৎপাদন পদ্ধতি দেওয়া হ'ল।

পেয়ারার জেলি

টাটকা আধ-পাকা পেয়ারাই নেবেন, তবে তার মধ্যে এক-আধটা পাকা থাকলেও ক্ষতি



নেই। ধুয়ে পাতলা ও ছোট টুকরোয় কাটুন। কাটার সময় জলে ডুবিয়ে রাখুন যাতে টুকরো কালচে না হয়। কাটার জন্তু ষ্টেনলেস স্টিল ছুরি বা বঁটি ব্যবহার করাই ভাল। সব পেয়ারা কাটা হলে জল থেকে তুলে মগে চাপাচাপি ভর্তি করে মাপুন। যত মগ টুকরো হবে তত মগ জলে এগুলি সিদ্ধ করতে দিন। মগের আয়তন এক লিটার হলে প্রতি মগ টুকরোর জন্তু ২-৩ চা-চামচ পাতিলেবুর ছাঁকা রস (অথবা ১—১'৫ গ্রাঃ সাইট্রিক এসিড) এই সময় মেশান। টুকরো বেশ সিদ্ধ হলে হাতা দিয়ে কিছুটা ভেঙে দিন। প্রথম অবস্থায় দেখা যায় মিশ্রণে জলের পরিমাণ থাকে অনেক বেশি। কিন্তু ফোটাতে ফোটাতে হাতায় নেড়ে যখন মনে হয় জল ও টুকরো প্রায় সমান সমান তখন আগুন থেকে নামিয়ে পরিষ্কার খাপি কাপড়ে ছেঁকে তরল অংশ বা পেয়ারা-ফোটানো রস সংগ্রহ করে আবার মগে মাপুন এবং নিম্নলিখিত প্রয়োজনীয় বিষয়গুলি লক্ষ্য করুন।

(১) ব্যবহৃত প্রতি তিন মগ টুকরোর জন্তু হ'মগ রস পাওয়া গেলে বুঝতে হবে ফোটানো ঠিকমতই হয়েছে।

(২) কিন্তু রসের পরিমাণ যথেষ্ট বেশি হলে তা পুনরায় ঐ সিদ্ধ টুকরোর সাথে মিশিয়ে কিছুক্ষণ ফুটিয়ে নিন যাতে ছাঁকার পর রস উপরোক্ত (১) অনুপাতে আসে। তবে রসের পরিমাণ অল্পস্বল্প বেশি হলে আর ফোটানোর প্রয়োজন নেই।

(৩) রসের পরিমাণ যদি টুকরোর তুলনায় বেশ কম হয় তাহলে ঘাটতির সমপরিমাণ (অথবা একটু বেশি) সাধারণ ঠাণ্ডা জল ঐ ছেঁকে

রাখা টুকরোয় মিশিয়ে ভালভাবে নাড়ুন। আগুনে আর বসাতে হবে না। তারপর কিছুটা চাপ দিয়ে বাড়তি রস কাপড়ে ছেঁকে সংগ্রহ করে প্রথম ছাঁকা রসে মিশিয়ে ঘাটতি পূরণ করুন।

এইভাবে সঠিক পরিমাণ রস পাওয়া গেলে মগে বা কাপে মেপে নিম্নলিখিত তালিকা অনুযায়ী চিনি ও পাতিলেবুর ছাঁকা রস বা সাইট্রিক এসিড নিন।

উপাদান তালিকা

	(ক)	(খ)
পেয়ারা ফোটানো রস	১ লিটার মগ	১০ কাপ
চিনি	১ ” ”	১০ ”
পাতিলেবুর ছাঁকা রস	—	১ ”
সাইট্রিক এসিড	১৫ চা-চামচ	

সাইট্রিক এসিড যোগাড় থাকলে তালিকা (ক) এবং পরিবর্তে পাতিলেবুর রস মেশাতে হলে তালিকা (খ) অনুসরণ করুন।

এইবার মাপা চিনি ও রস একত্রে মিশিয়ে আগুনের উপর বসান। নাড়তে থাকুন। চিনি সম্পূর্ণ দ্রবীভূত হলে অর্থাৎ গুলে গেলে এবং এই সিরাপ ফুটিতে শুরু করলে চিনির ময়লা পরিষ্কার করার জন্তু এতে কিছুটা পাতিলেবুর রস (১০ কাপ চিনি দেওয়া থাকলে ৪—৬ চা-চামচ) অথবা সাইট্রিক এসিড (প্রতি লিঃ মগ চিনির জন্তু ৫ চা-চামচ বা ২ গ্রাঃ মত) মেশান। মনে রাখবেন সিরাপ পরিষ্কার করার জন্তু উপরোক্ত মেপে রাখা সাইট্রিক এসিড বা পাতিলেবুর রস থেকেই এগুলি নেবেন। ২-৩ মিনিট ফোটানোর পর হাতায় তুলে যখন

বসুন্ধরা : ভাদ্র : ১৩৯২

দেখবেন সিরাপ পরিক্ষার হয়ে গেছে তখন আশুন থেকে নামিয়ে পরিক্ষার খাপি কাপড়ে ছেকে তা পুনরায় ফোটাতে দিন। এরপর ফুটন্ত সিরাপের ওপর যে ময়লা ফেনা ভেসে ওঠে তা হাঁকনি-হাতার সাহায্যে মাঝে মাঝে তুলে ফেলে দিন, এর ফলে জেলি স্বচ্ছ হবে। তবে পরিক্ষার ফেনা ফেলবেন না।

এইভাবে কিছুক্ষণ ফোটানোর পর দেখবেন ফুটন্ত সিরাপের উপরিভাগ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বৃদবৃদ বা ফেনায় ভরে গেছে এবং তা নাড়া সত্ত্বেও উথলে উঠতে চাইছে। এই সময় লক্ষ্য করলে আরও দেখা যাবে সিরাপ অপেক্ষাকৃত ঘন হয়েছে এবং রঙও কিছুটা লালচে হয়ে গেছে। তখনই অবশিষ্ট সমস্ত পাতিলেবুর রস বা সাইট্রিক এসিড মিশিয়ে আরও ফোটাতে থাকুন।

এইবার হাতায় খুব অল্প করে সিরাপ নিয়ে একটি থালায় বা ডেকটির সমতল ঢাকনার উপর হাতাটি স্পর্শ করে একপাশে একটু টেনে দিন যাতে থালায় সিরাপের প্রলেপ লাগে (অনেকটা তুলি দিয়ে এক পৌছ রঙ দেওয়ার মত)। প্রলেপটি ঠাণ্ডা হলে তার এক প্রান্ত থেকে ছুরি দিয়ে চেষ্টা তুললে নরম আমসত্ত্বর মত উঠে আসে কিনা দেখুন। এই রকম না হওয়া পর্যন্ত সিরাপ ফুটিয়ে যান এবং বারবার ঐ থালা-পরীক্ষা করতে থাকুন যতক্ষণ না ছুরির

ডগায় প্রলেপটি উঠে আসে। তখনই জেলি আশুন থেকে নামান। হাতা দিয়ে ওপরের ফেনা সরিয়ে পরিক্ষার জীবাণু-মুক্ত চওড়া-মুখ বোতলে ঢালুন।

ঠাণ্ডা হলে জেলি জমে যায় এবং তখন অল্প মোম গলিয়ে জেলির উপরিভাগে ঢেলে দিন। এই মোমের আবরণ জেলিকে বাইরের সংক্রমণ থেকে রক্ষা করে। মোম দেওয়ার পর বোতলের ছিপি আটকে দিন। এরপর প্রয়োজন মত ছিপি খুলে মোমের আবরণ তুলে ফেলে জেলি ব্যবহার করুন।

* বোতলকে জীবাণু-মুক্ত করার জন্ম পরিক্ষার করে ধুয়ে ১৫ মিনিট জলে ফুটিয়ে নিন। এইজন্ম জল ঠাণ্ডা থাকাকালীনই তাতে বোতল ডুবিয়ে আশুনে বসান।

* ছোট পরিবারের জন্ম জেলি ছোট বোতলেই ভরবেন।

* থালা-পরীক্ষা করার সময় প্রলেপ ঠাণ্ডা হতে কিছুটা সময় লাগে, এই ফাঁকে ফুটন্ত মিশ্রণ যাতে উথলে না যায় বা বেশি ঘন হয়ে না পড়ে তা লক্ষ্য রাখতে হবে এবং প্রয়োজন মনে হলে অল্পক্ষণের জন্ম আশুন থেকে নামাতেও পারেন।

* কাপ :—সাধারণ মাপের চা-কাপ।

পশ্চিম বাংলায় কৃষি প্রগতির স্বার্থে চারা-শিল্পের উন্নতি চাই

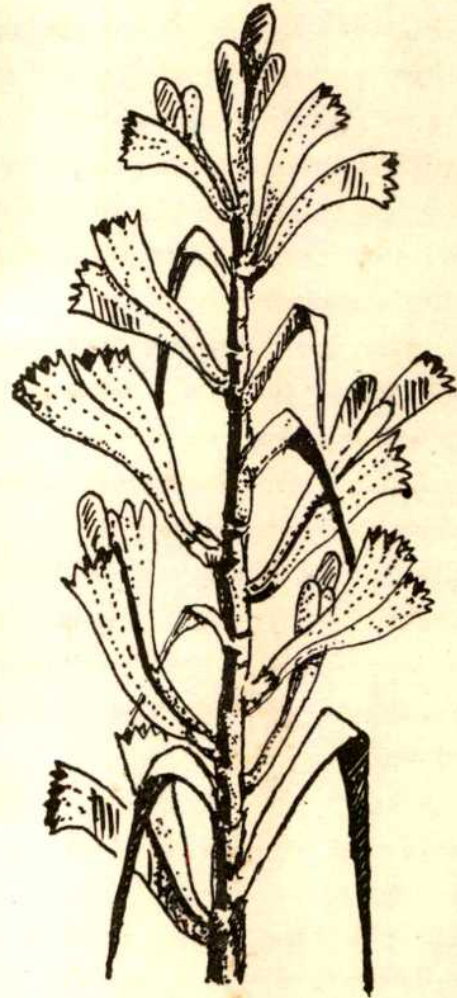
ডঃ রাধাগোবিন্দ মাইতি

পশ্চিমবাংলার মাটি ও জলবায়ু চারা তৈরী শিল্পের পক্ষে বিশেষ অনুকূল। ছোট বড় মিলে এ রাজ্যে বর্তমানে উদ্ভিদঅঙ্গন বা নাসারীর সংখ্যা চার হাজারেরও উপরে। এই পেশার উপর নির্ভরশীল লক্ষাধিক মানুষ। এই পেশা বেশ লাভজনক বলে গত দু'দশকে এ রাজ্যের উদ্ভিদঅঙ্গনের সংখ্যা দু'গুণেরও বেশী বেড়ে গেছে। যত দিন যাচ্ছে এই সংখ্যা বেড়েই চলেছে। কিন্তু আভিকালের চারা তৈরীর কলাকৌশল সরিয়ে আজও আধুনিক পদ্ধতির সেখানে প্রচলন হয়নি। দু'একটি ব্যতিক্রম ছাড়া শুধু পশ্চিমবাংলা নয় সারা ভারতবর্ষে এই প্রাচীন অবস্থা বহাল ভবিয়তে রাজত্ব করে যাচ্ছে। তাই এদেশে উৎপন্ন চারার মান অস্বাভাবিক উন্নত দেশের তুলনায় অনেক নীচে। তার উপর আছে অসুস্থ প্রতিদ্বন্দিতা। সব মিলিয়ে এই শিল্পের বর্তমান অবস্থা বিশেষ আশাশ্রম নয়। এই ক্ষয় শিল্পকে সবল করে উন্নতির সোপানে বসাতে হলে চাই—

(ক) উন্নতমানের উৎস-তরু (mother plant)

চারা উচ্চমানে না পৌঁছানোর একটা বড় কারণ হ'ল উন্নতমানের উৎস-তরুর অভাব।

বিধানচন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, কল্যাণী।



বসুন্ধরা : ভাদ্র : ১৩৯২

কলমের চারাতে উৎস-তরুর সমস্ত গুণাগুণ লব্ধ বর্তায়। তাই উৎস-তরু যদি অধিক ফলনশীল হয়, রোগ ও অগ্ন্যাগ্ন আক্রমণ প্রতিরোধের ক্ষমতা থাকে, প্রতিকূল আবহাওয়ার সঙ্গে লড়াই করতে পারে, ফলের চেহারা ও গুণ মনোগ্রাহী হয় তবে সেই গাছ থেকে তৈরী কলমের চারায়ও এই উন্নত গুণাবলী বজায় থাকবে। বাগানে লাগানোর পর চারা বড় হয়ে ফুল-ফল দিতে শুরু করলে ক্রেতা যদি খুশী হয় তবে শুধু যে নিজে ভবিষ্যতে ঐ উদ্ভিদঅঙ্গন থেকে প্রয়োজনে আরও চারাগাছ কিনবে তাই নয়, বন্ধু-বান্ধব এবং পরিচিত লোকদেরও ঐ উদ্ভিদঅঙ্গন থেকে গাছ-পালার চারা কেনার সুপারিশ করবে। এইভাবে ধীরে ধীরে উদ্ভিদঅঙ্গনের সুনাম ছড়ায় এবং চারা বিক্রীর বাজার তৈরী হয়।

ফলের ক্ষেত্রে পশ্চিমবাংলায় উন্নত উৎস-তরু সন্ধানের প্রচুর সুযোগ আছে। আমের কথাই ধরা যাক। বাজারে ল্যাংড়া বলে যে সব আম বিক্রী হয় তাদের আকার ও স্বাদে একটা সার্বিক সামঞ্জস্য থাকলেও ওজন, চেহারা, রং, স্বাদ, গন্ধ ও ফলনে যথেষ্ট তারতম্য লক্ষ্য করা যায়। হিমসাগর, বোম্বাই, কজলী, গোপালভোগ, গোলাপখাস প্রভৃতি যে শতাধিক নামী জাতের আম এ রাজ্যে জন্মায় তাদের বেলায়ও একই কথা খাটে।

সারা রাজ্য জুড়ে প্রত্যেকটি নামী জাতের আমের হাজার হাজার গাছ আছে। যে কোন একটি নামী জাতের উন্নতমানের উৎস-তরু পেতে হলে সেই হাজার হাজার গাছের ভিতর থেকে কয়েকটি অতি উত্তম গাছ খুঁজে বের করতে হবে।

রাজ্য কৃষি দপ্তরের অধীনে কৃষি প্রযুক্তি সহায়করা ছড়িয়ে আছেন এ রাজ্যের সর্বত্র। আছেন বিষয়বস্তু বিশারদ (Subject Matter Specialist) ও অগ্ন্যাগ্ন কৃষিবিদরা প্রশাসনের বিভিন্ন স্তরে। প্রথমতঃ কৃষি প্রযুক্তি সহায়কদের মাধ্যমে প্রত্যেক এলাকার সেরা গাছের খবর নিতে হবে। তারপর আর একটু উচ্চ পর্যায়ে অভিজ্ঞ লোক দিয়ে প্রতি অঞ্চলের সেরা গাছগুলির মধ্য থেকে সবচেয়ে সেরা গাছটি খুঁজে বের করতে হবে।

সমীক্ষার দ্বিতীয় পর্যায়ে প্রতি অঞ্চলের সেরা গাছগুলি পরীক্ষা করবেন বিশেষজ্ঞরা। তারপর সারা রাজ্যে কয়েকটি অতি উচ্চমানের গাছ বেছে নিয়ে সেগুলির অবস্থান, মালিকের নাম ও ঠিকানা, গাছের বয়স ও চেহারা, ফলস্বাদ বহুরে আমের সংখ্যা, কাঁকা বছরে যদি কিছু আম হয়—তার সংখ্যা, ফলের গড় ওজন, আঁটির ওজন, রং, স্বাদ, গন্ধ ইত্যাদি বিশেষভাবে লিপিবদ্ধ করার পর এই গাছগুলির উপযুক্ত রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে।

পরের মরসুমে ঐ গাছ থেকে কলম পদ্ধতিতে চারা তৈরী করে পাঠিয়ে দিতে হবে বিভিন্ন সরকারী খামারে। সেখানে গাছগুলি বড় হলে এগুলি থেকে কলমের চারা তৈরী করে বিতরণ করতে হবে সরকারী নথিভুক্ত (registered) চারা-কুশলীদের (nursery-men) খামারে। এই তৃতীয় স্তরের গাছগুলি বড় হলে সেগুলি থেকে প্রচুর সংখ্যায় চারা তৈরী করে বিলি বা বিক্রীর মাধ্যমে ছড়িয়ে দিতে হবে জনসাধারণের মধ্যে। এইভাবে সারা রাজ্যে এবং রাজ্যের বাইরে ছড়িয়ে পড়বে

সেরা সেরা জাতের আমের বংশধরের।

একইভাবে উন্নতমানের উৎস-তরু খুঁজে বার করতে হবে লিচু, পেয়ারা, কাঁঠাল, সপেদা, কলা, কমলালেবু, নারকেল, বাতাবিলেবু, মিষ্টি লেবু, পাতিলেবু, কাগজীলেবু, গন্ধরাজলেবু, জামরুল, সুপারি, তাল, গোলাপজাম প্রভৃতি সবরকম ফলের জন্য। অন্ধ্র প্রদেশে আঙ্গুরের ক্ষেত্রে উন্নত উৎস-তরু 'আজাব-ই-শাহী' এবং তামিলনাড়ুতে জুঁইএর ক্ষেত্রে 'পরীমুল্লাই' জাত নিজ নিজ রাজ্যে এই ফসলগুলির উৎপাদনে যুগান্তর এনেছে। পশ্চিমবাংলার বাজারে পায়রার ডিমের মত বড় বড় বীজযুক্ত যে সবুজ মিষ্টি আঙ্গুর রাশি রাশি আসে—সেটাই আজাব-ই-শাহী যার আক্ষরিক অর্থ 'হ'ল 'রাজকীয় ড্রাক্স'।

(খ) চারা তৈরীর আধুনিক কলা-কৌশল

ষাটের দশকের মাঝামাঝি পর্বন্ত পশ্চিম-বাংলায় গোলাপের চারা তৈরী হত জোড়-কলম (inarching) করে। পরে চারা-কুশলীরা উন্নততর পদ্ধতি চোখ-কলমের (budding) সাহায্য নেন। এখন এ রাজ্যে প্রায় সমস্ত গোলাপ চারাই তৈরী হচ্ছে চোখ-কলম করে। তার ফলে গোলাপ চারা তৈরী আগের চেয়ে এখন অনেক সহজ হয়ে গেছে। চারা তৈরীর আধুনিক পদ্ধতি গ্রহণের ঝোঁক কিন্তু অল্প ফসলের ক্ষেত্রে তেমন দেখা যাচ্ছে না।

আম এ রাজ্যের সর্বপ্রধান ফল। আমের চারা তৈরীর চিরচরিত পদ্ধতি হ'ল জোড়-কলম। এই পদ্ধতিতে সময় লাগে বেশী, ঝামেলাও অনেক। পরবর্তীকালে উদ্ভাবিত পদ্ধতিগুলির মধ্যে সহজ ও কার্যকরী পদ্ধতি হ'ল পাত-জোড় (veneer grafting) এবং অংকুর-জোড়

(epicotyl grafting)। উত্তর ভারতের চারা-কুশলীরা এখন প্রাচীন জোড়-কলম পদ্ধতি ছেড়ে পাত-জোড় পদ্ধতিতে আমের কলম তৈরী করছেন। কিন্তু পশ্চিমবাংলায় এ পদ্ধতি এখনও তেমন চালু হয়নি।

অংকুর-জোড় পদ্ধতিতে তৈরী আমের চারা জোড়-কলম বা পাত-জোড়ের চেয়ে এক বছর আগেই ব্যবহারের উপযোগী হয়ে যায়। কুশলী হাতে এ পদ্ধতিতে একশ' কলম করলে ৮০ থেকে ৯০টি ক্ষেত্রে জোড়া লেগে চারা তৈরী হয়ে যায়। অথচ রাজ্যের চারা-কুশলীদের অধিকাংশই এ বিষয়ে অবহিত নন।

লেবু, লিচু, পেয়ারা, গন্ধরাজ, জামরুল, কামিনী প্রভৃতি যে সব গাছের চারা সাধারণতঃ গুটি-কলম (layering) করে তৈরী হয়, সেই সব গাছের মাত্র ১০/১২ সেন্টিমিটার লম্বা ডগা অধুনা-উদ্ভাবিত কুয়াশা-ঘরে (mist propagation chamber) রেখে তাতে শিকড় গজিয়ে অতি সহজে চারা তৈরী করা যায়। ফলে যে পরিমাণ ডাল থেকে গুটি-কলম পদ্ধতিতে মাত্র একটি চারা পাওয়া যায়, নতুন পদ্ধতিতে সেই পরিমাণ ডাল থেকে আট-দশটি চারা তৈরী করা সম্ভব। কিন্তু কুয়াশা-ঘর ব্যবহার করা তো দূরের কথা, অনেকে এর নামও শোনেন নি।

কুয়াশা-ঘর তৈরীর প্রাথমিক খরচ বেশী এবং যেখানে বিজলী এবং কলের জলের ব্যবস্থা নেই সেখানে এটা চালু করা যায় না। তাই দূর গ্রামাঞ্চলের উদ্ভিদঅঙ্গনে বর্তমানে এ পদ্ধতি ব্যবহারের সুযোগ নেই। এই পরিস্থিতিতে লেখকের উদ্ভাবিত স্বার্জ কক্ষ (auto-humid chamber) কুয়াশা-ঘরের প্রায়-বিকল্প হিসাবে

বসুন্ধরা : ভাদ্র : ১৩২২

ব্যবহার করা যেতে পারে। এটা দামে যেমনি সম্ভা, তৈরী করাও তেমনি সহজ। *

গাছের শাখা-প্রমাণ ডগা নিয়ে অল্প-প্রজননের (micro-propagation) সাহায্যে হাজার হাজার রোগমুক্ত সতেজ চারা তৈরীর ব্যাপারটি এ রাজ্যের চারা-কুশলীদের কাছে তো কল্প-কাহিনী। অথচ বিদেশে এবং এ দেশেরই ছ'-এক জায়গায় এই পদ্ধতি কাজে লাগিয়ে খুব কম খরচে অল্প চারা তৈরী করা হচ্ছে। ব্যক্তিগত মালিকানায় কালিম্পংএর এক উদ্ভিদঅঙ্গনে প্রধানত: অর্কিডের চারা তৈরীর জন্য এ ধরনের একটি বৈজ্ঞানিক প্রয়োগশালা (Laboratory) কিছুদিন আগে তৈরী করা হয়েছে। এ ছাড়া আরও অনেক পদ্ধতি উদ্ভাবিত হয়েছে যেগুলির সাহায্যে সহজে ও সম্ভায় ভাল চারা তৈরী করা যায়।

(গ) উৎপন্ন চারার রক্ষণাবেক্ষণ

শুধু চারা তৈরী করলেই হবে না, উপযুক্ত যত্ন ও পরিচর্যার সাহায্যে তাকে বাগানে লাগানোর উপযোগী সুষ্প, সবল ও সুন্দর করে গড়ে তুলতে হবে। এ রাজ্যের অধিকাংশ উদ্ভিদঅঙ্গন এ বিষয়ে অনেক পিছিয়ে আছে। সতেজ ও সুন্দর চারা তৈরী করতে হলে কয়েকটি বিষয়ে লক্ষ্য রাখা দরকার। যে মাটিতে চারা বড় হবে তার গঠন (composition) যেন চারার প্রয়োজনের উপযোগী হয়। কোন চারা চায় ভারী মাটি, কোন চারা পছন্দ করে হালকা। টবে চারা তৈরীর অনেক সুবিধা। সেখানে মাটি, বালি, সার ইত্যাদি প্রয়োজনীয় মাত্রায় মিশিয়ে গাছের উপযোগী করে তৈরী করা যায়। অনেক সময় মাটিতে ক্ষতিকারক কীটশত্রু বা

রোগজীবাণু থাকে। উচ্চ তাপ ও চাপ অথবা রাসায়নিক পদার্থের প্রয়োগে টবের মাটি কীটশত্রু এবং রোগজীবাণু থেকে মুক্ত করা যায়। এই মাটির অল্প ও ক্ষার প্রয়োজনমত অদল-বদল করা সহজ। টবের চারা এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় নিয়ে যাওয়াও সুবিধাজনক। এ চারা টব থেকে সাবধানে বের করে জমিতে লাগালে মরে যাওয়ার ভয় থাকে না। ঘরবাড়ি সাজাতে যে বাহারী গাছ দরকার তা টবে থাকা চাই। টবের প্রধান অসুবিধা হ'ল জমির তুলনায় এ ধরনের গাছে জল দিতে হয় অনেক বেশী।

অধিকাংশ উদ্ভিদঅঙ্গনে চারা তৈরী করা হয় খোল। জমিতে আকাশের নীচে। ছোট ছোট এই চারাগাছগুলিকে সমানে বৃষ্টি ও ঝড়-ঝাপটা সহ্য করতে হয় বলে স্বাস্থ্য নষ্ট হয়ে যায়। ফলে এই চারার চাহিদা ও দাম দুইই কমে যায়। এ ধরনের গাছ সুন্দর নয় বলে ঘর সাজাতে এগুলি কাজে লাগে না।

ভাল চারা তৈরী করতে হয় আচ্ছাদনের নীচে। কাঠ বা লোহার ফ্রেমের উপর কাঁচ বা পলিথিন দিয়ে এ উদ্দেশ্যে বড় বড় নার্সারীতে যে ঘর তৈরী করা হয় তাকে বলে গ্রীণহাউস (Greenhouse)। এই ঘরে বৃষ্টি ও ঝড়-ঝাপটা আসতে পারে না অথচ গাছ তার প্রয়োজনীয় আলো এবং তাপ পায়। ঘরের মধ্যে ধুলোবালিও কম, তাই চারা বেশ সতেজ ও স্বাস্থ্যবান হয়।

(ঘ) প্রশিক্ষণ

চারা তৈরীর পদ্ধতি বক্তৃতা দিয়ে সহজে বোঝানো যায় না; আধুনিক কলা-কৌশল

খানিকটা জটিলও বটে। তাই এ বিষয়ে উপযুক্ত প্রশিক্ষণের প্রয়োজন। আজকাল কৃষিবিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় ব্যাপক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা হলেও চারা তৈরীর ক্রিয়া-কৌশল সম্বন্ধে শিক্ষাদানের তেমন কোন ব্যবস্থা নাই। কখনও কখনও সাময়িক শিবিরের আয়োজন করে এ বিষয়ে কিছু কিছু প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। কিন্তু চারা তৈরীর বিভিন্ন ক্রিয়া-কলাপ চলে সারা বছর ধরে। তাই উপযুক্ত পাঠ্যসূচী তৈরী করে এ বিষয়ে অন্ততঃ এক বছর ধরে শিক্ষাদানের জগ্গ রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় ডিপ্লোমা কোর্স চালু করা দরকার। এই কার্যক্রম হাতে নিলে বহু অল্পশিক্ষিত বেকার যুবক-যুবতীর কর্মসংস্থান হবে। কলকাতার আলিপুরে কেরী ইনষ্টিটিউটে এ ধরনের একটি শিক্ষাক্রম চালু আছে। কিন্তু সেখানে যে পরিমাণ ছাত্রকে ভর্তি করা হয় তা প্রয়োজনের তুলনায় সিন্ধুতে বিন্দুবৎ। তাছাড়া এখানে ভর্তি হবার যোগ্যতামান হায়ার সেকেন্ডারী; এটা নামিয়ে আনা দরকার।

(ঙ) বিপণন ব্যবস্থা

বর্তমানে পশ্চিমবাংলায় উদ্ভিদঅঙ্গনের সংখ্যা বেড়ে যাওয়ায় বিপণন সমস্যা অবশ্যস্তাবীরূপে দেখা দিয়েছে। ক্রেতার সঙ্গে উৎপাদকের সরাসরি যোগাযোগের স্বর্ধ ব্যবস্থার অভাবই এই বিপণন সমস্যার প্রধান কারণ। এই সুযোগ কাজে লাগিয়ে মুনাফা লুণ্ঠন মধ্যবর্তী ব্যবসায়ীরা।

বড় বড় চারার বাজারে মধ্যবর্তী ব্যবসায়ীদের একচেটিয়া আধিপত্য। কলকাতার প্রত্যন্তবর্তী কিছু গ্রামে ব্যাপকহারে গোলাপের চারা তৈরী হয়। এই চারা-কুশলীদের অধিকাংশই স্বল্প-

শিক্ষিত। তাঁরা পাইকারী হারে শতকরা ছ'শ থেকে আড়াই শ' টাকা দামে যে চারা বিক্রী করেন সেই চারাই কয়েক মাইল দূরের কলকাতা শহরে প্রত্যেকটি বিক্রী হয় চার-পাঁচ টাকায়। প্রতিপত্তিশীল মধ্যবর্তী ব্যবসায়ীদের চাপে এইসব উৎপাদকের পক্ষে শহরের বাজারে প্রবেশ করা বেশ কষ্টকর। তাই তাঁরা তাঁদের তৈরী চারা গ্রামে সস্তায় বিক্রী করে দিতে বাধ্য হন। কলকাতার নামাদামী ভারত বিখ্যাত 'নাসারী'-দের অধিকাংশই নির্ভরশীল গ্রামের এই উৎপাদকদের উপর।

এই অবস্থার প্রতিকারের জগ্গ প্রথমতঃ দরকার উদ্ভিদঅঙ্গনের মালিকদের সংঘবদ্ধ হওয়া; দ্বিতীয়তঃ ছোট-বড় শহরে, বড় রেল স্টেশনের কাছে বা পরিবহনের সুবিধাযুক্ত কোন জায়গায় চারার বাজার গড়ে তোলা।

এই বাজারে চারা-কুশলী সংঘের নিজস্ব দোকান, গুদাম এবং প্রদর্শন কক্ষ থাকবে। চারা ব্যবসায়ীরাও এখানে দোকান করার সুযোগ পাবেন। এভাবে উৎপাদনকারী ও ব্যবসায়ীদের মধ্যে স্বস্থ প্রতিযোগিতা ও সৌহার্দ্য গড়ে উঠবে। এই বাজারের পরিচিতি ছড়িয়ে পড়লে রাজ্যের ও বাইরের বিভিন্ন অঞ্চলের ছোট-বড় ক্রেতা এখানে এসে তাঁদের পছন্দমত জিনিস কিনতে পারবেন। এই ব্যবস্থার ফলে বিক্রী বাড়বে, উৎপাদক ও ক্রেতার মধ্যে সহজ যোগসূত্র স্থাপিত হবে এবং উৎপাদকরা উপযুক্ত দাম পাবেন।

বিভিন্ন রাজ্য সরকার সম্প্রসারণ কাজের প্রয়োজনে প্রচুর চারা কেনেন। এই চারার মান ঠিক রাখার জগ্গ এগুলি কেনা হয় সরকারী

বসুন্ধরা : ভাদ্র : ১৩৯২

অথবা রেজিস্ট্রীকৃত উদ্ভিদঅঙ্গন থেকে। উত্তর-প্রদেশ ও অগ্ন্যাশ্রয় অনেক রাজ্যে বেসরকারী উদ্ভিদঅঙ্গনের রেজিস্ট্রেশনের ব্যবস্থা আছে। কিন্তু পশ্চিমবাংলায় এ ব্যবস্থা এখনও চালু হয় নি। ফলে এ রাজ্যের উদ্ভিদঅঙ্গনগুলি সরকারী চাহিদা মেটাবার সুযোগ কম পাচ্ছেন।

এ ব্যাপারে দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণের প্রয়োজন। প্রথম পর্যায়ে রাজ্যের সমস্ত উদ্ভিদঅঙ্গনের তালিকা প্রস্তুত করতে হবে এবং উচ্চমানের চারার গুণগত বৈশিষ্ট্য সরকারী স্তরে নির্দিষ্ট করতে হবে। কিছু চারার ক্ষেত্রে ইন্ডিয়ান স্ট্যান্ডার্ড ইন্সটিটিউশন (ISI) গুণগত মান তৈরী করে দিয়েছেন। সেটা কাজে লাগাতে হবে।

উদ্ভান-বিজ্ঞানে উপযুক্ত শিক্ষণপ্রাপ্ত লোককে নিযুক্ত করে তাঁদের সাহায্যে বিভিন্ন উদ্ভিদ-অঙ্গনে প্রস্তুত চারার গুণগত মান স্থির করতে হবে। যে সব উদ্ভিদঅঙ্গন সরকারী মানে পৌঁছতে পারবে তাদের রেজিস্ট্রীভুক্ত করতে হবে। কোন রেজিস্ট্রীভুক্ত উদ্ভিদঅঙ্গনের গুণগত মান নেমে গেলে তাদের রেজিস্ট্রেশন বাতিলের ব্যবস্থা রাখতে হবে।

এই অনুশাসন বজায় রাখতে পারলে উদ্ভিদঅঙ্গনগুলি নিজেদের স্বার্থে তাদের উৎপন্ন পণ্যের গুণগত মান বজায় রাখতে বাধ্য হবে; চারার নাম ও জাতের বিবরণ দেওয়ার ক্ষেত্রে অসামান্য কমবে। ফলে এ রাজ্যের চারার সুনাম বাড়বে, বিস্তৃত বাজার তৈরী হবে। রেজিস্ট্রেশন ব্যবস্থা চালু হলে সরকারী স্তরে চারা বিক্রীর অসুবিধা দূর হবে।

(চ) অর্থের যোগান

এ রাজ্যের চারা-কুশলীদের আর্থিক সঙ্গতি

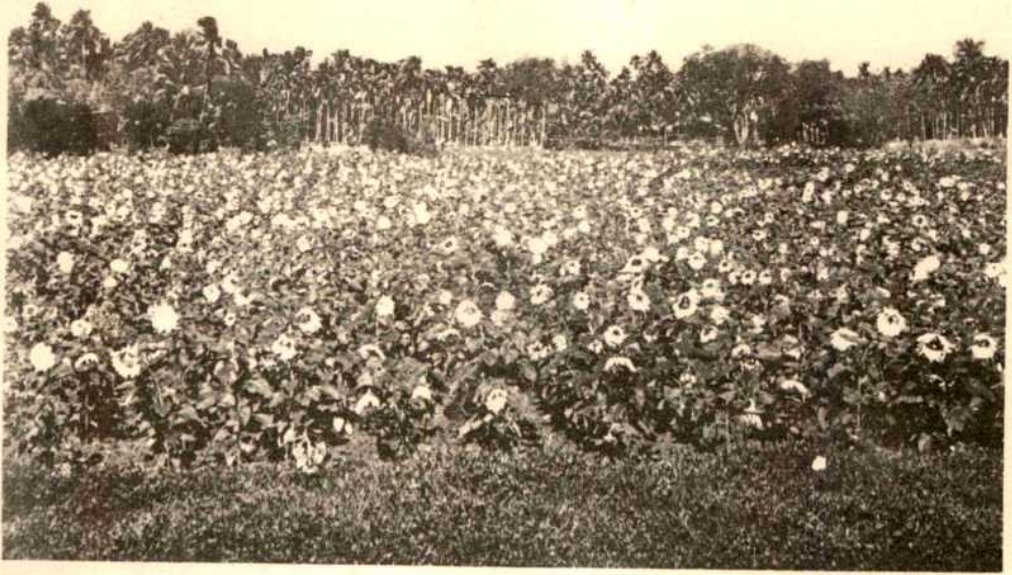
অধিকাংশ ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ। তাঁদের পক্ষে ব্যাপক হারে ব্যয়বহুল উন্নত প্রণালী গ্রহণ করা সহজ নয়। চারা তৈরীর আধুনিক কলার্কোশল কাজে লাগাতে হলে দরকার গ্রীণ হাউস, কুয়াশা-ঘর, আধ-ছায়া ঘর (Lath house) এবং অনু-প্রজ্ঞনের (micro-propagation) জ্ঞান প্রয়োজনীয় বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি সহ প্রয়োগশালা। এইসব কাজের জ্ঞান চাই অর্থের যোগান।

রাষ্ট্রীয় বা বাহ্যিক কোন সূত্র থেকে কম সুদে ঋণ পেলে এ কাজে অগ্রগতি হবে। ছোট ছোট উদ্ভিদঅঙ্গনের মালিকের ক্ষেত্রে এইসব গঠন-কাজ করার সামর্থ্য ও প্রয়োজন দুইই কম। যদি সমবায় ভিত্তিতে ঋণ নিয়ে কাছাকাছি অবস্থিত অনেকগুলি উদ্ভিদঅঙ্গনের জ্ঞান একটি করে গ্রীণ হাউস বা অগ্ন্যাশ্রয় ব্যয়বহুল জিনিস তৈরী করা যায়, তবে কাজটা সহজ হয় এবং পুরোমাত্রায় জিনিসগুলিকে কাজে লাগানো যায়। বড় মাপের উদ্ভিদঅঙ্গনগুলি প্রয়োজনে প্রত্যেকে তৈরী করতে পারেন। তবে তারজ্ঞানও ঋণের প্রয়োজন হতে পারে।

(ছ) কর্মতৎপরতা

চারা কেনার আগে ক্রেতার সাধারণতঃ চিঠিপত্রের মাধ্যমে বিভিন্ন উদ্ভিদঅঙ্গনে খোঁজ খবর নেন। এই অনুসন্ধানের জবাব দিতে অনেক উদ্ভিদঅঙ্গন তৎপর নয়। বাঞ্ছিত চারা না থাকলে অনেকে জবাবই দেন না। এই মনোভাব ব্যবসায়ের পক্ষে ক্ষতিকর।

বিক্রীর আগে চারা জমি থেকে তোলা, মোড়ক করা এবং সেগুলি পাঠানোর ব্যাপারেও প্রয়োজনীয় যত্ন নেওয়া হয় না। ফলে বাগানে



লাগানোর পর অনেক চারা মরে যায়। উদ্ভিদ-
অঙ্গনের সুনাম ক্ষুণ্ণ হওয়া এবং চারার বাজারে
মার খাওয়ার এগুলি অশ্রুতম কারণ।

চারা বিক্রীর জন্য ছোট ও মাঝারি উদ্ভিদ-
অঙ্গনগুলির পক্ষ থেকে সাধারণতঃ কোন রকম
প্রচারের ব্যবস্থা করা হয় না। প্রচার ছাড়া
আজকাল কোন জিনিসের বিক্রী বাড়ে না।
উদ্ভিদঅঙ্গনগুলির উচিত সংস্কারভাবে এই
প্রচারের কাজ হাতে নেওয়া।

উল্লিখিত সমস্যাগুলি দীর্ঘায়িত হলে শুধু
উদ্ভিদঅঙ্গনগুলিই ক্ষতিগ্রস্ত হবে না, ফল, ফুল
ও অশ্রুত উদ্ভিদজাত ফসলের উপর এর বিরূপ

প্রতিক্রিয়া পড়বে। তাছাড়া ভিন রাজ্যে চারা
রপ্তানী করে যে অর্থাগম হয় তা অশ্রু রাজ্য
ছিনিয়ে নেবে। সর্বোপরি যে সব ক্ষুদ্র, প্রান্তিক
ও ভূমিহীন কৃষক চারা তৈরী শিল্পে নিযুক্ত
আছেন, তাঁদের রুজি-রোজগারের পথ ক্রমশঃ
সংকীর্ণ হয়ে পড়বে।

এই পরিস্থিতির সামগ্রিক উন্নতির জন্য
প্রয়োজন অবিলম্বে উদ্ভিদঅঙ্গনগুলির মানোন্নয়নের
কাজে হাত দেওয়া। ইদানীং এদিকে যে কিছুটা
সরকারী নজর পড়েছে, এটা খুবই আশার
কথা। তবে এখনও প্রচেষ্টা প্রয়োজনের
তুলনায় অকিঞ্চিৎকর।

* এ বিষয়ে বিশদ বিবরণের জন্য আনন্দ এজেন্সি
কর্তৃক ৯৮ নিম্ন গোস্বামী লেন, কলিকাতা-৫ থেকে
প্রকাশিত 'চারা তৈরির চাবিকাঠি' বইটি দ্রষ্টব্য।

ধানের কয়েকটি রোগ

অনিমা পাল

রোগ ও রোগ-জীবগুর নাম	রোগের লক্ষণ
১। চারা ধসা Seedling blight [<i>Helminthosporium Sp</i> , <i>Alternaria Sp</i> , <i>Sclerotium rolfsii</i>]	চারাগাছের গোড়া ও শিকড় হালকা বাদামী রঙের হতে দেখা যায়। শীতের প্রকোপ বাড়ার সাথে সাথে অসহনশীল জাতের যে অবস্থা হয়, রোগাক্রান্ত চারাগুলিও স্থানে স্থানে সে অবস্থায় পরিণত হয়। ক্রমে চারাগুলি শুকিয়ে যায়।
২। ঝলসা বা পোড়া দাগ Blast [<i>Pyricularia Oryzae</i>]	পাতায় ছোট ছোট বাদামী রঙের দাগ দেখা যায়। এগুলি বেড়ে ক্রমে মাকু বা চোখের আকার ধারণ করে। দাগের মধ্যভাগ ধূসর রঙের এবং চারিধার বাদামী রঙের হয়। আক্রমণ তীব্র হলে দাগগুলি পরস্পর মিশে বড় দাগে পরিণত হয়। আক্রান্ত গাছ বলসে শুকিয়ে যায়। পর্ব আক্রান্ত হলে কালো রং ধারণ করে। ইহাকে নোড ব্লাস্ট বলে। ফুল হওয়ার পর

উদ্ভিদ রোগ তত্ত্ববিদ, খান্না গবেষণা কেন্দ্র, চুঁচুড়া।

ও তার প্রতিকার

রোগাক্রমণের সময়/বিস্তার	ওষুধ প্রয়োগে রোগ দমন / মাত্রা
বিশেষ করে বোরো খন্ডে এই রোগের প্রাদুর্ভাব বেশী।	বেভিষ্টিন / ১ গ্রাম / ১ লিটার জলে ওলে মাটি ভিজিয়ে স্প্রে করলে উপকার পাওয়া যায়। অথবা ব্রাসিকল ৭৫% ৩০০-৪০০ গ্রাম প্রতি ১০০ বর্গ মি. জমিতে ভালভাবে মিশিয়েও রোগ দমন করা যায়।
আবহাওয়া যখন মেঘলা বা কুয়াশাচ্ছন্ন থাকে এবং রাতের তাপমাত্রা দিনের তাপমাত্রার চেয়ে কম তখন রোগবিস্তার তাড়াতাড়ি হয়। বিশেষ করে এরূপ জলবায়ু মাঘ-ফাল্গুন ও অশ্বিন-কার্তিক মাসে দৃষ্ট হয়।	হিনোসান ৫০ ইসি / কিটাজেন ৪৮ ইসি ১ মিলি / ১ লি জলে অথবা ব্যাভিষ্টিন ১ গ্রা / ১ লিটার জলে ভালভাবে মিশিয়ে স্প্রে করে রোগ দমন করা যায়।
আবার অত্যধিক খরার সময় বীজতলা অধিকদিন শুকনো অবস্থায় থাকলে রোগ আক্রমণের প্রবণতা বেড়ে যায়।	আবহাওয়া ও রোগের তীব্রতা অনুযায়ী ৮-১২ দিন অন্তর ২-৩ বার স্প্রে করতে হবে।

রোগ ও রোগ-জীবগুর নাম	রোগের লক্ষণ
৩। বাদামী দাগ Brown spot [<i>Helminthosporium Oryzae</i>]	শিষের নীচ আক্রান্ত হলে একে বলে নেক ব্লাস্ট। শিষ আক্রান্ত হলে ক্ষতি বেশী হয়। পাতায় ছোট ছোট গাঢ় বাদামী দাগ দেখা যায়। দাগগুলি ছোট বড় নানা আকারের হতে পারে। দানায়ও এই দাগ দেখা যায়। খুব বেশী রোগাক্রান্ত ধানের চাল কালো হয় এবং ভাত তেতো লাগে।
৪। খোলা পচা Sheath rot [<i>Sarocladium Oryzae</i>]	উপরিভাগের খোলায় যেখান থেকে শিষ বের হয় সেখানে হালকা বাদামী রঙের দাগ দেখা যায়। রোগের তীব্রতায় সময় সময় শিষ বের হয় না এবং ধান চিটে হয়ে যায়।
৫। খোলা ধসা Sheath blight [<i>Thanatephorus cucumeris</i>]	কাণ্ড যেখানে জলের উপরিভাগে থাকে সেখানে রোগের লক্ষণ প্রথম দেখা যায়। খোলার গায়ে এবং পাতায় অসামঞ্জস্যভাবে বাদামী রঙের দাগ দেখা যায়। দাগগুলি চাক চাক ভাবে ছড়িয়ে থাকে। রোগের তীব্রতার আধিক্য হলে পুরো খোলা আক্রান্ত হয়ে পাতায় ছড়িয়ে পড়ে। এক গাছের পাতার থেকে অল্প গাছের পাতা আক্রান্ত হয়। প্রথম দিকে পাতায় স্থানে স্থানে মেটে সবুজ হয়। দাগগুলির ভিতর ধূসর রঙের এবং চারিদিক বাদামী রঙের হয়।
৬। ডাঁটা পচা Stem rot [<i>Sclerotium Oryzae</i>]	জমির জলের উপরিভাগে গাছের গুঁড়িতে হালকা বাদামী রঙের দাগ সময় সময় চোখে পড়ে। সাধারণতঃ ফুল আসার সময় বা তারও পরে এই রোগের লক্ষণ প্রকাশ পায়। গাছের বয়স বাড়ার পর ডাঁটার পচা অংশটি মাঝামাঝি চিরলে অসংখ্য কালো কালো দানা দেখা যায়।

রোগাক্রমণের সময়/বিস্তার	ঔষধ প্রয়োগে রোগ দমন / মাত্রা
বাতাসের সাহায্যে জীবাণু ছড়ায়। অতিরিক্ত নাইট্রোজেন এবং গাছ ঘন থাকলে রোগ আক্রমণের তীব্রতা বেড়ে যায়। জমিতে নাইট্রোজেন সারের অভাব হলে অথবা খুব বেশী পরিমাণে সার দিলে এই রোগ বাড়ে। পটাশ সারের অভাব বা অল্পতা বেশী হলে রোগের প্রাচুর্য্য বেশী হয়। খরিফ খন্দেই এই রোগ বেশী হয়। বাতাসের সাহায্যে এই রোগ ছড়ায়।	সকাল অথবা বিকেলে ডাইথেন এম-৪৫ ২'৫ গ্রাম ১ লিটার জলে মিশিয়ে স্প্রে করে রোগ দমন করা যায়।
মাজরা পোকা, টুংরো ও ধসা রোগে আক্রান্ত গাছে এই রোগের আক্রমণ বেশী হয়।	ওপরের মতো।
জমির উর্বরতা (নাইট্রোজেন) যদি বেশী থাকে তবে রোগ আক্রমণের প্রবণতা বেড়ে যায় এবং ছড়িয়ে পড়ে তাড়াতাড়ি। গাছে ফুল আসার সময় রোগের আক্রমণ বেশী হয় এবং রোগ তখনই বেশী ছড়িয়ে পড়ে।	আক্রান্ত গাছে ব্যাভিষ্টিন ১ গ্রাম ১ লিটার হিসেবে জলে গুলে স্প্রে করলে রোগ দমন হয় এবং ফলনের ক্ষতিও বিশেষ হয় না।
নীচু জমি ও যেখানে জল নিকাশের ব্যবস্থা নেই সেখানেই রোগের প্রাচুর্য্য বেশী। রোগ-জীবাণু দানাগুলি মাটিতে থাকে। উপযুক্ত পরিবেশে তা গাছকে আক্রমণ করে। রোগ-জীবাণু মাটি ও গাছের গোড়ায় অনেক দিন বেঁচে থাকে।	

রোগ ও রোগ-জীবাণুর নাম	রোগের লক্ষণ
৭। * বাকানি রোগ এবং গোড়া পচা Bakanac disease and foot rot [<i>Fusarium moniliforme</i>]	গাছ অস্বাভাবিক লম্বা হয়ে যাওয়া এই রোগের একটি প্রধান এবং সুস্পষ্ট লক্ষণ। এই লক্ষণ বীজতলায় এবং ক্ষেতে উভয় ক্ষেত্রেই পরিলক্ষিত হয়। আক্রান্ত চারাগাছ সাধারণতঃ সুস্থ গাছ থেকে বেশ অনেকটাই লম্বা হয়। রোগাক্রান্ত গাছ লিকলিকে লম্বা হয় এবং সতেজতা সুস্থ গাছ থেকে কম। তাও দেখা গেছে যে আক্রান্ত গাছ সব সময়েই লম্বা হয় না। কখনো কখনো খর্বাকৃতিও হয়। সময় সময় ইহাদের বৃদ্ধি বন্ধ হয়ে যায় এবং আক্রান্ত গাছ সুস্থ গাছের মতোই দেখায়। রোগাক্রান্ত গাছে পাশকাঠি কম হয় এবং নীচের পাতা থেকে শুকোতে আরম্ভ করে। * বিঃ দ্রঃ—পশ্চিমবঙ্গে এই রোগটির কথা ১৯৮২ সালের আগে পর্যন্ত শোনা যায় নি। বারাসাত মহকুমায় ১৯৮২ বোরো খন্ডে Saket-4 জাতটিতে এই রোগটি পরিলক্ষিত হয়। ইদানিংকাল থেকে বর্ধমান, হুগলী, মালদা ইত্যাদি স্থানেও এই রোগটি দেখা যাচ্ছে।
৮। ব্যাকটেরিয়াজনিত ধসা রোগ Bacterial leaf blight [<i>Xanthomonas Campestris</i> pv. <i>Oryzae</i>]	পাতার ডগা অথবা পাতার কিনারায় এই রোগের লক্ষণ প্রথমে দেখা যায়। ডগা থেকে শুকনো হতে শুরু হয়। পাতার কিনারা দিয়ে ঢেউ খেলানো ভাবে নীচের দিকে নেমে আসে। সমস্ত পাতাটাই আক্রান্ত হতে পারে। আক্রান্ত পাতাগুলি দেখলে মনে হয় ঝলসে গেছে। তাই এই রোগটি ঝলসা রোগ বলা হয়। সবুজ অংশ সহ ঝলসানো পাতা সমানভাবে কেটে অনেকগুলো একসাথে বেঁধে কাঁচের গ্লাসে স্বচ্ছ

রোগাক্রমণের সময়/বিস্তার	ঔষধ প্রয়োগে রোগ দমন / মাত্রা
রোগ-জীবগু বীজ ও মাটিতে থাকে। উপযুক্ত পরিবেশে জীবগু বেড়ে যায় এবং সাথে সাথে আক্রমণের সম্ভাবনাও বৃদ্ধি পায়।	পারদ ঘটিত ঔষধ দিয়ে বীজ শোধন করে নিলে রোগ আক্রমণের সম্ভাবনা অনেক কমে যায়। এক কেজি বীজের জন্য ৩ গ্রাম ঔষধের প্রয়োজন।
ধানগাছে ফুল আসার সময় এবং ফুল আসার পরে এই রোগের আক্রমণ সবচেয়ে বেশী হয়। জমিতে খুব বেশী নাইট্রোজেন প্রয়োগে এই রোগ বাড়ে। বৃষ্টি এবং বাতাসে রোগ ভাড়াভাড়ি ছড়িয়ে পড়ে। নালা, খানা-খন্দে এই রোগের প্রাদুর্ভাব বেশী হয়।	ঔষধের সাহায্যে রোগ দমন সম্ভবপর নছে। সুতরাং রোগ সহনশীল জাতের চাষ এবং পরিচ্ছন্ন ও বৈজ্ঞানিক মতে চাষই এই রোগ দমন করতে পারে।

রোগ ও রোগ-জীবগুর নাম	রোগের লক্ষণ
৯। ডোরা দাগ Bacterial leaf streak [<i>Xanthomonas Campestris</i> pv. <i>Oryzicola</i>]	জলে ডুবিয়ে রাখলে রোগ-জীবগু বের হতে দেখা যায়। তখন এই সস্থকে নিশ্চিত হওয়া যায়। অনেক সময় ক্ষেতের মাঝে মাঝে গোটা ঝাড়টাই শুকিয়ে যেতে দেখা যায়। পাতাগুলি তখন মেটে সবুজ হয়ে শুকিয়ে দড়ির মতো গুটিয়ে যায়। এরূপ লক্ষণ রোগের এক মাসের মাথায় দেখা যায়। এরূপ অবস্থাকে চক্রসেক বলে। গাছ তুলে গোড়ার অংশ ছুরি দিয়ে কেটে টিপলে পর পুঁজের মতো বের হয়। এই রোগে পাতার শিরার মাঝে মাঝে লম্বা লম্বা হলদেটে দাগ দেখা যায়। আলোর দিকে ধরলে দাগগুলি পরিষ্কার দেখা যায়। বেশী আক্রান্ত পাতাগুলি হলদেটে-কমলা রং হয়। ডোরার রং বাদামী হয়ে যায়। পাতায় পাশা-পাশি অনেক দাগের সঙ্গে ডোরা দাগগুলি মিশে পুড়ে যাওয়ার মতো হয়।
১০। ভাইরাসজনিত টুংরো রোগ Rice tungro Virus (RTV) বাহক পোকা—ঞামা [<i>Nephotettix Virescens</i>]	প্রথমে মাঠের আলের ধারে ধারে বা মাঝে মাঝে ২ ১টি গাছ আক্রান্ত হয়। আক্রান্ত গাছের কয়েকটি পাতা হলদে হয়ে যায়। হলদে রং পাতার অগ্রভাগ থেকে আরম্ভ হয়। পরে নীচের দিকে নেমে আসে। আক্রান্ত গাছের পাতা গাছের বয়স, আক্রমণের সময় এবং জাত অনুযায়ী হলদে থেকে হলদেটে কমলা বা কমলা রঙের হয়। গাছ বেঁটে হয়ে যায়। চারা অবস্থায় বা পাশকাঠি ভাড়ার সময় গাছ আক্রান্ত হলে গাছ বেঁটে হয়ে যায় এবং সময় সময় গাছ মরেও যায়। আক্রান্ত গাছে ফুল এলে অনেক দেরী করে আসে। বীজতলা আক্রান্ত হলে ক্ষতি বেশী হয়।

রোগাক্রমণের সময়/বিস্তার	ঔষধ প্রয়োগে রোগ দমন / মাত্রা
খরিক খন্দেই এই রোগের প্রাধান্য বেশী। পাশকাঠি ছাড়ার সময়কালীন হতে ফুল আসার আগে পর্যন্ত এই ডোরা রোগ বেশী দেখা যায়। অর্থাৎ শ্রাবণ-ভাদ্র মাসেই রোগটা বেশী দেখা যায়। গাছের বয়স বাড়লে রোগের প্রকোপ আপনিই কিছুটা কমে। আমন খন্দেই এই রোগের প্রাবল্য বেশী এবং তাড়াতাড়ি ছড়ায়। কারণ ভাদ্র মাস থেকে শ্রামা পোকা বাড়তে থাকে এবং আখিন কার্তিক চূড়ান্তভাবে বেড়ে যায়। শ্রামা পোকা আক্রান্ত গাছের পাতা থেকে রস শুষে নিয়ে যখন সুস্থ গাছের পাতায় বসে এবং রস খায় তখনই মুখের রোগ-জীবাণু পাতায় প্রবেশ করে। এইভাবে সুস্থ গাছ আক্রান্ত হয়। গাছের বয়স বাড়ার সাথে সাথে রোগ সহ্য করার ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়।	ঔষধের সাহায্যে রোগ দমনের পরীক্ষা চলছে। বীজতলায় কার্বোফুরান ২ কেজি এ.আই/হেক্টর হিসেবে প্রয়োগ করে রোগ দমন করা যায়। রোয়ার আগে আক্রান্ত চারাগাছ নষ্ট করে ফেলতে হবে। পাশকাঠি ছাড়ার সময় যদি প্রতি বর্গমিটারে ২-১টি আক্রান্ত গাছ দেখা যায় তবে বাহক পোকা দমনের জন্য কার্বোফুরান ব্যবহার করে রোগ আয়ত্তে রাখা যায়। যেহেতু ঔষধের খরচ অনেক বেশী সেজন্য রোগ সহনশীল জাতের চাষই রোগ দমনের প্রকৃষ্ট উপায়।



আশ্বিন মাসে কৃষকের করণীয়

ধান

আশ্বিনে ক্ষেতে ধান ধীর পরিণত হয়ে উঠছে। এ মাসে অধিক ফলনশীল ধানে গন্ধি পোকাকার আক্রমণের সম্ভাবনা থাকে। বিশেষ করে গন্ধি ও শীষ কাটা লেদা পোকাকার আক্রমণের ভয় থাকে। প্রয়োজনে দমনের ব্যবস্থা নিন।

আলু

এ মাসের শেষ থেকে জলদি জাতের আলু কুফরি চন্দ্রমুখী ও কুফরি অলঙ্কার বসান। কুফরি সিন্দুরি জাতের আলুও জলদি চাষে ব্যবহার করা যায়। বীজ বসানোর আগে তা অবশ্যই শোধন করে নেবেন। মাটি পরীক্ষা করিয়ে সুপারিশমত সার দিন। তা না হলে জমির উর্বরতা অল্পযায়ী একর প্রতি ৪০—৬০ কেজি করে নাইট্রোজেন, ফসফেট ও পটাশ আলু বসানোর নালিতে ছড়িয়ে দিয়ে অল্প গুঁড়ো মাটি ছড়িয়ে আলুবীজ বসান।

সরিষা

আশ্বিনের মাঝামাঝি থেকে টোরি বি-৫৪ (অগ্রণী), শ্বেত সরষে বি-৯ (বিনয়) ও রাই

টি-৫৯ (বরুণা) জাতের বীজ বুছন। অসেচ এলাকায় রাই বি-৮৫ (সীতা) ও টোরি বি-৫৪ (অগ্রণী) বোনা যায়। তবে বোনার কাজটি আশ্বিনের দ্বিতীয় পক্ষের মধ্যে শেষ করতে হবে।

জমি তৈরির সময় ৮—১০ গাড়ী জৈব সার দিন। মাটি পরীক্ষা করে সুপারিশ মত রাসায়নিক সার দিন। তা না হলে প্রতি একরে শেষ চাষের সময় সেচপ্রাপ্ত এলাকায় টোরিতে ৮ কেজি করে এবং রাই ও শ্বেত সরষেতে ১০ কেজি করে নাইট্রোজেন, ফসফেট ও পটাশ দিন। সেচবিহীন এলাকায় একর প্রতি ৮ কেজি করে নাইট্রোজেন, ফসফেট ও পটাশ দিন।

শাকসবজি

মাঝারি ও নাবি জাতের বাঁধাকপি, ওলকপি, বেগুন, টমেটো, লঙ্কার চারা, মটরশুঁটির বীজ এবং পটলের লতি লাগান। পেঁয়াজের বীজতলা করুন। ভাল জাত পুসা রেড, গ্লোব ও পাটনাই। আগে লাগানো সবজির পরিচর্যা করুন এবং চাপান সার দিন।



সপ্তম পঞ্চবার্ষিক যোজনার ব্যাপক প্রস্তুতি

উন্নত মানের বীজ উৎপাদন ও সরবরাহের কাজে
পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বীজ নিগম-এর সম্প্রসারিত কার্যক্রম

উন্নত মানের বীজ উৎপাদন ও সরবরাহ কার্যক্রমে (পাট, ধান, গম, ডালশস্ত্র এবং তৈলবীজ)	বর্তমান পরিস্থিতি (১৯৮৪-৮৫) ৩০০০ মেঃ টন	৭ম যোজনার লক্ষ্যমাত্রা (১৯৮৯-৯০) ১৫,০০০ মেঃ টন
--	--	---

পশ্চিমবঙ্গের জলবায়ু মাটির উপযোগী এ রাজ্যেই উৎপাদিত
উন্নত মানের শংসিত বীজ ব্যবহার করুন
ফলন বাড়ান : আয় বাড়ান

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বীজ নিগম লিঃ-এর জেলা দপ্তর

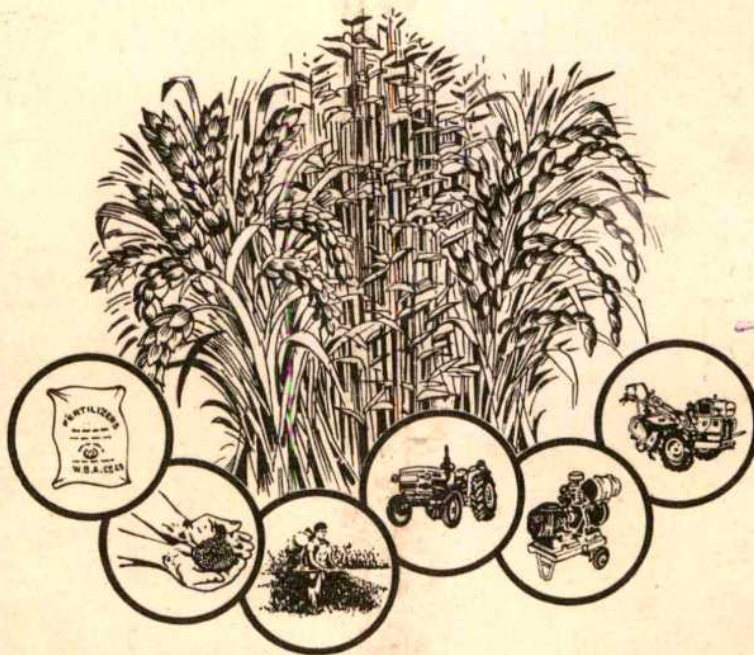
ব্রাহ্মগঞ্জ	: উকিলপাড়া, রায়গঞ্জ (পশ্চিম দিনাজপুর)
মালদা	: মকদমপুর, মালদা
বহরমপুর	: পঞ্চাননতলা, বহরমপুর (মুর্শিদাবাদ)
কৃষ্ণনগর	: ১২, ডি. এন. রায় রোড, কৃষ্ণনগর (নদীয়া)
বর্ধমান	: ৭৯, এন. এন. বসু রোড, বর্ধমান
সিউড়ী	: দাঙ্গালপাড়া, সিউড়ী (বীরভূম)
বাঁকুড়া	: চাঁদমারীডাঙ্গা, বাঁকুড়া
মেদিনীপুর	: ৩৫/১, অরবিন্দনগর, নরমপুর, মেদিনীপুর

সদর দপ্তর :

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বীজ নিগম লিঃ

৪, গঙ্গাধর বাবু লেন (৬ষ্ঠ তল), কলিকাতা-৭০০০১২

GREEN REVOLUTION— our aim in West Bengal



Green Revolution is our aim. The object is to modernise farming in the State. And Agro-Industries Corporation is lending a helping hand to achieve the goal. The Corporation has been supplying modern implements like Tractors, Sprayers, Threshers and Pump-sets to the farmers on hire or on hire-purchase basis.

The Corporation also supplies quality seeds, fertilisers and pesticides.

Agro-Industries Corporation also provides custom

service for cultivation of cotton/groundnut and for Small Farmers Development Agency and Marginal Farmers & Agricultural Labourers Development Project Schemes.

The Corporation has another role too—to create employment opportunities for Engineering graduates/diploma holders and Agricultural graduates in different Agro-Service centres in this State.

*Hand in hand with farmers—
Agro-Industries Corporation*

West Bengal Agro-Industries Corporation Limited

(West Bengal Govt. Undertaking)

23B, Netaji Subhas Road, (3rd Floor), Calcutta-700 001

Telegram : AGRINPUT

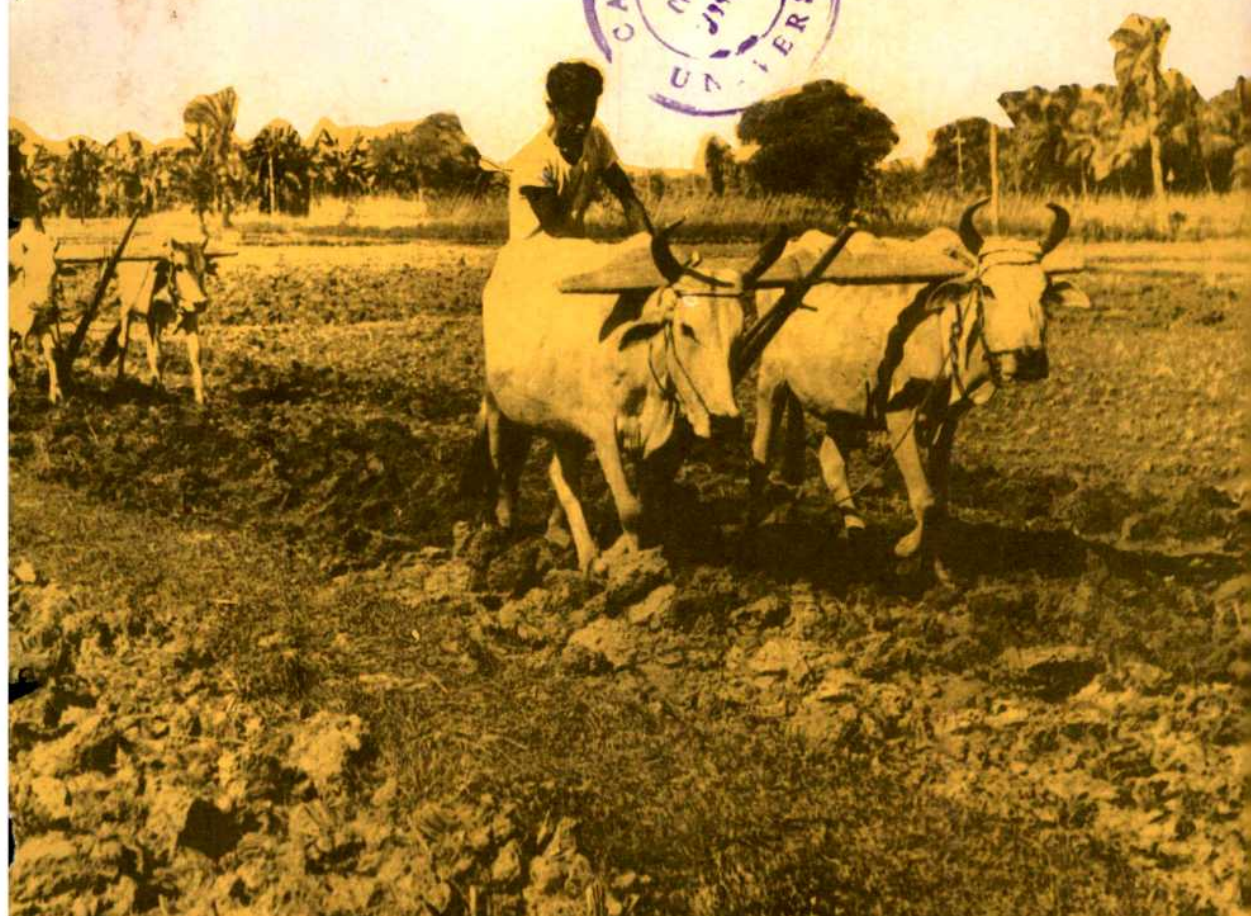
Telephone : 22-2314 / 23-3192

বসন্ত বসন্ত

সপ্তদ্বিংশ বর্ষ



আশ্বিন • ১৩৩২



সূচী

সম্পাদকীয়	৩-৪
রাইজোবিয়াম প্রযুক্তি মুর্শিদাবাদে	
ডাল চাষ আরও বাড়াবে	৫-৬
ডঃ পরিতোষ ভট্টাচার্য্য	
আলুর চাষ	৭-১১
পশ্চিমবঙ্গে কলা চাষের সমস্যা ও	
সমাধান	১২-১৪
ডঃ প্রদীপ কুমার চট্টোপাধ্যায়	
মাঠে যেতে (কবিতা)	১৫
গৌর দাশ	
প্রশ্নোত্তর	১৬-১৭
পঞ্চম বিশ্ব খাদ্যদিবস পালন	১৮-১৯
পটলের চাষ	২০-২৪
ডঃ রাধাগোবিন্দ মাইতি	
পার্বত্য উত্তরাঞ্চলে বড় এলাচ	
একটি অর্থকরী ফসল	২৫-২৮
হীরেন্দ্র চন্দ্র সেনগুপ্ত	
পশ্চিমবঙ্গে ১৯৮৫-৮৬ সালে ডাল	
উৎপাদন বৃদ্ধির কার্যসূচী	২৯-৩১
কার্তিক মাসে কৃষকের করণীয়	৩২

সম্পাদনা উপদেষ্টা পর্বদ	
বিষ্ণুপদ মণ্ডল, কৃষি অধিকর্তা, পশ্চিমবঙ্গ	
ডঃ দেবব্রত মুখার্জী, অপর কৃষি অধিকর্তা	
(গবেষণা)	
দুর্জ্জটা মুখার্জী, যুগ্ম কৃষি অধিকর্তা (সম্প্রসারণ)	
জ্যোতির্ময় বোস, উপ-সচিব (উন্নয়ন), কৃষি বিভাগ	
অমলেন্দু সরকার, মুখ্য প্রচার ও জনসংযোগ	
আধিকারিক, কৃষি অধিকার	
অমিয় কুমার মিত্র, জেলা কৃষি তথ্য আধিকারিক	
(সদর)	
স্বলেখা ঘোষ, সম্পাদিকা	
চিদানন্দ গোস্বামী, সহ-সম্পাদক	
প্রধান সম্পাদক	
বিষ্ণুপদ মণ্ডল, কৃষি অধিকর্তা, পশ্চিমবঙ্গ	

বহুধার

অগ্নিন-১৩৯২

কৃষি অধিকার (কৃষি তথ্য সংস্থা)
পৃ ৪৪ সরকার কর্তৃক প্রকাশিত ও প্রচারিত

কৃষি সংবাদ



আমন ধানে চাপান সার

বৃষ্টিপাতের স্বল্পতার জন্য কোথাও কোথাও আমন ধানের নাবি চাষ হয়েছে। সেইসব এলাকায় নিড়ানি দিয়ে অবিলম্বে একর প্রতি অধিক ফলনশীল ধানে ২৫ কেজি এবং দেশী ধানে ১৬ কেজি ইউরিয়া চাপান দিন।

মূলসার প্রয়োগের সময় পটাশ দেওয়া না থাকলে একর প্রতি অধিকফলনশীল ধানে ২০ কেজি এবং দেশী ধানে ১২ কেজি হারে মিউরিয়েট অফ পটাশ ইউরিয়ার সঙ্গে মিশিয়ে চাপান হিসাবে প্রয়োগ করুন।

চাপান দিয়ে মাটি ঘেঁটে দিন।

পামরী পোকের আক্রমণে অনেক জায়গায় ধানের, বিশেষ করে নাবি আবাদী ধানের বাড় ব্যাহত হয়েছে। এসব এলাকায় এলাকাভিত্তিক প্রয়োজনীয় কীটনাশক ওষুধ ব্যবহার করে চাপান সার প্রয়োগ করলে সুফল পাওয়া যায়।

সম্পাদক



বাংলার ঋতুপর্বায়ে শরতের মাধুর্য গ্রামজীবনে ও নগরজীবনে আনে এক বিশেষ আবেদন। শরতের সোনালী আলোয় অকাল বোধনের আনন্দ যেমন ছড়িয়ে থাকে, গ্রামবাংলার ক্ষেত প্রান্তরও এই সময় সবুজে সজীব হয়ে ওঠে। কৃষকের আশার ধন আমন ধান শরতের রোদে আর রাতের শিশিরে ধীরে তৈরী হয়ে ওঠে।

আমন ধানের চারা রোয়ার পর এখন সেই চারার যত্ন ও তদারকির কাজ চলছে। ঠিকমত যত্ন ও তদারকির উপর ভাল ফলন নির্ভর করে। এ বছর বৃষ্টি দেৱীতে নামায় রোয়ার কাজ কিছু কিছু জায়গায় পিছিয়ে গেছে। তাছাড়া রোগপোকার উপদ্রবও এ বছর খুব বেশী দেখা গেছে। বিশেষ করে পামরী পোকা। এ বছর মরশুমের শুরু থেকেই আমন ধানে পামরী পোকার আক্রমণ হতে দেখা গেছে। কিছু কিছু অঞ্চলে ব্যাপকভাবে এর আক্রমণ হয়েছে।

তবে এই সমস্যা সম্বন্ধে কৃষক এবং সরকার উভয়েই যথেষ্ট সজাগ রয়েছেন এবং রোগপোকা দমনের জগ্গ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাও নিয়েছেন। পোকায় আক্রান্ত অঞ্চলে সঠিক পরিমাণ ওষুধ প্রয়োগের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। যেসব জায়গায় পামরী পোকার আক্রমণে গাছের ক্ষতি হয়েছে, সেখানে পরিমাণমত চাপান সার প্রয়োগ করলে গাছ সতেজ হয়ে উঠবে এবং ভাল ফলনের সম্ভাবনা বাড়বে। এ সম্বন্ধে প্রয়োজন হলে স্থানীয় কৃষিকর্মীর সঙ্গে কৃষকরা যেন যোগাযোগ করেন।

এই সময় আমন ধানের যত্ন ও তদারকির কাজ যেমন চলতে থাকবে, সেইসঙ্গে রবিচাষের প্রস্তুতিও নিতে হবে। এই আশ্বিনেই রবিচাষের কাজ শুরু হচ্ছে। গম, তৈলবীজ, ডালশস্য এই সময়ের ফসল। এগুলির ফলন বাড়াবার জগ্গ এখন থেকে তৎপর হতে হবে।

ডাল ও তৈলবীজে এই পশ্চিমবঙ্গ ঘাটতি রাজ্য। ডাল ও তৈলবীজের ফলন বাড়াবার জগ্গ এ বছরও বিশেষ কার্যসূচী নেওয়া হয়েছে যাতে চাহিদা ও সরবরাহের মধ্যে ব্যবধান কমিয়ে আনা যায়। তাছাড়া তৈলবীজ ও ডালশস্যের কোন একটির বাড়তি ফসল তুলে নেওয়ার সুযোগও আশ্বিন মাসে আছে। আশ্বিনে এমন অনেক জমি খালি পড়ে থাকে যেখানে পাট বা আউশের পর অগ্গ চাষ হয় না, সেসব জমিতে বৃষ্টির জলে বা মাটির স্বাভাবিক রসে সরষে, ছোলা

বা মুহুরের যে কোন একটি ফসল তুলে নেওয়া যায়।

ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষীরা যাতে রবিশস্ত্রের চাষ সমন্বিত শুরু করতে পারেন, সেজন্য মুগ, ছোলা, কলাই প্রভৃতির মিনিকিট বিনামূল্যে দেওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষীরা এইসব মিনিকিটের সুবিধা নিয়ে আশাকরি ডাল ও তৈলবীজ চাষে এগিয়ে আসবেন।

রবি মরসুমের শুরুতেই তাই কৃষকদের নিজের সুবিধামত চাষ পর্যায় ঠিক করে নিতে হবে। এসব বিষয়ে সাহায্য ও পরামর্শের প্রয়োজন হলে কৃষকরা যেন স্থানীয় কৃষিকর্মীর সঙ্গে যোগাযোগ করেন।



রাইডেবিয়াম প্রযুক্তি মুর্শিদাবাদে ডাল চাষ আরও বাড়াবে

ডঃ পরিতোষ ভট্টাচার্য

মুর্শিদাবাদ জেলার সদর শহর বহরমপুরের পৌরনভা এলাকার সীমানার পাশ দিয়ে উত্তর-দক্ষিণ বরাবর ভাগীরথী নদী বয়ে চলেছে। এই নদীকে ঘিরেই এই জেলার যা কিছু কৃষি-সমৃদ্ধি। আর এই সমৃদ্ধির জন্মই মুর্শিদাবাদ জেলা চাষ-বাসের ব্যাপারে এ রাজ্যের সব জেলাকে ছাপিয়ে গিয়েছে। ভাগীরথীর পূর্বদিকে যে বিস্তীর্ণ সবুজ অঞ্চল, তার নাম 'বাগড়ী' এলাকা। এইখানে প্রচুর পরিমাণে শস্য চাষ হয়। অক্টোবর থেকে এই নদীর পশ্চিম পাড়ে, যার নাম রাঢ় এলাকা, সেখানে চাষের পরিমাণ বেশ খানিকটা কম। শক্ত, এঁটেল লাল এবড়ো-খেবড়ো মাটি

নিয়ে এই রাঢ় অঞ্চলের অবস্থান। বিদ্য পর্বতমালা থেকে জলের সাথে ভেসে আসা পাথুরে কণা থেকে এই ধরণের মাটির প্রকৃতি তৈরী হয়েছে। গঙ্গা পেরিয়ে স্থাশনাল হাইওয়ে-৩৪ দিয়ে যদি এই অঞ্চলে ঢোকা যায় তবে দেখা যাবে রাস্তার দুপাশে এই রবি মরসুমে প্রচুর এলাকা ফাঁকা পড়ে আছে। ধান কেটে নেবার পর আর কিছু চাষ হয় নি। প্রসঙ্গত বলা যেতে পারে, এখানকার বেশীরভাগ এলাকাই এক ফসলী— শুধুমাত্র আমন ধান হয়। কয়েকটি সীমিত সেচ এলাকায় শস্য পর্যায় হ'ল আউশ-আমন-তৈলবীজ বা আমন-বোরো।

রিসার্চ অফিসার (মাইক্রোবায়োলজী), ডালশুগ্ৰ ও তৈলবীজ গবেষণা কেন্দ্র, বহরমপুর।

বঙ্গবন্ধু : আশ্বিন : ১৩৯২

এত কথা বলা হোল এই কারণে যে মুর্শিদাবাদ জেলার কৃষি-সমৃদ্ধি বাগড়ী অঞ্চলে যতটা হয়েছে, রাঢ় অঞ্চলে ততটা হয় নি। চেষ্টা যে চলেনি তা নয়, কিন্তু নানা ধরনের প্রযুক্তি-গত প্রতিকূলতার দরুণ এখানে শস্যের চাষ বিশেষ করে ডালের চাষ বাড়িয়ে তোলা সম্ভব হয় নি। যদিও বা কোন কোন জমিতে আমন ধান তুলে নেবার পর ঐ রসেই মূলতঃ ছোলা ছিটিয়ে দিয়ে খানিকটা ডাল তৈরী করে নেবার উদ্যোগ কোন কোন চাষী করেছেন, তবে তা খুব একটা কার্যকরী হয় নি। অথচ এসব এলাকায় যেখানে সেচের ব্যবস্থা নেই সেখানে আমন ধান তুলে নেবার পর ঐ রসেই ডালের চাষ ও ফলন বাড়ানোর পর্যাপ্ত সম্ভাবনা রয়েছে।

সম্প্রতি বছর কয়েক হ'ল, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কৃষি বিভাগের বহরমপুরে অবস্থিত ডালশস্য ও তৈলবীজ গবেষণা কেন্দ্রের জীবাণু-বিজ্ঞান শাখার কর্মীরা ঐ শহরের ২৫ কিলো-মিটার দূরে “সুকী” ও “আয়রা” অঞ্চলে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়ে দেখেছেন যে ঐ সব এলাকায় যদি রাইজোবিয়াম-প্রযুক্তি কাজে লাগিয়ে আমন ধান কেটে নেবার পর ঐ রসেই নানা ধরনের ডালশস্যের চাষ করার ব্যাপারে উদ্যোগ নেওয়া হয় তবে তা সফল হতে পারে। এতে রাজ্যে ডাল চাষের এলাকা ও ফলন দুইই বাড়বে বলে আশা করা যাচ্ছে। আসলে এই বিস্তীর্ণ এলাকায় মাটিতে নাইট্রোজেনের পরিমাণ কম থাকায় এবং প্রয়োজনীয় রাইজোবিয়ামের উপস্থিতি প্রায়ই না থাকায় ডালের চাষ এখানে

আগে খুব একটা সফল হয়নি।

গত বছর (১৯৮৩-৮৪ সালে) ঐ গবেষণা কেন্দ্রের পক্ষ থেকে ঐ প্রযুক্তি কাজে লাগিয়ে ব্যাপক এলাকায় চাষীর জমিতে ডালের চাষ সফলভাবে বাড়ানো সম্ভব হয়েছে। এইচ-৪৫ জাতের রাইজোবিয়াম ব্যবহার করে “সুকী” গ্রামের চাষী কালীশঙ্কর মন্ডলের জমিতে ছোলার ফলন ৬৪ শতাংশ বৃদ্ধি করা গেছে। শ্রীমণ্ডল এর আগেও বছবার তাঁর জমিতে ছোলার চাষ ভালোভাবে করার উদ্যোগ নিয়েছিলেন, কিন্তু প্রতিবারেই ব্যর্থ হন। ফলে বছর বছর তাঁর বহু জমি খালি থেকে যেত। এবারে ঐ সফলতায় তিনি খুবই উৎসাহ পেয়েছেন। জীবাণু সার ব্যবহার করে হেক্টরে প্রায় তিন কুইন্টালের মত ফলন তিনি বেশী পেয়েছেন। ১৯৮৪-৮৫ সালেও মুন্সুরি এবং মটর ব্যাপকভাবে ওখানে চাষ হয়েছে এবং যেখানে যেখানে রাইজোবিয়াম জীবাণু সার মাথিয়ে ঐ ধরনের ডালের চাষ হয়েছে, সেখানেই সফলতা পাওয়া গিয়েছে। এই পরীক্ষাগুলি চলেছে “সুকী” গ্রামে দিবাংকর মণ্ডল ও দুর্গাশঙ্কর মণ্ডলের জমিতে এবং “আয়রা”-তে বিকাশ দে'র জমিতে। উভয়ক্ষেত্রেই আমন ধান কেটে নেবার পর ঐ রস কাজে লাগানো হয়েছে। যাই হোক, এর ফলে ঐ এলাকার চাষীরা খুবই উৎসাহিত। কিন্তু সমস্যা যেটা তা হ'ল ঐ সার কিভাবে পাওয়া যাবে তা ওখানকার চাষীরা জানতেন না। সম্প্রতি তাঁরা বহরমপুর গবেষণা কেন্দ্রের সাথে এ ব্যাপারে যোগাযোগ করছেন।

আলুর চাষ

জমি

বেলে দো-আশ বা দো-আশ।

জাত

জলদি (২০ দিন) : (ক) কুফরি চন্দ্রখুঁ—আলু বড়, সামান্য বাঁকা, ডিম্বাকৃতি, নাবি ধসা প্রবণ, সংরক্ষণ উপযোগী। সমতলে ফলন অপেক্ষাকৃত বেশী।

(খ) কুফরি অলংকার—ধান-আলু-গম শস্তপর্ষায়ে চাষ উপযোগী।

নাবি (১১০ দিন) : (ক) কুফরি জ্যোতি—আলু সাদা, বড়, সামান্য চ্যাপ্টা, ডিম্বাকৃতি, ভাসা চোখ, সার প্রয়োগে সাড়া দেয়, নাবি ধসা প্রতিরোধ সক্ষম, সংরক্ষণ উপযোগী। আব (ওয়াট) রোগ হয় না।

(খ) কুফরি সিন্দুরি—মাঝারি জাত। গভীর চোখ, আলু লাল, গোল, আঠালো, খোসা শক্ত ও ধসাপ্রবণ।

জলদি আলু নাবি চাষেও ব্যবহার করা যায়, আবার কুফরি সিন্দুরি জলদি চাষেও লাগানো যায়।

জমি তৈরি

গভীর ও বুরবুরে করে মাটি তৈরি করে জমি সমান করুন। চাষের সময় একরে ১৫—২০ গাড়ী কম্পোস্ট বা গোবর সার দিন। জমিতে উই, কাটুই বা ঘূরঘূরে পোকের উপদ্রব থাকলে শেষ চাষের সময় একর প্রতি ১৫ কেজি অলড্রিন ৫% বা হেপ্টাক্লোর ৫% বা ক্লোরডেন ৫% গুঁড়ো ছড়িয়ে দিন। বি-এইচ-সি কখনও ব্যবহার করবেন না, আলুতে গন্ধ হয়।

বসুন্ধরা : আশ্বিন : ১৩৯২

বীজের হার

একর প্রতি ৮ কুইন্টাল।

বীজ নির্বাচন

রোগমুক্ত এলাকা ও জমি থেকে আলুবীজ সংগ্রহ করুন। ৩—৫ সেমি মাপের প্রতিটি গড়ে কমবেশি ২০ গ্রাম ওজনের গোটা আলু ভাল। বড় আলু কেটে লাগালে প্রতি টুকরোয় অন্তত ২টি চোখ থাকবে। কাটার সময় আলুর ভিতর কোন রোগের চিহ্ন দেখলে সেগুলো বাতিল করুন এবং ১% পটাশ পারমানগানেট দ্রবণ বা বীজ শোধনের ওষুধ গোলা জল দিয়ে প্রতিবার বীজ বা কাটার যত্ন মুছে নিন।

বীজ শোধন

মাটির গামলা বা কাঠের ডাবায় ৫০ লিটার জলে ১০০ গ্রাম মিথোয়ি ইথাইল মারকিউরিক ক্লোরাইড মিশিয়ে তাতে ১ কুইন্টাল বীজ আলু ২ মিনিট ডুবিয়ে একটু নাড়াচাড়া করে তুলে ছায়াতে শুকিয়ে নিন। ৪ বার ব্যবহারের পর নতুন দ্রবণ ব্যবহার করতে হবে।

আলু বসানো

- সময় : (ক) জলদি—আশ্বিনের শেষ থেকে কার্তিকের প্রথম।
(খ) প্রধান ফসল—কার্তিকের মাঝামাঝি থেকে অগ্রহায়ণের মাঝামাঝি।
(গ) নাবি—অগ্রহায়ণের শেষ পর্যন্ত (কেবল কুফরি জ্যোতি)।

দূরত্ব : সারি থেকে সারি : ৪৫—৫০ সেমি।

বীজ থেকে বীজ : ১৫—২০ সেমি।

সার ও পদ্ধতি

মাটি পরীক্ষা করিয়ে সারের মাত্রা জেনে নিন। অগ্রথায় জমির উর্বরতা অনুযায়ী একর প্রতি নাইট্রোজেন, ফসফেট ও পটাশ প্রতিটি ৪০—৬০ কেজি

হিদেবে সার আলু বসাবার নালিতে ছড়িয়ে দিন। তার উপর অল্প শুঁড়ো মাটি ছড়িয়ে বীজ বসিয়ে বাকি মাটি দিয়ে নালি ঢেকে দিন যাতে বীজ ৫—৭ সেমি মাটির নিচে চাপা পড়ে।

জলদি আলুর চাষে জল বসার সম্ভাবনা থাকলে ১০ সেমি উঁচু ভেলি করে ভেলির মাথায় ১০ সেমি নিচে আলু বসান। এক্ষেত্রে মূল সার জমি তৈরির সময় দিয়ে ভেলি করবেন। এবং সারি থেকে সারি ও বীজ থেকে বীজের দূরত্ব অপেক্ষাকৃত কম হবে।

চাপান সার ও পরিচর্যা

বীজ বসানোর ৩—৪ সপ্তাহের মধ্যে আলুগাছ যখন ১০—১৫ সেমি উঁচু হবে তখন একর প্রতি ২০ কেজি নাইট্রোজেন দিয়ে ভেলি বেঁধে দিন। এর মধ্যে দরকার মত আগাছা দমন করুন। বীজ বসানোর ৬ সপ্তাহ পরে ভেলিতে আবার মাটি ধরিয়ে দিন।

সেচ

ভেলি প্রথম বাঁধবার ২-৩ দিন আগে পর্যন্ত প্রয়োজনবোধে ৩-৪ দিন অন্তর জলের ঝাপটা দিন। ভেলি বাঁধবার পর সপ্তাহে একবার ও দ্বিতীয়বার মাটি ধরানোর পর ৭—১০ দিন অন্তর সেচ দিন। সেচের জলে ভেলির ঠুঁ ভাগের বেশী যেন না ডোবে। মাটিতে রসের অবস্থা বুঝে সেচের সময় ও সংখ্যার কিছু হেরফের হতে পারে। আলু তোলার ১০—১৫ দিন আগে সেচ বন্ধ করলে কুফরি জ্যোতি আলু ফাটে না ও অগ্ন্যান্ত জাতগুলি সংরক্ষণে সুবিধা হয়। মাঘের শেষে গরম পড়ে গেলেও সেচ বন্ধ করুন।

শত্রুরক্ষা

রোগ : (ক) জলদি ও নাবি ধসা—সাধারণত পৌষের মাঝামাঝি থেকে দেখা যায়। জলদি ধসা প্রতি বছরই দেখা যায়। স্যাঁতসেঁতে আবহাওয়া, মেঘলা আকাশ ও মাঝে মাঝে বৃষ্টি হলে নাবি ধসায় ক্ষতি বেশি হয়।

উভয় রোগ প্রতিরোধকল্পে পৌষের মাঝামাঝি থেকে প্রতি লিটার জলে ২ গ্রাম মানকোজেব বা জিনেব বা ৪ গ্রাম কপার অক্সিক্লোরাইড গুলে পাতার দু'পিঠে ও ডাঁটায় ভালভাবে স্প্রে করুন। একরে ৩০০ লিটার জল লাগবে। রোগের প্রকোপ বুঝে ১০—১৫ দিন অন্তর আরও ২-৩ বার ওষুধ স্প্রে করুন।

বহুধর : আশ্বিন : ১৩৯২

শুকনো আবহাওয়ায় সকাল ৮টা থেকে সাড়ে ১১টা ও বিকেল আড়াইটা থেকে ৪টার মধ্যে স্প্রে করলে সবচেয়ে ভাল ফল পাওয়া যায়।

(খ) কুটে রোগ—এ রোগ দেখা দিলে গাছ একটু বড় হওয়ার পর (৬—৮ সপ্তাহ) একবার ও পরে আর একবার জমি থেকে রোগাক্রান্ত গাছ তুলে পুড়িয়ে বা দূরে মাটিতে পুতে ফেলুন। রোগাক্রান্ত গাছের আলুগুলিও তুলে ফেলুন।

(গ) বছরের পর বছর একই জমিতে পাটের পর আলু চাষ করলে পাটের গোড়া পচা রোগ ও আলুর গোড়া শুকিয়ে যাওয়া রোগ দেখা যায়। এ স্বকম অবস্থায় প্রথম ভেলি বাঁধবার সময় একর প্রতি ১২ কেজি ত্রাসিকল ২০% গুঁড়ো দিয়ে দিন।

(ঘ) ঢলে পড়া—এ রোগ বেশি দেখা গেলে সে জমিতে অন্ততঃ ৩ বছর আলু, টমেটো, লঙ্কা বা বেগুনের চাষ করা উচিত নয়। এক জাতীয় ব্যাকটেরিয়া এই রোগ ঘটায়।

পোকা

(ক) কাটুই পোকা—আক্রান্ত ক্ষেতের মাঝে মাঝে কিছু ঘাস, আগাছা ইত্যাদি সন্ধ্যাবেলা জড়ো করে রাখলে কাটুই পোকা এতে আশ্রয় নেবে। সকালে এগুলো মেরে ফেলুন। আক্রমণ বেশি হলে একরে ৩০০ লিটার জলে ১ লিটার হেপ্টাক্লোর ২০% বা অলড্রিন ৩০% গুলে বারি দিয়ে জমি ভিজিয়ে দিন।

(খ) জাব পোকা—এ পোকার আক্রমণ বেশি হলে বা অস্বাভাবিক চোবি পোকার আক্রমণ হলে প্রতি লিটার জলে ২ মিলি ম্যালাথিয়ন অথবা ফরমোথিয়ন ২ মিলি মিশিয়ে স্প্রে করুন। এই পোকা কুটে রোগের বাহক।

ফসল তোলা

গাছ হলদে হয়ে শুকোতে শুরু করলে কোদাল বা লাঙল দিয়ে সাবধানে আলু তুলুন যাতে আলু কেটে না যায়।

আলুর রোগ-পোকা দমনের জন্য বলা ওষুধগুলির রাসায়নিক ও বাজারে
প্রচলিত নামের তালিকা

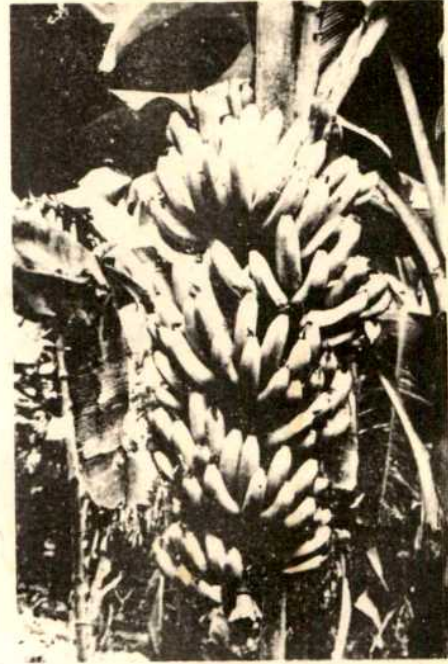
রাসায়নিক নাম	বাজারে প্রচলিত নাম
মিথোজি ইথাইল মারকিউরিক ক্লোরাইড	এবেরটান-৬, এমেসান-৬
ম্যানকোজেব	ডাইথেন এম-৪৫
জিনেব	ডাইথেন জেড-৭৮, লোনাকল, হেক্সাথেন, ইউনিজেব
কপার অক্সিক্লোরাইড	ব্লাইটক্স, ফাইটেলান, ব্লু-কপার
ম্যালাথিয়ন	ম্যালাথিয়ন, সাইথিয়ন ৫০%
কুইনটোজিন	ব্রাসিকল ২০% ডি, পি,
ফরমোথিয়ন	এ্যানথিয়ো ২০%

পশ্চিমবঙ্গে কলা চাষের এমতত ও সমস্যা

ডঃ প্রদীপ কুমার চট্টোপাধ্যায়

পশ্চিমবঙ্গের কলা বলতে আগে চাঁপা, মর্তমান, কাঁঠালী প্রভৃতি কলাকেই বোঝাতো। কিন্তু বেশ কয়েক বছর ধরে বেঁটে জাতের কলা—বিশেষ করে জায়েন্ট গভর্ণর, রোবাস্টা ব্যবসায়িক ভিত্তিতে অনেক জায়গায় বাপকভাবে চাষ করা হচ্ছে। কৃষির অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে নিবিড় চাষ আমরা গ্রহণ করেছি—কিন্তু মাকাতার আমলের চাষ পদ্ধতি সব জায়গায় ঝেড়ে ফেলতে পারিনি। অথচ বিজ্ঞান মেনে চাষ করতে হলে, সঠিক পরিমাণে সার ও সেচ দেওয়া, রোগ ও পোকার বিরুদ্ধে সঠিক ওষুধ প্রভৃতি প্রয়োগে পিছিয়ে গেলে চলবে না।

বেঁটে জাতের কলার চাষ বন্ধির ফলে সাময়িকভাবে আমরা কিছু রোগ, পোকা ইত্যাদির হাত থেকে রেহাই পেলেও পরবর্তী সময়ে নতুন রোগ এ চাষে সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। বেঁটে জাতের কলার চাষ বেড়েছে শুধুই এর উৎপাদন ক্ষমতা বেশী তা বলেই নয়, এ জাতের কলা চাষে আরও বাড়তি কিছু সুবিধা রয়েছে।
উদাহন বিজ্ঞান বিভাগ, বিধানচক্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়।



যেমন, বেঁটে হওয়ায় ঝেড়ে ক্ষতির সম্ভাবনা অনেক কম, কাঁদি হওয়ার পর খুঁটি না লাগালে চলবে, সুবিধাজনকভাবে রোগ-পোকা দমনের ওষুধ ছিটানো যায় ইত্যাদি। এখন কলা চাষের প্রধান সমস্যাগুলি আলোচনা করা হচ্ছে—

পাতায় দাগ ধরা রোগ যা সিগাটোকা রোগ নামে পরিচিত। এ রোগের আক্রমণ ক্রমশঃ তীব্র হতে থাকলে পাতার সবুজ অংশ ভীষণভাবে কমে যায়। পাতাগুলি বলসানো মনে হয়। পাতা শুকিয়ে বুলে পড়ে। কাঁদি একদম পুষ্ট হয় না। সাধারণভাবে তাপমাত্রা কমতে

থাকলে দাগ ধরা রোগ বাড়তে থাকে। চাঁপা বা মর্তমান কলা গাছে এ রোগ কম হয়। পশ্চিমবাংলায় বেঁটে জাতের কলা চাষে এ রোগ বেশ সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। তবে, অতিক্রান্ত হওয়ার কোন কারণ আছে বলে মনে হয় না। প্রথম করণীয় হচ্ছে— সঠিক পরিচর্যা অর্থাৎ সময়মত সঠিক পরিমাণে সার ও সেচ প্রয়োগ আর বাড়তি তেউড় তুলে ফেলা। পাতায় ছ একটা দাগ দেখতে পেলে ক্যালিকসিন আধ মিলিলিটার অথবা ডাইথেন এম-৪৫ আড়াই গ্রাম হিসাবে প্রতি লিটার জলে মিশিয়ে মাইক্রোনাইজার স্প্রে মেশিন দিয়ে স্প্রে করতে হবে। একই সঙ্গে প্রতি লিটার জলে আধ গ্রাম ডিটারজেন্ট পাউডার মিশিয়ে নিলে ভাল হয়।

ঢলে পড়া রোগের মধ্যে পানামা রোগ বা মর্তমান কলার চাষ যথেষ্ট পরিমাণে কমিয়ে দিয়েছে। তবে, বেঁটে জাতের কলা এ রোগের আক্রমণে ক্ষতিগ্রস্ত হয় না।

সাম্প্রতিককালে এঁটে ও গোড়াপচা রোগ (সকট রট) বেঁটে জাতের কলায় বেশ ব্যাপকভাবে দেখা যাচ্ছে। এটি জীবগুণিত রোগ। গাছ লাগানোর কয়েকদিন পর পাতা হলদে হয়ে গাছ শুকাতে আরম্ভ করে। গাছের কাণ্ড জলে ভেজা মনে হয় এবং পচতে শুরু করে। অনেক ক্ষেত্রে গাছ উলটে পড়ে যায়। প্রতি লিটার জলে ২ গ্রাম হিসাবে ব্রিচিং পাউডার মিশিয়ে গাছের গোড়া ভালভাবে ভিজিয়ে দিতে হবে।

ভাইরাস রোগের মধ্যে গুচ্ছমাথা বা 'বানচি টপই' প্রধান। একরকম জাবপোকা এ রোগ ছড়ায়। পোকা দমনের জন্য রোগের ১ মিলি-

লিটার বা দেড় মিলিলিটার ম্যালাথিয়ন প্রতি লিটার জলে মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে। এ রোগ দমন করতে না পারলে ব্যবসায়িকভিত্তিতে কলা চাষ সমস্যা হয়ে দাঁড়াবে। বাগান থেকে রোগাক্রান্ত গাছ তুলে পুড়িয়ে ফেলা, আক্রান্ত বাগান থেকে চারা না নেওয়া, বাগানের পরিচ্ছন্নতা রক্ষা করা, সময়মত পোকা দমন প্রভৃতি এ রোগের বিস্তার কমাতে সাহায্য করবে।

বেঁটে জাতের কলা চাষের প্রধান কীটশত্রু ফল এবং পাতা চাঁছা পোকা (ফ্রুট এণ্ড লিফ স্মারিং বিটল)। এরা কচি ফল আর পাতার সবুজ অংশ খেয়ে নেয়। ফলে বাজারে কলার দাম ভীষণভাবে কমে যায়। দমন করার জন্য ম্যালাথিয়ন ৫ শতাংশ গুঁড়ো একর প্রতি ১২ কেজি হিসাবে পাতায় এবং কাঁদিতে ছড়িয়ে দিতে হবে। অথবা, সেভিন ৫০ শতাংশ জলে গোলা গুঁড়ো প্রতি লিটার জলে ২ গ্রাম হিসাবে মিশিয়ে স্প্রে করলেও এদের দমন করা যাবে।

মাজরা পোকা বেঁটে জাতের কলার চেয়ে চাঁপা, মর্তমান প্রভৃতি জাতে বেশী ক্ষতি করে। এই পোকা গাছের কাণ্ড এবং এঁটেতে নালি করে। মাটি থেকে ৬ ইঞ্চি উপরে গাছের ২৩ জায়গায় গর্ত করে আক্রমণের তীব্রতা অনুযায়ী ২৩টি সেলফস বড়ি গর্তে ঢুকিয়ে কাদা দিয়ে ঢেকে দিতে হবে।

কুমি রোগ (নিম্যাটোড) ভারতবর্ষের অগ্রাগ্র প্রদেশে কলার ফলন বেশ কমিয়ে দিয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে এ নিয়ে খুব একটা সমীক্ষা হয়নি। তবে, তেউড় বসানোর আগে দানাদার কীটনাশক গুণ্ডা ছড়িয়ে বসালে কুমি

বসুন্ধরা : আশ্বিন : ১৩৯২

রোগের আক্রমণের সম্ভাবনা কম থাকবে।

এ রোগের আক্রমণ হলে গাছের শেকড় ভাল বাড়ে না, শেকড় পচে যায়। ফলে সার, সেচ প্রভৃতি গাছ সম্পূর্ণভাবে ব্যবহার করতে পারে না এবং ফলন ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

ঝোড়ো হাওয়া কলাগাছের বেশ ক্ষতি করে। বেঁটে জাতের কলার চাষ করলে এর থেকে কিছুটা রেহাই পাওয়া যায়। বাঁশের খুঁটি ব্যবহার করেও ক্ষতির পরিমাণ কমানো সম্ভব। তাছাড়া লাগানোর সময়ের হেরফের করেও কিছুটা সফল পাওয়া যাবে।

কলার রোগ-পোকা সাধারণভাবে তেউড়ের এঁটের সঙ্গে যে মাটি ও শেকড় থাকে তার মাধ্যমে এক অঞ্চল থেকে অন্য অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। এভাবে যাতে রোগ-পোকা ছড়িয়ে না পড়ে সেদিকে সতর্ক থাকা বিশেষ প্রয়োজন। গুচ্ছমাথা, ঢলে পড়া আর কুমি রোগ এভাবেই এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় ছড়িয়ে পড়েছে। পাতায় দাগ পড়া রোগ যদিও এভাবে ছড়ায় না তবুও কলা চালান দেওয়ার জগ্জ পাতার ব্যবহার কমালেই ভাল হয়।

এজগ্জ কলার উৎপাদন বাড়াতে সুসংহত পরিকল্পনা নেওয়ার প্রয়োজন রয়েছে এবং সেগুলি হ'ল :

- ১) কলা চাষের জগ্জ জমি নির্বাচনের সময় দেখতে হবে যে, মাটিতে কাদার পরিমাণ (ক্রে) ৪০ শতাংশের বেশী না হয় এবং

মাটির নীচের জল কখনও ১ মিটারের উপরে না ওঠে।

- ২) চারা লাগানোর আগে জমিকে অবশ্যই আগাছামুক্ত করতে হবে। কেননা আগাছা থাকলে মাটি থেকে খাবার নিয়ে নেবে। এ ছাড়া চওড়া পাতার আগাছা থাকলে ভাইরাস এবং কুমি রোগের সম্ভাবনা বেশী থাকে।
- ৩) রোগমুক্ত সতেজ চারা অবশ্যই লাগাতে হবে।
- ৪) সব সময় লক্ষ্য রাখতে হবে যে বাগানে কোন রোগ লেগেছে কিনা বা গাছে কোন অস্বাভাবিকতা আছে কিনা।
- ৫) নিয়মিত আক্রান্ত গাছ অবশ্যই তুলে বা পুড়িয়ে ফেলতে হবে।
- ৬) পাতা শুকিয়ে গেলে তা কেটে ফেলতে হবে। তাহলে পাতায় দাগ ধরা রোগ হওয়ার সম্ভাবনা কম থাকবে।
- ৭) ফুলের যে অংশ কলার ডগায় লেগে থাকে তা ফেলে দিলে রোগের সম্ভাবনা কমে।
- ৮) সূর্যের তাপে যাতে কাঁদি নষ্ট না হয়— সেজগ্জ কাঁদি পাতা দিয়ে ঢেকে দেবেন।
- ৯) একবার লাগিয়ে প্রতি গর্ত থেকে একটি কাঁদি নিলেই ভাল হয়। তাই একটু যত্ন করে চাষ করলে কলা চাষে ভাল পয়সা পাওয়া সম্ভব।

মাঠে যেতে । গৌর দাশ

মাঠের রাস্তা ধরে হেঁটে যেতে বেশ লাগে
সেই কথা কাকে বলা যায় ?
তুমি ছাড়া নয় তাই বলছি তোমায় ।
যতদূর চোখ যায় পটে আঁকা ছবি যেন ।
ছোট বড় নানা গাছে পাখী ডাকে কাকে কেন !
কোথাও ঝোপের পাশে বুনো ফুল ফুটে আছে—
টেবিলে সাজানো ফুল মলিন যে তার কাছে ।
এই কথা কাকে বলা চলে ?
তুমি ছাড়া নয় তাই বলি কুতূহলে ।

যেসো পথে হেঁটে গেলে হৃদয় জুড়িয়ে যায় ;
বাতাস যে চুপি চুপি ছোঁয়া দেয় ঠাণ্ডায় ।
শাস্ত্র আকাশ দূরে ছুঁয়ে আছে মাটি-মাকে—
এ কথাটি বলি বলো কাকে ?
তোমাকেই বলা যায়, বলছি তোমাকে ॥

পশ্চিম দিনাজপুর জেলার হেমতাবাদ ব্লকের বিদিশোল গ্রামে সম্প্রতি একটি কৃষক দিবস পালিত হয়। সেখানে চাষ আবাদ এবং কৃষকদের নানা সমস্যা নিয়ে আলোচনা করা হয়। কৃষকরা এই সময় তাঁদের কিছু কিছু প্রশ্ন কৃষি প্রযুক্তিবিদদের কাছে তুলে ধরেন। উপস্থিত কৃষি প্রযুক্তিবিদরা সেইসব প্রশ্নের উত্তর দেন। এইসব প্রশ্নের কিছু কিছু এবং কৃষি প্রযুক্তিবিদদের দেয়া কিছু উত্তর এখানে দেওয়া হলো। এই আলোচনায় অংশগ্রহণ করেছিলেন অজিত চৌধুরী, এস,এম,এস, অলিক কুমার মণ্ডল, কৃষি উন্নয়ন আধিকারিক, কল্যাণ কুমার সেন, কৃষি উন্নয়ন আধিকারিক (তৈলবীজ) প্রভৃতি কৃষি প্রযুক্তিবিদ।

প্রশ্নোত্তর

প্রশ্নকারীর নাম	প্রশ্ন	উত্তর
শ্রী দীনেশচন্দ্র দেবশর্মা পিরোজপুর	সরষের ফুল আসার সময় ছোট ছোট পোকা দেখা যায়, প্রতিকারের উপায় কি?	এই পোকার নাম জাব পোকা। এর আক্রমণে তেলের ভাগ কমে যায়। প্রতিকারের উপায় : রোগর ৩০ ই,সি, ১ মিলি প্রতি লিটার জলে অথবা মেটাসিসটকস ২৫ ই,সি, ২ মিলি প্রতি লিটার জলে গুলে স্প্রে করতে হবে।
আবুল কহসাম আজাদ মালোন	গম ও কলাই বীজ সংরক্ষণের উপায় কি?	গম ও কলাইয়ের বীজ তোলার পর রসের ভাগ কমিয়ে ১১% ভাগে নিয়ে আসতে হবে। বীজ শুকিয়ে দাঁতে দিলে কট করে শব্দ হলেই বুঝতে হবে রসের ভাগ ঠিকমাত্রায় আছে। তার পরবীজ ছায়ায় ঠাণ্ডা করে বায়ু নিরোধক পাত্রে রাখলে ভাল থাকবে।



বসুন্ধরা : আশ্বিন : ১৩২২

শ্রী সদানন্দ সরকার বিদিশোল	(ক) আলুর কল বেরিয়ে যায় কেন ? (খ) আলু কাটলে ভিতরে কালো দাগ দেখা যায় কেন ?	অকুরোদগমের আবহাওয়া পেলে আলুর কল বেরিয়ে যাবে। রিংরট রোগবিহীন ভাল আলুর বীজ সংগ্রহ করতে হবে। আলুবীজ কেটে লাগালে প্রতিবার ভাল করে কাটার যন্ত্রকে পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেট বা স্পিরিট দিয়ে পরিষ্কার করে নিতে হবে যাতে রোগজীবাণু একটি কাটা আলু থেকে আর একটি কাটা আলুতে সংক্রামিত হতে না পারে।
শ্রী শচীন সরকার কুমড়াবাটা	আলুর কাটাই পোকা দমনের উপায় কি ? বেগুনের গোড়া পচা রোগের প্রতিকার কি ?	আলু লাগানোর সময় বিঘা প্রতি ৪ কেজি হারে অলড্রিন বা হেপ্টাক্লোর ৫%, ক্লোরডেন ৫%, শেষ চাষের সময় জমিতে দিতে হবে। ব্রাসিকল ৫ গ্রাম প্রতি লিটার জলে গুলে গাছের গোড়া ভিজিয়ে দিলে সুফল পাবেন।
শ্রী মহেশ্বর সরকার বিদিশোল	বেগুনের নলা পোকা দমনের উপায় কি ?	বেগুন চারা লাগানোর ২১ দিন পরে ফুরাডন- ৩ জি, ২ চামচ প্রতি গাছের গোড়ায় দিতে হবে। পরে দরকার হলে হুভাক্রণ-৪০, এক মি.লি, প্রতি লিটার জলে গুলে স্প্রে করতে হবে।
শ্রী দীপেন্দ্রনাথ বর্মণ বিদিশোল	কুমড়ো ছোট হলে পচে যাচ্ছে কেন ?	কুমড়োর ফুটফুটাই ছোট অবস্থায় কুঁড়িতে ডিম পাড়ে এবং কীড়াগুলি কুঁড়ি ফুটো করে পচিয়ে দেয়। প্রতিকারের উপায় সুমিথিয়ন বা সাইথিয়ন ২ মি.লি, প্রতি লিটার জলে গুলে স্প্রে করতে হবে।



গত চার বছর ধরে ১৬ই অক্টোবর দিনটি বিশ্ব খাদ্যদিবস হিসাবে পালিত হয়ে আসছে। এই দিনটি পালনের উদ্দেশ্য বিশ্বের খাদ্য সমস্যা কে সর্বসাধারণের কাছে তুলে ধরা এবং এই সমস্যা সমাধানের জন্য নতুন উদ্যম ও শপথ নেওয়া। পৃথিবীর প্রতিটি দেশেই এই দিনটি বিশেষ গুরুত্ব সহকারে পালিত হয়ে থাকে। এ রাজ্যেও বিভিন্ন জেলায় ও গ্রামে আলোচনা সভার আয়োজন করে এই দিনটি পালনের তাৎপর্য জনসাধারণকে বুঝিয়ে বলা হয়।

তবে একদিন আলোচনা সভার মাধ্যমে দিনটির তাৎপর্য বর্ণনা করেই আমাদের কাজ শেষ হবে না। এই দিনটি পালনের গুরুত্ব মনে রেখে আমাদের খাদ্য উৎপাদন প্রচেষ্টা বাড়িয়ে যেতে হবে যাতে খাদ্যাভাব দেশ থেকে দূর হয়।

ক্রমবর্ধমান লোকসংখ্যার খাদ্য চাহিদা মেটাবার জন্য প্রতি বছরই বেশী শস্য উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা ঠিক করা হয়। সেইমত কার্যসূচী নিয়ে

১৬ম বিশ্ব
খাদ্য দিবস
পালন



লক্ষ্যমাত্রা পূরণের চেষ্টা করা হয়। এই চেষ্টার ফলে খাওয়ার মোট উৎপাদন বাড়ানো সম্ভব হয়েছে। তবে উৎপাদন শুধু বাড়ালেই হবে না, সেইসঙ্গে উৎপাদিত শস্যের সদ্ব্যবহার এবং সুরক্ষার ব্যবস্থার উপরও নজর দিতে হবে। একটি সমীক্ষায় দেখা গেছে সময়মত ও সঠিক সংরক্ষণের অভাবে মোট উৎপাদিত শস্যের দশ শতাংশ প্রাতি বছর বিভিন্ন কারণে নষ্ট হয়ে যায়। সঞ্চিত শস্য যাতে নষ্ট না হয় সেজন্য যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া দরকার। যেমন ঘরে রাখা শস্য রোদে শুকিয়ে ঠাণ্ডা করে বাতাস না ঢোকে এরকম পাত্রে রাখা ও মাঝে মাঝে দেখা সেই শস্য কোন পোকা লেগেছে কিনা। পোকাকার আক্রমণ হলে তা দমন করার জন্ত উপযুক্ত ওষুধ ব্যবহার করা। শস্যরক্ষার জন্ত নানা রাসায়নিক ওষুধ বার হয়েছে। এগুলির ব্যবহার সযত্নেও যথেষ্ট সতর্ক হওয়া দরকার। ওষুধ ব্যবহারের সময় তাই খেয়াল রাখতে হবে যাতে তার পরিমাণ যেন উপযুক্ত মাত্রায় হয়। মাত্রা বেশী বা কম হলে ঠিক ফল পাওয়া যাবে না।

উপযুক্তভাবে খাদ্যশস্য সংরক্ষণ করে রাখা ছাড়া খাওয়ার যাতে অপচয় না হয় সেদিকেও আমাদের যথেষ্ট সচেতন হওয়া দরকার বলে মনে করি।

খাওয়ার উৎপাদন বাড়িয়ে, খাদ্য যথাযথভাবে

সংরক্ষণ করে ও খাওয়ার অপচয় বন্ধ করে দেশের খাদ্যভাব দূর করার যেমন চেষ্টা করতে হবে, সেইসঙ্গে দেশের মানুষের অর্থনৈতিক উন্নতির চিন্তাও করতে হবে। কৃষি ও শিল্পের যুগপৎ উন্নতির মাধ্যমে তা করা সম্ভব। তাই কৃষির উন্নতির সঙ্গে শিল্পের উন্নতির দিকেও আমাদের লক্ষ্য রাখতে হবে। শিল্পের জন্ত কৃষিজাত কাঁচামালের প্রয়োজন। খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শিল্পের প্রয়োজনীয় কাঁচামাল উৎপাদনের দিকেও নজর দিতে হবে।

বনজ দ্রব্য থেকে শিল্পের জন্ত প্রয়োজনীয় নানা জিনিস পাওয়া যায়। বনজ সম্পদ শুধু তাই বাড়ালেই হবে না, তা যাতে ধ্বংস না হয় সেদিকেও নজর দিতে হবে। বনভূমি বা বনজ সম্পদ শুধু শিল্পের নানা প্রয়োজনে লাগে তাই নয়, দেশকে খরা, অনাবৃষ্টি, বন্যা ও তার ফলে কৃষি বিপর্যয় থেকেও রক্ষা করতে সাহায্য করে। সেইসঙ্গে প্রাকৃতিক পরিবেশেরও সমতা রক্ষা করে।

সামাজিক বনস্বজন কার্যসূচীর মাধ্যমে নতুন নতুন বৃক্ষ রোপণের কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে এবং এই কাজ আরও এগিয়ে নিতে হবে। এই বিশ্ব খাদ্যদিবসে আমাদের শপথ থাকবে “ক্ষুধা থেকে মুক্তি” এবং গ্রামীণ জীবনের সর্বোচ্চ উন্নতি সাধন করা।

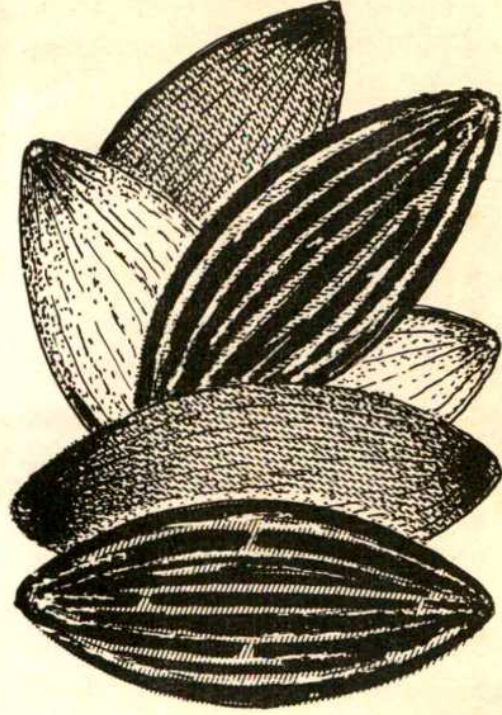
পটল একটি অভিজাত সবজি। ঠিকমত করতে পারলে এ চাষে অনেক পয়সা আসে। পটল কি করে চাষ করতে হয় এবং এ চাষে সমস্যা কি কি—তা না জানলে এ চাষে সফল লাভ হবে না।

অধিক ফলনশীল ধানের চাষ করে চাষীভাইরা বুঝতে পেরেছেন—চাষের খুঁটিনাটি ঠিকমত মেনে চললে যথেষ্ট ফলন পাওয়া যায়। একটু অবহেলায় হয়ত সব চাষটাই মার খেতে পারে। সব রকম চাষের ক্ষেত্রেই এ কথা খাটে।

নিজ্বাদের অজ্ঞতার ফলে কোন চাষে সাফল্য না এলে অনেক সময় সে চাষের সম্বন্ধে কুসংস্কার জন্ম নেয়। প্রচুর গবেষণার ফলে বিজ্ঞানীরা চাষের বহু সমস্যার সমাধান খুঁজে বের করেছেন। কিন্তু এই বৈজ্ঞানিক তথ্যগুলি চাষীদের কাছে ঠিকমত পৌঁছায়নি। তাই কুসংস্কার আজও নিজের শিকড় গেড়ে রয়েছে। মনের সংকীর্ণতার জগু আমাদের কাছে যুক্তি ও বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার চেয়ে অনেক সময় কুসংস্কারটাই গ্রহণযোগ্য মনে হয়। ধারাবাহিকভাবে বংশ পরম্পরায় কুসংস্কার চলে আসায় মনের এত গভীরে শিকড় গেড়েছে যে তাকে উপড়ে ফেলা সহজ নয়।

পটলকে ঘিরেও কিছু কুসংস্কারের জন্ম হয়েছে। পটল চাষ করলে পটল তুলতে (মরতে) হবে এ ধারণা শুধু গ্রাম্য চাষীভাইদেরই নয়, বহু শিক্ষিত লোকেরও। পটল চাষের সঙ্গে মৃত্যুর কি সম্পর্ক—এটা তলিয়ে দেখার মানসিকতা অনেকেরই নেই।

পটলের সুস্বাদু তরকারী প্রমাণ করে যে এর কোন বিষক্রিয়া নেই, বরং পাতা, ডাঁটা ও ফলের অধ্যাপক, বিধানচন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, কল্যাণী।



ডঃ রাধাগোবিন্দ মাইতি

পটলের চাষ

অনেক ভেষজ গুণ আছে। পটলের গাছে বিছুটির মত জ্বালাও নেই। তবে পটল চাষ করলে লোকে পটল তুলবে কেন? কিন্তু বুদ্ধি দিয়ে যেমন ভূতের ভয় জয় করা যায় না, তেমনি কুসংস্কারকে জয় করা যায় না যুক্তি দিয়ে!

পটল চাষে মানুষের ব্যর্থতাই এই কুসংস্কারের জন্মদাতা। বেগুন, লঙ্কা বা সীম লাগালেই প্রচুর ফলে। অথচ পটল লাগালে কোথাও ফলে, কোথাও ফলে না। আগেকার মানুষ এর কোন স্মৃষ্টি কারণ খুঁজে পাননি।

অধিকাংশ গাছে ফল ধরে ফুলের গর্ভমুণ্ডে পরাগ সঞ্চারিত হয়ে গর্ভকোষের ডিম্ব নিষিক্ত হলে। এ ব্যাপারে মানুষ বা অন্যান্য জীবজন্তুর সঙ্গে গাছের প্রভেদ নেই। অধিকাংশ প্রজাতির গাছে একই ফুলে থাকে গর্ভমুণ্ড (গর্ভকেশর বললেই ঠিক হয়) ও পরাগ। তাই পরাগ-মিলন ঘটে সহজে; তার থেকে জন্ম নেয় ফল। লাউ, কুমড়া, ঝিঙ্গে প্রভৃতির একই গাছে ছ'রকম ফুল হয়; পুরুষ ফুলে থাকে পরাগ আর স্ত্রী ফুলে থাকে গর্ভকেশর। মৌমাছি, প্রজাপতি বা অম্ম পতঙ্গ যখন মধু খেতে ফুলে ফুলে উড়ে বেড়ায় তখন তাদের গায়ে-পায়ে লেগে পুং ফুলের পরাগ স্ত্রী ফুলে চলে যায়। ফল ধরে। লাউ কুমড়ার স্ত্রী ফুল ফোটার আগেই একটা কাগজের চৌকি দিয়ে ভাল করে ঢেকে দিন, যেন তার ভিতরে কোন কীট-পতঙ্গ যেতে না পারে। দেখবেন, পরাগ-মিলনের অভাবে ফল ধরেনি।

অনেক প্রজাতি আছে যেখানে পুরো গাছটাই স্ত্রী কিংবা পুরুষ। সারা গাছে কেবল একরকম ফুলই ফোটে। এ ক্ষেত্রে ছ'রকমের দুটি গাছ পাশাপাশি না থাকলে ফল ধরবে না।

পটল এ ধরনের গাছ। বাগানে লাগানোর জন্য স্বভাবতঃই যে গাছে ফল ধরেছে সেই গাছ থেকেই চারা সংগ্রহ করা হয়। ফলে বাগানে কেবল স্ত্রী গাছই জন্মায়।

এদিকে নতুন বাগানে যত্ন-আত্তি পেয়ে গাছ বাড়ে খুব, ফুলও ধরে প্রচুর। কিন্তু পুরুষ গাছ না থাকায় পরাগ-মিলনের অভাবে সে ফুল ফলে পরিণতি লাভ করে না।

যুগ যুগ ধরে পটল চাষে মানুষের এই অকৃতকার্যতার ফলে জন্ম নিয়েছে কুসংস্কার। গবেষণার ফলে বৈজ্ঞানিকরা জানতে পেরেছেন যে ঠিকমত পটল পেতে হলে পটল ক্ষেতে দশটা গাছের মধ্যে একটা পুরুষ গাছ থাকা প্রয়োজন।

পটলের পুরুষ গাছে ফল ধরে না; তার শক্তিকম্ব হয় কম। তাই পুরুষ গাছ স্ত্রী গাছের চেয়ে অনেক জোরে বাড়ে এবং কিছুদিনের ভিতর স্ত্রী লতাকে ঢেকে মেরে ফেলতে থাকে। শেষে এমন অবস্থা হয় যে জমিতে স্ত্রী গাছ অবশিষ্ট থাকে না। এ ব্যাপার চাষীভাই টের পান না; তিনি ভাবেন—তার ভাগ্য খারাপ। তাই প্রথমেই দিকে ভাল পটল ধরলেও শেষের দিকে ফলছে না। কেউ ভাবেন তাঁর ফলন্ত গাছ-গুলোই ভাগ্যদোষে নিফলা গাছে রূপান্তরিত।

অনেকে পটলের স্ত্রী ও পুরুষ গাছ চেনেন এবং দেখেন যে পুরুষ গাছে ফল ধরে না। পরাগ-মিলনের ব্যাপারে পুরুষ গাছের ভূমিকা জানা না থাকায় তাঁরা এই গাছগুলো উপড়ে নষ্ট করে দেন। অনেক সময় দূর দূর থেকে পরাগ এনে মৌমাছি পরাগ-মিলন ঘটায়; তাই তাঁদের গাছে ফল ধরে। ফলে পুরুষ গাছের ভূমিকা তাঁরা স্বীকার করতে চান না।

বহুস্করা : আশ্বিন : ১৩২২

কীট পতঙ্গের গতিবিধির উপর ফল ধরা নির্ভর করে বলে খারাপ আবহাওয়ায় যখন তারা বের হতে পারে না, তখন পরাগ-মিলনের অভাবে ফল ধরে না। বৃষ্টিতে পরাগ ধুয়ে যাওয়াও ফল না ধরার আর এক কারণ। চাষীতাইরা ভাবেন ঝড়-বৃষ্টি হলে ফল ধরে না। পরাগ-সংযোগের ব্যাপারটা তাঁদের অজানা থেকে যায়। ফল ধরার ব্যাপারটা তাঁরা ভাবেন দৈবী অনুগ্রহ। তাঁরা পবিত্রতার উপর জোর দেন, গাছে গঙ্গা-জল ছড়ান, ওষার জলপড়া দেন। অনেকের মনে কুসংস্কার আছে যে মেয়েরা পটলের ক্ষেতে গেলে, বিশেষতঃ তাঁদের শারীরিক অশুচি অবস্থার কয়েকদিন; গাছে ফল ধরে না। আমাদের পুরুষ শাসিত সমাজে সব কিছুই জন্তুই মেয়েদের ঘাড়ে দোষ চাপে!

জলবায়ু ও মাটি

পশ্চিমবঙ্গের সমভূমিতে ভাল পটল ফলতে পারে। বর্ধমান, নদীয়া ও উত্তর চব্বিশ পরগণায় তো প্রচুর পটল হয়। সমুদ্রপৃষ্ঠের সমান জমি থেকে এক হাজার ফুট উচ্চতা পর্যন্ত জমি পটল চাষের উপযোগী। শীতকালে পাতা শুকিয়ে গাছ কাহিল হয়ে যায়। তখন ফুল ফল ধরে না, গাছ বাড়ে না; বরং কচি লতাগুলি শুকিয়ে যায়। গরম পড়তে শুরু করলে গাছ ডালপালা মেলে ধরে। অধিক খরাতে সেচের ব্যবস্থা না থাকলে গাছের ক্ষতি হয়।

যে জমিতে সারাদিন রোদ লাগে না বা বৃষ্টির জল দাঁড়ায়, তাতে পটল হবে না। পটলের জন্তু মাটি হওয়া চাই দোআঁশ বা বেলেদোআঁশ। চারা তৈরী

পটলের পুরানো মূল মাটির ভিতর অনেকটা

মূলোর মত মোটা হয়। এই মূল থেকে চারা করা হয়। মোটা লতাও লাগানো চলে। অভাবে বীজও চলতে পারে। মূল বা লতা থেকে চারা তৈরী করতে হলে শতকরা নব্বইটি নিতে হবে স্ত্রী গাছ থেকে এবং দশটি পুরুষ গাছ থেকে। বীজ থেকে চারা করলে প্রায় অর্ধেক গাছ পুরুষ হয়। তাই প্রথমে বেশী সংখ্যায় বীজ লাগানো উচিত; পরে ফুল ধরলে শতকরা দশটি রেখে বাকী পুরুষ গাছগুলি তুলে ফেলা উচিত।

পটলের চারা যেন রোগমুক্ত হয়। সাধারণতঃ বর্ধমানের চারা ভাল ফলন দেয়। বর্ধমান থেকে শান্তিনিকেতন যাওয়ার পথে গুসকরা স্টেশন। এর কাছাকাছি গ্রামগুলিতে ভাল পটলের মূল কিনতে পাওয়া যায়।

জমি তৈরী

বিষাপ্রতি তিন টন গোবর সার বা কম্পাষ্ট সার মিশিয়ে লাঙল দিয়ে চার-পাঁচবার চাষ দিয়ে মাটি খুরঝুরে করে নিতে হবে। জমিতে যেন ঘাস না থাকে। গোবর সারে মিতব্যয়িতা পটল চাষে প্রথম ভুল। শুধু গোবর সার নয়, এই সঙ্গে আর যেসব সার প্রয়োগের কথা এ প্রবন্ধে বলা হয়েছে সেগুলিও ঠিক সময়ে উপযুক্ত মাত্রায় দিলে তবেই ভাল ফলন হবে, নচেৎ নয়।

অনেকে মনে করেন রাসায়নিক সার দিয়ে খোল বা গোবর সারের অভাব পূরণ করবেন। এ চেষ্টা দুধের স্বাদ ঘোলে মেটানোর মত। সুফলের চেয়ে কুফলই বেশী হয় এতে। রাসায়নিক সার যেন ভিটামিনের বড়ি। নিয়মিত আহাৰ করার পরও দুর্বলতা থাকলে তবেই এই বড়ি খেতে ডাক্তাররা সুপারিশ করেন; কিন্তু শুধু ভিটামিন বড়ি খেয়ে বাঁচা যায় না। গোবর সার,

খোল, হাড়ের গুঁড়ো, কম্পোষ্ট—এগুলো হ'ল গাছের প্রধান খাবার। এতে ঠিকমত কাজ না হলে তবেই রাসায়নিক সার প্রয়োগ করতে হবে।

অনেক সময় যথেষ্ট জৈব সার পাওয়া না গেলে সেই অভাব পূরণের জগ্গ রাসায়নিক সার প্রয়োগ করা হয়। কিন্তু এ ব্যাপারে উপযুক্ত শিক্ষা ও সাবধানতা প্রয়োজন। যেসব ফসল তৈরী হতে চার-পাঁচ মাস বা তার কম সময় নেয়, তাদের ক্ষেত্রে সাধারণভাবে রাসায়নিক সারের প্রয়োগ উপযোগী হলেও পটলের মত দীর্ঘমেয়াদী ফসলে এ সার যত কম ব্যবহার করা যায় ততই ভাল।

জমি তৈরী হয়ে গেলে চারা লাগানোর জগ্গ পাঁচ ফুট দূরে দূরে এক ফুট গভীর ও এক ফুট চওড়া গর্ত খুঁড়ে প্রতি গর্তের মাটির সঙ্গে ১০০ গ্রাম খোল, ৫০ গ্রাম হাড়ের গুঁড়ো এবং দু' মুঠো কাঠি বা ঘাস-পাতা পোড়ানো ছাই মিশিয়ে গর্ত ভরাট করে কাঠি পুঁতে জায়গাগুলো চিহ্নিত করে রাখতে হবে। গর্ত তৈরী করে তাতে সার দেওয়ার কাজ শেষ করতে হবে চারা বসানোর একমাস আগে। সার দেওয়া গর্তে এর চেয়ে তাড়াতাড়ি চারা লাগালে সেগুলি মরে যেতে পারে। আশ্বিন মাস থেকে আরম্ভ করে যতদিন না শীত পড়ে ততদিন পর্যন্ত পটলের চারা বসানো যায়।

চারা লাগানো

প্রতি গর্তে দুটো করে মূল বসালে ভাল হয়; যদি একটা মরেও যায় অণুটা থেকে চারা গজাবে। মোটা লতা ব্যবহার করলে তার দৈর্ঘ্য হবে অন্ততঃ এক হাত এবং দু' মাথায় দুটো এবং মাঝে অন্ততঃ আর একটা গাঁট থাকবে।

গোড়ার দিকটা গোল করে পাকিয়ে তিন ইঞ্চি মাটির নীচে লাগিয়ে কেবল তিন-চার ইঞ্চি মাথার দিকটা মাটির বাইরে বের করে রাখতে হবে।

মূল ব্যবহার করলে তা এমনভাবে মাটির নীচে খাড়াভাবে পুঁতে হবে যেন মূলের মাথাটা জমির এক ইঞ্চি গভীরতার মধ্যেই থাকে। মাটিতে যথেষ্ট রস না থাকলে এবং তিন-চার দিনের ভিতর বৃষ্টি না হলে জল দিতে হবে। তারপর আধপচা খড় বা কচুরিপানা দিয়ে জমি ভাল করে ঢেকে দিতে হবে। এতে জমি সরস থাকবে এবং চারা সহজে গজানোর পরিবেশ সৃষ্টি হবে; উই বা পিপড়ের উপজীবের ভয় থাকলে লাগানোর সময় প্রতি গর্তে আধ চা-চামচ ১০ শতাংশ শক্তিবিশিষ্ট বি. এইচ. সি. মিশিয়ে নেওয়া ভাল। একবিঘা জমির জগ্গ ছ'-সাত কিলোগ্রাম মূল লাগে।

গজানোর পর শীতকালে লতা খুব ধীরে ধীরে বাড়ে। এই সময় সারা জমিতে পুরু করে খড় বা কচুরিপানা বিছিয়ে দিতে হবে। ফলে জমিতে ঘাস কম হবে, মাটি সরস থাকবে, মাটিতে লেগে ফল নোংরা হবে না এবং ঐগুলি পচে গেলে মাটিতে জৈব সারের পরিমাণ বাড়বে। মাটির উপর দিয়ে চলার সময় লতার গাঁট থেকে শিকড় গজায়। এই রকম লতা তেজী হয় বটে কিন্তু তাতে ফুল ফল ধরে কম। খড় বা পানার উপর দিয়ে লতা ছড়ালে তাতে শিকড় গজাতে পারে না; ফলে সেগুলি অধিক ফলবতী হয়।

প্রত্যেক দু' সার গাছের পর দু' ফুট করে চওড়া এবং দু' ইঞ্চি করে গভীর নালা কেটে দিতে হবে। চারা বসানোর আগেই এ কাজটা করতে পারলে ভাল। এই নালা জমির ঢাল

বসুন্ধরা : আশ্বিন : ১৩২২

বরাবর হবে জল নিকাশের জন্ত।

ফসল ও ফলন

শীতের শেষে তাপ বাড়তে থাকলে লতা তাড়াতাড়ি বাড়ে এবং ফুল ধরে। আশ্বিনে লাগানো চারা ফাল্গুন থেকে ফল দিতে শুরু করে। তখন বাজারে পটলের দাম বেশ চড়া। তাই তাড়াতাড়ি ফসল তুলতে পারলে ভাল পয়সা পাওয়া যায়। এক বিঘা জমি থেকে প্রথম বছর ফলন পাওয়া যায় ১০০০ থেকে ১৩০০ কিলোগ্রাম; দ্বিতীয় বছরে এর দ্বিগুণ। তৃতীয় বছরে গাছ নষ্ট করে দিন।

যত্ন-পরিচর্যা

প্রতি লিটার জলে ১০ গ্রাম ইউরিয়া, আড়াই গ্রাম ট্রেসেল-২ এবং আড়াই গ্রাম ডাইথেন এম-৪৫ মিশিয়ে মাসে একবার ফসলের উপর স্প্রে করলে গাছ বাড়ে ভাল, ফলে বেশী এবং রোগের আক্রমণ থেকে মুক্ত থাকে।

অনেক সময় সকালবেলা জমিতে গেলে দেখা যাবে যে কচি পটলের গায়ে পঁপের মত সাদা আঠা জমে আছে। কয়েকদিন পরে ফলগুলি হলদে হয়ে মরে যায়। ফল ভেঙ্গে দেখলে ভিতরে কুমির মত অনেক পোকা দেখা যায়। এক ধরনের ছোট মাছি ফলে হল ফুটিয়ে ডিম পেড়ে এই ক্ষতি করে।

এ সমস্যার মোকাবিলা করতে কখনও জমিতে কীটনাশক ওষুধ ছড়াবেন না; তাহলে ফলের গায়ে বিষ লেগে যাবে এবং যারা এই

পটল খাবে তারা অসুস্থ হয়ে পড়বে। তাছাড়া বিষাক্ত ওষুধের জন্ত জমিতে পরাগমিলনকারী পতঙ্গ আসবে না; অথবা এলে মরে যাবে। ফলে পটলও ধরবে না।

এই ফলের মাছির আক্রমণ ঠেকাতে হলে আধ লিটার তাড়ির সঙ্গে আধ কিলোগ্রাম গুড় এবং দু গ্রাম সেভিন বা দু মিলিলিটার ম্যালাথিয়ন ওষুধ মিশিয়ে ছোট ছোট মাটির খুরি অথবা চায়ের ভাঁড়ে করে দশ ফুট দূরে দূরে সারা জমিতে পাতার নীচে বসিয়ে দিন। তাড়ির গন্ধে ও গুড়ের লোভে ফলের মাছি এসে এই মিশ্রণ খাবে এবং কীটনাশকের বিষক্রিয়ায় মারা যাবে।

পটলের জমিতে সেচের বিশেষ প্রয়োজন হয় না। বীজ শক্ত করে কখনও পটল তুলবেন না। এতে ফলের ওজন বাড়ে বটে কিন্তু মোট উৎপাদন কমে যায়। তবে যে অঞ্চলে বাজারে বীজওয়ালা পটলের চাহিদা বেশী, সেখানে বাধ্য হয়ে বীজ শক্ত হওয়া পর্যন্ত ফসল গাছে রাখতে হবে।

একই জমিতে দু' বছরের বেশী ফসল রাখা উচিত নয়। রাখলে ফলন কমে যায়, রোগ-পোকার উপদ্রব বাড়ে। প্রতিবারে নতুন ফসল লাগানোর সময় বর্ধমানের চারা আনা ভাল। এসব চারা আনার খরচ ও হাঙ্গামা পুষিয়েও পটলের বেশী উৎপাদনের ফলে উপরি-লাভ ভাল থাকবে।

পার্বত্য ডিওরাঙালে বড় এলাচ একটি অর্থকরী ফসল

—হীরেন্দ্র চন্দ্র সেনগুপ্ত

গত কয়েক শতাব্দী ধরে ভারতবর্ষ মসলার জন্মভূমি হিসাবে পরিচিত। সমস্ত মসলার মধ্যে এলাচকে মসলার রাণী হিসাবে গণ্য করা হয়। এলাচ পৃথিবীর সমস্ত জায়গায় তার গন্ধ এবং স্বাদের জগ্ন পরিচিত। এর ব্যবহার সর্বব্যাপী।

ভারতে ছ'রকম এলাচের চাষ হয়, যথা বড় এলাচ ও ছোট এলাচ। এই ছটি এলাচই সারা পৃথিবীতে সমাদৃত। ছোট এলাচ সাধারণতঃ চাষ হয়ে থাকে পশ্চিম ঘাট অঞ্চলে, অর্থাৎ কর্ণাটক, কেরালা এবং তামিলনাড়ুতে। বড় এলাচের চাষ হয়ে থাকে সিকিম রাজ্যে, পশ্চিমবঙ্গের দার্জিলিং জেলার পার্বত্য অঞ্চলে



কৃষি উন্নয়ন আধিকারিক (ফার্ম),
কালিংপং আঞ্চলিক উপযোগী গবেষণা কেন্দ্র।

বস্তুকরা : আশ্বিন : ১৩৯২

এবং আসামে। সিকিম রাজ্যে বড় এলাচের চাষ সবচেয়ে বেশী হয়ে থাকে। তারপরেই পশ্চিম-বঙ্গের দার্জিলিং জেলায়। সিকিমের ২২ (বাইশ) হাজার হেক্টর জমির মধ্যে ১৭ হাজার হেক্টর জমিতে বড় এলাচের চাষ হয়ে থাকে এবং দার্জিলিং জেলার ২২০০ (দু হাজার দুশো) হেক্টর জমিতে বড় এলাচের চাষ হয়। সিকিমের বাৎসরিক উৎপাদন প্রায় তিন হাজার থেকে সাড়ে তিন হাজার মেট্রিক টন এবং দার্জিলিং জেলার মোট উৎপাদন প্রায় ৪০০ থেকে ৫০০ মেট্রিক টন।

বড় এলাচ গাছ ও তার প্রকৃতি

বড় এলাচের বৈজ্ঞানিক নাম 'এমোমাম সাবুলেটাম' (Amomum sabulatum) এবং যেটা জিঞ্জিবারিসি পরিবারভুক্ত। মোটা-মুটিভাবে বৈজ্ঞানিকরা এটাই ধরে নিয়েছেন যে বড় এলাচের জন্মস্থান সিকিম রাজ্যে এবং কালক্রমে তা সম্প্রসারিত হয়েছে পশ্চিমবঙ্গের দার্জিলিং, আসাম, পূর্ব নেপাল এবং ভূটানে।

বড় এলাচ একটি বর্ষজীবী গাছ এবং এর ভূনিম্নস্থ কাণ্ড থেকে ভূমির উপরে গাছ বার হয়। গাছের পাতার এবং কাণ্ডের রঙ সবুজ থেকে কালচে লাল রঙের হয়। এই কাণ্ডের নীচ থেকে ফুল বার হয়। ফল সাধারণতঃ কালচে লাল রঙের, ত্রিকোণাকৃতি এবং বীচি বাদামী রঙের হয়।

জাত

সাধারণতঃ তিন জাতের বড় এলাচের চাষ হয়ে থাকে (১) রামসাই (২) গোলসে (৩) সাউনে। এদের অনেক উপজাতও আছে, যেমন (ক) রামনগ (খ) রামলা (গ) মধুসাই

(ঘ) মঙনে, এদের তফাত করা যায় এদের চরিত্র থেকে।

রামসে : রামসে একটি ভূটিয়া শব্দ যার অর্থ হলুদ রঙ। এই জাতের এলাচ খুব উচুতে চাষ করা হয়ে থাকে। নিম্ন উচ্চতায় চাষ করলে এর ফুরকি এবং চিরকি রোগে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা বেশী থাকে। এই জাতের ফুলের রঙ হলুদ, আকারে ছোট এবং সংখ্যায় বেশী। উপযুক্ত ফুল আসার সময় মে মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহ। এই জাতের ফলের আকার ছোট এবং ভিতরের বীজ কম। ফলের রঙ কালচে লাল।

গোলসে : গোলসে কথাটি ভূটিয়া এবং হিন্দির মিশ্রিত শব্দ। যার অর্থ গোল এবং হলুদ। এই জাতের বড় এলাচ নিম্ন উচ্চতায় চাষ হয়ে থাকে। পর্ণাশু ফুল আসার সময় মে মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহ। ফুলগুলি বড় এবং উজ্জল হলুদ রঙের। ফলগুলি ডিম্বাকৃতি এবং বড়। এই জাতের গাছে প্রচুর ফুল আসে। ফলগুলি খুব ভালো হয়। এবং এর খোসা পাতলা। এর একটি উপজাত আছে যা স্বেত গোলসে অর্থাৎ সাদা ও গোল হিসাবে পরিচিত।

সাউনসে : সাউনসে একটি নেপালী শব্দ। এটি শ্রাবণ মাসে অর্থাৎ আগষ্ট মাসে কাটা হয়। এই জাতটি রামসের মত। অল্প উচ্চতায় চাষ করলে এই জাতের ভাইরাস রোগে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা। মে মাসের প্রথম দিকে এই জাতের গাছে ফুল আসে। ফল খুব ভালো হয় এবং বীজের সংখ্যাও বেশী থাকে। কাঁচা ফলের রঙ কিছু হালকা লাল।

চাষ পদ্ধতি

আবহাওয়া : পার্বত্য হিমালয় অঞ্চলে বড় এলাচের চাষ সাধারণত: ১৫০০ থেকে ৩৫০০ মিলিমিটার বৃষ্টিপাত এবং ৬° থেকে ৩৩° সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় ও সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ৬০০ থেকে ২০০০ মিটার উচ্চতায় হয়ে থাকে। তুষারপাত এবং শিলাবৃষ্টি বড় এলাচের পক্ষে ক্ষতিকারক।

মাটি : বড় এলাচ সাধারণত: বনজ, দো-আঁশ মাটিতে চাষ হয়ে থাকে। এই মাটি সাধারণত: অম্ল এবং জৈব সারে এবং নাইট্রোজেনে সমৃদ্ধ। বড় এলাচ গাছের গোড়ায় জল দাঁড়ানো সহ্য করতে পারে না। মাটিতে দ্রুত জল নিকাশের ব্যবস্থা থাকা গাছের বৃদ্ধির পক্ষে সহায়ক।

বীজতলা তৈরি

বড় এলাচের চাষ সাধারণত: বীজ এবং ভূনিম্নস্থ কাণ্ড থেকে হয়ে থাকে। এই ভূনিম্নস্থ কাণ্ড প্রথমে একটি বীজ আড়ায় লাগানো হয়, তারপর নির্দিষ্ট জমিতে রোপণ করা হয়। এতে গাছের ছাত এবং ফলনের কোন পরিবর্তন হয় না। পর্যায়ক্রমে ভূনিম্নস্থ অংশ থেকে গাছ তৈরী করলে গাছের বৃদ্ধি ও ফলন কমে যায়। সুতরাং পর্যায়ক্রমে চাষ না করাই ভালো।

অন্য প্রণালীতে বীজ থেকে গাছ তৈরী করে গাছ লাগানো যেতে পারে। এই প্রণালীতে বীজ সম্পূর্ণ পাকা ফল থেকে সংগ্রহ করতে হবে। এরপর ২ থেকে ৩ দিন কাঠের ছাই মিশিয়ে ছায়াতে শুকিয়ে নিতে হবে। এতে সাধারণত: ৩০ থেকে ৫০ ভাগ গাছ পাওয়া যায়। বীজের অক্সুরোদগম ক্ষমতা বাড়ানোর জন্মে

২ মিনিট সালফিউরিক অ্যাসিডে অথবা ১০ মিনিট কনসেনট্রেটেড নাইট্রিক অ্যাসিডে ভিজিয়ে রাখলে অক্সুরোদগম ক্ষমতা বাড়ে। এলাচের গাছ সাধারণত: দুই পর্যায়ে লাগানো হয়। প্রথম পর্যায়ে বীজ আড়ায় লাগানো হয় তারপর নির্দিষ্ট জমিতে প্রচুর পরিমাণে জৈব সার দিয়ে ১০ সেমি অন্তর গাছ থেকে গাছ এবং ১৫ সেমি লাইনে লাগানো হয়ে থাকে। বীজ-তলায় চারাগাছকে সূর্যালোক থেকে রক্ষা করবার জন্মে খড়ের ছাউনি দেওয়া হয়, এবং মাটিতে যাতে জলীয় ভাব রাখা যায় তারজন্মে খড় এবং শুকনো পাতা দিয়ে মাটিকে ঢেকে দেওয়া হয়।

রোপণ : জুন জুলাই মাসে ১ বছর বয়সের গাছ রোপণ করার উৎকৃষ্ট সময়। জমির অবস্থান অনুযায়ী এই গাছ সাধারণত: ঢালু জমিতে লাগানো হয়। মাঝারি ঢালু জমিতেও তা লাগানো যেতে পারে। এই গাছ সাধারণত: আঙতা বা ছায়ায় খুব ভালো হয়। চারা ৯০ সেমি X ৯০ সেমি ও ১৫০ সেমি X ১৫০ সেমি, দূরত্বে লাগানো হয়ে থাকে। রাসমে এবং সোয়ানসের ক্ষেত্রে ১৫০ সেমি X ১৫০ সেমি দূরত্বে ভালো হয়। গোলসের ক্ষেত্রে ৯০ সেমি X ১২০ সেমি দূরত্বে লাগানো হয়ে থাকে।

এপ্রিল মে মাসে নির্দিষ্ট জমিতে ৩০ সেমি X ৩০ সেমি X ৩০ সেমি মাপে গর্ত খোঁড়া হয় এবং সেই গর্ত গোবর সার, পচা পাতার সার এবং ১০০ গ্রাম রক ফসফেট দিয়ে পূর্ণ করে জুলাই আগষ্ট মাসে লাগানো হয়ে থাকে। খুব বেশী বৃষ্টিতে গাছ না লাগানোই ভালো। লাগানোর পর গর্তগুলি শুকনো পাতা দিয়ে

বনুজ্জরা : আশ্বিন : ১৩৯২

ভরে দেওয়া হয় যাতে গাছের গোড়ায় জলের অভাব না হয়। রাসায়নিক সারের ব্যবহার এলাচে বড় একটা করা হয় না।

আগাছা দমন

আগাছার প্রাচুর্য্য অমুযায়ী আগাছা দমন করা হয়ে থাকে। সাধারণতঃ প্রথম আগাছা দমন করা হয় ফেব্রুয়ারী-মার্চ মাসে এবং দ্বিতীয় আগাছা দমন করা হয় মে-জুন মাসে। অক্টোবর মাসে এলাচ তোলার আগে এলাচের শুকনো পাতা এবং অমুৎপাদক গাছ তুলে ফেলা হয়।

এলাচ সংরক্ষণ

এলাচে সাধারণতঃ খুব কম পোকাকার আক্রমণ দেখা যায়। যেসব পোকা খুব ক্ষতিকারক নয়, এদের মধ্যে (১) শুঁয়োপোকা (২) কাণ্ড ছিঁড়কারী পোকা। এদের ০.১% থায়োডিন দিয়ে বা লুভাক্রন ০.১% দিয়ে দমন করা যায়।

রোগ

এলাচে সাধারণতঃ দু'টি ভাইরাস ঘটিত রোগ দেখা যায়। যারা এলাচের ভীষণভাবে ক্ষতি করে। এই রোগ দুটি সাধারণতঃ জাব পোকা বাহিত, (১) এলাচের ফুড়কি রোগ (২) মোজাইক বা চিড়কে রোগ।

ফুড়কি রোগ : এই রোগের আক্রমণ হলে বেঁটে বেঁটে অমুৎপাদক গাছ হয় যাদের রঙ ফ্যাকাশে হলুদ এবং সেই গাছে ফুল হয় না।

গাছের ভূনিম্নস্থ কাণ্ডও মরে যায়।

চিড়কে রোগ : এই রোগে গাছের পাতার মধ্যাংশে মধ্যশিরার সমান্তরাল হালকা সবুজ রঙের মোজাইকের মত দাগ দেখা যায়।

রোগ প্রতিরোধ

(১) এই রোগে আক্রান্ত হলে সাধারণতঃ সেই এলাচ ঝাড়কে বিনষ্ট করা উচিত।

(২) জাব পোকাকার আক্রমণ থেকে প্রতি-রোধের জন্য গাছে রোগার ডেমিক্রন শতকরা ১ শতাংশ হিসাবে প্রয়োগ করা হয়।

(৩) যে সমস্ত গাছে জাব পোকাকার আক্রমণ হয়েছে সেগুলো ধ্বংস করা উচিত।

(৪) রোগাক্রান্ত জমির বীজ বা গাছের গেঁড় নতুন গাছ লাগানোর জন্য কখনই ব্যবহার করা উচিত নয়। এছাড়া গাছে যদি গাছ পচা রোগ, পাতায় দাগ ধরা রোগ হয়ে থাকে তাহলে শতকরা ১ ভাগ বোর্দো মিশ্রণ বা ব্লাইটস ৫০ বা ব্রাসিকল (৩ গ্রাম প্রতি লিটার জলে) প্রয়োগ করে প্রতিরোধ করা সম্ভব।

ফসল কাটা

এলাচের ফুল আসে সাধারণতঃ মে থেকে আগষ্ট মাসের মধ্যে এবং কাটা হয় সাধারণতঃ সেপ্টেম্বর থেকে ডিসেম্বর মাসের মধ্যে। তারপর উন্নত প্রণায় শুকিয়ে বাজারে বিক্রির জন্য পাঠানো হয়।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

কার্ডামাম্ বোর্ড

বাণিজ্য মন্ত্রক

কেন্দ্রীয় সরকার

পশ্চিমবঙ্গ ডাল উৎপাদনে ঘাটতি রাজ্য।
বর্তমানে বার্ষিক চাহিদা আনুমানিক ৭৫ লক্ষ
টন। কিন্তু স্বাভাবিক উৎপাদন তিন লক্ষ
টনেরও কম।

চাহিদা এবং উৎপাদনের মধ্যে ব্যবধান যতটা
সম্ভব কমিয়ে আনার জন্ত এ বছর অর্থাৎ
১৯৮৫-৮৬ সালে ডাল উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা
ধরা হয়েছে পাঁচ লক্ষ হেক্টরে তিন লক্ষ টন।
এই তিন লক্ষ টন ডাল উৎপাদন হবে খরিফ ও
রবি মরসুমে। বিভিন্ন ডালের জন্ত যে লক্ষ্যমাত্রা
ধরা হয়েছে তা নীচে বলা হলো :

পশ্চিমবঙ্গে ১৯৮৫-৮৬ সালে ডাল উৎপাদন বৃদ্ধির কার্যসূচী

খরিফ	এলাকা হাজার হেক্টরে	উৎপাদন হাজার টনে
কলাই	৪০'০০	২২'৪০
মুগ	৫'০০	২'৫০
অড়হর	৩০'০০	৩০'০০
অচ্চাচ্চ	১০'০০	৫'১০
	৮৫'০০	৬০'০০
রবি		
মুগুর	৯০'০০	৪৫'০০
ছোলা	৯০'০০	৬৩'০০
কলাই	১০০'০০	৫০'০০
মুগ	৪৫'০০	২২'০০
অচ্চাচ্চ	৯০'০০	৬০'০০
	৪১৫'০০	২৪০'০০
মোট—	৫০০'০০	৩০০'০০

বসুন্ধরা : আশ্বিন : ১৩৯২

১৯৮৫-৮৬ সালে ডালের উৎপাদন তিন লক্ষ টন করার লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে এবং তা প্রতি জেলায় ছুভাবে করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

১। বৃষ্টিনির্ভর অঞ্চলে, ২। সেচপ্রাপ্ত এলাকায়।

১) বৃষ্টিনির্ভর অঞ্চলে বাড়তি জমি ডাল-শস্যের আওতায় আনার জন্য নিম্নলিখিত বিষয়গুলির উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

ক) খরা-কবলিত এলাকার উঁচু জমিতে ডালশস্য হিসাবে কেবল মুগ, কলাই, অড়হর, সয়াবিন, বারসিম প্রভৃতি ডাল-শস্যের চাষ।

খ) বোনা ধান, ভুট্টা ও বজরার সঙ্গে সাথী ফসল হিসাবে মুগ, কলাই, অড়হর ও সয়াবিন প্রভৃতি ডালশস্যের চাষ।

গ) মাঝারি নীচু পতিত ধানজমিতে পায়রা চাষ।

ঘ) অমুক্ত অঞ্চলে যেখানে জমির অল্পভাব চুন, ফসফেট অম্লখাত প্রভৃতি প্রয়োগে দূর করা হয়েছে সেই জমিতে প্রয়োজনীয় রস থাকলে সেখানে ডালশস্য বোনা।

২) সেচপ্রাপ্ত এলাকা

ক) রবিশস্য যেমন সরষে, আলু, সবজি প্রভৃতি ফসল কাটার পর সেই জমিতে গ্রীষ্মকালীন মুগের চাষ।

খ) বৃহৎ ও মাঝারি সেচপ্রকল্পের আওতাভুক্ত সেচসেবিত এলাকায় আশপাশে রবিতে ডালশস্যের চাষ।

গ) আখক্ষেতের ধারে ধারে অড়হরের চাষ।

হেক্টর প্রতি ফলন বৃদ্ধির জন্য নিম্নলিখিত বিঘয়ের উপর গুরুত্ব দিতে হবে

১) উন্নত মানের জলদি জাতের বীজের

ব্যবহার।

২) নির্দিষ্ট রাইজোবিয়াম কালচার দিয়ে বীজ শোধন।

৩) জমিতে পর্যাপ্ত সংখ্যক চারা যাতে থাকে সেজন্য বীজের হার বৃদ্ধি ও লাইনে বোনা।

৪) জৈব ও রাসায়নিক সারের ব্যবহার।

৫) অল্প জমিতে অল্পশোধনকারী দ্রব্য ব্যবহার।

৬) রোগপোকার জন্য প্রয়োজনীয় শস্তরক্ষা ব্যবস্থা গ্রহণ।

১৯৮৫-৮৬ সালে কার্যসূচী রূপায়নের জন্য সাহায্য

১) ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের চাষের সুবিধার জন্য বিভিন্ন ডালশস্যের ১,৮০,০০০ মিনিকিট বিলি করা হবে।

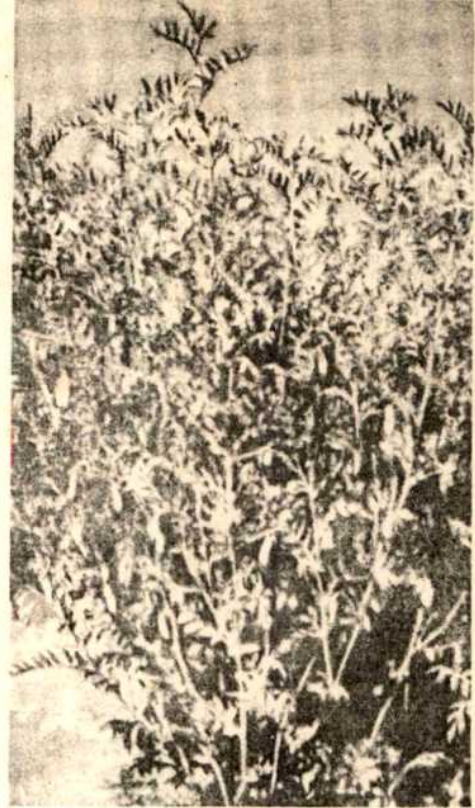
২) বিভিন্ন ডালশস্যের জন্য বিভিন্ন জেলার মাটি অনুযায়ী ডালশস্যের প্রদর্শনী ক্ষেত করা হবে।

৩) সয়াবিনের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য গুরুত্ব দেওয়া হবে এবং চলতি বছরে খরা-প্রবণ অঞ্চলে সয়াবিনের চাষ করানোর উপর গুরুত্ব দেওয়া হবে।

৪। গ্রীষ্মকালীন মুগ চাষের এলাকা বৃদ্ধি
গ্রীষ্মকালীন মুগ চাষের এলাকা বাড়ানোর জন্য প্রদর্শনী ক্ষেতের ব্যবস্থা করা, সংশ্লিষ্ট বীজ উৎপাদন, সেচে ভরতুকি প্রদান ইত্যাদি ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

৫। বীজ উৎপাদন

উন্নত মানের ডালশস্যের বীজ উৎপাদনের উপর গুরুত্ব থাকবে।



মুগ ডালের গাছ এবং মুসুরি ডালের গাছ

৬। শস্তরক্ষার ব্যবস্থা

শস্তরক্ষার ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য রাসায়নিক ওষুধ এবং ওষুধ প্রয়োগের খরচ, যন্ত্রপাতি কেনার খরচের উপর ভরতুকি দেওয়ার ব্যবস্থা ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

৭। প্রশিক্ষণ

১৯৮৫-৮৬ সালের এই কর্মসূচী রূপায়নের

জন্ম কৃষি সম্প্রসারণ আধিকারিকদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা। প্রশিক্ষণ ও পরিদর্শন কার্যসূচীর মাধ্যমে প্রতি পক্ষে চাষের প্রধান প্রধান বিষয়-গুলি নিয়ে আলোচনা করা। কৃষকরা যাতে উন্নত চাষ ও সেই সংক্রান্ত বিষয়ে প্রয়োজনীয় নির্দেশ যথাসময়ে পান তার জন্য যথাবিধি ব্যবস্থা নেওয়া।



কার্তিক মাসে কৃষকের করণীয়

কার্তিকে রবিশস্ত্রের চাষ শুরু হয়ে যাচ্ছে। প্রথমেই আসি সরিষার চাষে। তৈলবীজের ফলন বাড়াবার জন্ত এ বছরও রবি কর্মসূচীতে এর চাষের উপর যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। তৈলবীজের মধ্যে সরিষার চাষই প্রধান। এ মাসের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে অগ্রণী ও বিনয় এবং মাঝামাঝির মধ্যে সীতা ও তৃতীয় সপ্তাহের মধ্যে বরুণা বোনা শেষ করুন।

আলু

তারপরই আলু। এ সময়ের একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ ফসল। জলদি জাতের আলু এ মাসের প্রথম দিকেও লাগানো যায়। নাবি জাত কুফরি জ্যোতি ও কুফরি সিন্দুরি। প্রধান ফসল হিসাবে এ মাসের মাঝামাঝি থেকে আলু লাগান। মাটি পরীক্ষা করে সুপারিশমত সার দিন। তা না হলে কৃষির উর্বরতা অনুযায়ী একর প্রতি ৪০—৬০ কেজি করে নাইট্রোজেন, ফসফেট ও পটাশ, আলু বসানোর নালিতে ছড়িয়ে দিয়ে অল্প গুঁড়ো মাটি ছড়িয়ে আলুর বীজ বসান।

গম

এ মাসের শেষ সপ্তাহ থেকে সমতলভূমিতে সোনালিকা ও ইউ, পি-২৬২ জাতের গম শোধন করে বুনুন। গমের বীজ ৩-৪ বছর অঙ্কুর পাণ্টে নেওয়া প্রয়োজন। অগ্রণী বীজের ফলন ক্ষমতা কমে যায়। মাটি পরীক্ষা করিয়ে সুপারিশমত সার দিন। অগ্রাঙ্ক ফসলের মধ্যে সারা মাস ধরে মটর, তৃতীয় সপ্তাহ পর্যন্ত মুসুর এবং চীনাবাদাম লাগান। মুসুরের উন্নত জাত, আশা।

বোরো ধান

অপেক্ষাকৃত নিচু জমি ও যেখানে মাটির জলধারণ ক্ষমতা বেশী এবং পৌষ থেকে বৈশাখ পর্যন্ত যেখানে নিশ্চিত সেচের জল পাওয়া যাবে সেখানে বোরো চাষ করুন।

এ মাসের মাঝামাঝি থেকে শোধন করা বীজ বীজতলায় ফেলুন। বোরো ধানের জাত এমনভাবে ঠিক করুন যাতে বৈশাখের মধ্যে কেটে ফেলা যায়।



সপ্তম পঞ্চবার্ষিক যোজনার ব্যাপক প্রস্তুতি

উন্নত মানের বীজ উৎপাদন ও সরবরাহের কাজে
পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বীজ নিগম-এর সম্প্রসারিত কার্যক্রম

উন্নত মানের বীজ উৎপাদন ও সরবরাহ কার্যক্রমে (পাট, ধান, গম, ডালশস্য এবং তৈলবীজ)	বর্তমান পরিস্থিতি (১৯৮৪-৮৫) ৩০০০ মেঃ টন	৭ম যোজনার লক্ষ্যমাত্রা (১৯৮৯-৯০) ১৫,০০০ মেঃ টন
--	--	---

পশ্চিমবঙ্গের জলবায়ু মাটির উপযোগী এ রাজ্যেই উৎপাদিত
উন্নত মানের শংসিত বীজ ব্যবহার করুন
ফলন বাড়ান : আয় বাড়ান

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বীজ নিগম লিঃ-এর জেলা দপ্তর

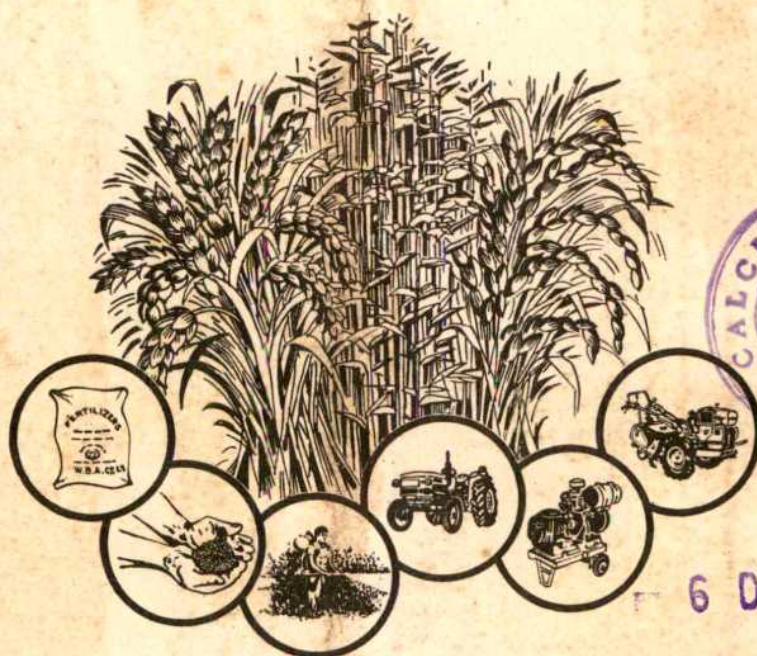
ব্রাহ্মগঞ্জ	ঃ উকিলপাড়া, রায়গঞ্জ (পশ্চিম দিনাজপুর)
মালদা	ঃ মকদমপুর, মালদা
বহরমপুর	ঃ পঞ্চাননতলা, বহরমপুর (মুর্শিদাবাদ)
কুমারগঞ্জ	ঃ ১২, ডি. এন. রায় রোড, কুমারগঞ্জ (নদীয়া)
বর্ধমান	ঃ ৭৯, এন. এন. বসু রোড, বর্ধমান
সিউড়ী	ঃ দাঙ্গালপাড়া, সিউড়ী (বীরভূম)
বাঁকুড়া	ঃ চাঁদমারীডাঙ্গা, বাঁকুড়া
মেদিনীপুর	ঃ ৩৫/১, অরবিন্দনগর, নরমপুর, মেদিনীপুর

সদর দপ্তর ৪

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বীজ নিগম লিঃ

৪, গঙ্গাধর বাবু লেন (৬ষ্ঠ তল), কলিকাতা-৭০০০১২

GREEN REVOLUTION— our aim in West Bengal



6 DEC 1985

Green Revolution is our aim. The object is to modernise farming in the State. And Agro-Industries Corporation is lending a helping hand to achieve the goal. The Corporation has been supplying modern implements like Tractors, Sprayers, Threshers and Pump-sets to the farmers on hire or on hire-purchase basis.

The Corporation also supplies quality seeds, fertilisers and pesticides.

Agro-Industries Corporation also provides custom

service for cultivation of cotton/groundnut and for Small Farmers Development Agency and Marginal Farmers & Agricultural Labourers Development Project Schemes.

The Corporation has another role too—to create employment opportunities for Engineering graduates/diploma holders and Agricultural graduates in different Agro-Service centres in this State.

*Hand in hand with farmers—
Agro-Industries Corporation*

West Bengal Agro-Industries Corporation Limited

(West Bengal Govt. Undertaking)

23B, Netaji Subhas Road, (3rd Floor), Calcutta-700 001

Telegram : AGRINPUT

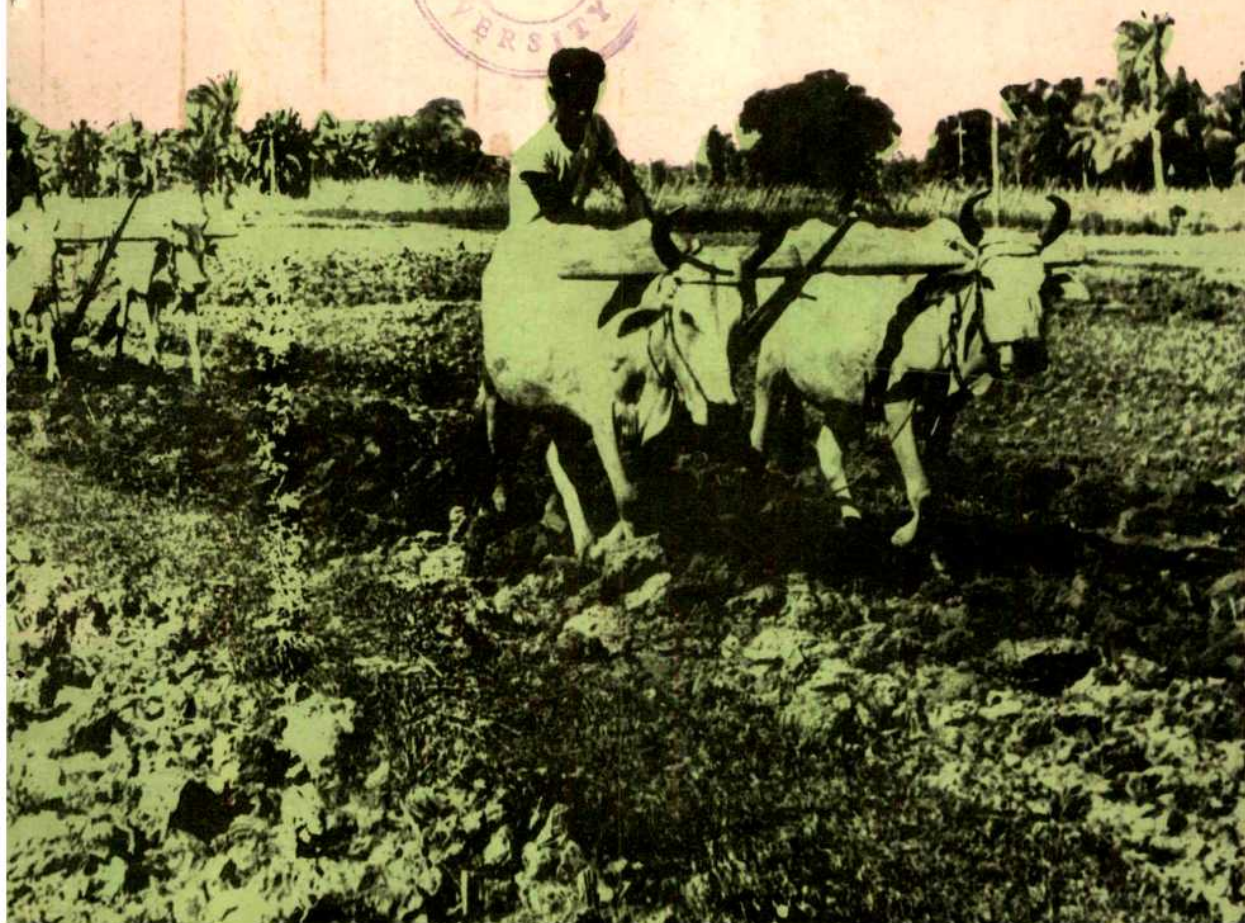
Telephone : 22-2314 / 23-3192

কামকবা

কামকবা

সপ্তদ্বিংশ বর্ষ

বার্তিক • ১৩৩২



সূচী

সম্পাদকীয়	৩৪
পশ্চিমবঙ্গে ১৯৮৫-৮৬ সালে গম	
উৎপাদনের পরিকল্পনা	৫-১০
বিষুপদ মণ্ডল	
পশ্চিমবঙ্গে মুস্তুরি উৎপাদনে গবেষণা	
ও তার অগ্রগতি	১১-১৫
শিশির কুমার ঘোষ	
ডালশস্ত্র ও তৈলবীজের ঘাটতি পূরণে	
পয়রা চাষের ভূমিকা	১৬-১৯
প্রমোদনা নাথ রায়	
ছোলা মুস্তুরের চাষ	২০-২৩
ধনের চাষ	২৪-২৬
ডঃ রাধাগোবিন্দ মাইতি	
সরষে চাষের উন্নত প্রথা	২৭-৩১
অগ্রহায়ণ মাসে কৃষকের করণীয়	৩২

সম্পাদনা উপদেষ্টা পর্ষদ
বিষুপদ মণ্ডল, কৃষি অধিকর্তা, পশ্চিমবঙ্গ
ডঃ দেবব্রত মুখার্জী, অপর কৃষি অধিকর্তা (গবেষণা)
মুর্জী মুখার্জী, যুগ্ম কৃষি অধিকর্তা (সম্প্রসারণ)
জ্যোতির্ময় বোস, উপ-সচিব (উন্নয়ন), কৃষি বিভাগ
অমলেন্দু সরকার, মুখ্য প্রচার ও জনসংযোগ
আধিকারিক, কৃষি অধিকার
অমিন কুমার মিত্র, জেলা কৃষি তথ্য আধিকারিক (সদর)
স্বলেবা ঘোষ, সম্পাদিকা
চিদানন্দ গোস্বামী, সহ-সম্পাদক
প্রধান সম্পাদক
বিষুপদ মণ্ডল, কৃষি অধিকর্তা, পশ্চিমবঙ্গ

বহুসংস্করণ

কার্তিক-১৩৯২

কৃষি অধিকার (কৃষি তথ্য সংস্থা)

পঃ বঃ সরকার কর্তৃক প্রকাশিত ও প্রচারিত

কৃষি সংবাদ



আমন ধানে ঝলসা রোগ দমন করুন

আমন ধানে কোন কোন জায়গায় বিক্ষিপ্তভাবে ঝলসা রোগ দেখা যাচ্ছে। ঝলসা রোগে পাতায় মাকু বা চোখের মত বাদামী রঙের দাগ দেখা যায় ও দাগের মাঝখানে ধূসর রঙের হয়। আক্রমণ বেশী হলে সমস্ত ঝাড়টি ঝলসে যেতে পারে। এই রোগ দেখা গেলে নীচের লেখা যে কোন একটি ওষুধ স্প্রে করুন।

ওষুধের নাম		প্রতি লিটার জলে ওষুধের পরিমাণ
হিনোসান	৫০ %	১ মিলি
কিটাজেন	৪৮ %	১ মিলি
কুমান এল	৮০ %	৩ মিলি

সম্পাদক



কার্তিকের মাঠে এখন আমন ধান ধীরে পুষ্ট হয়ে উঠছে। এ বছর চাষের প্রায় শুরু থেকেই আমনের ক্ষেতে পোকা, বিশেষ করে পামরি পোকার আক্রমণ খুব বেশী দেখা যায়। এরজন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা কৃষকরা নিয়েছেন যাতে ফসলের ক্ষতি না হয়। তবে ঘরে ফসল না ওঠা পর্বন্ত বিপদের সম্ভাবনা থেকেই যায়। তাই কৃষকদের এখনও ফসলের উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে যাতে কোথাও রোগ বা পোকার আক্রমণ দেখলে সঙ্গে সঙ্গে তা দমনের ব্যবস্থা নেওয়া যায়।

এই কার্তিকে রবিশস্তুর চাষও শুরু হয়ে যাচ্ছে। রবি ফসলের মধ্যে বিশেষ করে তৈলবীজ ও ডালশস্য। আমন ধান কাটার পর জমিতে যে রস থাকে তাতেই প্রধানতঃ রবি ফসলের চাষ হয়ে থাকে। ডালশস্য ও তৈলবীজ এ দুটি শস্যের চাষএলাকা ও ফলন দুই-ই প্রয়োজনের তুলনায় কম। এই ফসলের ঘাটতি যতটা সম্ভব কমিয়ে আনার জন্য আমাদের চেষ্টা করতে হবে।

এই দুটি ফসলের ফলন যাতে বাড়ে তারজন্য রাজ্য সরকার বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। বিভিন্ন প্রকারে তৈলবীজ ও ডালশস্যের উৎপাদন বাড়ানোর জন্য চলতি বছরেও রাজ্য সরকার বিশেষ কার্যসূচী নিয়েছেন। এ বছর ডাল উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে পাঁচ লক্ষ হেক্টরে তিন লক্ষ টন। এই তিন লক্ষ টন ডাল উৎপাদন হবে খরিফ ও রবি মরসুমে। তাছাড়া তৈলবীজের উৎপাদন বাড়ানোর জন্যও প্রকল্প নেওয়া হয়েছে এবং খরিফ ও রবি মরসুম মিলিয়ে উৎপাদন লক্ষ্যসীমা ধরা হয়েছে ৪'২০ লক্ষ হেক্টরে ২'২০ লক্ষ টন।

এই লক্ষ্যে পৌঁছাতে গেলে কৃষকদের উন্নত জাতের বীজ ব্যবহার করা এবং উন্নত চাষ পদ্ধতি গ্রহণ করা দরকার। এ বিষয়ে সরকার কৃষকদের নানাভাবে সাহায্যও করছেন। বর্তমানে তৈলবীজের চাষে সার ও সেচের ব্যবহার সীমিত। যেখানে সেচের জলের সুবিধা আছে সেখানে সেচ দেওয়া ও নির্দিষ্ট পরিমাণ মত সার ব্যবহারের জন্য কৃষকদের অনুরোধ জানানো হচ্ছে। এ ছাড়া উন্নত চাষ পদ্ধতি ও তার ফলাফল কৃষকদের সামনে তুলে ধরার জন্য বিভিন্ন ডাল ও তৈলবীজের প্রদর্শন ক্ষেত্রের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

ডাল ফলনের জন্য সময়মত চাষ শুরু করা যেমন দরকার তেমন দরকার উন্নত মানের বীজের। বীজের সরবরাহ যাতে ঠিক থাকে সেজন্য

সরকার বিশেষ যত্ন নিয়েছেন এবং এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাও সরকার থেকে নেওয়া হচ্ছে।
বীজের অভাবে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষীরা যাতে অল্পবিধায় না পড়েন সেজন্য এবছরও মিনিকিটের
মাধ্যমে বিভিন্ন ডালশস্য ও তৈলবীজ বিলি করার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

ডালশস্য ও তৈলবীজের উৎপাদন বাড়িয়ে আমাদের ঘাটতি যতটা সম্ভব পূরণ করার চেষ্টা
করতে হবে। এজন্য যেখানে যে ধরনের শস্যের চাষ করার সুবিধা আছে তা ঠিক করে নিয়ে
চাষ করতে কৃষকদের অনুরোধ করি। এ বিষয়ে সাহায্য ও পরামর্শের প্রয়োজন হলে কৃষকরা
যেন স্থানীয় কৃষি উন্নয়ন আধিকারিকের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। কৃষকদের সক্রিয় চেষ্টাতেই
উৎপাদন বাড়ানো সম্ভব।

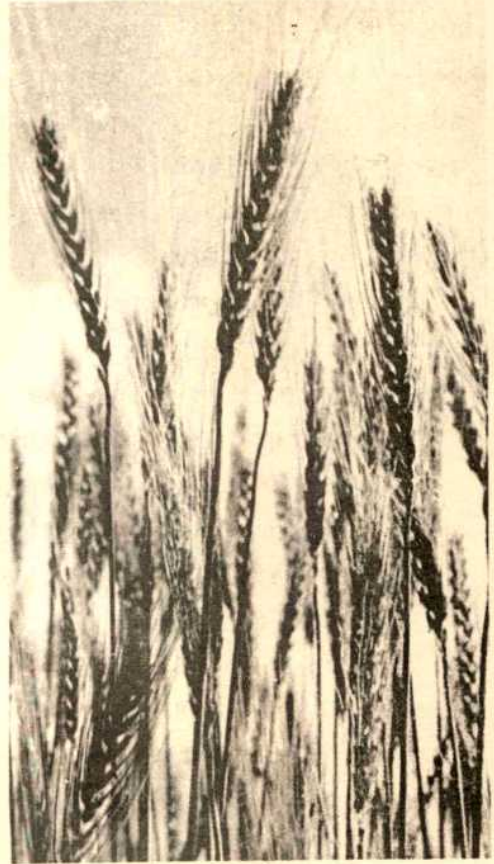
পশ্চিমবঙ্গে ১৯৮৫-৮৬ সালে গম উৎপাদনের পরিকল্পনা

১৯৬৫-৬৬ সালে এ রাজ্যে ৪১ হাজার হেক্টর থেকে সত্তরের দশকের মাঝামাঝি গমের এলাকা ৫ লক্ষ হেক্টরে পৌঁছেছিল। উৎপাদনও ১৯৬৫-৬৬ সালে ৩৪ হাজার টন থেকে বৃদ্ধি পেয়ে সত্তরের মাঝামাঝি ১০ লক্ষ টনেরও বেশী হয়েছিল। হেক্টর প্রতি অভাবনীয় ফলন ৮ কুইন্টাল থেকে ২০ কুইন্টালে পৌঁছানো সম্ভব হয়েছিল জলদি জাতের অধিক ফলনশীল মেক্সিকান গমের চাষে। সেচ ব্যবস্থার উন্নতি এবং সারের সুযম ব্যবহারও এই অধিক ফলনশীল জাতের উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধিতে বিশেষ সহায়ক হয়েছিল।

১৯৭৫-৭৬ সালে গমের সর্বোচ্চ এলাকা ছিল ৫'৬ লক্ষ হেক্টর এবং উৎপাদন হয় ১১'৫ লক্ষ টন। কিন্তু ১৯৭৯-৮০ সাল থেকে গমের এলাকা এবং উৎপাদন এবং হেক্টর প্রতি ফলন উল্লেখযোগ্যভাবে কমেতে থাকে। এই অবস্থা চলে প্রায় তিন বছর ধরে। এটি ঘটেছিল নানা প্রযুক্তিগত এবং অর্থনৈতিক কারণে।

তবে ১৯৮২-৮৩ সালে উৎপাদনের এই নিম্ন-গতি কিছুটা রোধ করা সম্ভব হয়েছিল।
কৃষি অধিকর্তা, পশ্চিমবঙ্গ।

বিষুপদ মণ্ডল



বসুন্ধরা : কার্তিক : ১৩৯২

১৯৮৩-৮৪ সালে আগের বছরের তুলনায় ১৩৭ হাজার হেক্টর ক্ষমিতে চাষ বৃদ্ধি করা সম্ভব হয় এবং রেকর্ড ফলন হয় হেক্টরে ২৫'৯ কুইন্টাল। ১৯৮৪-৮৫ সালে চাষ এলাকার বৃদ্ধি সত্ত্বেও উৎপাদন এবং হেক্টর প্রতি ফলন আবার কিছুটা কমে যায়। সেচের জলের অপ্রতুলতা এর অন্যতম কারণ। যদিও এ রাজ্যে গমের ফলনের হার বাড়িয়ে হেক্টরে ২৫'৯ কুইন্টাল করা সম্ভব হয়েছিল কিন্তু পরীক্ষামূলক ও প্রদর্শন ক্ষেতের ফলন এবং সাধারণ কৃষকের ক্ষেতের ফলনের হারের মধ্যে বিরাট ব্যবধান লক্ষিত হয়। উপযুক্ত পরিবেশে বিজ্ঞানভিত্তিক চাষে হেক্টরে ৪০—৫০ কুইন্টাল পর্যন্ত ফসল উৎপাদন করা সম্ভব। কাজেই ফলনের এই ব্যবধান ঘটান কারণগুলি খতিয়ে দেখা দরকার।

রাজ্যে গম উৎপাদনের এলাকা এবং উৎপাদন হ্রাসের কারণগুলি নীচে উল্লেখ করা হলো।

- ১) অস্বাভাবিক রবিশস্য যেমন সরিষা, আলু ও সবজির তুলনায় গমে আয় কম।
- ২) উত্তরবঙ্গের তরাই অঞ্চলে যেখানে সম্প্রতি গম চাষ সেচপ্রাপ্ত, সীমিত সেচপ্রাপ্ত এবং এমনকি অসেচ এলাকায় বৃদ্ধি পেয়েছে সেখানে ঐ পরিবেশে আরও বিভিন্ন রোগ প্রতিরোধক জাতের উদ্ভাবন এবং প্রসারের প্রয়োজন রয়েছে।
- ৩) প্রান্তিক কৃষক যারা উন্নত মানের শংসিত বীজ কিনতে সমর্থ না হয়ে নীচু মানের বীজ চাষ করে থাকেন তাঁরা যাতে উচ্চ মানের শংসিত বীজ ব্যবহার করতে পারেন তার ব্যবস্থা প্রয়োজন।

৪) বর্ষাকালে বীজ আট মাসের মত সংরক্ষিত থাকে তখন তাতে নানা রকম পোকা লেগে বীজের গুণাগুণ নষ্ট হয়। এই সময়ে বীজ সংরক্ষণের সুবন্দোবস্ত দরকার।

৫) মাটি পরীক্ষার ভিত্তিতে মাটি সংশোধন করা এবং সুষম সারের ব্যবহারের বিশেষ প্রয়োজন।

৬) সেচের জলের আরও বেশী প্রসার এবং সদ্যবহার।

৭) সুসংহত পরিচর্যা ও প্রয়োজনভিত্তিক শস্যরক্ষা।

৮) ঠিক সময়ে ফসল কেটে ঝাড়াই, মাড়াই এবং সংরক্ষণের বিশেষ বন্দোবস্ত।

গমের উৎপাদন বাড়ানোর কার্যক্রম

ক) অধিক ফলনশীল জাতের উন্নত মানের বীজের ব্যবহার।

১৯৬৮ সাল থেকে একটানা চাষের ফলে অতি জনপ্রিয় জাত সোনালিকায় নানা রকম পাতার রোগ দেখা দিচ্ছে যার ফলে ফলন কমে যাচ্ছে। সেজন্য সোনালিকার পরিবর্তে ছুটি নতুন জাত যথা ইউ,পি, ২৬২ এবং এইচ,পি ১২০৯ এর প্রবর্তন করা হয়েছে। এ ছুটি জাত শুধু ভাল ফলনই দেয় না ক্ষেতে মরিচা রোগ অনেকটা প্রতিরোধ করতে পারে। কিন্তু উত্তরবঙ্গের তরাই অঞ্চলে সোনালিকার চাষই এখনও ছ এক বছর করতে হবে। কারণ এই জাতে নিঃফলা শীঘ্র প্রতিরোধ করার ক্ষমতা আছে।

যদিও এ রাজ্যে পাট-আমন ধান-গম এই শস্যপর্গায় জনপ্রিয় কিন্তু নাবি বোনার উপযুক্ত জাতের অভাবে গম চাষের এলাকা বাড়ানো

যাচ্ছে না। তবে গত বছর সেন্ট্রাল ভ্যারাইটি রিলিফ কমিটি যে বি, ডবলিউ ১১ (B.W 11) জাত চাষের ক্ষয় ছেড়েছেন তা অনেক দিনের এই অভাব পূরণ করতে পারবে বলে আশা করা যায়। এ রাজ্যের বৈজ্ঞানিকরা আর একটি জাত বি, ডবলিউ ১০১১ (B.W1011) উদ্ভাবন করেছেন তা একই অবস্থায় নিয়মিত ভাল ফলন দিচ্ছে। এগুলি ছাড়া অগ্নাজাত যেমন B.R 356, n.g 1044, B.R 2161, Dh 95-2, B.W 158, Dh 220-2 প্রভৃতি সেচপ্রাপ্ত এলাকায় বা নাবি জাত হিসাবে বোনার উপযোগী হবে তা অনুমোদনের প্রতীক্ষায় রয়েছে।

সোনালিকা জাতের গমের পাতায় বিভিন্ন রোগের আক্রমণ সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও সফল শীষের জন্ম উত্তরবঙ্গের তরাই অঞ্চলে কেবলমাত্র এই জাতের চাষই হয়ে থাকে। নতুন একটি জাত বি, ডাবলিউ ১০০৮ উদ্ভাবন করা সম্ভব হয়েছে যা সোনালিকার চেয়ে ফলন বেশী ও রোগ প্রতিরোধে সক্ষম। এই জাতের আরও গুণ আছে যেমন সোনালী রং এবং বড় দানা। এই জাতটি এখন মিনিকিটে পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্ম বিলি করা হচ্ছে।

খ) ঠিক সময়ে বোনা

দেখা গেছে নভেম্বরের দ্বিতীয় ভাগ দক্ষিণবঙ্গে গমের বীজ বোনার পক্ষে সবচেয়ে অনুকূল সময়। তার থেকে ১৫ দিন পরে বুনলে হেক্টরে ৪—৫ কুইন্টাল ফলন কম হয় আবার তরাই অঞ্চলে নভেম্বরের শেষ সপ্তাহ থেকে ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত বীজ বোনার পক্ষে অনুকূল। তরাই অঞ্চলে অবশ্য মাটিতে বেশী আর্দ্রতা থাকার জন্ম নভেম্বরের মাঝামাঝি বীজ বোনার পক্ষে

অনুকূল নয় বলে বেশির ভাগ এলাকাতে ডিসেম্বরের মধ্যেই বীজ বোনা হয়। ফলে ফলনও কম হয়।

গ) সার ও সেচের জলের সদ্যবহার

এই দুটি উপাদান পরস্পরের পরিপূরক। এই দুটি উপাদানের ব্যবহার ঠিকমত হওয়ার জন্ম সুপারিশমত সার ও সেচের ব্যবস্থার প্রয়োজন। এ রাজ্যে বিভিন্ন কৃষি আবহাওয়া অঞ্চলে ঠিক সময়ে বীজ বোনা হলে, শস্য বৃদ্ধির বিভিন্ন অবস্থায় যদি হেক্টর প্রতি ৪—৬টি সেচ $১০০ \times ৫০ \times ৫০$ এবং এন, পি, কে প্রয়োগ করা হয় তাহলে গমের সর্বোচ্চ ফলন পাওয়া যেতে পারে। তরাই অঞ্চলে অবশ্য দু তিনটি সেচই যথেষ্ট। বিভিন্ন কৃষি আবহাওয়া অঞ্চলে সীমিত সেচ ব্যবস্থায় সার প্রয়োগের সুপারিশ করা হয়েছে।

দুর্বল শ্রেণীর ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষীদের জন্ম সারমাত্রা ব্যবহারের সুপারিশ করা হয়েছে। এই সুপারিশ, পুষ্htিকা, কৃষি সংবাদ, আকাশবাণী প্রভৃতি প্রচার মাধ্যমের সাহায্যে সর্বসাধারণকে জানানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে।

ঘ) শস্যরক্ষা ও আগাছা দমন ব্যবস্থা

পশ্চিমবঙ্গে বিশেষ করে এ রাজ্যের উত্তরাঞ্চলে গমে মরিচা ও পাতা ঝলসানো রোগের আক্রমণে ফলন কমে যাচ্ছে। অগ্নাজাত রোগ যেমন চারার শিকড় ও গোড়া পচা প্রভৃতি রোগের আক্রমণ এ রাজ্যে তেমন দেখা যায় না। তবে ভূসা রোগের প্রাদুর্ভাব রয়েছে, বীজ সংশোধন করলে এই রোগের প্রাদুর্ভাব কমান যায়।

মরিচা রোগ প্রতিরোধের জন্ম নিচের ব্যবস্থাগুলি নেওয়া যেতে পারে। এগুলি খরচের

বহুসংখ্যক : কার্তিক : ১৩৯২

দিক থেকেও সুবিধাজনক।

ক) রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা সম্পন্ন জাত যেমন ইউ,পি ২৬২, এইচ,পি ১২০২ এবং বি,ডবলিউ ১১ চাষ করা।

খ) ঠিক সময়ে বীজ বোনা।

গ) সুস্থ সারের ব্যবহার।

এখনও পূর্বস্থ পাতা বলসানো রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বিশিষ্ট কোন জাত এ রাজ্যে বার করা সম্ভব হয়নি। কিন্তু এই রোগ দেখা গেলে প্রতিরোধের জন্য প্রতি লিটার জলে ২২ গ্রাম হারে ডাইথেন এম-৪৫ জলে গুলে ১০—১৫ দিন অন্তর ছোটলে ভাল ফল পাওয়া যায়।

সম্প্রতি গম ক্ষেতে দুটি মারাত্মক আগাছা যেমন ফালাধাস ও বুনো যাই এর উপদ্রব দেখা যাচ্ছে। এইসব আগাছা দমনের জন্য প্রশিক্ষণ ও পরিদর্শন কর্মসূচীর মাধ্যমে কৃষকদের সজাগ দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে।

১৯৮৫-৮৬ সালে গম উৎপাদন বৃদ্ধির বিশেষ কার্যক্রম

গত ১৯৮৪-৮৫ সালে এ রাজ্যের মোট গম জমির পরিমাণ এবং ফলন ছিল যথাক্রমে ৩৩৫'৯ হাজার হেক্টর ও ৮১২'২ হাজার টন এবং হেক্টর প্রতি গড় ফলন ছিল ২৪১৮ কেজি। ১৯৮৫-৮৬ সালে মোট চাষের জমির পরিমাণ এবং মোট উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে যথাক্রমে ৪ লক্ষ হেক্টর ও ৯ লক্ষ টন। এই লক্ষ্য পৌঁছাতে গেলে নিম্নলিখিত ব্যবস্থাগুলি গ্রহণ প্রয়োজন।

ক) সেচ ব্যবস্থার সম্প্রসারণ

এখানে ভালভাবে গম চাষ করতে গেলে জলের একান্ত প্রয়োজন। সেজন্য সরকার সেচ ব্যবস্থা সম্প্রসারণের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা

নিিয়েছেন। যেমন ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষীদের সেচের সুবিধা বেনী করে দেওয়ার জন্য কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণাধীন কতকগুলি পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। এ ছাড়া রাজ্য বাজেট থাকেও গভীর ও অগভীর নলকূপ বসিয়ে এবং নদীসেচ প্রকল্পের মাধ্যমে সেচের সম্প্রসারণ করার ব্যবস্থাও নেওয়া হয়েছে। এই কাজের জন্য বিভিন্ন বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক ও রাজ্য ক্ষুদ্র সেচ নিগমও সাহায্য করবেন।

খ) উন্নত মানের বীজ সরবরাহের ব্যবস্থা

এ বছর রাজ্য বীজ নিগম সংস্থা প্রায় ১০০০ টন উন্নত মানের গমবীজ সরবরাহের লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করেছেন। এ ছাড়া রাজ্য জাতীয় বীজ নিগম, তরাই বীজ নিগম, সমবায় বিপণন সংস্থা ও এগ্রো ইণ্ডাস্ট্রিজ করপোরেশন এবং অগ্রা বীজ ব্যবসায়ীগুলিও প্রায় ২০০০ টন উন্নত মানের বীজ যেমন সোনালিকা, ইউ,পি ২৬২ ও এইচ, পি ১২০২ সরবরাহের পরিকল্পনা নিয়েছেন।

গ) সারের সূষ্ঠা ব্যবহার

গমের উৎপাদন বাড়াতে সার ও সেচ এই দুটিই অত্যন্ত প্রয়োজনীয় উপাদান এবং উভয় উভয়ের পরিপূরক।

সারের ব্যবহার বাড়ানোর জন্য নিচের ব্যবস্থাগুলি নেওয়া হয়েছে।

১) মাটি পরীক্ষার ফলাফল কৃষকদের যত শীঘ্র সম্ভব জানানো।

২) ক্ষুদ্র, প্রান্তিক এবং বর্গাচাষীদের সার ক্রয়ের জন্য ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ ও ভরতুকি দেওয়ার ব্যবস্থা।

৩) হুর্গম অঞ্চলে সার ব্যবসায়ীদের সার বহনের খরচের ওপর ভরতুকি দেওয়া।

৪) প্রশিক্ষণ ও পরিদর্শন কর্মসূচীর মাধ্যমে গম চাষীদের সুশ্রম সার ব্যবহারের প্রশিক্ষণ দেওয়া।

৫) ১৯৮৫-৮৬ সালে রবিথল্ডে সার ব্যবহারের লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে নাইট্রোজেন ১৭৫ হাজার মেট্রিক টন, ফসফেট ৭৫ হাজার মেট্রিক টন এবং পটাশ ৫০,০০০ মেট্রিক টন। সারের সরবরাহ যদি অব্যাহত থাকে তাহলে কৃষকদের সার পেতে অসুবিধা হবে না।

খ) বিপণন ব্যবস্থার উন্নতি ও মূল্য নিয়ন্ত্রণ

বিভিন্ন কৃষি উপকরণ যেমন বীজ, সার কীটনাশক ওষুধ ও যন্ত্রপাতি প্রভৃতি কৃষকদের সরবরাহ করার জন্ত এবং কৃষকদের উৎপাদিত শস্য গ্রাহ্যমূল্যে বিক্রির ব্যবস্থা করার জন্ত খুচরো ও পাইকারি বাজারগুলির উন্নতি করা। এজন্ত নিম্নলিখিত কার্যসূচী নেওয়া হয়েছে।

- ১) নিয়ন্ত্রিত বাজার (খুচরো ও পাইকারী দুই-ই) প্রতিষ্ঠা করা,
- ২) গ্রামে গুদাম তৈরি করা,
- ৩) বাজারের সংযোগরক্ষাকারী রাস্তার উন্নতি করা,
- ৪) উৎপাদিত শস্যের গ্রাহ্যমূল্য নির্ধারণ,
- ৫) ক্ষুদ্রচাষীদের শস্য সংরক্ষণের জন্ত গুদাম তৈরি করা এবং ভরতুকিতে ধাতু নির্মিত শস্তাধার বিলি করার ব্যবস্থা করা,
- ৬) গম ওঠার মরসুমে যখন এর দাম কম থাকে তখন কেন্দ্রীয় খাদ্য নিগম থেকে গম সংগ্রহ করার ব্যবস্থা করা।

গবেষণার নতুন ক্ষেত্র

- ১। মরিচা রোগ ও পাতা ঝলসানো রোগ

প্রতিরোধ ক্ষমতাবৃদ্ধি এবং গুদামের প্রধান প্রধান পোকা দমনে সক্ষম উন্নত প্রজাতির সৃষ্টি।

২। মাঝারি উর্বর জমি ও সীমিত সেচ ব্যবস্থায় মোটামুটি ভাল ফলন দিতে পারে এমন জাত উদ্ভাবন করা।

৩। মাটির অম্লখাতের এবং অগ্ন্যাক্ত অম্লত্ব নির্ধারণ করার পর সেই অবস্থার উপযোগী জাত উদ্ভাবনের জন্ত পরীক্ষা চালানো।

৪। বিভিন্ন আবহাওয়ার উপযোগী জাত ব্যবহারের জন্ত ক্রমাগত জাত বাছাই করা।

৫। গম কাটার সময় যদি বৃষ্টিও হয় তাহলেও বীজের মান কমে যাতে না যায় তেমন প্রতিরোধ ক্ষমতা সম্পন্ন জাত তৈরি করা।

৬। গুদামে পোকায় আক্রান্ত হয়ে গমের ক্ষতি যাতে না হয় সেজন্ত স্বল্পমূল্যে বীজাধার তৈরির চেষ্টা করা।

৭। বীজের গুণগত মান যাতে কমে না যায় সেজন্ত শুকনো উপায়ে বীজ শোধন করার ব্যবস্থা উদ্ভাবন করা।

৮। মাঝারি উর্বর জমিতে সেচপ্রাপ্ত এলাকায় দেরীতে বৃনে ভাল ফলন পাওয়া যেতে পারে তার জন্ত উন্নত পরিচর্যার ব্যবস্থা।

৯। উত্তরবঙ্গের তরাই অঞ্চলের, পশ্চিম অঞ্চলের এবং লাল কাঁকুরে মাটি অঞ্চলের মাটির অম্লখাতের বর্তমান অবস্থা সম্বন্ধে অনুসন্ধান করা।

বসুন্ধরা : কাঠিক : ১৩৯২

- ১০। অনুখাতির প্রয়োগের ফলাফল মূল্যের যত্নপাতি উদ্ভাবন করা।
পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে নিয়মিত দেখা গত দু দশক ধরে গম এ রাজ্যের দ্বিতীয়
এবং তার ভিত্তিতে সুপারিশ নির্ণয় প্রধান খাদ্যশস্য। আশা করা যায় যেসব
করা। ব্যবস্থা নেওয়ার প্রস্তাব করা হয়েছে সেগুলি
১১। জমি তৈরি, সারিতে বোনা, ফসল ভারতীয় কৃষি অনুসন্ধান পরিষদ এবং কেন্দ্রীয়
কাটা এবং ফসল কাটার পরের সরকারের সক্রিয় সহযোগিতায় রূপায়িত করে
কাজগুলি করার জন্য উপযুক্ত স্বল্প গম উৎপাদন বাড়ানো সম্ভব হবে।

পশ্চিমবঙ্গে গমের ফলন

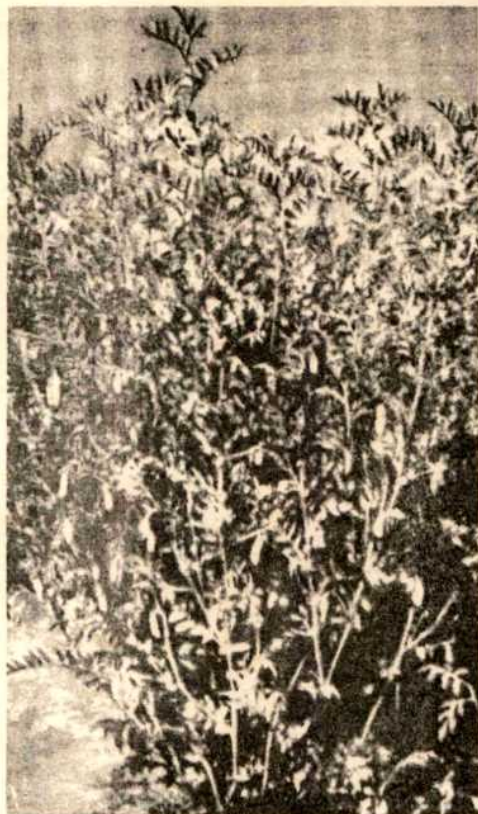
মলাকা(০০০হেক্টরে)উৎপাদন(০০০টনে) ফলনেরথার(কেজি/হেঃ)

বছর	মলাকা	উৎপাদন	ফলন
১৯৬৫-৬৬	৪১.২	৩৪.০	৮১৫
১৯৬৬-৬৭	৫৫.৪	৪৫.৫	৮২১
১৯৬৭-৬৮	৭৯.০	৭১.১	৯০০
১৯৬৮-৬৯	১২৮.০	২৬৮.১	২০৯৫
১৯৬৯-৭০	২০৬.৮	৪৮১.৭	২৩৩০
১৯৭০-৭১	৩৬০.২	৮৬৮.১	২৪১১
১৯৭১-৭২	৪২২.৪	৯২২.২	২১৮১
১৯৭২-৭৩	৩৬৮.২	৬৮৮.০	১৮৬৯
১৯৭৩-৭৪	৩৩০.১	৬২৮.৮	১৯০৫
১৯৭৪-৭৫	৪২১.৮	৮৩৬.৮	১৯৮৪
১৯৭৫-৭৬	৫৬৫.৩	১১৮৭.২	২১০০
১৯৭৬-৭৭	৫১৫.২	১০৫১.২	২০৪০
১৯৭৭-৭৮	৪৮৪.৪	১০৩৬.৫	২১৪০
১৯৭৮-৭৯	৫২১.০	৯৯৮.২	১৯১৬
১৯৭৯-৮০	৫০৫.৯	৭৬৮.০	১৫১৮
১৯৮০-৮১	৪৫০.০	৮০০.০	১৭৭০
১৯৮১-৮২	২১৪.০	৩৮৯.৩	১৮১৯
১৯৮২-৮৩	২৬৬.২	৬০৫.৫	২২৭৪
১৯৮৩-৮৪	৩২৯.১	৮৫৪.২	২৫৯৫
১৯৮৪-৮৫	৩৩৫.৯	৮১২.২	২৪১৮

পশ্চিমবাংলার ভূতপূর্ব মুখ্যমন্ত্রী তথা স্বনামধন্য চিকিৎসক স্বর্গীয় ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় একসময় বলেছিলেন বাঙালী যদি পেটপুরে ভাত আর মুহুরির ডাল খেতে পায় তবে পুষ্টির জন্ম তাকে ভাবতে হবে না। সত্যিই সস্তায় এত উচ্চমানের প্রোটিন একমাত্র মুহুরিই যোগাতে পারবে এবং বাঙালীকে রক্ষা করবে অপুষ্টির হাত থেকে। প্রোটিন সবরকম ডালেই আছে তবে কেবলমাত্র মুহুরিতেই আছে লাইসিন-সমৃদ্ধ প্রোটিন যা আমরা কেবল প্রাণিজ প্রোটিন থেকেই পাই, ডাল জাতীয় খাদ্য হিসাবে মুহুরির তাই এত সমাদর। এ ডাল যেমন উপকারী তেমন উপাদেয়। সারা পৃথিবীতে বড় দানা মুহুরির চাহিদা আজ যথেষ্ট, তাই ভালভাবে উন্নত জাতের চাষ করলে এর চাষ অভ্যস্ত লাভজনক।

গবেষণার ইতিবৃত্ত

পশ্চিমবাংলায় মুহুরি গবেষণার ক্ষেত্রে অগ্র-গতির রূপায়নের কাজ বহরমপুর ডালশস্য ও তৈলবীজ গবেষণা কেন্দ্রটি চালিয়ে আসছে



শিশির কুমার ঘোষ

পশ্চিমবঙ্গে মুহুরি উৎপাদনে গবেষণা ও তার অগ্রগতি

গবেষণা আধিকারিক, ডাল ও তৈলবীজ গবেষণাগার,
বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ।

বহুক্ষরা : কার্তিক : ১৩৯২

নিরলসভাবে, প্রায় তার জন্মলগ্নের শুরু থেকেই। এবং তার প্রথম ফলশ্রুতি পশ্চিমবাংলার প্রথম উন্নত মুন্সুরির প্রজ্ঞাতি 'আশা'। এই প্রজ্ঞাতিটিকে 'প্রজ্ঞাতি নির্বাচন' পদ্ধতিতে বাছাই করা হয়েছিল ভিন্নরাজ্য আসামের স্থানীয় মুন্সুরি থেকে। দ্বিতীয় প্রজ্ঞাতির উদ্ভব এই গবেষণা-কেন্দ্র থেকেই 'সি-৩১'। দুটি প্রজ্ঞাতিই পশ্চিম-বাংলার বিভিন্ন জেলার চাষীভাইদের কাছে জনপ্রিয়তা লাভ করে এবং 'আশা' আজও তার স্রষ্টা গবেষকদের নিষ্ঠা ও বিশ্বদ্বতার স্বাক্ষর বহন করছে।

দ্বিতীয় পর্যায়ে আনা হ'লো ভারতীয় কৃষি গবেষণা সংস্থা (I.C.A.R.) মারফৎ বিভিন্ন রাজ্য থেকে বড়দানা মুন্সুরির প্রজ্ঞাতি, আরও আনা হ'লো বিদেশ থেকে (রাশিয়া) অতি-বড়দানা মুন্সুরির প্রজ্ঞাতি। পশ্চিমবাংলায় সমগ্র ডালচাষের প্রায় ২১ ভাগ জুড়ে রয়েছে মুন্সুরির চাষ—আবার মুন্সুরি চাষের পুরোটাই হয় ছোট দানাসূক্ত প্রজ্ঞাতির; অথচ ক্রেতার বাজারে পছন্দ করেন বড়দানা মুন্সুরির। তাই, গবেষকগণ মুন্সুরি গবেষণার এই পর্যায়ে দেশ-বিদেশ থেকে আনা বিভিন্ন জলবায়ুর উপযোগী প্রজ্ঞাতি-গুলি নিয়ে গবেষণাকেন্দ্রের জমিতে তাদের বংশানুগত গুণাগুণ পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেন।

ছূর্ভাগ্যের বিষয় পশ্চিমবাংলার স্বল্পমেয়াদী শীতের জন্ম বড়দানা কোন মুন্সুরির প্রজ্ঞাতিই আশামুরূপ ফলন দিতে পারেনি। ফলে, পশ্চিমবাংলার চাষীভাইদের হাতে তুলে দেওয়া যায়নি বড় দানার উচ্চফলনশীল কোনও প্রজ্ঞাতি। স্বভাবতঃই এই রাজ্যের ক্রেতা সাধারণের বড়দানা মুন্সুরির চাহিদা মেটানোর

জন্ম রাজ্য সরকারকে আমদানী করতে হয়েছে বড়দানার মুন্সুরি—ভারতবর্ষের অগ্রাগ্র রাজ্য যথা, বিহার, উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ ও পাঞ্জাব থেকে।

তাই গবেষণার তৃতীয় পর্যায়ে বহরমপুর ডালশস্য ও তৈলবীজ গবেষণা কেন্দ্রকে ভাবতে হয়েছে কিভাবে বড়দানার মুন্সুরি উৎপাদনে রাজ্যকে স্ব-নির্ভর করে তোলা যায়। গবেষকদের প্রচেষ্টা চলে বড়দানা মুন্সুরির প্রজ্ঞাতি উদ্ভাবনে। এদেশীয় জলবায়ুর উপযোগী মুন্সুরির ফলন মোটামুটি ভালো কিন্তু দানা অনেক ছোট; অথচ ভিন্দেশের মুন্সুরির দানা অনেক বড় তবে ফলন এতই কম যা চাষীভাইরা চাষ ক'রে কেবল লোকসানই করবেন। তাই এই গবেষণা কেন্দ্রের গবেষকদের কাছে সমস্যাটি ছিল দানার সাইজ ও ফলন এই দুটি গুণের সমন্বয় ঘটিয়ে এমন একটা প্রজ্ঞাতি উদ্ভাবন করা যা হবে বড়দানা যুক্ত এবং এ রাজ্যের জলবায়ুর উপযোগী উচ্চফলনক্ষম। অর্থাৎ আমিটি হবে ফজলির সাইজে কিন্তু ল্যাংড়ার মতই স্বাচ্ছন্দ্য। শুরু হ'লো সঙ্করীকরণের কাজ। প্রধান অন্তরায় হ'লো ফুলের অতি ক্ষুদ্রকায় সাইজ যার ভেতরে প্রকৃতির বিরুদ্ধে কৃত্রিম উপায়ে পরাগযোগ ঘটানো এবং পুনরায় সেই ফুলকে টিকিয়ে রাখা অত্যন্ত কষ্টকর। সঙ্করীকরণের আঘাত সামলে কোন ফুলই সাধারণতঃ ফলে পরিণত হচ্ছিল না; কাজেই বহু পরিশ্রম করেও এ গবেষণায় কোন সুফল পাওয়া যায়নি। গবেষকরা হতাশ না হয়ে এবার রঞ্জন রশ্মির সাহায্যে বড়দানা উচ্চ-ফলনশীল প্রজ্ঞাতি উদ্ভব করার চেষ্টা শুরু করলেন। 'আশা'র বীজকে রঞ্জন রশ্মি দিয়ে

বিকিরণ করা হলো এবং এই গবেষণায় বহরমপুর ডালশস্ত্র ও তৈলবীজ গবেষণা কেন্দ্রে উদ্ভাবন হ'লো। নতুন এক মাঝারি-দানার উচ্চফলনক্ষম প্রজাতি 'বি-১৭৭', এটির থেকেও উৎকৃষ্ট প্রজাতি নির্বাচনের কাজ চললো এবং স্বল্প-কালের মধ্যেই এই গবেষণা কেন্দ্রে উদ্ভাবন হলো আরও দুটি ছোটদানার উচ্চফলনশীল প্রজাতি 'বি-২৩৫' ও 'রজন'। এই 'রজন' নির্বাচিত হলো পশ্চিমবাংলার খরা-প্রবণ অঞ্চলসমূহের প্রজাতি হিসাবে।

গবেষণার চতুর্থ পর্যায়ে বহরমপুর ডালশস্ত্র ও তৈলবীজ গবেষণা কেন্দ্রে মুহুরির 'প্রজাতি ভাণ্ডার' থেকে বড়দানা মুহুরির কয়েকটি প্রজাতি নিয়ে রাজ্যের বিভিন্ন জেলার সরকারী খামারে বিভিন্ন জলবায়ুতে পরীক্ষা নিরীক্ষা চললো। বোঝ করা হয়েছিল বড়দানা মুহুরি উৎপাদনের জন্য সঠিক জলবায়ু, এবং সেই উপযুক্ত জলবায়ুর (দীর্ঘ মেয়াদী শীতে) উপযোগী প্রজাতি নির্বাচন। যদি অন্ততঃ কিছু অঞ্চলেও বড়দানা মুহুরি ভাল ফলন দেয় তবে পশ্চিমবাংলায় বড়দানা মুহুরির আমদানির অন্ততঃ খানিকটা কমানো যাবে। বারবার প্রতিটি বীজ থেকে পাওয়া গাছ ও তার সম্ভূতিদের নিয়ে পৃথকভাবে নির্বাচন করে (Pure-line selection) অবশেষে সঠিক প্রজাতি নির্বাচন করা হ'লো। ডব্লু-বি-এল-১০০ (সি), ডব্লু-বি-এল-১২৩, এ পর্যায়ের গবেষণার সম্ভাবনাময় ফলশ্রুতি, দুটি প্রজাতিই বড়দানার এবং উচ্চফলনক্ষম। 'রাজ্য প্রজাতি অনুমোদন সংস্থার কাছ থেকে অনুমোদন পেলে প্রজাতি দুটি চাষীভাইদের কাছে পৌঁছে যাবে। সমতালে গবেষণা চালিয়ে

'আশা'র বীজের উপর বিভিন্ন রসায়ন (ই-এম-এস ও ই-আই) প্রয়োগ করা হ'ল (কেমিক্যাল মিউটেশন ব্রীডিং)। এক লক্ষ আশি হাজার গাছ এই পদ্ধতির প্রয়োগের পর নেওয়া হ'লো। যার ফলন হবে 'আশা'র অধিক, অথচ বড়দানার, এমন সঠিক গাছ নির্বাচিত হ'লো এই এক লক্ষ আশি হাজার গাছের ভেতর থেকে। এই গাছটি থেকেই গ'ড়ে তোলা হল এক-২০/২। কেবল ফলনের দিক দিয়েই নয় এই প্রজাতিটির বড়দানা হিসাবেও যথেষ্ট সম্ভাবনা পশ্চিমবাংলার অনেক জেলাতেই প্রমাণিত হয়েছে। কোনও প্রজাতি অনুমোদিত হবার আগে বিভিন্ন ধরনের পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হয়। অগ্রাণু উচ্চফলনশীল প্রজাতির সঙ্গে তাদের বিভিন্ন জেলার সরকারী খামারে, তাড়পর বিভিন্ন ব্রকের সরকারী খামারে ও পরিশেষে চাষী-ভাইদের মাঠে পরীক্ষা করা হয়। এই সবক'রটি পরীক্ষাতেই প্রজাতিটি যদি ভালো ফলন দেয় তবেই সেই প্রজাতি 'অনুমোদিত' হয়। এক-২০/২ এই সব পরীক্ষাতেই উত্তীর্ণ হয়েছে।

এই পর্যায়েই বহরমপুর ডালশস্ত্র ও তৈলবীজ গবেষণা কেন্দ্রে এক বিপুল সঙ্করীকরণের কাজ শুরু হ'ল। পাঁচটি বড়দানা প্রজাতি ও পাঁচটি ছোটদানা উচ্চফলনশীল প্রজাতি এই দশটি মুহুরি প্রজাতির মধ্যে আশু প্রজাতি সঙ্করণ করা হ'লো অত্যন্ত নিষ্ঠা ও উদ্যোগ নিয়ে। পরের বছর পাওয়া গেল ৪৫ রকমের সঙ্কর প্রজাতি। গবেষকদের মনে তখনো সংশয়, উন্নুক্ত পরিবেশে (Field condition) এত সংকর প্রজাতি পাওয়া কি সম্ভব? হয়তো প্রজাতিগুলি আদৌ সঙ্কর নয়! কিন্তু গাছগুলি বেড়ে উঠার সাথে

সংস্করণ : কাঠিক : ১৩৯২

সাথে দেখা গেল এরা সত্যিই স্বল্প প্রজাতির। এদের মধ্যে একটি প্রজাতি পাওয়া গেল যার পত্রবিন্যাস ও গঠনশৈলি গবেষকদের বিস্মিত করে। অতি খর্বকাণ্ড (dwarf) প্রজাতিটির চরিত্র হ'লো বিশুদ্ধ (Pure) এবং অভূতপূর্ব। একই বছরে পাওয়া গেল ৭৫-৮০ দিনে পাকে এরকম অতি-স্বল্প মেয়াদী গাছ। সাধারণতঃ মুসুরি পাকতে সময় নেয় ১৩৫-১৪০ দিন; তাই আউশ ধান কাটার পরই সেই পরিত্যক্ত জমিতে জলদি মুসুর চাষ করার জন্ম এই অতি-স্বল্প-মেয়াদী গাছ থেকে একটি নতুন প্রজাতি “ডব্লু-বি-এল-১২ (৫)” তৈরী করা হল। প্রজাতিটি বাইরের দেশ থেকে সংকলিত ‘লেস-৮৩০’ ও ‘জে-এল-এস-৪’ এই দুটি প্রজাতির মধ্যে সংকরীকরণের ফল তথা পশ্চিমবাংলায় মুসুরি গবেষণার ফল। এটির উদ্ভাবনের মধ্য দিয়ে একদা “পশ্চিমবাংলার মুসুরি গবেষণা” গৌরবোজ্জ্বল হয়ে উঠবে সারা বিশ্বে।

অতি স্বল্প-মেয়াদী এই প্রজাতিটিকে আরও ফলনক্ষম করে তোলার কাজে গবেষণা অতি দ্রুত এগিয়ে চলেছে বহরমপুরে। প্রজাতিটি নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে-এর রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা, সারের চাহিদার পরিমাণ, কখন বুনলে সবচেয়ে বেশি ফলন পাওয়া যাবে ইত্যাদি নানা বিষয়ে। আশা করা যায় এবছরই প্রজাতিটি অমুমোদনের জন্ম রাজ্য প্রজাতি অমুমোদন কমিটির কাছে যাবে। সংকরীকরণ করে আরও পাঁচটি ছোট ও বড়দানার উচ্চফলনশীল প্রজাতিকে নিয়ে রাজ্য স্তরে পরীক্ষা নিরীক্ষা হয়। প্রজাতিগুলি সম্ভাবনাপূর্ণ হওয়ায়

১৯৮৩-৮৪ সনে সেগুলি পাঠানো হয় “ভারতীয় কৃষি গবেষণা সংস্থা”য় (I.C.A.R.)। বিদেশে অগ্ৰাণ্য প্রজাতিদের সাথে পশ্চিমবাংলার এই প্রজাতি পাঁচটির সংযুক্ত পরীক্ষা-নিরীক্ষা (Co-ordinated Varietal Trial) হয়। ফলন, দানার সাইজ, গাছ প্রতি গুঁটির সংখ্যা, ইত্যাদি নানারকম চরিত্র নিয়ে তুলনামূলক পরীক্ষায় এই প্রজাতি পাঁচটি সফল হয় এবং I.C.A.R. কর্তৃক ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে এদের চাষের সুপারিশ করা হয়। ১৯৮৪-৮৫ সনে পশ্চিমবাংলায় মুসুরি গবেষণার ফলপ্রসূতি, ডব্লু-বি-এল-৫৮ উক্ত পরীক্ষাটিতে (C.V.T.) “প্রথম” হিসাবে নির্বাচিত হয় এবং পশ্চিম-বাংলার মুসুরি গবেষণার মানও উন্নীত হয়। একই সাথে পশ্চিমবঙ্গে মুসুরি উৎপাদনে বিরাট সম্ভাবনা সূচিত হয়।

ক্রমশঃ ‘মুসুরি সংকরীকরণ’ কর্মসূচী সম্প্রসারিত করা হচ্ছে বহরমপুর ডালশস্য ও তৈলবীজ গবেষণা কেন্দ্রে এবং গবেষণাও চলবে সমতালে। যতদিন পর্যন্ত পশ্চিমবাংলাকে এক গ্রামও মুসুরি বাইরে থেকে আমদানী করতে হচ্ছে ততদিন পশ্চিমবাংলায় মুসুরি গবেষণার অগ্রগতি অব্যাহত থাকবে।

মুসুরির ফলনের এই বিভিন্ন চাহিদা মেটাতে আজ পশ্চিমবাংলায় মুসুরি গবেষকগণ সমবেত-ভাবে কঠোর প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন এবং বহরমপুর ডালশস্য ও তৈলবীজ গবেষণা কেন্দ্রে তারই পথিকৃৎ।

ডালশস্যের গবেষণাগারে এ রাজ্যের জগ্রে উপযোগী যে সব মুসুরির জাত উদ্ভাবন করা হয়েছে তার একটি তালিকা পরপৃষ্ঠায় দেয়া হোল।

রাজ্যের ডালশস্ত্র গবেষণাগারে পশ্চিমবাংলার উপযোগী বিভিন্ন মুহুরির প্রজাতি :

চতুস্তর গবেষণায় পশ্চিমবাংলায় উদ্ভাবিত
মুহুরির প্রজাতি সমূহের বৈশিষ্ট্য

প্রজাতির নাম	হেক্টর প্রতি গড় ফলন (কুইঃ)	প্রতি শতটির ওজন দানার সাইজ (গ্রাঃ)	পাকতে সময় নেয়
আশা	৫.০—৬.০	১.৫৬	১৩৮ দিন
সি-৩১	৪.৫—৫.৫	১.৫৮	১৪০ „
বি-১৭৭	৬.০—৭.০	১.৬২	১৪০ „
বি-২৩৫	৬.৫—৭.৫	১.৬০	১৩৯ „
রঞ্জন	৬.০—৭.০	১.৫৭	১৩৭ „
ডব্লু-বি-এল-১০০ (সি)	৯.০—১০.০	২.৮০	১৩৮ দিন
ডব্লু-বি-এল-১২৩	৮.৫—৯.৫	২.৭০	১৪০ „
ডব্লু-বি-এল-১২	৯.৩—১০.৫	২.১৫	১২৬ „
ডব্লু-বি-এল-২৬	৭.০—৮.০	১.৭২	১৩৬ „
ডব্লু-বি-এল-৫৭	৯.০—১০.০	৩.০৩	১৩২ „
ডব্লু-বি-এল-৫৮	১০.৫—১২.৫	২.১৩	১৩৬ „
ডব্লু-বি-এল-৬৮	৯.০—১০.০	১.৭৫	১৪০ „
ডব্লু-বি-এল-১২ (এ)	৮.০—৯.০	১.৯০	৭৭ „
এফ-২০/২	১২.০—১৩.০	২.০৫	১২৭ „

* 'ডব্লু-বি-এল' সংকেতটি 'পশ্চিমবাংলার মুহুরি' অর্থে দেওয়া।



ডাল শস্য ও তৈল বীজের ঘাটতি পূরণে পয়রা চাষের ভূমিকা

প্রেমেন্দ্রনাথ রায়

মানুষের জীবনে শারীরিক পুষ্টির জগু ডাল ও তেলের প্রয়োজন অপরিসীম। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ এ রাজ্যে এই দুটি শস্যের চাষ ও উৎপাদন প্রয়োজনের তুলনায় কম। তার উপর এই দুটি শস্যের বাজার দরও দিনের পর দিন ক্রমবর্ধমান। তাই স্বাভাবিক কারণেই ডালশস্য এবং তৈলবীজের উৎপাদন বাড়ানো অত্যন্ত জরুরী। কিন্তু এলাকা বাড়িয়ে এই দুটি ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি করার সুযোগ অত্যন্ত সীমিত। কাজেই কৃষি প্রযুক্তিবিদরা আর কিভাবে ফসল দুটির উৎপাদন বাড়ানো যায় তা নিয়ে ভাবনা চিন্তা করছেন। দেখা গেছে, পশ্চিমবাংলায় অসেচ এলাকায় আমন ধানের পর অনেক জমি তিন-চার মাস পতিত পড়ে থাকে। এই সমস্ত জমিতে পয়রা চাষ করে এই দুটি ফসলের উৎপাদন বাড়ানোর সুযোগ আছে।

ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে পয়রা ফসলের চাষ আবহমানকাল থেকেই প্রচলিত। মধ্যপ্রদেশ, বিহার, ওড়িশা, অন্ধ্র, মহারাষ্ট্র, তামিলনাড়ু, পশ্চিমবঙ্গ প্রভৃতি রাজ্যে এখনও চাষীরা পয়রা চাষ করে থাকেন।

গবেষণা আধিকারিক, ডালশস্য ও তৈলবীজ গবেষণা কেন্দ্র, বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ।

আবহাওয়া ও জমির প্রকৃতিভেদে খেসারী, ছোলা, মুন্সুরি, মুগ, কলাই, মটর, তিসি, কুন্ডুম, সরগুজা প্রভৃতি বিভিন্ন ফসলই পয়রা হিসাবে চাষ করা যায়। আবার মিশ্রচাষ হিসাবে তৈল জাতীয় শস্য তিসির সঙ্গে যে কোনও একটি ডাল জাতীয় শস্য যেমন ছোলা, কলাই বা মুগও পয়রা হিসাবে বোনা চলে।

পয়রা চাষে ফলনের যথেষ্ট সম্ভাবনা থাকে। সত্ত্বেও খুবই অল্পে এর চাষ হয় বলে চাষীরা আশাশ্রিত ফলন পান না। মাঠে কেবল বীজটুকু বুনে দিয়েই চাষী পয়রা চাষে তাঁর কর্তব্য সমাধান করেন। কিন্তু এই অবহেলিত ফসল চাষে কিছুটা সচেতন ও সামান্য যত্নশীল হয়ে অসেচ এলাকার ব্যাপক অঞ্চলে এর চাষ বাড়ালে যেমন পয়রা ফসলও লাভজনক ফসল হিসাবে ঘরে তোলা যাবে তেমনি ডাল ও তৈল-শস্যের ঘাটতি পূরণে বিরাট সহায়তা হবে।
পয়রা ফসল কি?

অসেচ এলাকায় আমন ধান কাটার পর যে সমস্ত জমি তিন চার মাস পতিত থাকে সেই সমস্ত জমিতে মাটির সঞ্চিত রসের সদ্যাবহার করে

বসন্ত : কার্তিক : ১৩২২

ফসলের নাম : একর প্রতি বীজের হার :

মুগ : ১৬—২০ কেজি

কলাই : ১৬—২০ কেজি

তিসি : ১২—১৫ কেজি

বোনার আগে বীজ শোধন করে নিতে পারলে

ভাল হয়। ডাল জাতীয় শস্তকে প্রতি

৩ গ্রাম থাইরাম এবং অল্প ফসল ডাইথেন এম-৪৫

দিয়ে বীজ শোধন করে নিলে ভালো হয়।

‘রাইজোবিয়াম’ জীবাণু সারের ব্যবহার

ধানের জমি জলে ভোবা থাকে বলে জমির

‘রাইজোবিয়াম’ জীবাণু সার নষ্ট হয়ে যাওয়ার

সম্ভাবনা থাকে কাজেই বোনার আগে বীজ

‘রাইজোবিয়াম’ জীবাণু সার মাখিয়ে নিয়ে বীজ

বুনলে ভালো হয়। ‘রাইজোবিয়াম’ জীবাণু সার

না পেলে যে ডাল জমিতে আগের বছর নীরোগ

ডাল জাতীয় শস্ত ছিল ফসল ভেঙ্গে সেই জমির

বেশ কিছু মাটি এনে পয়রা ফসল বোনার আগে

ছিটিয়ে দিলেও ভালো ফল পাওয়া যায়।

বীজ বোনা

বীজ বোনার সময় কিছুটা সাবধানতা নেওয়া

প্রয়োজন। বোনার সময় হাত নীচু করে

এমনভাবে বীজ ছিটাতে হবে যাতে বীজ হতটা

সম্ভব ধানের ছুই সারির মাঝখানে পড়ে।

রাখা প্রয়োজন যাতে বীজ, ধানগাছের পাতার

গোড়ায় যেন আটকে না যায়। ছিটানোর পর

বীজ পা দিয়ে চেপে দিলে খুব ভালো হয়।

এতে বীজ কাদায় গেঁথে যাবে। বোনার পর

লাইন ধরে কয়েকবার হাঁটা চলা করলেও ভাল

ফল পাওয়া যায়।

জৈব সার ও রাসায়নিক সার প্রয়োগ

ধানের জমিতেই পয়রা ফসলের চাষ করা

হয়। পয়রা ফসলের জন্তু আলাদা সার দেওয়ার

সুযোগ নেই। কাজেই ধান চাষের আগে ঐ

জমিতে প্রচুর গোবর সার প্রয়োগ করা

প্রয়োজন। গোবর সার প্রয়োগে মাটির গঠন

প্রণালীর উন্নতি হয় এবং পয়রা ফসলের শিকড়

অতি সহজে মাটির গভীরে প্রবেশ করতে পারে।

পয়রা চাষের জন্তু রাসায়নিক সার প্রয়োগের

সুপারিশ করা আপাত দৃষ্টিতে বিলাসিতা বলেই

মনে হবে। তবুও যদি ধানের জমিতে ডাল

জাতীয় পয়রা ফসলের জন্তু সামান্য ৮ কেজি

(একর প্রতি) ফসফেট যুক্ত সার এবং তিসি

জাতীয় ফসলের জন্তু একর প্রতি ৪ কেজি

নাইট্রোজেন সার অতিরিক্ত প্রয়োগ করা যায়

তবে ধানের ফলন যেমন বাড়বে পয়রা ফসলের

ফলনও বাড়বে।

আগাছা দমন

পয়রা চাষে আলাদা করে আগাছা দমন

করা হয় না। মূল ধানের জমি যদি আগাছা মুক্ত

থাকে তবে পয়রা ফসলও ভাল বাড়তে পারবে।

কাজেই যেসব ধান জমিতে পয়রা চাষ করা হবে

সেই জমি যাতে আগাছা মুক্ত থাকে সেই দিকে

নজর দিতে হবে। আর একটি ব্যাপারে বিশেষ

নজর রাখা দরকার। ধানের জমিতে যদি

ক্ষতিকারক শ্রাওলার আক্রমণ পড়ে থাকে তবে

পয়রা ফসলের চারা বের হতে পারে না।

কাজেই সেইরকম অবস্থা থাকলে পয়রা ফসল

বোনার আগেই ধানের জমি শ্রাওলার আক্রমণ

মুক্ত করা বিশেষ প্রয়োজন।

আবহাওয়া

পয়রা শস্ত বোনার পর বৃষ্টি হলে পয়রা

ফসলের বিশেষ ক্ষতি হয়। সাধারণতঃ পয়রা

ফসল বোনার মরহুমে বৃষ্টিপাত বিশেষ একটা হয় না। কোন কোন বছর বৃষ্টির সম্ভাবনা দেখা দিলে বোনার আগেই সচেতন হলে ক্ষতির হাত থেকে রেহাই পাওয়া যায়।

ধান কাটার সময় সতর্কতা

ধান কাটার সময়ে পয়রা ফসলের কচি চারায় আঘাত লাগবেই। তবুও ধান কাটার সময়ে কিছুটা সাবধানতা অবলম্বন করা যেতে পারে। বিশেষ করে মাঠে মৃগ বা কলাই জাতীয় ফসলে ডগা কাটা পড়লে বিশেষ ক্ষতি হবে। ধানগাছ যতটা সম্ভব গোড়া ঘেঁসে কাটা উচিত। এতে পয়রা ফসল স্বছন্দে বাড়তে পারবে। তবে খেসারী বা মটরের বেলায় গোড়া ঘেঁসে ধান কাটার দরকার হয় না। ধানের কাটা গোড়া খেসারী গাছকে উপরে উঠতে সাহায্যই করে। ধানকাটা জনিত আঘাত একবার কাটিয়ে উঠতে পারলে খেসারী, ছোলা, তিসি প্রভৃতি ফসলের বাড় খুব ভালো হয়। আর একটি বিষয়ে নজর রাখা প্রয়োজন। ধান কাটার পর ধানের গোছা ৪-৫ দিনের বেশী যেন

জমিতে না পড়ে থাকে।

পয়রা ফসল চাষে প্রতিবন্ধকতাগুলি হলো অসময়ে বৃষ্টিপাত, শিকড় ঠিকমতো গভীরে না যেতে পারা, ধানজমির শক্ত মাটি, আগাছার সঙ্গে প্রতিযোগিতা, পয়রা ফসল চাষের উপযুক্ত জাত সম্বন্ধে সঠিক তথ্য না জানা এবং রোগ ও পোকাকার উপদ্রব ইত্যাদি। একমাত্র অসময়ের বৃষ্টি জনিত ক্ষতি ছাড়া আর যে কোনও প্রতিবন্ধকতাই কাটিয়ে ওঠা সম্ভব।

তবুও বলা যায় ব্যাপকভাবে পয়রা ফসল চাষ করে ডালশস্ত্র ও তৈলবীজের ঘাটতি পূরণে যথেষ্ট সাহায্য করা যায়।

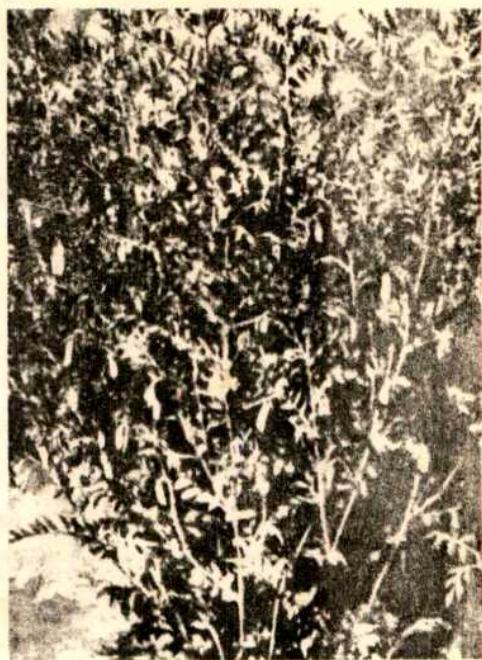
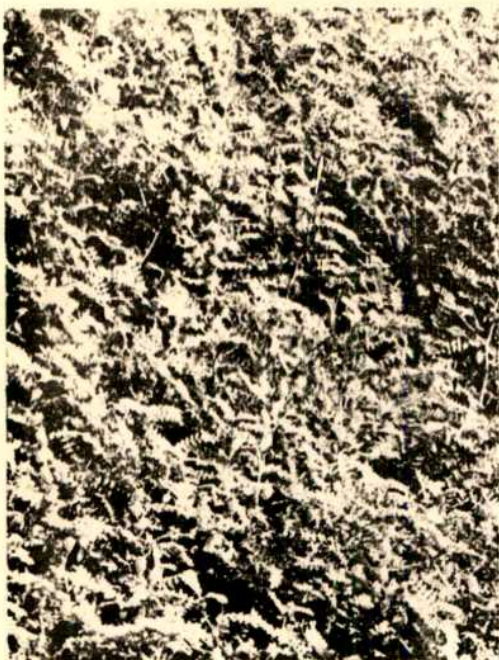
গবেষণার ফল

বহরমপুর ডালশস্ত্র ও তৈলবীজ গবেষণা কেন্দ্রের খামারে ধানের চাষ না হওয়ায় এ ব্যাপারে ব্যাপকভাবে কোন কাজ করা সম্ভব হয়নি। তবে যে জমিতে ধান হয় সেদিক দিয়ে সরকারী কৃষি খামারে কয়েকটি ফসল পয়রা হিসাবে চাষ করে মোটামুটি ফল পাওয়া গিয়েছে। কয়েকটির বিবরণ উল্লেখ করা হলো।

সারণী

ফসলের নাম	ভাকুরী খামার	গড়বেতা খামার
জাত	১ম বৎসর	২য় বৎসর
খেসারী (নির্মল)	৩০০	৬১২
খেসারী (পি-২৪)	১৫০	১৫০
মুহুরি (আশা)	১৫০	১৫০
ছোলা (মহামান্না-১)	১৫০	১৫০
তিসি (নীলা)	১৫০	১৫০

। আরও তথ্য জানতে চাইলে ডায়ালেক্টর ডায়ালেক্টর ডায়ালেক্টর



ছোলা-মুসুরের চাষ

বাঙ্গালীর প্রধান খাদ্য ডাল-ভাত। অথচ ডাল উৎপাদনে পশ্চিমবঙ্গ অনেক পিছনে। চাষ পরিকল্পনার সাহায্যে রদবদল করে ডাল চাষের বাড়তি সুযোগ করা যায়, উৎপাদন বাড়ানো যায়। যেমন,

- অ-সেচ এলাকায় পাট, আউশ, জলদি আমন ধান কাটার পর আশ্বিন-কার্তিক মাসে ছোলা মুসুর বুনুন।
- রবিতে মিশ্রচাষ হিসাবে সরষে+ছোলা বা মুসুর+গম বা গম+ছোলার চাষ করা যায়।
- সময়ে বুনলে অল্প খরচে এটি লাভজনক বাড়তি চাষ।

জমি

সব মাটিতে মুন্সুরের চাষ হয়। অল্প ও নোনা মাটি ছাড়া সব মাটিতেই ছোলার চাষ করা যায়। জল বসা জমিতে ডাল শস্তের চাষ ভাল হয় না। তাই বেলে দোআশ বা দোআশ মাটিতে এই সব ফসলের চাষ ভাল হয়।

জমি তৈরি

ছোলার জমি জমি খুব খুব-খুব করার দরকার হয় না। মুন্সুরের জমি জমি অপেক্ষাকৃত ভাল ভাবে তৈরী করতে হবে।

সার প্রয়োগ

চাষ দেবার পর একর পিছু ৬-৮ গাড়ী জৈব সার এবং ১৬ কেজি ফসফেট দিন। আরসব গুটি জাতীয় ফসলের মত ডাল শস্তেও নাইট্রোজেন সার লাগে না, ফসল শিকড়ের গুটি থেকে ঐ সার পায়। কিন্তু শিকড়ের ঐ গুটি ভালভাবে তৈরী করার জমি ফসফেট দরকার।

সুপারিশ মত জৈব সার না দিলে ছোলায় একরে ৪ কেজি নাইট্রোজেন লাগবে; কিন্তু মুন্সুরে ৮ কেজি নাইট্রোজেন সব সময়ই দেবেন। ফসফেট ও নাইট্রোজেন সার জৈব সারের সঙ্গে মূল সার হিসাবে দিতে হবে।

উন্নত জাত

পশ্চিমবঙ্গের উপযোগী উন্নত জাতগুলি হল :

ফসল	জাত	বিশেষ গুণ
ছোলা	মহামায়া—১	আকারে বড়, ঢলে পড়া
	মহামায়া—২	রোগ প্রতিরোধক্ষম।
মুন্সুর	আশা	দানা মাঝারি, ছাই রং।

বীজশোধন

বোনার আগে প্রতি কেজি বীজে দেড় গ্রাম থাইরাম ও দেড় গ্রাম ব্রাসিকল-৭৫ মিশিয়ে বীজ শোধন করে নিন।

জীবাণুসার ব্যবহার করলে প্রতি কেজি বীজে শুধু ডায়থেন এম-৪৫ দিয়ে বোনার ৭ দিন আগে বীজ শোধন করবেন। অস্থায়ী জীবাণুসারের উপকারিতা থাকবে না।

বসুন্ধরা : কার্তিক : ১৩৯২

বীজ বোনা

কার্তিক মাসের প্রথম থেকে তৃতীয় সপ্তাহ পর্যন্ত মুনুর এবং পুরো অগ্রহায়ণ মাসে ছোলা বোনার উপযুক্ত সময়। অগ্রহায়ণ মাসের প্রথম সপ্তাহেও মুনুর বোনা যায় তবে ফলন কম হয়, দানা ছোট হয়।

মুনুর প্রতি একরে ১২-১৪ কেজি ছিটিয়ে বুনবেন। ছোলা সারিতে বুনলে ৪০ সেমি. $\times$ ২০ সেমি. বা ১২ ফুট $\times$ ৮ ইঞ্চি, ২০ কেজি বীজ লাগবে।

অগ্রহায়ণ মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে বুনলে দূরত্ব কম দেবেন (৩০ সেমি $\times$ ১০ সেমি বা ১ ফুট $\times$ ৪ ইঞ্চি)। ছিটিয়ে বুনলে ছোলার বীজের হার হবে একরে ২৫-৩০ কেজি। জমির রসের উপর বীজের হার কম-বেশী হবে।

জীবাণু সারের ব্যবহার

যে সব জমিতে মুনুর ও ছোলার জীবাণু নতুন করা হবে সেখানে জীবাণু সারের ব্যবহার বা যে জমিতে আগে ঐ ডাল শস্যের চাষ হয়েছে, সেই জমির কিছু মাটি ব্যবহার করা দরকার। অল্পখায় ডাল জাতীয় ফসলের শিকড়ে যে নাইট্রোজেন সংগ্রহকারী গুটি ধরে সে গুটি থেকে গাছ নাইট্রোজেন পাবে না, ফলন কম হবে। জীবাণু সার ব্যবহারের জঙ্ঘ নিম্নলিখিত প্রয়োগবিধি অবশ্যই মেনে চলবেন।

- (১) বোনার আগে বীজ কিছু সময় জলে ভিজিয়ে নেবেন।
- (২) জীবাণু সার নির্দেশ মত বীজে মাখিয়ে বীজ রেখে দেবেন না। ছায়াতে শুকিয়ে তখনই বুনবেন।
- (৩) যদি বীজ-শোধন ওষুধ ব্যবহার করেন তবে তা বীজ বোনার ৭ দিন আগে শোধন করে রাখবেন।
- (৪) ভিন্ন ভিন্ন ডাল শস্যের জীবাণু সার আলাদা। অতএব নির্দিষ্ট জীবাণু সার বিশেষ ডাল শস্যের জঙ্ঘ ব্যবহার করবেন।

সেচ পরিচর্যা

সাধারণতঃ কোন সেচ লাগে না। তবে বোনার সময় মাটিতে উপযুক্ত রস না থাকলে একটা হালকা সেচ দিয়ে বীজ বোনা দরকার।

চারা বেরোবার ৩ সপ্তাহ ও ৬ সপ্তাহ পরে আগাছা নিড়িয়ে দিন।

রোগ-পোকা

চলে-পড়া রোগ মাঝে মাঝে দেখা যায়। এই রোগ দেখা গেলে ২-৩ বছর ঐ জমিতে এই চাষ বন্ধ রাখুন। এ ছাড়া ছোলাতে মরচে রোগ বা ধসা রোগ মাঝে মাঝে হয়।

ছোলাতে শুঁটি ছিদ্রকারী পোকা ক্ষতি করে। এর কীড়া লম্বায় দেড় ইঞ্চি ও সবুজ রং-এর। আক্রান্ত ক্ষেতে প্রতি লিটার জলে ২ মিলি এণ্ডোসালফান অথবা কুইনালফস বা ফেনিট্রোথায়ন মিশিয়ে ভালভাবে স্প্রে করুন। প্রতি একরে ৩০০ লিটার জল লাগবে। ওষুধ ছেটানোর পর অন্ততঃ ১৫ দিন কাঁচা ছোলা বা শাক খাবেন না, গরুকে খাওয়াবেন না।

ফসল তোলা

সাধারণতঃ ১২৫-১৩০ দিনে মুসুর এবং ১৩০-১৪০ দিনের মধ্যে ছোলা কাটার উপযুক্ত হয়। সময়ে ফসল না তুললে শুঁটি ফেটে বীজ মাটিতে ঝরে পড়ে। শুঁটি ঠিকমত পেকে গেলে গাছের পাতা শুকিয়ে যায়। তখনই ফসল তোলার উপযুক্ত সময়। ভোরের দিকে ফসল কাটলে শুঁটি ঝরে কম।

কাটা ফসল ভালভাবে মাড়াই-ঝাড়াই করে দানা বার করে নিন। দানা বা বীজ রোদে ভাল করে শুকিয়ে নিয়ে ঘরে তুলুন। কিছুদিন অন্তর মধ্যে-মধ্যে ভাল কড়া রোদে শুকিয়ে ঠাণ্ডা করে মুখ-বন্ধ মাটি বা টিনের পাত্রে রাখবেন, এতে পোকা লাগবে না। বীজের অঙ্কুরোদগম-ক্ষমতা বজায় থাকবে।

পয়রা চাষ এবং মিশ্র চাষ

আমন ধানের ক্ষেতে ধান কাটার ২-৩ সপ্তাহ আগে কার্তিক মাসে এবং কার্তিক-অগ্রহায়ণ মাসে ছোলা ছিটিয়ে পয়রা চাষ করা হয়। ধান কাটার আগে শেষ বারের মত জল বার করে দেবার পর মাটি যখন ভিজে থাকে তখনই মুসুর একর-প্রতি ৩০ কেজি এবং ছোলা ৪০-৪৫ কেজি ছিটাবেন। ধানের মধ্যে বুনলে ছোলা বীজ কলিয়ে নিয়ে বুনলে ভাল হয়।

ছোলা-মুসুরের সঙ্গে তিসি মিশ্র চাষ হিসাবে করা যায়। একরে ৮-৯ কেজি মুসুর এবং ১ কেজি তিসি বা ১৪ কেজি ছোলা ও ২ কেজি তিসি মিশ্র চাষ হিসাবে ছিটিয়ে বুনুন। এতে লাভ বেশি। আর ছোলা মুসুরের চলে-পড়া রোগও কম হয়। এ ছাড়া সরষের সঙ্গে ছোলার বা মুসুর এবং গমের সঙ্গে ছোলার মিশ্র চাষও করা যায়।

ধানের চাষ

ডঃ রাধাগোবিন্দ মাইতি

ধনের ব্যবহার প্রাচীনকাল থেকে চলে আসছে। রাশিয়া, উত্তর আফ্রিকা, ইরান, প্যালেস্টাইন, পাকিস্তান, ভারত, ব্রহ্মদেশ ও দক্ষিণ আমেরিকায় ধনের চাষ হয়। ভারতে তামিলনাড়ু, অন্ধ্রপ্রদেশ, মাদ্রাজ, মধ্যপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র, গুজরাট, রাজস্থান ও বিহার প্রধান ধনে উৎপাদনকারী রাজ্য। কিছুদিন ধরে পশ্চিম-বাংলার নদীয়া, চব্বিশ পরগণা প্রভৃতি জেলার কোন কোন এলাকায় ধনের ব্যাপক চাষ হচ্ছে।

জলবায়ু ও মাটি

অপেক্ষাকৃত ঠাণ্ডা মরসুমে ধনে ভাল হয়। তবে পাতার জন্ত একমাত্র গ্রীষ্মকাল ছাড়া অন্য যে কোন সময়ে ধনে বোনা যায়। ধনে গাছের ডালপালা সরু সরু ও হালকা ধরণের। তাই বেশী বৃষ্টি হলে বা সেইসঙ্গে বাতাস বইলে গাছ ভেঙ্গে পড়ে অথবা মাটির সঙ্গে লেপটে যায়। অনবরত বৃষ্টির ফলে মাটি স্যাঁতসেঁতে থাকলে পাতা হলদে হয়ে গোড়া পচে গাছ মরে যায়। তাই ভারী বৃষ্টি ও জোর বাতাস বা লাগাতার ঝিমঝিম বর্ষা ধনে চাষের পক্ষে ক্ষতিকর।

নানা ধরণের মাটিতে ধনে হয়। দক্ষিণ ভারতের কাল মাটি ধনের পক্ষে খুবই উপযুক্ত।
অধ্যাপক, বিধানচন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, কল্যাণী।

বলে ঐ অঞ্চলে প্রচুর ধনের চাষ হয়। দো-আঁশ জমিতেও ভাল ধনে জন্মায়। এঁটেল, দো-আঁশ এবং বেলে দো-আঁশ জমিতেও ধনে লাগানো যায়। তবে জমিতে যেন সারাদিন রোদ লাগে এবং জল নিকাশের ভাল ব্যবস্থা থাকে।

জমি তৈরী

পাট বা আউশ ধানের ফসল কাটার পর ভাদ্রের শেষে বা আশ্বিনে জমি থেকে পূর্ববর্তী ফসলের গোড়া এবং ঘাস তুলে ফেলে চার-পাঁচবার চাষ দিয়ে মাটি বুঝবুঝে করে ফেলুন। অল্প জমিও ধনের জন্ত ব্যবহার করা যায়। দ্বিতীয় চাষের সময় একর প্রতি ১০ টন গোবর সার বা খামারপচা সার ছড়িয়ে ভালভাবে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিন। শেষ চাষের সময় দিন ২০ কিলোগ্রাম ইউরিয়া বা ৪৫ কিলোগ্রাম এ্যামোনিয়াম সালফেট। এইভাবে তৈরী জমিকে ১০ ফুট X ১০ ফুট মাপের কেয়ারীতে ভাগ করে প্রতি হু' সারি কেয়ারীর মাঝ বরাবর এক ফুট চওড়া নালা তৈরী করুন। নালা বানাবেন জমির চেয়ে অল্প নীচু করে। তাহলে এই নালায় সাহায্যে সেচ ও জল নিকাশ—হু' কাজই চলবে।

বীজ বোনা

এক একর জমির জম্ম ৫-৬ কিলোগ্রাম বীজ লাগে। কার্তিক মাসে ধনে বুনতে হয়। Sel 81, Sel 130, C.J.S. 267, D.K.S. 45, No. 5363 প্রভৃতি ধনের উন্নত জাত। উন্নত মানের বীজ জোগাড় করে বুনুন। যতদূর সম্ভব পুষ্ট ও চকচকে বীজ কিনবেন। চব্বিশ পরগণা জেলার বনগাঁ ও বাগদা এলাকায় ব্যাপক হারে ধনের চাষ হয়। এই এলাকার চাষীদের কাছে বা বীজ ভাণ্ডারে ভাল ধনেবীজ পাওয়া যাবে।

ধনের অংকুরোদগম ক্ষমতা ছ' বছর পর্যন্ত ভালভাবে বজায় থাকে। তবু বোনার আগে পরীক্ষা করে নেওয়া ভাল। গুনে গুনে একশ' ধনেবীজ নিয়ে ১০-১২ ঘণ্টা জলে ভিজিয়ে রেখে তারপর একটি শ্রাকড়ায় বেঁধে সারির গাদার গরমে চাপা দিয়ে রেখে দিন। চার-পাঁচ দিনে অংকুর বেরিয়ে যাবে। শতকরা সত্তরটার কম অংকুরিত হলে বুঝবেন, সে বীজ ভাল নয়। হয়ত পরিমাণের চেয়ে বেশী বীজ বুনলে জমি গাছে ঢেকে যেতে পারে। কিন্তু সেই গাছ অপেক্ষাকৃত দুর্বল হবে এবং ফলন কম হবে।

ধনে দেখতে গোল, কিন্তু ওতে ছোটো বীজ থাকে। তাই বোনার আগে হাতে রগড়ে বীজগুলো আলাদা করে দিন। প্রতি লিটার জলে আধ গ্রাম দ্রবণীয় সেরেসান ওষুধ মিশিয়ে সেই জলে ১০-১২ ঘণ্টা ভিজিয়ে তারপর ছিটিয়ে অথবা এক ফুট দূরে দূরে সারিতে বীজ বুনবেন। সারিতে বুনলে নিড়ানি এবং অগ্রাশ্র পরিচর্যা করতে সুবিধা হয়। ভিজা বীজ খানিকক্ষণ ছায়ায় বিছিয়ে রাখলে অথবা শুকনো ছাই মিশিয়ে নিলে বোনার সুবিধা হয়।

ফসলের যত্ন

ভিজিয়ে বুনলে আট-দশ দিনে বীজ থেকে চারা বেরিয়ে যায়। শুকনো বুনলে কুড়ি-বাইশ দিন সময় লাগে। চারা ইঞ্চি দুয়েক লম্বা হলে জমি নিড়িয়ে ফসল পাতলা করে দিন। ছিটিয়ে বোনা জমিতে ছ-সাত ইঞ্চি দূরে দূরে একটা করে চারা রেখে বাকীগুলো উঠিয়ে দিন। সারিতে বুনলে চারার দূরত্ব থাকবে পাঁচ-ছ' ইঞ্চি। দ্বিতীয় নিড়ানি দিতে হবে এক মাস পরে। গাছে ফুল ধরার পর নিড়ানি দিলে বা জমিতে ঘোরাফেরা করলে ভাল ভেঙ্গে গাছের ক্ষতি হয়।

সেচ

মাটিতে রস কম থাকলে বোনার পরই একবার সেচ দেওয়া দরকার। কিন্তু এর ফলে কিছু বীজ মাটির এত গভীরে চলে যায় যে তার থেকে চারা বের হতে পারে না। তাই দরকার হলে বোনার আগে সেচ দিয়ে তারপর জো এলে বীজ বোনা উচিত। জমিতে চারা বেরিয়ে যাওয়ার পর যখনই উপরেব মাটি দেড় থেকে ছ' ইঞ্চি শুকিয়ে মাঝে-তখনই সেচ দেওয়া উচিত। ছপূরের দিকে গাছ সাময়িকভাবে ঝিমিয়ে গেলে অনেকে জমিতে সেচ দেওয়া প্রয়োজন বলে মনে করেন। সেচের সময় নির্ধারণের এটাও একটা উপায়। কিন্তু জমিতে নাইট্রোজেন বেশী থাকলে রস থাকা সত্ত্বেও গাছ ছপূরে ঝিমিয়ে যেতে পারে। অভিজ্ঞতার দ্বারাই সেচের সময় নির্ধারণ করতে হবে। জমিতে বেশী রস থাকা বিপদজনক। সেক্ষেত্রে গোড়া-পচা রোগে ফসল নষ্ট হয়ে যাওয়ার ভয়।

ফসল তোলা

ফসল পাতলা করার সময় উপড়ানো চারা

বহুধরা : কার্তিক : ১৩৯২

‘ধনে পাতা’ হিসাবে বিক্রী করা যায়। পাতার জন্ম বুনলে জমিতে অনেক ঘন চারা রাখা দরকার। গাছ যখনই পাঁচ-ছ’ ইঞ্চি বড় হবে তখনই উপর থেকে পাতা কেটে বাজারে পাঠাতে হবে। বেশী ঘন জায়গা থেকে প্রথমের দিকে কিছু চারা উপড়ে পাতলা করে দেওয়া দরকার। একরে পাঁচ-ছ’ কুইন্টাল পাতা পাওয়া যায়। গাছে ফুল আসার আগেই ক্ষেত খালি করে ফসল তুলে নিতে হয়। অনেকে গাছে কুঁড়ি এলে পাতা তোলা বন্ধ করে দেন। এভাবে কিছুটা ধনেও পাওয়া যায়।

পুরো ফলন পেতে হলে কিছুতেই পাতা তোলা চলবে না। বোনার প্রায় ছ’ মাস পরে গাছে ফুল আসে। আরও মাস দেড়েক পরে ফসল কাটার উপযোগী হয়ে যায়। ফলের গোছা হলদেটে হলে গাছ কেটে কয়েকদিন গাদা করে রাখুন। তারপর রোদে খটখটে করে শুকিয়ে ডাণ্ডা দিয়ে শিটিয়ে বা পা দিয়ে মাড়িয়ে গাছ থেকে বীজ আলাদা করুন। ঝেড়ে পরিষ্কার করে আর একবার রোদে শুকিয়ে বস্তাবন্দী করে গুদামে রাখুন বা বাজারে পাঠান। এক একর ডাল ফসল থেকে ৪০০ থেকে ৫০০ কিলোগ্রাম ধনে পাওয়া যায়। ডাল চাষীরা ৯৭০ কেজি পর্যন্ত ফলন পেয়েছেন।

রোগ

ধনের মারাত্মক রোগ হল পাউডারী মিলডিউ। শীতের দিনে হঠাৎ মেঘলা করে ঠাণ্ডা কমে গেলে এই রোগ দেখা দেয়। মনে হয়, ফসলের উপর কেউ যেন সাদা পাউডার ছড়িয়ে দিয়েছে। আগে গন্ধকের সূক্ষ্ম গুঁড়ো

ছড়িয়ে এই রোগ দমন করা হত। এখন গন্ধকের দাম বেড়ে যাওয়ায় দামে পোষায় না। তাই প্রতি লিটার জলে তিন গ্রাম হিসাবে সালট্রাফ বা ছ’ মিলিলিটার কেলথেন বা কেরাথেন মিশিয়ে স্প্রে করে পাউডারী মিলডিউ দমন করুন।

ধনের গোড়া-পচা রোগে সারা জমির ফসল মরে শেষ হয়ে যায়। হঠাৎ এই রোগ দেখা দেয়; মাটির কাছাকাছি গাছের গোড়ায় পচন ধরে। একই জমিতে বার বার ধনে বুনলে এই রোগ হতে পারে। মধ্যপ্রদেশ সরকারের কৃষি বিভাগ কর্তৃক আবিষ্কৃত 5363 নম্বর জাতের ধনের এই রোগ প্রতিরোধের ক্ষমতা আছে। জমিতে রস বেশী না থাকলে, সারাদিন রোদ লাগলে এবং গাছ পরিমাণমত পাতলা থাকলে এই রোগ কম হয়।

কীটশত্রু

জাব পোকাই ধনের প্রধান কীটশত্রু। কালচে রঙের ক্ষুদে ক্ষুদে পোকাকুলি গাছের নরম ডাল, পাতা, ফুল ও ফলে ছেয়ে ফেলে এবং রস চুষে খেয়ে ফসলের খুব ক্ষতি করে। আক্রমণ বেশী হলে পাতা হলুদ হয়ে গাছ শুকিয়ে মরে যায়। সাধারণতঃ গাছে ফুল-ফল ধরার সময় জাব পোকাকার আক্রমণ বেশী হয়।

প্রতি লিটার জলে এক মিলিলিটার হিসাবে মেটাসিস্টক্স ২৫ ই.সি. বা আধ মিলিলিটার হিসাবে ডিমেক্রথ ১০০ ই.সি. স্প্রে করলে ২৪ ঘণ্টায় জাব পোকা মরে যায়। ওষুধ কার্যকরী হলে ১৫ মিনিটেই পোকা মরতে শুরু করে। মরত্মমে একাধিকবার জাব পোকাকার আক্রমণ শুরু হতে পারে। তখন বারবার ওষুধ দিতে হয়।

সরষে চাষের উন্নত প্রথা

তৈলবীজের ঘাটতি মেটাতে সরষে চাষের উপর যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। কৃষকরাও এখন সরষের চাষে খুব আগ্রহী। কারণ এটি খুব অর্থকরী ফসল। এর চাষ করে নিশ্চয়ই তাঁরা ভাল ফলন পেতে চান। এখানে সরষের উন্নত প্রথায চাষ সম্বন্ধে বলা হলো।

পাট বা আউশ ধান কেটে সরষের চাষ করে একটি বাড়তি ফসল সহজেই তোলা যায়। এর জন্ম জলদি জাতের অধিক ফলনশীল ধান এবং চৈত্র-বৈশাখ মাসে বোনার উপযোগী পাট চাষের পরিকল্পনা শুরুতেই নিতে হবে।

জমি নির্বাচন

সেচের সুব্যবস্থাযুক্ত বেলে দো-আশ ও দো-আশ মাড় সরষে চাষের উপযোগী। জল নিকাশী ব্যবস্থায়ুক্ত এঁটেল মাটিতেও সরষে হয়।

অল্প মাটিতে ফলন আশানুরূপ হয় না, এ ধরনের মাটিতে প্রয়োজন মত চুন, ডলোমাইট বা বেসিক স্ল্যাগ দিয়ে অল্প শোধন করে নিন। চুন বা ডলোমাইট প্রাক খরিক খঙ্গে দেওয়া বাঞ্ছনীয়।

উন্নত জাত

পশ্চিমবাংলায় টোরি বা মাঘি, রাই বা চৈতি এবং শ্বেত সরষের চাষ হয়। নিম্নলিখিত জাতগুলি এই রাজ্যের উপযোগী।

(১) অগ্রণী (টোরি বি-৫৪): গাছ বেঁটে, শাখাবহুল, কাণ্ড সবুজ, পাতা মসৃণ এর দানা ছোট, গোল বা ডিম্বাকৃতি, পুষ্ট, হালকা বাদামী রংয়ের এবং খোসা মসৃণ। আশ্বিনের মাঝামাঝি থেকে কার্তিকের প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত বোনা চলে। ৭০-৭৫ দিনের মধ্যে কাটার উপযুক্ত হয়। একর প্রতি ফলন ৫ কুইন্টাল। তেলের পরিমাণ শতকরা ৪০ ভাগ।

(২) বিনয় (শ্বেত সরষে বি-২): রাই সরষের চেয়ে গাছ কিছু ছোট। দানা বড়, গোল, মসৃণ, ও ফিকে হলদে রংয়ের। আশ্বিনের মাঝামাঝি থেকে কার্তিকের প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত বোনা চলে। ৯০-৯৫ দিনে পাকে। একর প্রতি ফলন ৬ কুইন্টাল। তেলের পরিমাণ শতকরা ৪৬ ভাগ।

(৩) সীতা (রাই বি-৮৫) : গাছ লম্বা, শাখাবহুল, দানা আকারে টোরির চেয়ে ছোট। গোল বা ডিম্বাকৃতি কালচে রংয়ের এবং খোসা কৌচকানো। কার্তিকের মাঝামাঝির মধ্যে বুনতে হবে। এর পরে বুনলে ফলন কম হবে। বিনা সেচের চাষে পাকতে ৮০-৯০ দিন এবং সেচের চাষে আরও ১০-১৫ দিন বেশী লাগে। একর প্রতি ফলন ৭ কুইন্টাল। তেলের পরিমাণ শতকরা ৪০ ভাগ।

(৪) বরুণা (রাই টি-৫৯) : গাছ লম্বা, দানা বড়। পাকতে ১১৫-১২০ দিন লাগে। আশ্বিনের মাঝামাঝি থেকে কার্তিকের তৃতীয় সপ্তাহের মধ্যে বুনলে ফলন ভাল হয়। একর প্রতি ফলন ৯ কুইন্টাল। তেলের পরিমাণ শতকরা ৩৭ ভাগ।

(বীজে যে পরিমাণ তেল আছে তার সবটা পিষে ঘানিতে বের করা যায় না, ঘানিতে ভাঙ্গালে শতকরা ৬-৭ ভাগ কম তেল পাওয়া যায়)।

সেচবিহীন এলাকায় জমির জো বুঝে সীতা (রাই বি-৮৫) ও অগ্রণী (টোরি বি-৫৭) এর চাষ করা যায়। তবে আশ্বিনের দ্বিতীয় পক্ষের মধ্যে বোনা শেষ করতে হবে। পাট বা আউশ ধানের পর টোরি এবং অধিক ফলনশীল আমন বা জলদি দেশী আমনের পর রাই ও শ্বেত সরষের চাষ করা যায়।

জমি তৈরি

সরষের জমি এমনভাবে তৈরি করতে হবে যেন মাটি বুরবুরে হয়, জমি সমতল থাকে এবং জল কোথাও না জমে। জমি তৈরির সময় ৮-১০ গাড়ী জৈব সার দিন। মাটি পরীক্ষা করে নিয়ে স্তুপারিশ মত রাসায়নিক সার দেওয়া উচিত। তা না হলে নীচের হারে মূল সার প্রয়োগ করুন।

জাত	একর প্রতি কেজিতে		
সেচপ্রাপ্ত এলাকা	নাইট্রোজেন	ফসফেট	পটাশ
(১) টোরি	৮	৮	৮
(২) রাই ও খেত সরষে	১০	১০	১০
সেচবিহীন এলাকা	৮	৮	৮

বীজ শোধন ও বোনা

একর পিছু ২২—৩ কেজি বীজ লাগবে। বোনার আগে প্রতি কেজি বীজে ৩ গ্রাম ব্রাসিকল-৭৫ বা ইথাইল মারকিউরিক ক্লোরাইড বা ম্যানকোজেব গুঁড়ো ওষুধ মাখিয়ে বীজ শোধন করে নেবেন।

সরষে সাধারণতঃ ছিটিয়ে বোনা হয়। সারিতে বুনলে ফসলের পরিচর্যা খরচ কম হয়, সূর্যের আলো ও বাতাস ভালোভাবে পায় এতে ফলনও বেশী হয়। সারিতে বুনলে সারি থেকে সারির দূরত্ব হবে ৩০ সে, মি (১২ ইঞ্চি)। কিন্তু বরুণার ক্ষেত্রে দূরত্ব হবে ৪৫ সে, মি।

সেচ

বোনার সময় এবং বোনার পরে মাটিতে উপযুক্ত রস থাকা দরকার। অল্পাধায় বীজ ভাল গজাবে না, এতে গাছের সংখ্যা কম হবে ও ফলন কমে যাবে। কাজেই মাটিতে যথেষ্ট রস না থাকলে বোনার ৩-৪ দিন আগে একটা হালকা সেচ দিন। এর পর জমির অবস্থা অনুযায়ী ২৫-৩০ দিন অন্তর সীতা ও বিনয়েতে ২টি, বরুণাতে ৩টি এবং ফুল আসার আগে টোরিতে একটি সেচ দেয়া দরকার। মনে রাখবেন ফুল আসা ও দানা পুষ্ট হবার সময় যেন জমিতে রস থাকে

পরিচর্যা ও চাপান

সময়মত আগাছা দমন করলে সরষের ফলন অনেক বেশী হয়। বোনার ১৫ দিন পরে একবার নিড়েন দিন ও চারা পাতলা করে দিন। এমনভাবে

পাতলা করুন সারির মধ্যে দুটি গাছের মাঝে ১০-১৫ সে. মি (৪-৬ ইঞ্চি) দূরত্ব থাকে। ছিটিয়ে বুনলে প্রতি বর্গ হাতে ৮-১০টি গাছ থাকা দরকার।

সেচ-সেবিত এলাকায় প্রথম সেচের আগে প্রতি একরে টোরিতে ৮ কেজি এবং রাই ও ধাত সরিষায় ১০ কেজি নাইট্রোজেন চাপান দিন। সেচ-বিহীন এলাকায় যদি ফুল আসার আগে বৃষ্টি পাওয়া যায় তাহলে ৮ কেজি নাইট্রোজেন চাপান দেওয়া যায়।

রোগ

সরষে গাছে প্রায়ই ধসা রোগ দেখা যায়। এই রোগের আক্রমণে পাতায় প্রথমে ছোট ছোট বাদামী দাগ দেখা দেয়, পরে সেই দাগ কালচে হয়ে যায়। এই দাগগুলি ক্রমশঃ ডাঁটা, পাতা ও শূঁটির খোসায় দেখা যায়। ডাঁটার দাগ লম্বাটে ধরণের ও খোসায় দাগ গোলাকার হয়ে থাকে। সুস্থ গাছ থেকে বীজ জোগাড় করে বীজ বোনা উচিত।

এই রোগের আক্রমণ প্রতিরোধ করতে পৌষের শেষে এবং প্রয়োজনবোধে ১৫ দিন পরে আর একবার নীচের যে কোন একটি রোগনাশক ওষুধ স্প্রে করুন।

ওষুধের নাম	প্রতি লিটার জলে ওষুধের পরিমাণ (গ্রাম)	একর প্রতি ওষুধের পরিমাণ ৩০০ লিটার জলে (গ্রাম)
ম্যানকোজেব	২	৬০০
জিনেব	২	৬০০
কপার অক্সিক্লোরাইড	৪	১২০০

পোকা

সরষের প্রধান কীটশত্রু জাব পোকা। এই পোকা সবুজ রংয়ের ও খুব ছোট। এরা একত্রে অনেক সংখ্যায় পাতার তলায় ডাঁটা বা শূঁটি অথবা অনেক সময় গাছের সর্বত্রই চাপ চাপ ভাবে বসে রস চুষে খায়।

এই পোকা দেখা গেলে ১৫ থেকে ২০ দিন অন্তর নীচের যে কোন একটি ওষুধ স্প্রে করবেন। কিন্তু ফসল কাটার ১ মাস আগে ওষুধ দেয়া অবশ্যই বন্ধ করবেন। কার্তিকের গোড়ায় বুনলে ফুল ফোটার পরে একবার ওষুধ দিয়েই জাব পোকা দমন করা যায়, কিন্তু এর পরে বুনলে একবারের বেশী ওষুধ দেবার দরকার হতে পারে।

ওষুধের রাসায়নিক নাম	প্রতি লিটার জলে ওষুধের পরিমাণ (মিলিলিটার)	একর প্রতি (৩০০ লিটার জলে) ওষুধের পরিমাণ (মিলিলিটার)
ফস্ফামিডন ৮৫%	২	১৫০
মিথাইল ডেমিটন ২৫%	১	৩০০
ডাইমিথোয়েট ৩০%	১	৩০০

চারি অবস্থায় করাতে পোকা ও পাতা জড়ানো পোকাকার আক্রমণও দেখা যায়। ঘন করে বীজ বুনলে করাতে পোকাকার আক্রমণ বাড়ে। আক্রমণের প্রকোপ বেশী হলে কীটনাশক ওষুধ ম্যালাথিয়ন ৫০% প্রতি লিটার জলে ২ মি. লি. হিসাবে স্প্রে করুন।

গাছের বাড় অমুযায়ী একর প্রাত ওষুধ গোলা জলের পরিমাণ ৩০০ লিটারের কমবেশী লাগতে পারে। সেই অমুযায়ী ওষুধও পরিমাণমত কম বা বেশী লাগবে। সরবে ক্ষেতে মৌমাছির ক্ষতি যাতে না হয় সেজন্য বিকালের দিকে ওষুধ স্প্রে করুন।

ফসল কাটা

শুটিতে যখন হলদে রং ধরবে তখনই ফসল কেটে নিন। সকালের দিকে ফসল কাটুন, এতে দানা ঝরে নষ্ট হবার সম্ভাবনা কম। কেটে এনে ঢাকা জায়গায় ৭-৮ দিন জাগ দিয়ে রাখবেন। এতে বীজে সামান্য রস থাকলে তা শুকিয়ে যায়, তারপর মাড়াই করে, ঝেড়ে ও শুকিয়ে পরিষ্কারভাবে গোলাজাত করুন।



অগ্রহায়ণ মাসে কৃষকের করণীয়

রবি মরসুমের চাষ শুরু হয়েছে। এখনতো সেচের সুযোগ বাড়ার ফলে রবিশস্ত্রের চাষের এলাকাও অনেকটা বেড়েছে। প্রথমে আগুর কথায় আসি।

আলু

এ মাসের প্রথমার্ধ পর্যন্ত প্রধান ফসলের জন্ম এবং শেষ পর্যন্ত নাবি ফসলের চাষ করা যাবে। নাবি চাষের জন্ম কুফরি জ্যোতি লাগান। আগে লাগানো আলুতে একর প্রতি ২০ কেজি নাইট্রোজেন চাপান দিন। সেচ, পরিচর্যা ও রোগ দমনের জন্ম প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিন। লক্ষ্য রাখবেন সেচের জলে ভেলির তিন-চতুর্থাংশের বেশী যেন কখনই ডুবে না যায়।

গম

অগ্রহায়ণের মাঝামাঝির মধ্যে বীজ বোনা শেষ করুন। বীজ বোনার ৩ সপ্তাহ পরে প্রথম সেচ দেওয়ার সময় একর প্রতি ২০ কেজি নাইট্রোজেন চাপান দিন। সার ও সেচ দেবার আগে জমিতে নিড়ান দিয়ে আগাছা পরিষ্কার করুন।

ডালশস্ত্র

এ মাসে ছোলা বুনুন। ছোলার উন্নত জাত মহামায়া-১ ও মহামায়া-২। যে সমস্ত জমিতে ছোলার চাষ নতুন করা হবে সেখানে জীবানু সার বা যে জমিতে ছোলার চাষ হয়েছে তার কিছু মাটি ব্যবহার করুন। বীজ অবশ্যই শোধন করে বুনবেন। আমন ধানের ক্ষেতে ছোলা পয়রা চাষ হিসাবে করা যায়। মিশ্র চাষ হিসাবে সরষে+ছোলা বা মুত্তুর+গম বা গম+ছোলা বা ছোলা অথবা মুত্তুরের সঙ্গে তিসি করা যায়।

আখ

এ মাসের মধ্যেই বীজ আখ শোধন করে বসান। একর প্রতি ২৫—৩০ গাড়া গোবর বা কম্পোষ্ট সার জমি তৈরির সময় দিন। মূল সার হিসাবে একর প্রতি ২০ কেজি নাইট্রোজেন ও ৩০ কেজি করে ফসফেট ও পটাশ নাতিতে দিয়ে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিন।

বোরো ধান

এ মাসের মধ্যে বীজতলায় বোরো ধানের জন্ম বীজ বোনার কাজ শেষ করুন।



সপ্তম পঞ্চবার্ষিক যোজনার ব্যাপক প্রস্তুতি

উন্নত মানের বীজ উৎপাদন ও সরবরাহের কাজে
পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বীজ নিগম-এর সম্প্রসারিত কার্যক্রম

উন্নত মানের বীজ উৎপাদন ও সরবরাহ কার্যক্রমে (পাট, ধান, গম, ডালশস্য এবং তৈলবীজ)	বর্তমান পরিস্থিতি (১৯৮৪-৮৫) ৩০০০ মেঃ টন	৭ম যোজনার লক্ষ্যমাত্রা (১৯৮৯-৯০) ১৫,০০০ মেঃ টন
--	--	---

পশ্চিমবঙ্গের জলবায়ু মাটির উপযোগী এ রাজ্যেই উৎপাদিত
উন্নত মানের শংসিত বীজ ব্যবহার করুন
ফলন বাড়ান : আয় বাড়ান

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বীজ নিগম লিঃ-এর জেলা দপ্তর

বাহাগঞ্জ	ঃ উকিলপাড়া, বাহাগঞ্জ (পশ্চিম দিনাজপুর)
মালদা	ঃ মকদমপুর, মালদা
বহরমপুর	ঃ পঞ্চাননতলা, বহরমপুর (মুর্শিদাবাদ)
কৃষ্ণনগর	ঃ ১২, ডি. এন. রায় রোড, কৃষ্ণনগর (নদীয়া)
বর্ধমান	ঃ ৭৯, এন. এন. বসু রোড, বর্ধমান
সিউড়ী	ঃ দাঙ্গালপাড়া, সিউড়ী (বীরভূম)
বাঁকুড়া	ঃ চাঁদমারীডাঙ্গা, বাঁকুড়া
মেদিনীপুর	ঃ ৩৫/১, অরবিন্দনগর, নরমপুর, মেদিনীপুর

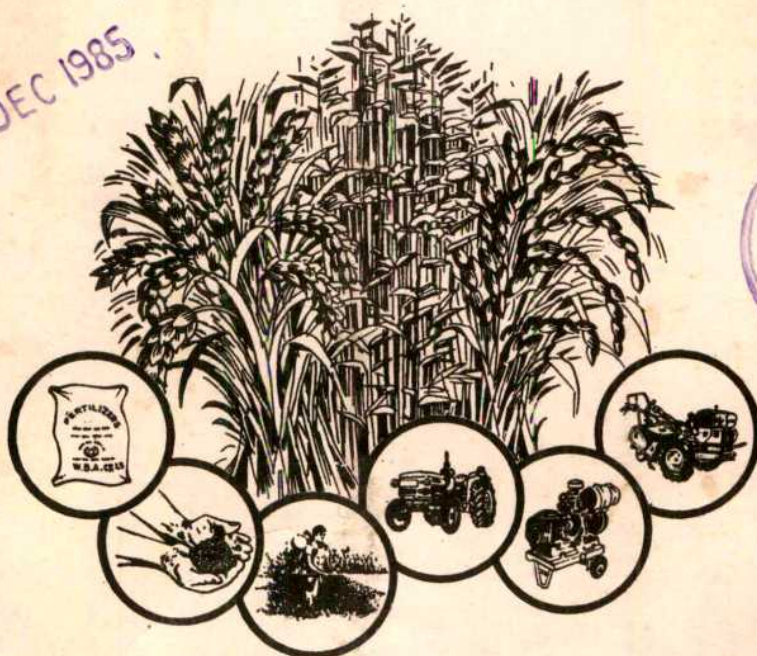
সদর দপ্তর :

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বীজ নিগম লিঃ

৪, গঙ্গাধর বাবু লেন (৬ষ্ঠ তল), কলিকাতা-৭০০০১২

GREEN REVOLUTION— our aim in West Bengal

24 DEC 1985



Green Revolution is our aim. The object is to modernise farming in the State. And Agro-Industries Corporation is lending a helping hand to achieve the goal. The Corporation has been supplying modern implements like Tractors, Sprayers, Threshers and Pump-sets to the farmers on hire or on hire-purchase basis.

The Corporation also supplies quality seeds, fertilisers and pesticides.

Agro-Industries Corporation also provides custom

service for cultivation of cotton/groundnut and for Small Farmers Development Agency and Marginal Farmers & Agricultural Labourers Development Project Schemes.

The Corporation has another role too—to create employment opportunities for Engineering graduates/diploma holders and Agricultural graduates in different Agro-Service centres in this State.

*Hand in hand with farmers —
Agro-Industries Corporation*

West Bengal Agro-Industries Corporation Limited

(West Bengal Govt. Undertaking)

23B, Netaji Subhas Road, (3rd Floor), Calcutta-700 001

Telegram : AGRINPUT

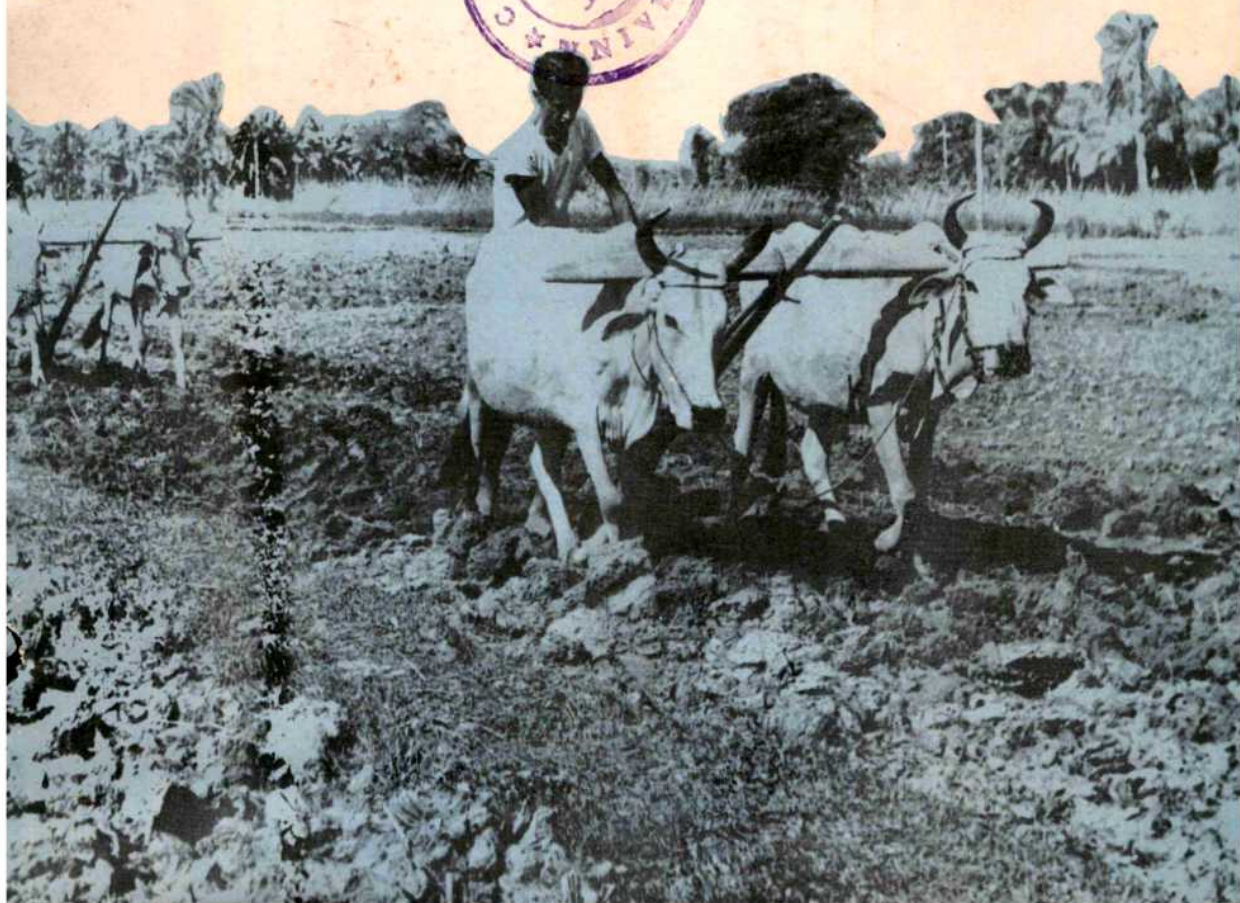
Telephone : 22-2314 / 23-3192

24/12/85

বসন্ত বসন্ত

সপ্তদ্বিংশ বর্ষ

অগস্তায়ন • ১৩৩২



সূচী

সম্পাদকীয়	...	৩-৪
গমের চাষ ও বেশী ফলন	...	৫-৯
ডঃ শক্তিপদ সরকার		
তৈলবীজ উৎপাদন বৃদ্ধির গবেষণা	...	১০-১৩
সুরদাস মুখোপাধ্যায়		
বিতর্কিত ডালশস্য : খেসারি	...	১৫-১৯
ডঃ কল্যাণব্রত সেনগুপ্ত		
ডঃ পরিতোষ ভট্টাচার্য		
সরষের চাষে প্রদর্শনী ক্ষেতের		
ভূমিকা	...	২০-২১
প্রবাল গুপ্ত		
পশ্চিমবঙ্গে তৈলবীজ উৎপাদন		
কার্যসূচী	...	২২-২৪
সংবাদ	...	২৫
পৌষ মাসে কৃষকের করণীয়	...	২৬
পশ্চিমবঙ্গের গ্রামে জিজিয়ার কল্যাণ		
শ্রীমতী মেলেন	...	২৭-২৮
ইঁস পালন ও লাভজনক	...	২৯-৩০

সম্পাদনা উপদেষ্টা পর্ষদ
বিস্মপদ মণ্ডল, কৃষি অধিকর্তা, পশ্চিমবঙ্গ
ডঃ দেবব্রত মুখার্জী, অপর কৃষি অধিকর্তা (গবেষণা)
মুর্জী মুখার্জী, যুগ্ম কৃষি অধিকর্তা (সম্প্রসারণ)
জ্যোতির্ময় বোস, উপ-সচিব (উন্নয়ন), কৃষি বিভাগ
অমলেন্দু সরকার, মুখ্য প্রচার ও জনসংযোগ আধিকারিক, কৃষি অধিকার
অমিয় কুমার মিত্র, জেলা কৃষি তথ্য আধিকারিক (সদর)
স্বলেখা ঘোষ, সম্পাদিকা
চিদানন্দ গোস্বামী, সহ-সম্পাদক
প্রধান সম্পাদক
বিস্মপদ মণ্ডল, কৃষি অধিকর্তা, পশ্চিমবঙ্গ

বহুসংস্করণ

অগ্রহায়ণ-১৩৯২

কৃষি অধিকার (কৃষি তথ্য সংস্থা)

পঃ বঃ সরকার কর্তৃক প্রকাশিত ও প্রচারিত

পাঠকদের প্রতি

বন্ধুরা পত্রিকা প্রসঙ্গে চিঠিপত্র লেখার সময় জবাবের জন্য চিঠির সঙ্গে স্ট্যাম্প বা পোস্টকার্ড পাঠানোর প্রয়োজন নেই। প্রয়োজনবোধে সব পত্রের উত্তর দেওয়া হয় এবং সরকারী চিঠিপত্রের সার্ভিস ডাকটিকিটই কেবল ব্যবহার করা চলে।

প্রধান সম্পাদক

সম্পাদক



গ্রামবাংলার ক্ষেত প্রান্তরের এখন সোনার রঙ। আমন ধান ক্ষেতে তৈরি। সেই ফসল কেটে কৃষক এখন ঘরে তুলবে। আর সেই ধানে হবে নবান্ন উৎসব বা ফসল কাটার উৎসব। মানুষের জীবনে মূল লক্ষ্য হলো আনন্দ ও সুখ। আর আনন্দ ও সুখ মানুষ তখনই পায় যখন অন্ন থাকে ঘরে। নতুন ধান তাই বড় আদরের সম্পদ। সেই ধান তুলে পালিত হয় নবান্ন উৎসব।

এ বছর আমন চাষের শুরুতেই নানা বাধা বিপত্তি ঘটে। বিশেষ করে পামরি পোকাকার আক্রমণ। এর ফলে ফসলের ভাল ফলন সম্বন্ধে সংশয় দেখা দিয়েছিল। কিন্তু কৃষকের ঐকান্তিক চেষ্টা, যত্ন এবং কৃষি প্রযুক্তিবিদদের সাহায্য ও সহায়তায় সময়ে ব্যবস্থা নেওয়ার ফলে সেই সম্ভট কাটিয়ে ওঠা সম্ভব হয়েছে। এরপরেই আসে অক্টোবরের ঘূর্ণিঝড় ও বন্যা। তাতে এ রাজ্যের কয়েকটি জেলার ফসলের বেশ কিছু ক্ষতি হয়। তবে অক্টোবরের এই বৃষ্টি সাধারণভাবে আমনের ফলনের পক্ষে শুভ হয়েছে। মনে হয় গত বছরের মত না হলেও এ বছরের ফলন খুব খারাপ হবে না।

তবে খরিকে যে ক্ষতি হলো তা পূরণের জন্ত রবি মরশুমে আমাদের তৎপর হতে হবে। সেচের জলের সরবরাহে আশা করা যায় এ বছর কোন অসুবিধা থাকবে না। সেচের জলের সুবিধা নিয়ে রবি ফসলের উৎপাদন বাড়ানোর জন্ত কৃষককে চেষ্টা করতে হবে।

এই সময়ের অগ্রতম ফসল হলো গম। এর চাষ এখন শুরু হচ্ছে। গমের ফলন বাড়ানোর জন্ত আমাদের চেষ্টা করতে হবে। এ বছরও গম চাষের এলাকা ও ফলনের লক্ষ্যমাত্রা বেশী করে ধার্য করা হয়েছে। এই লক্ষ্যমাত্রায় পৌঁছাতে গেলে কয়েকটি বিষয়ের উপর গুরুত্ব দেওয়া দরকার। যেমন উন্নত জাতের বীজ সময়ে বুনতে হবে। উন্নত জাতের শংসিত বীজ কৃষকরা যাতে সময়মত পেতে পারেন সে বিষয়ে দৃষ্টি রাখা হয়েছে। এ রাজ্যে শীত স্বল্পকালীন। বোনার কাজ তাই সময়মত অবশ্যই শেষ করতে হবে। না হলে ফলন আশাহুরূপ হবে না। অগ্রাগ্র প্রযুক্তিগত ব্যবস্থাও সময়মত নিতে হবে। বিশেষ করে সার ও সেচ এই দুটির উপর গুরুত্ব দেওয়া দরকার। সার ও সেচের প্রয়োগ ঠিকমত করতে

পারলে ফলনের সম্ভাবনাও অনেকটা উজ্জ্বল হয়।

যাঁরা বোরো ধানের চাষ করছেন, এ মাসের মধ্যে তাঁদের বীজতলায় বোরো ধানের বীজ ফেলার কাজ শেষ করতে হবে। আশাকরি কৃষকরা ইতিমধ্যে তাঁদের নিজের জমির উপযোগী অধিক ফলনশীল জাতের বীজ সংগ্রহ করে রেখেছেন।

গম ও বোরো ধান ছাড়া এখন তৈলবীজ ও ডালশস্য চাষেরও মরসুম। এইসব শস্য এ রাজ্যে ঘাটতি। তাই এদের ফলন বাড়ানোর জন্য আমাদের যতটা সম্ভব চেষ্টা করতে হবে। এরজন্য যে লক্ষ্যমাত্রা এ বছর নির্দিষ্ট হয়েছে তা পূরণের জন্য কৃষককে সচেতন হতে হবে।

খাত্তের মোট ফলন বাড়ানোর জন্য রবি ফসলের চাষ ঠিকমত করা দরকার। সেজন্য উন্নত চাষ পদ্ধতি ও উন্নত জাতের বীজ ব্যবহার করা একান্ত প্রয়োজন। এসব বিষয়ে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও চিন্তা ভাবনা কৃষি বিশেষজ্ঞরা করে চলেছেন। কৃষকদের তাই অনুরোধ তাঁরা স্থানীয় কৃষিকর্মীদের সঙ্গে যেন যোগাযোগ রাখেন এবং প্রয়োজনমত সাহায্য ও পরামর্শ নেন। তাঁদের সুপারিশ মত যদি চাষ পদ্ধতি অনুসরণ করা যায় তাহলে ফলন বাড়ানো কঠিন হবে না।

গমের চাষ ও বেশী ফলন

ডঃ শক্তিপদ সরকার

১৯৬৬-৬৭ সাল থেকে শুরু করে পশ্চিম-বাংলায় উচ্চ-ফলনশীল জাতের গম চাষ ধাপে ধাপে আজ অনেকদূর এগিয়ে গেছে। স্বাধীনতার পরে পশ্চিমবাংলা গম চাষের এলাকা হিসাবে কোনও উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করতো না। ১৯৪৭-৪৮ সালে মাত্র ৩৭ হাজার হেক্টর জমিতে গম চাষ হতো। জাত ছিলো সব দেশী ও বেশীদিনের। এদের ফলন হতো মাত্র হেক্টরে ৬ কুইন্টাল। কয়েক বছরের মধ্যে কিছু উন্নত জাত উদ্ভাবন করা গেলেও নতুন জাতের ফলন হেক্টরপিছু ১০ কুইন্টালের বেশী পাওয়া যেতো না। উচ্চ ফলনশীল জাতের উদ্ভাবন ও তাদের চাষের প্রচলন করার সাথে সাথে একটা জিনিস পশ্চিমবাংলার চাষীদের কাছে খুব পরিষ্কার হয়ে গেলো—সেটা হচ্ছে এই সব জাত চাষ করার পক্ষে পশ্চিমবাংলার প্রায় সব জায়গার (শুধু সমুদ্রের ধারের কিছু কৃষি অর্থনীতিবিদ ও অপর কৃষি অধিকর্তা, পশ্চিমবঙ্গ সরকার।

এলাকা ছেড়ে দিলে) মাটি ও আবহাওয়া খুবই উপযুক্ত। এর ফলে গমের চাষ পশ্চিমবাংলায় হ হ করে বেড়ে গেলো, হেক্টর পিছু অনেক বেশী ফলন হতে লাগলো এবং এর ফলে দেখা গেলো যে ১৯৭৫-৭৬ সালে ৫.৬৫ লক্ষ হেক্টর জমিতে গম চাষ করে ১১.৫ লক্ষ টন গম উৎপাদিত হয়েছে।

এর পরের ইতিহাস ঠিক উল্টো। শুধু এলাকাই কমতে থাকলো তাই নয় ফলনের হারও নিম্নমুখী হলো। তবে আশার কথা গম চাষের এলাকা ও ফলন কমে যাওয়ার কারণগুলো অনুসন্ধান করে যথোচিত ব্যবস্থা নেওয়ার ফলে আবার এলাকা বাড়তে আরম্ভ করেছে। গত ১৯৮০-৮৪ সালে তিন লক্ষ হেক্টরের বিছ বেশী জমিতে গমের চাষ হয়েছে। হেক্টরপিছু উৎপাদন হয়েছে প্রায় ২৭ কুইন্টাল যেটা এখনও পর্যন্ত রেকর্ড। এই বছর ৮ লক্ষ টন গম উৎপাদন

বসুন্ধরা : অগ্রহায়ণ : ১৩৯২

হয়েছে। আশা করা যাচ্ছে এই অগ্রগতি আগামী দিনেও বজায় থাকবে। এ বছর গম চাষের এলাকা বাড়বে ও মোট উৎপাদনও বেড়ে যাবে এরকম আশা করার যথেষ্ট সংগত কারণ

আছে।

গমের সাথে ধানের বিভিন্ন বিষয়ে অনেক পার্থক্য আছে। এই পার্থক্যগুলো নীচে দেওয়া হলো :

ধান	গম
খুব শীতে ও ঠাণ্ডা জায়গায় ধানগাছ পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় না ও ফলে না।	শীতকালের অস্তিত্ব ও স্থায়িত্ব যে দেশে নেই সেখানে গম চাষ সম্ভব নয়।
পশ্চিমবাংলায় শুধু আশ্বিন মাসের শেষের দিক ও কার্তিক মাস বাদ দিয়ে বছরের সব সময়েই ধান চাষ করা সম্ভব।	শুধু শীতকালের শুরুতেই চাষ করলে ভাল ফলন পাওয়া যায়।
ধানের শীষে দানার সংখ্যা বেশী ও প্রতিটি দানার ওজন অপেক্ষাকৃত কম।	গমের শীষে দানার সংখ্যা কম ও প্রতিটি দানার ওজন অপেক্ষাকৃত বেশী।
ধানের পাশকাঠি সংখ্যায় বেশী হয়।	গমের পাশকাঠি সংখ্যায় অপেক্ষাকৃত কম হয়।
ধানের গোড়ায় সবসময় জল দাঁড় করিয়ে রাখলে ফলন সর্বাধিক হয়।	গমের গোড়ায় গোড়ায় জল দাঁড়িয়ে থাকলে ফলনের ক্ষতি হয়।
ধানে 'মুকুট শেকড়' বের হয় না।	গম বোনার পর ২০ ২১ দিনের মাথায় 'মুকুট শেকড়' বের হয়। এদের ক্ষমতা অত্যন্ত স্বাভাবিক শেকড়ের তুলনায় বেশী।
ধানের ডগার পাতার ও শীষের সালোক-সংশ্লেষণ ক্ষমতা খুব কম।	গমের ডগার পাতা ও শীষের সালোক-সংশ্লেষণ ক্ষমতা খুব বেশী।

ধান ও গমের মধ্যে প্রকৃতিগত পার্থক্য ঠিকভাবে না বুঝে ও প্রযুক্তিগত কলাকৌশলের সাহায্য না নিয়ে ব্যাপক হারে গম চাষ করতে যাওয়ার ফলেই মাঝে হেষ্টির পিছু ফলনের হার কমে যাচ্ছিল এবং গমচাষীরা নিরুৎসাহ হয়ে গম চাষের এলাকা কমিয়ে দিচ্ছিলেন। বিশেষজ্ঞরা অনুসন্ধান করে দেখেছেন যে গমচাষের এলাকা কমে যাওয়া ও ফলনের হার কমে যাওয়ার অন্যতম কারণগুলো হ'লো—

১। সোনালিকার বিকল্প কোনও জাত উদ্ভাবন

করতে না পারা যাতে সোনালিকার ভাল গুণগুলোতে থাকবেই উপরন্তু সেই জাতের রোগ প্রতিরোধক ক্ষমতা বেশী হবে।

২। যথেষ্ট পরিমাণে উন্নতমানের বীজ বিশেষ করে 'শংসিত বীজ' (Certified Seed) সময়ে কৃষকদের কাছে সরবরাহ করতে না পারা।

৩। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে গম না বুনে বেশী দিনের দেশী ধান কেটে সেই জমিতে দেবী করে গম বোনা।

৪। দেৱীতে বোনা গমে প্রাক্তিগত কলাকৌশল ঠিকভাবে প্রয়োগ না করা।

৫। উত্তরবঙ্গের অনেক জায়গায়, বিশেষতঃ তরাই অঞ্চলে, “ডলোমাইট” বা চুন প্রয়োগ না করে গম চাষ করা।

৬। উত্তরবঙ্গের কিছু জায়গায় অমুখাওয়ার ঘাটতি।

৭। মাঘ-ফাল্গুন মাসে বৃষ্টি হলেই গমে “পাতা ঝলসানো” ও “মরচে ধরা রোগের” প্রাদুর্ভাব।

৮। কোন কোন বছর শীত পড়ার পরে মাঝে কিছুদিন গরম আবহাওয়ায় প্রাদুর্ভাব।

গমে ভাল ফলন পেতে হলে প্রথমেই উন্নত মানের বীজ সংগ্রহ করতে হবে। যেহেতু যে কোনও গমের দানা মাটিতে ফেললেই গাছ জন্মাবে সেজন্য উন্নত মানের বীজ সংগ্রহ না করে নিম্নমানের বীজ লাগানোর ঝোঁক কারও না থাকাই উচিত। উত্তরবঙ্গের আবহাওয়ায় যথেষ্ট সাবধানতা অবলম্বন না করলে উন্নত মানের বীজ উৎপাদন করা ও তা সংরক্ষণ করা সম্ভব নয়। যতদিন না উত্তরবঙ্গের কৃষকরা এই বীজ উৎপাদন ও তার সংরক্ষণের খুঁটিনাটি কলাকৌশল রপ্ত করতে পারছেন ততদিন তাঁদের পক্ষে উচিত হবে প্রতি ছবছর অন্তর উন্নত মানের বীজ সংগ্রহ করে লাগান। এতে ফলনের হার সুনিশ্চিত থাকবে।

সোনালিকা, ইউ, পি-২৬২ ও এইচ, পি-১২০৯ এই তিনটি হচ্ছে বর্তমানে অনুমোদিত উচ্চ ফলনশীল জাত। সোনালিকা হচ্ছে সব-থেকে জনপ্রিয়। স্বল্পমেয়াদি, এর দানা পুষ্ট ও রং ধূসর-লালচে, প্রায় সব জায়গাতেই ভাল হয়। সবথেকে বড় কথা হলো লাগাতে একটু

দেৱী হলেও ফলন খুব একটা কমে যায় না। ইদানীং অবশ্য সোনালিকার গাছে শীতকালে বৃষ্টি হলেই ‘মরচে পড়া রোগ’ (Rust) ও ‘পাতা ঝলসানো’ (Leaf Blight) রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা যাচ্ছে। অপরদিকে ইউ, পি-২৬২ ‘মরচে পড়া রোগে’ আক্রান্ত হয়। গমে রোগের প্রাদুর্ভাব উত্তরবঙ্গে গত কয়েক বছর বেড়েই চলেছে। এর অগ্রতম কারণ শীতকালে বৃষ্টি। সুতরাং এইসব রোগের আক্রমণ ঠেকাতে হলে একদিকে যেমন রোগ প্রতিরোধক ক্ষমতা সম্পন্ন গমের নতুন জাত উদ্ভাবন করা দরকার তেমনি প্রযুক্তিগত কিছু ব্যবস্থা নেওয়াও দরকার।

ঠিক সময়ে গম লাগান ভাল ফলন পাওয়ার জন্য অত্যন্ত জরুরী। এমন সময়ে গম বোনা উচিত যখন দিন ও রাতের তাপমাত্রা এমন থাকে যাতে অঙ্কুরোদগম তাড়াতাড়ি হয়। অঙ্কুরোদগমের পরেই মাটির নীচে শেকড় ও মাটির ওপরে গাছ বড় হবে এবং পাশকাঠি ছাড়া শুরু হবে। কৃষি বিজ্ঞানীর পরীক্ষা করে দেখেছেন যে প্রথম দিকে শেকড় যদি তাড়াতাড়ি বড় না হয় ও বিস্তার লাভ না করে তাহলে মাটি থেকে অল্প সময়ের মধ্যে খাওয়া উপাদান সংগ্রহ করে গাছকে সরবরাহ করতে পারে না এবং এর ফলে মাটির ওপরে কাণ্ড ও পাতার বৃদ্ধি হয় না। এর নীট ফল কমসংখ্যক পাশকাঠি। গমে ভাল ফলন পেতে হলে প্রতি বর্গমিটারে অর্থাৎ প্রতি পাঁচ বর্গহাতে ৪০০—৪৫০টি শীষ দরকার।

এই পরিমাণ পাশকাঠি পেতে হলে ছোটো জিনিসের প্রয়োজন—একটা হচ্ছে প্রয়োজনীয় পরিমাণ সার প্রয়োগ ও অন্যটা হচ্ছে বাতাসের শীতলতা বাড়তে থাকা অর্থাৎ শীত বেশী পড়া

বস্তুকরা : অগ্রহায়ণ : ১৩৯২

অব্যাহত থাকি। সার হিসাবে ফসফেট জাতীয় সার বোনার সময় দিতেই হবে—এটা করা না হলে শুধু যে পাশকাঠির সংখ্যা কমে যাবে তাই নয় দানা ছোট হবেই। অপরদিকে দিনের শর্বোচ্চ তাপমাত্রা ও রাতের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা যোগ করে দুই দিয়ে ভাগ করলে যে তাপমাত্রা পাওয়া যাবে তা বোনার সময় ২০ ডিগ্রী সেলসিয়াস হলে অকুরোদগম তাড়াতাড়ি হবে, বোনার এক সপ্তাহ বাদে কম করে ১৮ ডিগ্রী সেলসিয়াস হলে শেকড়ের বৃদ্ধি ও বিস্তার ভাল হবে ও বোনার দু সপ্তাহ পরে ১৬ ডিগ্রী সেলসিয়াস হলে পাশকাঠি অধিক সংখ্যায় বার হবে। এরপরে যতদিন পাশকাঠি ছাড়তে থাকবে অর্থাৎ বোনার পরে ৪০—৪৫ দিন পর্যন্ত, ততদিন শীত খুব বেশী থাকাই বাঞ্ছনীয়। যদি কয়েকদিন শীত কমে গিয়ে গরম হাওয়া বইতে আরম্ভ করে (যা কোনও কোনও বছর হয়) তাহলে শুধু পাশকাঠির সংখ্যাই কমবে না, গাছ সরু হবে, ছোট হবে, শীঘ্র ছোট হবে ও শীঘ্র দানার সংখ্যা কম হবে। আবার ফুল আসা ও দানায় দুই আসার সময় যদি গরম হাওয়া বয় তাহলে দানা ছোট হবে ও দানায় ঝাঁজ হবে। সবদিক বিচার করে দেখা গেছে যে অগ্রহায়ণ মাসের প্রথম থেকে মাঝামাঝি পর্যন্ত বীজ বোনার উপযুক্ত সময়। যে বছর শীত পড়তে একটু দেরী হয় সে বছর অগ্রহায়ণ মাসের তৃতীয় সপ্তাহ পর্যন্ত বুনলেও ভাল ফলন পাওয়া যায়। এর পরে বুনলে কিছু প্রযুক্তিগত সাহায্য নিতে হবে, না হলে ফলন মোটেই ভাল হবে না। এই প্রযুক্তিগত ব্যবস্থাপুলি হলো—

১। হেক্টর পিছু স্বাভাবিক অবস্থায় ১০০ কেজি

- বীজের বদলে ১২০ কেজি বীজ ব্যবহার করা।
২। জমি ভালভাবে তৈরী করে হেক্টর পিছু ৫ টন গোবর সার বা কম্পোষ্ট সার ছেটানো।
৩। বীজ বোনার আগে ২৪ ঘণ্টা জলে ভেজানো।
৪। বীজ মাটির বেশী গভীরে না ফেলা (যেন ৩ সেন্টিমিটারের বেশী নীচে না যায়)।
৫। জলে দ্রবণীয় ফসফেট সারের ব্যবহার (সুপার ফসফেট, ডাই-এমোনিয়াম ফসফেট)
৬। ফসফেট সার নির্ধারিত হারের থেকে বেশী পরিমাণে প্রয়োগ করা।
৭। নাইট্রোজেনের ক্ষুদ্র নাইট্রেট জাতীয় সার দেয়া গমের জমি খুব গভীর করে চাষ করলে বাড়তি ফলন দেয় না। ৬ ইঞ্চি গভীর করে চাষ করলেই যথেষ্ট তবে মাটি বারবার কাছল ৬ মই দিয়ে বুঝবুঝে করে তৈরী করতে হবে। মাটির ৪ থেকে ৫ সেন্টিমিটার গভীরে বীজ বুনতে হবে। এবং লাইনে বুনবেন। লাইন থেকে লাইনের দূরত্ব ২০ সেন্টিমিটার।

উত্তরবঙ্গের মাটি বিশেষতঃ তরাই অঞ্চলে বেশ অম্লভাবাপন্ন। অল্পতর বেশী হলে গম বোনার অন্ততঃপক্ষে একমাস আগে হেক্টরপিছু দু থেকে তিন টন 'ডলোমাইট' বা চুন প্রয়োগ করলে তবেই গমে ভাল ফলন পাওয়া যাবে নচেৎ নয়।

গমে সার প্রয়োগ সেচের সংস্থান বুঝে করতে ভাল। সারের পরিমাণ মাটি পরীক্ষার ভিত্তিতেই ঠিক করা বাঞ্ছনীয়। সাধারণভাবে যেখানে ৩ থেকে ৪ বার সেচ দেওয়ার সুযোগ আছে সেখানে হেক্টরপিছু নাইট্রোজেন, ফসফরাস ও পটাশ যথাক্রমে ১০০ কেজি, ৫০ কেজি ও ৫০ কেজি ব্যবহার করতে হবে। এক থেকে দুবার সেচ দেওয়ার মতো জলের সংস্থান থাকলে

নাইট্রোজেন, ফসফরাস ও পটাশের পরিমাণ কমে দাঁড়াবে যথাক্রমে ৬০ কেজি, ১০ কেজি ও ৩০ কেজি। সম্পূর্ণ ফসফরাস ও পটাশ সার জমি তৈরীর সময় দিতে হবে। নাইট্রোজেন সার জমি তৈরীর সময় অর্ধেক ও বীজ বোনার ২০ | ২১ দিন বাদে 'মুকুট শেকড়' বের হওয়ার সময় বাকী অর্ধেক দেওয়াই বাঞ্ছনীয়, তবে উত্তর-বঙ্গের হাক্কা বেলে দৌ-আশ মাটিতে নাইট্রোজেন সার তিনবারে দিলে ভাল ফল হয়। এনেত্র জমি তৈরীর সময় সিকিভাগ, ২০ | ২১ দিন বাদে অর্ধেক ও গাছে খোড় আসার সময় অর্থাৎ বোনার ৫০ | ৫৫ দিন বাদে সিকিভাগ দেবেন।

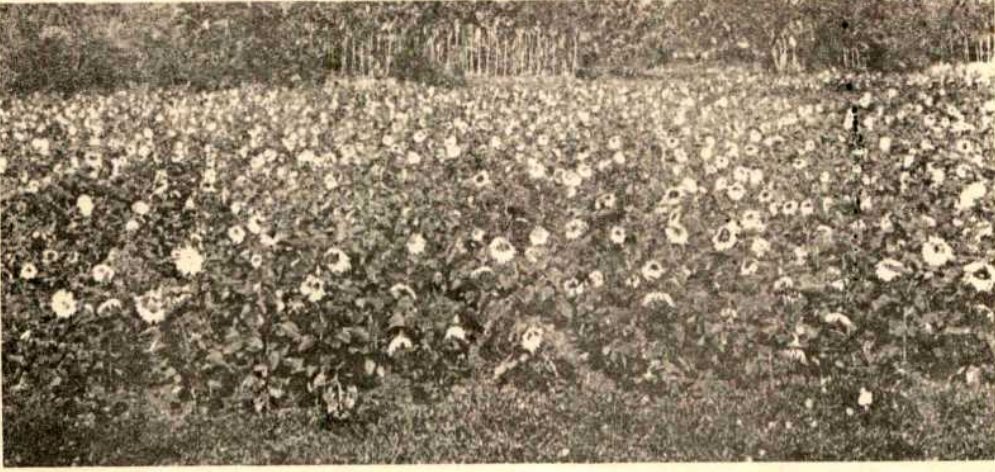
গমে সেচ দেওয়ার ব্যাপারে অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষা আমাদের পশ্চিমবাংলাতেও হয়েছে। উত্তরবঙ্গে ১টি বা ২টি সেচ দিয়ে ও দক্ষিণবঙ্গে তিন থেকে চারটি দিয়ে ও অগ্রাগ্র প্রযুক্তিবিজ্ঞা প্রয়োগ করে কৃষি বিজ্ঞানীরা দেখেছেন হেক্টর-পিছু ৪০ থেকে ৪৫ কুইন্টাল ফলন খুব সহজেই পাওয়া যায়। অবশ্য যে কবার সেচ দেওয়ার মতো জল থাকবে সেই সেচ কখন দিতে হবে এটা জানা খুবই জরুরী। যদি একবার সেচ দেওয়ার মতো জল থাকে তাহলে তা অতি অবশ্যই 'মুকুট শেকড়' বের হওয়ার সময় দিতে হবে। দুটি সেচের জল থাকলে মুকুট শেকড় বের হবার সময় প্রথমবার ও ফুল আসার সময় অর্থাৎ বোনার পর ৭০ দিনের মাথায় দ্বিতীয়বার সেচ দেবেন। যেখানে তিনবার সেচ দেওয়ার মতো জল আছে সেখানে তৃতীয় সেচটি প্রথম ও দ্বিতীয় সেচের মধ্যখানে পড়বে। এটা দিতে হবে যখন

পাশকাঠি চাড়া প্রায় শেষ হয়ে এসেছে অর্থাৎ বোনার পরে ৪০ দিনের মাথায়। আর যদি কেউ ৪ বার সেচ দেওয়ার মতো জলের সংস্থান করতে পারেন তাহলে চতুর্থ সেচটি দেবেন একেবারে শেষে যখন দানায় ছুঁ আসবে অর্থাৎ বোনার পরে ৮৫ দিনের মাথায়।

আজকাল কিছু কিছু জায়গায় বিশেষ করে উত্তরবঙ্গে কোনও কোনও স্থানে গমে শীষ বের হচ্ছে না, শীষ বের হলেও ছোট ছোট এবং দানা পুষ্ট হচ্ছে না। এসব অমুখাছের বিশেষ করে দস্তা ও বোরনের অভাবের জন্ম হচ্ছে। এ ব্যাপারে মাটি পরীক্ষা করে কোন অমুখাছের ঘাটতির জন্ম এরকম হচ্ছে তা বের করে বিশেষজ্ঞের পরামর্শমত অমুখাছ সংযুক্ত রাসায়নিক যৌগ নির্ধারিত পরিমাণে প্রয়োগ করলেই ম্যাজিকের মতো কাজ হবে।

সবশেষে একটা কথা বলার আছে। সেটা হচ্ছে উত্তরবঙ্গের ও অগ্রাগ্র জায়গার হাক্কা মাটিতে এবং যেখানে সেচের জলের সীমিত সুযোগ আছে সেখানে বোরো ধানের বদলে গম চাষ করাই উচিত। এতে একদিকে যেমন এক হেক্টর জমিতে বোরো ধান চাষ করতে যে পরিমাণ জলের দরকার হয় তা দিয়ে চার হেক্টর জমিতে গম চাষ করা যাবে, তেমনি মোট ফসলের উৎপাদনও চারগুণ হবে। এর ফলে শুধু যে ব্যাপক এলাকাতেই চাষ করা সম্ভব হবে এবং অধিক সংখ্যক চাষী আর্থিক দিক দিয়ে উপকৃত হবেন তাই নয়, অনেক বেশী সংখ্যক কৃষি মজুর মাঠে কাজ করার সুযোগ পাবেন।





পশ্চিমবঙ্গে বর্তমানে বছরে ১২ লক্ষ টনের
কিছু বেশী তৈলবীজের প্রয়োজন। অথচ
১৯৮৩-৮৪ সালে মাত্র ১'৮৬ লক্ষ টনের মত
তৈলবীজ উৎপন্ন হয়েছে। অর্থাৎ প্রতি বছর
প্রয়োজনের শতকরা ৮০ থেকে ৯০ ভাগ তৈলবীজ
অন্য রাজ্যগুলি থেকে আনতে আমরা বাধ্য
হচ্ছি। প্রয়োজন ও উৎপাদনের মধ্যে এতবড়
ব্যবধান ভরাট করা সম্ভব নয়, তবে চেষ্টা করলে
খানিকটা কমিয়ে আনা যেতে পারে।

পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন কৃষি গবেষণা কেন্দ্রে ও
সরকারী খামারে এ সম্বন্ধে নানা পরীক্ষা নিরীক্ষা
হয়েছে। সেই সব গবেষণা কেন্দ্রের সুপারিশ
হল, যে কোন ফসলের ফলন বাড়াতে হলে
ঐ ফসলের আওতায় আরও জমি আনতে হবে
অর্থাৎ আয়তন বাড়াতে হবে। এবং উন্নত
জাতের বীজ ব্যবহার করে উন্নত প্রণালী চাষ
করতে হবে।

তৈলবীজের আয়তন বাড়াতে গেলে মোটামুটি
তিনটি পথ অনুসরণ করা যেতে পারে।

সহকারী উদ্ভিদবিদ, ডালশস্ত্র ও তৈলবীজ গবেষণা
কেন্দ্র, বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ।

সুরদাস মুখোপাধ্যায়

তৈলবীজ উৎপাদনে বাড়ির গবেষণা

১। এক ফসলী জমিগুলিতে দ্বিতীয় ফসল হিসাবে তৈলবীজের চাষ।

২। অল্প ফসলের সঙ্গে মিশ্র চাষ।

৩। কম অর্থকরী অল্প ফসলের বদলে বেশী অর্থকরী তৈলবীজের চাষ।

অবশ্য এইগুলি নির্ভর করবে কোন একটি অঞ্চলের আবহাওয়া ও মাটির গুণাগুণের ওপর।

তৈলবীজ নিয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে প্রথমেই রাই ও সরষের কথা মনে আসে। পশ্চিমবঙ্গের পঃ দিনাজপুর জেলাতেই সরষের আওতায় বেশী জমি রয়েছে। এছাড়া অল্প প্রধান জেলাগুলি হল— নদীয়া, বর্ধমান, মুর্শিদাবাদ, বীরভূম, ২৪-পরগণা (উঃ), মালদা, জলপাইগুড়ি, কুচবিহার ইত্যাদি। সম্প্রতি সম্প্রসারণ শাখার কর্মীদের প্রচেষ্টায় মেদিনীপুর (পূর্ব ও পশ্চিম), ২৪-পরগণা (দঃ) ও অমৃত্য জেলাগুলিতেও সরষে ও রাই চাষের এলাকা বাড়ছে।

পশ্চিমবঙ্গের আর একটি প্রধান তৈলবীজ হ'ল তিল। জগলী, বাঁকুড়া ও বর্ধমান জেলাতে তিলের চাষ অনেকেই করে থাকেন। গত

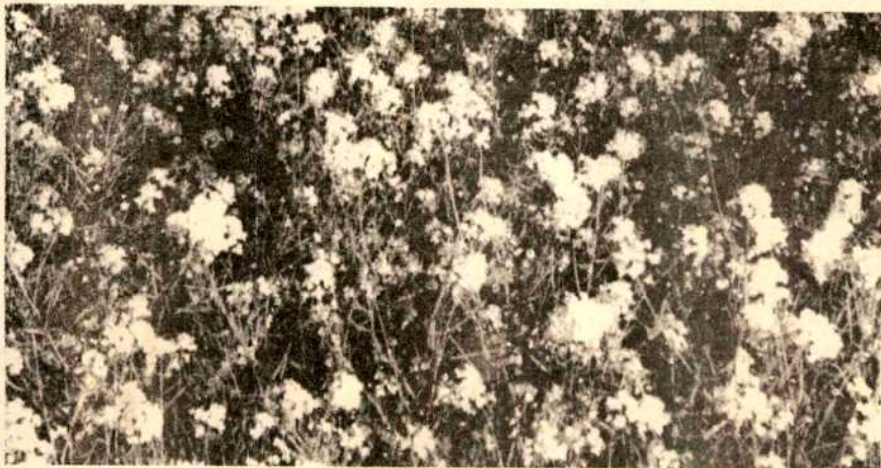
কয়েক বছর ধরে কৃষি দপ্তরের প্রচার ও প্রচেষ্টায় পঃ দিনাজপুর, মেদিনীপুর, বীরভূম, নদীয়া, মুর্শিদাবাদ, ২৪-পরগণা (উঃ) ও অমৃত্য কয়েকটি জেলাতেও তিল চাষের প্রসার ঘটেছে।

এ ছাড়া পঃ দিনাজপুর, মুর্শিদাবাদ, নদীয়া, মালদা প্রভৃতি জেলায় রবিফল তিসির চাষ হয়ে থাকে। তবে বেশীর ভাগ জমিতেই অবহেলিত ফসল হিসেবে এর চাষ হয়।

উপরোক্ত তৈলবীজগুলি ছাড়া বাদাম, সূর্যমুখী, সরগুজা, কুসুম, রেড়ি প্রভৃতির চাষও বিভিন্ন জেলাতে অল্প পরিমাণে হয়ে থাকে। পুরুলিয়া-বাঁকুড়া অঞ্চলে বাদামের চাষ করে সফলতা আশা করা যায়।

তৈলবীজের আয়তন বাড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে উৎপাদন বৃদ্ধির প্রসঙ্গও এসে পড়ে। যে কোন ফসলের ফলন বাড়তে হ'লে পাঁচটি নীতি অনুসরণ করলে উপকার পাওয়া যাবে। সেগুলি হ'ল :

১) উন্নত জাতের বীজ বোনা এবং অবশ্যই শোধন করে বোনা।



২) ঠিক সময়ে বীজ বোনা।

৩) মাঠে সঠিক সংখ্যক গাছ রাখা।

৪) পরিমাণমত সার ও প্রয়োজনমত সেচ দেওয়া।

৫) যথাসময়ে ও ঠিকমত শস্যরক্ষার ব্যবস্থা করা।

বহরমপুরের ডালশস্য ও তৈলবীজ গবেষণা কেন্দ্রে পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে সরষের দেশী জাতের বদলে উন্নত জাত ব্যবহার করলেই ফলনের হার শতকরা প্রায় ৩২ ভাগ বাড়ান সম্ভব। সারগী-১ থেকে বিশদভাবে এই নিরীক্ষার ফল জানা যাবে।

সারগী-১

(দুই বছরের ফলনের গড়)

জাত	ফলন (কেজি / হেঃ)	শতকরা বৃদ্ধি
১। দেশী জাত (বিনা সারে, বিনা সেচে ও রোগ-পোকা দমন না করে)	১২৮	—
২। উন্নত জাত (ঐ)	১৬৯	৩২
৩। দেশী জাত (পরিপূর্ণ উন্নত চাষ পদ্ধতিতে)	৬০১	৩৬৯
৪। উন্নত জাত (ঐ)	১০০৩	৪৯৩

সারগী-১ থেকে এটা বোঝা যায় যে উপযুক্ত সময়ে, উন্নত জাতের বীজ লাগিয়ে, সঠিক তদারকির ফলে ভাল ফলন পাওয়া যাবেই।

একক ফসল হিসাবে চাষের বদলে মিশ্র চাষ করলে অথবা সাথী ফসল হিসাবে চাষ করলেও উপকৃত হবেন। যেমন, তিসি ও ছোলার মিশ্র চাষের ফলে ছোলার চলে পড়া রোগ অনেকটা কমানো সম্ভব। সাথী ফসল হিসাবে আখের সঙ্গে টোরি সরষের চাষ করা যেতে পারে। বেথুয়াডহরির ইক্ষু গবেষণা কেন্দ্রে এ সম্বন্ধে পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে আখ লাগানোর মাসখানেকের মধ্যে টোরি জাতের সরষে লাগিয়ে অগ্রহায়ণের শেষে বা পৌষের প্রথমদিকে একটি অতিরিক্ত ফসল তুলে নেওয়া সম্ভব।

পশ্চিমবঙ্গের কালিম্পাঙে “জলের প্রকৃষ্ট সদ্যবহার” প্রকল্পের অধীনে গবেষণা করে দেখা গেছে যে উত্তরবঙ্গের কয়েকটি জেলায়, যেখানে জমির অল্পত বৈশি, সে সব অঞ্চলে চুন ও অম্লখাদক দিয়ে রবিচন্দ্রে টোরি ও খেত সরষের ফলন বাড়ান সম্ভব। সাধারণতঃ সরষের জমিতে প্রতি হেক্টরে ৫০ : ২৫ : ২৫ হারে নাইট্রোজেন, ফসফেট ও পটাশ প্রয়োগ করতে সুপারিশ করা হয়। উত্তরবঙ্গের কয়েকটি জেলায় ফসফেট ও পটাশের পরিমাণ বাড়িয়ে ও সেইসঙ্গে “বোরাক্স” দিয়ে ভাল ফলন পাওয়া গেছে।

বিভিন্ন তৈলবীজের রোগ ও পোকা দমন করার জন্য বহরমপুরের ডালশস্য ও তৈলবীজ গবেষণা কেন্দ্রে বিভিন্ন প্রকার নিরীক্ষা করা

বঙ্গদ্রা : অগ্রহায়ণ : ১৩৯২

হয়েছে। তাঁদের সুপারিশ হল :

১। সরষে ও রাইএর ধসা রোগের জন্ম থায়োকার্বমেট ঘটিত ওষুধ যেমন—“ডাইথেন এম-৪৫”, বা ক্যাপ্টাফল জাতীয় ওষুধ যেমন “ডাইফোলাটান” প্রয়োগ করতে হবে। জাব পোকের জন্ম মিথাইল ডেমিটন ঘটিত ওষুধ যেমন “মেটাসিষ্টক্স” অথবা ডাইমিথোয়েট ঘটিত ওষুধ যেমন “রোগর” সরষে ও রাই-এ প্রয়োগ করতে হবে।

২। তিলের ক্ষেত্রে “ফাইলোডী” বা “লিফকাল” রোগ দেখা দিলে রোগাক্রান্ত গাছ তুলে ফেলতে হবে। উভয় রোগই শ্যামা পোকের বা জাব পোকের মাধ্যমে ছড়ায়। প্রতিকার হিসাবে মিথাইল ডেমিটন ঘটিত ওষুধ যেমন “মেটাসিষ্টক্স” অথবা ডাইমিথোয়েট যেমন “রোগর” প্রয়োগ করতে হবে। লেদা বা বিছা পোকের প্রতিরোধক হিসাবে কুইনালফস ঘটিত ওষুধ যেমন “মেটাসিড” প্রয়োগ করা যায়। এ ছাড়া কাণ্ড ও গোড়া পচা রোগ দেখা গেলে ম্যানকোজেব জাতীয় ওষুধ যেমন ডাইথেন এম-৪৫ ছোট্টালে উপকার পাওয়া যায়। তবে এই রোগাক্রান্ত জমিতে তিন চার বছর তিল না চাষ করাই ভাল।

৩। এই দুটি প্রধান তৈলবীজ ছাড়া বাদাম ও তিসির মরচে রোগের জন্ম ডাইথেন জেড-৭৮

প্রয়োগ করে সুফল পাওয়া গেছে।

বহরমপুরের ডালশস্য ও তৈলবীজ গবেষণা কেন্দ্রে উদ্ভাবিত কয়েকটি উন্নত জাতের নাম নীচে দেওয়া হ’ল।

১। শ্বেত সরষে—বিনয়

২। টোরি—অগ্রণী, সি-১, সি-২, সি-৩,

৩। রাই—সীতা, আর ডব্লিউ-৩৫১, আর ডব্লিউ-৮৫-৫৯, করুণা *

৪। তিল—কালিন্দী, বি-৯, বি-১৪ (কৃষ্ণ)

৫। তিসি—নীলা, মুক্তা *, টি-৩৯৭ *

৬। বাদাম—বি-৩০, বি-৩১, পোলাচি-১ *, জে-১১ *, এম. এইচ-২ *

৭। সূর্যমুখী—ই সি-৬৮৪১৪ *,

ই.সি-৬৮৪১৫ *, মরডেন *

৮। কুসুম—সি.টি.এস-৭৪০৩ *,

এ.পি.আর.আর.-১ *

তারকা চিহ্নিত (*) জাতগুলি অল্প রাজ্যে উদ্ভাবিত। বিভিন্ন নিরীক্ষায় প্রমাণিত হয়েছে যে এই জাতগুলিও পশ্চিমবঙ্গের জল হাওয়ায় ভাল ফলন দেয়।

কৃষকের সামর্থ্য অল্পব্যয়ী উন্নত পদ্ধতি অনুসরণ করে ও সম্ভবমত চাষের জমির আয়তন বাড়িয়ে চাষ করলে রাজ্যের তৈলবীজের উৎপাদন বহুলাংশে বৃদ্ধি হবে, এতে কোন সন্দেহ নেই।

হিন্দুস্তান লিভারের নতুন উপহার সব ফসলের সর্বোত্তম আহার



নতুন পারশ ডি.এ.পি.সার (১৮:৪৪:০)

পূর্বভারতে প্রথম, হিন্দুস্তান লিভার তৈরী করছে
পরশ ডাই অ্যামোনিয়াম ফসফেট (১৮:৪৪:০) সার।

- অঙ্কুর বেরোবার সময় এবং চারার বেড়ে ওঠার রসদ হিসাবে স্টার্টার নাইট্রোজেন এবং ফসফেটের পয়োজন হয়—এই দুয়েরই পয়োজন মেটাতে অম্বিতীয় পরশ ডি. এ. পি. সার।
- পরশ ডি. এ. পি.তে আছে ১৮% নাইট্রোজেন এবং ৪৬% ফসফেট অর্থাৎ মোট ৬৪ ভাগ পুষ্টি—যা অন্য যে কোনো সারের তুলনায় অনেক বেশি।
- একদিকে পুষ্টিতে ডরপুর আবার অন্যদিকে দামেও সাশ্রয়। কম খরচে ফসলের ফসফেটের পয়োজন মেটানোর সেরা উপায় পরশ ডি. এ. পি. সার।
- পরশ ডি. এ. পি. সার তৈরী করছে হিন্দুস্তান লিভার—সার্ক, সানলাইট, লাইফবয়, রিন ইত্যাদি সেরা সামগ্রী যারা বানান। তাই সেরা গুণের গ্যারান্টি পরশ ডি. এ. পি. সার।

 হিন্দুস্তান লিভারের একটি উৎকৃষ্ট উৎপাদন

স্বপ্ন হোলো সত্যি... মাটি থেকে খাঁটি সোতা



MLL-569

বিতর্কিত ডালশস্য: খেসারি

ড: কল্যাণব্রত সেনগুপ্ত^১

ড: পরিতোষ ভট্টাচার্য্য^২

সারা দেশে সম্প্রতি খেসারি ডালের চাষ নিয়ে বিতর্ক দেখা দিয়েছে। প্রশ্ন উঠেছে— খেসারির ডাল খাওয়া উচিত কি উচিত নয়? কেননা খেসারির ডাল খাওয়ার ফলেই নাকি নিয়ন্ত্রণ পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে পড়ে। তাই স্বাভাবিক কারণেই এই প্রশ্ন। বর্তমান নিবন্ধের উদ্দেশ্য খেসারি ডাল সম্পর্কে সার্বিক পর্যালোচনা করা।

পরিচিতি

ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্যে খেসারি নানা নামে পরিচিত। যেমন গুজরাটেরা বলেন 'লাদু', মারাঠিরা বলেন 'লাখ', উত্তরপ্রদেশে 'চাপা', পাঞ্জাবে 'চুরাল', হিন্দীতে 'তেউরি',

'কাসারি', 'কাস্তুর' ইত্যাদি। আমরা বাঙালীরা বলি খেসারি। প্রাচীন ভারতে একে বলা হতো 'ত্রিপুট' কলাই। ইংরেজীতে এর নাম 'Chickling vetch'। উদ্ভিদবিজ্ঞানে এর নাম *Lathyrus Sativus*। *Lathyrus* শব্দটি এসেছে প্রাচীন গ্রীক ভাষা থেকে, যার অর্থ একরকমের ডালশস্য।

খেসারি প্রধানত: গো-খাত্ত হিসেবে চাষ হয়। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দরিদ্র মানুষ খেসারির ডালের রুটি, বেসম ও ছাতু খেয়ে থাকে। খেসারি ঠাণ্ডা আবহাওয়ার উপযোগী ফসল। আশ্বিন মাসে বুনো ফাল্গুন-চৈত্রের ফসল

১) যুগ্ম কৃষি অধিকর্তা (গবেষণা)।

২) গবেষণা আধিকারিক, ডালশস্য ও তৈলদীজ গবেষণা কেন্দ্র, বহরমপুর।

বন্স্করা : অগ্রহায়ণ : ১৩২২

কাটা হয়। পাকতে সময় নেয় ১২০—১৩০ দিন।

পশ্চিমবঙ্গে মোট ৬'১৮ লক্ষ হেক্টর জমিতে (দশ বছরের গড়) যে ডাল চাষ হয়, তার অন্তর্গত বিভিন্ন জেলায় খেসারি কতখানি এলাকা বা আয়তন জুড়ে চাষ হয়, ১নং সারণীতে তার হিসাব দেওয়া হোল।

খেসারি জনিত রোগ : 'ল্যাথাইরিজম' (Lathyrism)

১৮২২-৩০ খ্রীষ্টাব্দের আগে পর পর তিনবার উত্তরপ্রদেশ এলাকায় পর্যায়ক্রমে বন্যা ও খরা হওয়ায় প্রধান খাদ্য, যব, গম ও ধানের কসল নষ্ট হয়ে যায়। আসে দুর্ভিক্ষ। সে সময় ওখানকার মানুষ খেসারির ডালের চাপাটি, ছাতু, বেসম ও ডাল খেয়ে জীবনধারণের চেষ্টা করেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ খেসারি খেয়ে অনেক লোকেরই নিম্নাঙ্গ পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে যায়। ১৮২৪ সালে মধ্যপ্রদেশ থেকেও একই ধরনের খবর আসে। শুধু তাই নয়, এশিয়া, আফ্রিকার দেশ ছাড়াও অন্যান্য দেশ যেমন, ইতালী, স্পেন, রাশিয়া, আলজেরিয়া ইত্যাদি দেশেও এই রোগের খবর সমর্থিত হয়। ১৯৫৮ সালে মধ্যপ্রদেশের 'রেওয়া' জেলার মোট জনসংখ্যা ৬,৩৪,০০০ জনের মধ্যে ২৫০০০ জনই এই রোগে ভোগে। ১৯৭৪ সালে ঐ প্রদেশের রায়পুর জেলায় এক নিরীক্ষিত তথ্যে দেখা যায় যে প্রতি হাজার জনে ৪০ জন এই খেসারি জনিত রোগে ভুগছে। এই রোগের নাম 'ল্যাথাইরিজম'।

পশ্চিমবাংলার মুর্শিদাবাদ ও মালদহ জেলায় এই রোগের প্রাচুর্য দেখা যায়। বন্স্ক বিজ্ঞান মন্দিরের কিছু বিজ্ঞানী সমীক্ষা করে দেখেছেন যে ২০-২১ বছরের ছেলেদের মধ্যেই এই রোগ

বেশী। এই বিজ্ঞানীরা ৫৫টি পরিবারের ৬পয় সমীক্ষা চালিয়ে দেখেছেন প্রায় শতকরা ২০ শতাংশ লোক এই রোগে ভুগছে।

কেন এই রোগ

'ল্যাথাইরিজম' রোগটি কেন হয়, এই নিয়ে বিজ্ঞানীরা দীর্ঘদিন ধরেই নানা গবেষণা করে আসছেন। এই গবেষণার মাধ্যমে জানা যায় যে খেসারির বীজের এক ধরনের অধিবিষ (Neurotoxin) এর জন্ম দায়ী। এই অধিবিষ কয়েকটি উপকর (alkaloid) নিয়ে গঠিত। যথা :

- (১) বিটা (এন্)-অক্সালিল-অ্যামাইনো-
এ্যালানিন
(N-oxalyl-amino-alanine)
বা সংক্ষেপে B.O.A.A.
- (২) বিটা (এন্) অক্সালিল-আলফা-বিটা-
ডাইঅ্যামাইনো-প্রোপাইওনিক এসিড
(-N-oxalyl- - -
diamino-propionic acid)
- (৩) বিটা-গামা-গ্লুটামিল-অ্যামাইনো-
প্রোপাইওনাইট্রাইল
(-r-glutamyl-amino-
propionitryl)

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে যে 'আকারি' বা 'আকটা' (Vicia Sativa) নামে একটি আগাছা খেসারির সাথে একত্রে জন্মায়। এই আগাছার বীজে একটি বিষাক্ত উপকর থাকে, যার নাম বিটা-সায়ানো-এল-অ্যালানিন (-cyano-L-alanine)। যখন খেসারির বীজের সংগে এই বীজ মিশ্র অবস্থায় থাকে, তখন পক্ষাঘাত রোগের আক্রমণ হয়।

বসুন্ধরা : অগ্রহায়ণ : ১৩৯২

সারণী নং ১

পশ্চিমবাংলায় বিভিন্ন জেলায় আয়তন ভিত্তিক
('০০০ হেক্টর) খেসারির চাষের খতিয়ান
(দশ বছরের গড়)

জেলা	খেসারির এলাকা	আপেক্ষিক চাষ (শতকরা) (মোট খেসারির এলাকার ভিত্তিতে)	আপেক্ষিক চাষ (শতকরা) (মোট ডালচাষ এলাকার ভিত্তিতে)
মুর্শিদাবাদ	৩৯'১৬	২৪'৬৬	৬'৩৪
মেদিনীপুর (পূর্ব)	৩০'১৬	১৮'৯৯	৪'৮৮
বীরভূম	১৭'৭৩	১১'১৬	২'৮৭
হাওড়া	৯'৫১	৫'৯৯	১'৫৪
২৪-পরগণা (দঃ)	৯'৩২	৫'৮৭	১'৫১
মেদিনীপুর (পশ্চিম)	৮'৪০	৫'২৯	১'৩৬
মালদহ	৮'৩৬	৫'২৬	১'৩৫
বর্ধমান	৭'৯১	৪'৯৮	১'২৮
নদীয়া	৬'৯২	৪'৩৬	১'১২
কুচবিহার	৪'৬৩	২'৯২	০'৭৫
২৪-পরগণা (উঃ)	৪'৬০	২'৯০	০'৭৪
হুগলী	৪'১০	২'৫৮	০'৪২
বাঁকুড়া	৩'৪৭	২'১৮	০'৩৫
পঃ দিনাজপুর	৩'১৭	২'০০	০'৩২
জলপাইগুড়ি	২'৩৮	১'৫০	০'২৪

বসুন্ধরা : অগ্রহায়ণ : ১৩৯২

ল্যাথাইরিজমের প্রকারভেদ

‘ল্যাথাইরিজম’ রোগটি সাধারণতঃ
দু’ রকমের :

(ক) হাড়ের পক্ষাঘাত রোগ (Osteo-
lathyrism),

(খ) স্নায়ুর পক্ষাঘাত রোগ (Neuro-
lathyrism)।

হাড়ের পক্ষাঘাতের জন্ম যে অধিবিষ দায়ী, তার নাম বিটা-গামা-গ্লুটামিল-অ্যামাইনো-প্রোপিওনাইট্রাইল। দেহে এই অধিবিষের পরিমাণ বেশী হয়ে গেলে যোগবাহী কলার বিপাকে (metabolism) ব্যাঘাত ঘটে। তাছাড়া Vitamin A ও অনেক কম হয়ে যায়। ফলে হাড়ের গঠন ঠিকমত হয় না ও রোগী পঙ্গু হয়ে পড়ে।

স্নায়ুর পক্ষাঘাত রোগের জন্ম বিটা-অক্সালিল-অ্যামাইনো-অ্যালানিন বা B. O. A. A. অধিবিষটি দায়ী। সাধারণতঃ এই অধিবিষটি রক্তের সঙ্গে মেশে না। কিন্তু যদি কোনও কারণে রক্তের অম্লত্ব বেড়ে যায় তবে অধিবিষটি রক্তে মিশে মস্তিষ্কে চলে যায় ও বিবক্রিয়া শুরু হয়।

তবে কি উপায়

তাহ’লে কি খেসারির ডাল খাওয়া চলবে না? সম্প্রতি ভারতবর্ষের অনেক প্রদেশে সরকারী আইন বলে খেসারির চাষ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। নিঃসন্দেহে এটি যথোচিত। কিন্তু কি লাভ এতে? যেখানে ভারতের জনসংখ্যার অধিকাংশই দারিদ্র্য সীমারেখার নীচে ও খেসারি জমিতে অগ্র বিকল্প ফসল চাষের উপায় নেই, সেখানে শুধুমাত্র আইন করেই কি খেসারির চাষ

বন্ধ করা যাবে?

শুধুমাত্র তাই নয়। খেসারির বীজে যে একরকম অধিবিষ আছে তা অনেক আগে থেকেই আমাদের জানা। চরক-সংহিতায় খেসারির নাম রাখা হয়েছে ‘খণ্ডিক’ যা আয়ুর্কে খণ্ডন করে। অথর্ববেদে এর নাম ‘তর্বাদিক’, অর্থাৎ যে গতিকে পীড়িত করে।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে প্রাচীনকাল থেকেই খেসারির এই অধিবিষটির সংগে আমরা পরিচিত। তা সত্ত্বেও বিংশ শতাব্দীর শেষভাগেও খেসারির চাষ বন্ধ হয়নি। চাবীরা যে এই অধিবিষটির কথা জানেন না তা নয়। কিন্তু দারিদ্র্য তাঁদের খেসারির চাষে টেনে নিয়ে যায়। সুতরাং কোনও বিকল্প ব্যবস্থা নিতে হবে। সম্প্রতি এই প্রসঙ্গে দুটো ভাবনা এসেছে :

(১) অধিবিষহীন বা কম অধিবিষ সম্পন্ন নতুন জাত উদ্ভাবন,

(২) খেসারির বীজের অধিবিষ কাটিয়ে দেওয়া (detoxification)।

ভারতীয় কৃষি গবেষণা কেন্দ্রে অধিবিষহীন বা কম অধিবিষ সম্পন্ন উন্নত জাত উদ্ভাবনের কাজ বেশ কিছুদিন হলো আরম্ভ হয়েছে। এরই ফলে পুসা-২৪ নামে একটি উন্নত জাতের উদ্ভাবন হয়েছে যাতে অধিবিষের পরিমাণ শতকরা ০.১৯ ভাগ (যেখানে স্থানীয় জাতে এই অধিবিষের পরিমাণ শতকরা ০.৬০ ভাগ)। খেসারির বীজে শতকরা ০.৫০ ভাগ অধিবিষ থাকলেই ঐ বীজ বিযাক্ত বলে গণ্য হয় এবং খাওয়া উচিত নয়। পশ্চিমবঙ্গে কৃষি বিভাগের অধীনস্থ ডালশস্য ও তৈলবীজ গবেষণা কেন্দ্র, বহরমপুরেও দীর্ঘদিন গবেষণার ফলে ‘নির্মল’

বস্তুকরা : অগ্রহায়ণ : ১৩৯২

সারণী নং ২

খেসারি বীজের খাদ্যগুণ

নামে একটি উন্নত জাতের সন্ধান মিলেছে যাতে অধিবিষের পরিমাণ শতকরা ০.২০ ভাগ। দেখা গেছে খেসারির যে সমস্ত বীজ হালকা হলুদ রংয়ের, তাতে অধিবিষের পরিমাণ কম।

অধিবিষ কাটানোর ব্যাপারে নানা মতভেদ আছে। তবে দেখা গেছে ডাল ৬-৭ ঘন্টা জলে ভিজিয়ে রেখে সেই জলটি ফেলে দিয়ে ডাল ভালো করে ধুয়ে রান্না করলে এই অধিবিষটি থাকে না, কেননা এটি জলে দ্রবণীয়। তবে এই ডাল কখনোই শুকিয়ে বেসম বা ছাতু হিসেবে খাওয়া চলবে না।

বিজ্ঞানীদের মতে ভাত বা রুটির সাথে পরিমিত পরিমাণ খেসারির ডাল মিশিয়ে খাওয়া পৌষ্টিক দিক থেকে বেশী ভালো। খেসারির বিবিধ খাদ্যগুণ ২ নং সারণীতে উল্লেখ করা হলো।

খাদ্যগুণ	মান (১০০ গ্রাম অগ্রহায়ণে অংশের ভিত্তিতে)
জলীয় অংশ	১০.০ গ্রাম
প্রোটিন	২৮.২ "
স্নেহ পদার্থ	০.৬ "
খনিজ লবণ	২.৩ "
খেসার	৫৬.৬ "
ক্যালসিয়াম	২০ মিলিগ্রাম
ফসফরাস	৩১.৭ "
লোহা	৬.৩ "
থিয়ামিন	০.৩৯ "
নিয়াসিন	২.৯ "

উৎস : Nutritive value of Indian foods, 1977

G. Gopalan, B.V. Ram Sastri,

S.C. Balasubramanian

খেসারি ডালে 'লাইসিন' (Lysine) নামে একটি দুর্লভ অ্যামাইনো অ্যাসিড আছে, খাদ্যগুণ হিসেবে যার মূল্য প্রভূত। তাই সবদিক বিবেচনা করে খেসারির চাষ বন্ধ না করে বিকল্প ব্যবস্থার কথা ভাবা উচিত।



সরষের চাষ প্রদর্শনী ক্ষেত্রে ভূমিকা

প্রবাল গুপ্ত

গ্রামের নাম উচ্চগ্রাম। বর্ধমান জেলার গলসি ১নং ব্লকের অন্তর্গত একটি ছোট গ্রাম। এখানে কৃষি বিভাগের অন্তর্গত মৃত্তিকা সংরক্ষণ শাখার উদ্যোগে গত রবি মরশুমে কয়েকটি সরষের প্রদর্শনীক্ষেত্র করা হয়েছিল। ঘুরে ঘুরে প্রদর্শনীক্ষেত্রগুলি দেখেছিলাম। গম, আলু, সূর্যমুখী এবং সাবুর চাষের মাঝে মাঝে সরষের প্রদর্শনীগুলি বেশ ভালই হয়েছে। ঘুরতে ঘুরতে মর্বশ্রী শচীহুলাল মণ্ডল, নারায়ণ চন্দ্র পাল, সহদেব সাহা, জগবন্ধু খাঁ, রাধামাধব পাল এবং আরও অনেকের সঙ্গে আলাপ হ'ল। এঁরা সকলেই এ বছর এখানে সরষের চাষ করেছেন। এঁদের উৎসাহিত করেছে মৃত্তিকা সংরক্ষণ শাখা।

বর্ধমান থেকে বেরিয়ে অনেকটা রুক্ষ মাঠ পার হয়ে এসে এই সবুজ ফসলের সমারোহ বেশ ভাল লাগছিল। জানতে পারলাম গত কয়েক বছর ধরেই এই গ্রামে অচ্যুত রবি ফসলের সঙ্গে সরষের চাষ করে আসছেন এখানকার কৃষকরা। সরষে বলতে রাই সরষের চাষই বেশী করেছেন। রাইয়ের “সীতা” জাতটি এঁদের খুব পছন্দ। এর ফলনও এঁরা ভাল পেয়েছেন। আর ডব্লিউ-৩৫১ জাতের রাইও কেউ কেউ চাষ করেছেন। “সীতা”-র প্রদর্শনীক্ষেত্র হয়েছে ৩'০০ একরে এবং “আর ডব্লিউ-৩৫১”-র চাষ হয়েছে ২'০০ একর জমিতে। ফসলের চেহারা খুব ভাল। রোগ বা পোকাকার উপদ্রব মোটামুটি নেই। অবশ্য

কৃষি উন্নয়ন আধিকারিক, তৈলবীজ, কৃষি অধিকার,
পশ্চিমবঙ্গ।

বহুক্রম : অগ্রহায়ণ : ১৩৯২

এঁরা সকলেই নিয়মিত ওষুধ স্বেচ্ছা করেছেন। ডি. ভি. সি. ব্রাঞ্চ ক্যানল থেকে সব জমিতেই সেচ দেওয়া হয়েছে। একজন ভাল বীজের অভাবের কথা বললেন। তবে যারা প্রদর্শনীক্ষেত্রে সরষের চাষ করেছেন, তাঁরা সকলেই উন্নত বীজ পেয়েছেন। খরিক মরশুমে রস্বা ধান চাষ করে তারপরে এঁরা সরষের চাষ করেছেন। সরষের চাষ করে এঁরা সকলেই লাভবান হয়েছেন।

খরিক মরশুমে রস্বা ধান তুলে কার্তিক মাসের শেষ সপ্তাহে এঁরা “সীতা” এবং “আর ডব্লিউ-৩৫১” জাতের রাই সরষে লাগিয়েছেন। বোনার আগে কোনও সেচ দেওয়া হয়নি। ধান কেটে নেওয়ার পর মাটিতে থেকে যাওয়া রসেই সরষে বুনছেন। বীজ লেগেছে হেক্টর প্রতি ৭ কেজি হিসেবে। প্রদর্শনীক্ষেত্রে সকলে সার দিয়েছেন হেক্টর প্রতি ৫০ কেজি নাইট্রোজেন, ২৫ কেজি ফসফেট এবং ২৫ কেজি পটাশ। অর্ধেক নাইট্রোজেন এবং সমস্ত ফসফেট ও পটাশ, রাই বোনার আগে মূল সার হিসেবে দিয়েছেন। বাকি নাইট্রোজেন ছবারে যথাক্রমে ২০ এবং ৪০ দিন পরে চাপান সার হিসেবে দিয়েছেন। দুটি চাপানের আগেই একটি করে সেচ দিয়েছেন। ২০—২২ দিন অন্তর তিনটি সেচ দেওয়া হয়েছে। প্রথমবার চাপান সার দেওয়ার আগে একবার নিড়েন দিয়ে গাছ

পাতলা করে দেওয়া হয়েছে। রোগ ও পোকার আক্রমণ প্রায় ছিল না। জাব পোকার আগাম প্রতিষেধক হিসেবে ছবার ডিমেক্রেন প্রতি লিটার জলে ৫ মি.লি. হিসেবে স্বেচ্ছা করা হয়েছে। প্রত্যেকটি জমিতে বেশ স্বকৃৎকে তক্তকে। দেখলে বোকা যায় সকলেই বেশ যত্ন করেই চাষ করেছেন।

এঁদের মধ্যে সর্বপ্রথম নারায়ণ চন্দ্র পাল, সহদেব সাহা এবং অশ্বিনী কুমার পাল ফলন বেশী পেয়েছেন। “সীতা” জাতের সরষেতে এঁরা ফলন পেয়েছেন হেক্টরে ১৫ কুইন্টাল হিসেবে। শচীহুলাল মণ্ডল এবং জগবন্ধু খাঁ পেয়েছেন হেক্টরে ১৩ কুইন্টাল হিসেবে।

শচীহুলাল মণ্ডল, নারায়ণ চন্দ্র পাল এবং অশ্বিনী কুমার পাল “আর ডব্লিউ-৩৫১” জাতের রাইও চাষ করেছিলেন। এই জাতে এঁরা ফলন পেয়েছেন হেক্টরে ১২—১২½ কুইন্টাল হিসেবে। এইসব কৃষকরা এই ফলন পেয়ে যেমন খুলী তেমনি এর চাষ বাড়াতেও আগ্রহী। অন্য কৃষকরাও অনেকেই এই প্রদর্শনীক্ষেত্রে দেখে যাচ্ছেন মনে নতুন আশা নিয়ে।

মাঠ দেখতে দেখতে এবং গ্রামবাসীদের সাথে আলাপ করতে করতে কখন সন্ধ্যা হয়ে গেল টের পাইনি। গ্রামবাসীদের উৎসাহ বেশ আশাব্যঞ্জক। মনে হলো—এই চাষ বাড়ানোর জন্য আগ্রহী অনেকেই।

পশ্চিমবঙ্গ তৈলবীজ ঘাটতি রাজ্য। এই ঘাটতি মেটাবার জন্য তৈলবীজের উৎপাদন বাড়াবার চেষ্টা করা হচ্ছে। বর্তমানে এই রাজ্যে তৈলবীজ চাষের এলাকা এবং উৎপাদন দুই আগের তুলনায় অনেকটা বেড়েছে। গত পাঁচ বছরের মধ্যে তৈলবীজের উৎপাদন প্রায় শতকরা ১০০ ভাগ বেড়ে গেছে, যদিও এলাকা বেড়েছে শতকরা ৫৬ ভাগ। ফসলের উৎপাদিকা শক্তি বেড়েছে হেক্টর প্রতি ৪২৪ কেজি থেকে ৫৪৪ কেজি। গত পাঁচ বছরে তৈলবীজের এলাকা, উৎপাদন এবং উৎপাদিকা শক্তি কিভাবে বেড়েছে তা নিচের তালিকা থেকে বোঝা যাবে।



পশ্চিমবঙ্গে তৈলবীজ উৎপাদন কাযসূচী

বছর	এলাকা (হাজার হেক্টরে)	উৎপাদন (হাজার টনে)	হেক্টর প্রতি উৎপাদিকা শক্তি (হেক্টর প্রতি কেজি)
১৯৭৯-৮০	২৩১.৩	৯৮.০	৪২৪
১৯৮০-৮১	৩১৪.১	১৫০.৩	৪৭৮
১৯৮১-৮২	৩৪৭.০	১৭৫.৬	৫০৬
১৯৮২-৮৩	৩৫৮.৯	১৭৫.১	৪৮৮
১৯৮৩-৮৪	৩৫৯.৭	১৯৫.৬	৫৪৪

বঙ্গবন্ধু : অগ্রহায়ণ : ১৩৯২

এই উৎপাদন বাড়ার সঙ্গেও দেখা গেছে চাহিদার মাত্র শতকরা ২০ ভাগ বর্তমানে উৎপাদিত হচ্ছে। চাহিদা ও উৎপাদনের মধ্যে এই ব্যবধান দূর করার জন্য আমাদের উৎপাদন প্রচেষ্টা বাড়িয়ে যেতে হবে। এ রাজ্যে যেসব তৈলবীজ উৎপাদন হয়ে থাকে তার মধ্যে প্রধান হলো রাই সরিষা, তিল ও তিসি। চীনাবাদামের চাষও এ রাজ্যে হয়ে থাকে। বর্তমানে খরিফ ও রবি দুই মরসুমেই এর চাষ হচ্ছে এবং ফলনও ক্রমশঃ বাড়ছে। সূর্যমুখীর চাষ বাড়ার জন্যও চেষ্টা করা হচ্ছে। সরগুজা ও কুসুমের চাষ এ রাজ্যে খুবই কম।

গত ১৯৮৩-৮৪ সালে বিভিন্ন তৈলবীজ কতটা এলাকায় এবং কতটা উৎপাদন হয়েছিল তা পাশের কলামে দেখানো হলো :—

শস্য	এলাকা (হাজার হেক্টরে)	উৎপাদন (হাজার টনে)
রাই সরিষা	১৮৯'৩৪	১১২'২৮
তিল	২৪'৭৮	৫৪'৩৫
তিসি	৬২'৪৭	১৮'৭৩
অগ্ন্যান্ন যথা চীনাবাদাম, সরগুজা, কুসুম ১৩'১৬		৯'৫৪
	৩৫৯'৭৫	১৯৫'৬০

১৯৮৫-৮৬ সালে ৪'২০ লক্ষ হেক্টরে মোট ২'২০ লক্ষ টন উৎপাদন লক্ষ্যসীমা ধরা হয়েছে। ১৯৮৪-৮৫ সালে বিভিন্ন তৈলবীজের চাষের এলাকা এবং উৎপাদন লক্ষ্যসীমা (হাজার হেক্টরে) নীচে দেওয়া হলো।

শস্য	১৯৮৫-৮৬ সালের চাষ এলাকা (হাজার হেক্টরে)	১৯৮৫-৮৬ সালের উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা (হাজার টনে)
খরিফ তিল	৫'০	৩'০
খরিফ চীনাবাদাম	৫'০	৪'০
রাই সরিষা	২৬৫'০	১৫০'০
তিসি	৬০'০	১৮'০
গ্রীষ্মকালীন তিল	৮০'০	৪০'০
অগ্ন্যান্ন/চীনাবাদাম, সূর্যমুখী	৫'০	৫'০
প্রভৃতি		
	৪২০'০	২২০'০

কার্যসূচী

এই লক্ষ্যসীমায় পৌঁছানোর জন্য নানা কার্যসূচী নেওয়া হয়েছে। যেমন বিভিন্ন শস্যের প্রদর্শন ক্ষেত্র। ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের জন্য মিনিকিট বিলি করা। বিভিন্ন শস্যের মোট ২,৪১,০০০ মিনিকিট বিলি করার কার্যসূচী



চীনাবাদামের একটি সমৃদ্ধ ক্ষেত দেখা যাচ্ছে।

নেওয়া হয়েছে। তাছাড়া জাতীয় তৈলবীজ উন্নয়ন প্রজেক্টেও রাই সরিষা ও সূর্যমুখীর উৎপাদন বাড়ানোর জন্য বিশেষ কার্যসূচী নেওয়া হয়েছে।

উৎপাদন বৃদ্ধির এই প্রচেষ্টা সপ্তম যোজনা-কালেও বাড়িয়ে যাওয়া হবে। সপ্তম যোজনা-কালের মধ্যে অর্থাৎ ১৯৮২-৯০ সালের মধ্যে তৈলবীজের উৎপাদন তিন লক্ষ মেট্রিক টন করার কার্যসূচী নেওয়া হয়েছে। এই কার্যসূচী রূপায়িত করার জন্য নিম্নলিখিত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

(১) এলাকা বাড়ানোর জন্য একই ক্ষেত্রে একাধিক শস্য উৎপাদন। যেমন সাধী ফসল হিসাবে তৈলবীজের চাষ করা।

(২) উন্নত চাষ পদ্ধতি অনুসরণ করা।

(৩) রাজ্যের সরকারি খামার থেকে উন্নত মানের বীজ সরবরাহ করা।

(৪) সেচপ্রাপ্ত এলাকায় অধিক ফলনশীল জলদি জাতের ধানের সঙ্গে শস্য পর্যায়ে তৈল-বীজের চাষ করা।

(৫) পশ্চিমাঞ্চলের উঁচু ভূমিতে খরিফ মরসুমে দেশী জাতের কম ফলনের ধান চাষের বদলে এবং রাজ্যের দক্ষিণ ও উত্তরাঞ্চলের রবি-গ্রীষ্ম মরসুমে সেচপ্রাপ্ত এলাকায় চীনা-বাদামের চাষ করা।

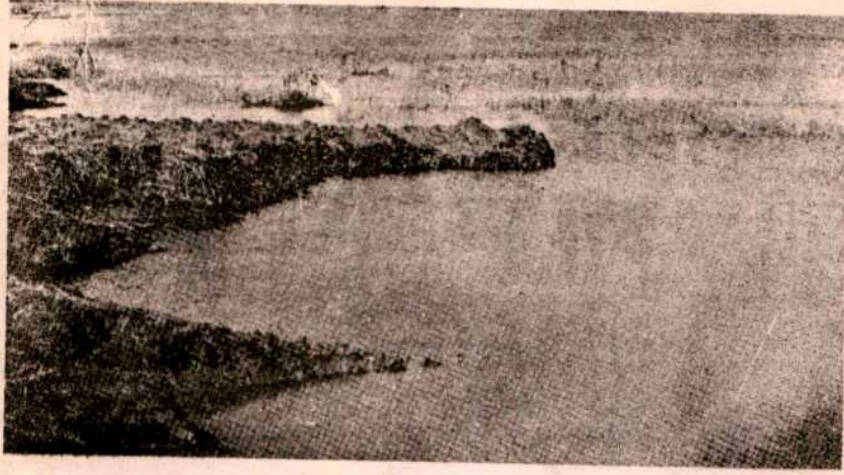
(৬) রবি-গ্রীষ্ম মরসুমে দক্ষিণ অঞ্চলে, তিলের চাষ বৃদ্ধি করা।

(৭) সুন্দরবন এলাকায় ধানের পরে দ্বিতীয় ফসল হিসাবে সূর্যমুখীর চাষ।

(৮) সরষের জাবপোকা দমনের জন্য ব্যাপক ব্যবস্থা নেওয়া।

(৯) অধিক সংখ্যক প্রদর্শন ক্ষেত্র করা।

(১০) তৈলবীজের চাষে সারের ব্যবহার বাড়ানো।



ঘূর্ণিঝড় ও বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত অঞ্চলের কৃষকদের সাহায্য দান

সংস্রুতি এ রাজ্যের উপর দিয়ে যে ঘূর্ণিঝড় ও বন্যা হয়ে গেল তাতে ২৪ পরগণা (উত্তর), ২৪ পরগণা (দক্ষিণ), মেদিনীপুর (পূর্ব), হাওড়া, হুগলী, মালদা ও জলপাইগুড়ির কৃষকরা মানাতাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন। ঘূর্ণিঝড়ে বাড়ীঘর পড়ে যাওয়া ছাড়া ক্ষেতের ফসলেরও ক্ষতি হয়েছে। বিশেষ করে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন কুম ও প্রান্তিক কৃষকরা। যাদের ক্ষেতের লব্ধ নষ্ট হয়েছে তারা যাতে আগামী রবি-গ্রীষ্ম ঋতুতে চাষ করে সেই ক্ষতির কিছুটা পূরণ করতে পাবেন সেজন্য সবজি, তরমুজ, বোরোধান ও গমের মিনিকিট বিলি করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এই মিনিকিট দেওয়া হবে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের। বিভিন্ন শস্যের প্রায় ৭৫,০০০ মিনিকিট বিলি করা হবে। সবজির মধ্যে দেওয়া হবে ট্যাডস ও লঙ্কার বীজ। তাছাড়া তরমুজের বীজ, অধিক ফলনশীল জলদি জাতের বোরো ধানের বীজ এবং শংসিত গমের বীজ।

সংবাদ



পৌষ মাসে কৃষকের করণীয়

আমরা ধান কৃষকের ঘরে উঠেছে এই পৌষে। সেই নতুন ধানে হবে নবান্ন, পৌষ পার্বন। পৌষ পার্বনের আনন্দ সারা পৌষ মাস ধরে কৃষকরা করুন। সেইসঙ্গে অনেক কৃষকেরই মনে মনে ইচ্ছা আছে বোরো ধান করে গ্রীষ্মকালেও আর একটি ফসল তোলেন।

বোরো ধান যাঁরা চাষ করছেন তাঁদের এ মাসে করণীয় হলো, লাঠিশাল ও কলমা-২১২ জাতের ধানের রোয়া করার কাজ এ মাসের প্রথমদিকে শেষ করতে হবে। অগ্ৰাণ্ড সুপারিশ করা জাতের চারা-সারা পৌষ মাস রোয়া করা চলবে। রোয়ার সময় সঠিক সংখ্যক গুছি সঠিক ব্যবধানে রোয়া করুন। অধিক ফলন-শীল জাতের চারা ২০ সেমি × ১০ সেমি এবং কলমা ও লাঠিশালের চারা ২০ সেমি × ১৫ সেমি দূরত্বে লাগান। রোয়ার গভীরতা যেন ৫ সেমির বেশী না হয়। জমি তৈরির জগু ৮—১০ গাড়ী জৈব সার দিন। এলোমেলোভাবে সার না দিয়ে মাটি পরীক্ষার ভিত্তিতে জমিতে রাসায়নিক সার দিন। এবং তাহলেই জমি যথাযথভাবে সাড়া দেবে।

গম

নাবি বোনা গমে চাপান সার দিন। আগাছা দমন করুন ও সুপারিশমত সেচ দিন। আলু

নিয়মিত ক্ষেত ঘুরে দেখুন। রোগপোকার আক্রমণ হলে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিন। সাধারণতঃ পৌষ মাসের মাঝামাঝি থেকে ধসা রোগের আক্রমণ দেখা যায়। এ বিষয়ে সতর্ক হোন এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা হিসাবে প্রতি লিটার জলে ২ গ্রাম ম্যানকোজিব বা জিনেব অথবা ৪ গ্রাম কপার অক্সিক্লোরাইড জলে পাতার ছপিঠে ও ডাঁটায় ভালভাবে স্প্রে করুন। রোগের প্রকোপ বুঝে ১০—১৫ দিন অন্তর আরও ২—৩ বার ওষুধ দিন।

সরিষা

ফুল আসার আগে প্রয়োজনবোধে সেচ দিন। জাব পোকার আক্রমণ দমনে ব্যবস্থা নিন। আখ

৪০—৪৫ দিন বয়সের চারায় নাইট্রোজেন চাপান দিয়ে ডাল বেঁধে দিন। এর ৪০—৪৫ দিন পরে আর একবার চাপান দেবেন।



চিত্রে বহুজ্ঞরা সম্পাদিকা স্নলেখা ঘোষের সঙ্গে মিস্ গারনেট মেলেনকে দেখা যাচ্ছে
(ফটো : দক্ষিণ ২৪-পরগণা জেলা কৃষি বিভাগের সৌজন্তে)

পশ্চিমবঙ্গের গ্রামে জর্জিয়ার কন্যা শ্রীমতী মেলেন

আমেরিকার জর্জিয়া থেকে এ রাজ্যে গত অগাষ্ট মাসে এসেছিলেন শ্রীমতী গারনেট মেলেন; ইন্টারন্যাশনাল ফোর এইচ ইয়ুথ এন্ডচেঞ্জ কার্যসূচীতে। উদ্দেশ্য এ রাজ্যের গ্রাম জীবন ও গ্রামের উন্নতিমূলক কাজ দেখা। গ্রামের উন্নতির জন্য যেসব কার্যসূচী নেয়া হয়েছে বিশেষ করে মহিলা, যুবক ও শিশুদের জন্য, সেসব উন্নয়নমূলক কাজকর্ম দেখা ও তার সঙ্গে পরিচিত হয়ে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করা।

গ্রামের উন্নয়নমূলক কাজ ও গ্রামের জীবন

যাত্রার সঙ্গে পরিচিত করানোর জন্য শ্রীমতী মেলেনকে এ রাজ্যের বিভিন্ন কৃষক পরিবারে ও গ্রামীণ পরিবেশে থাকার ব্যবস্থা করেন রাজ্য সরকার।

শ্রীমতী মেলেনের সঙ্গে দেখা হলো নিমপিঠ রামকৃষ্ণ আশ্রমে মহিলা শিক্ষিকাদের আবাসে। তিনি নিমপিঠে রামকৃষ্ণ আশ্রম পরিচালিত বিভিন্ন গ্রামোন্নয়ন ও শিক্ষা প্রসারের কাজগুলি যেমন দেখেন সেইসঙ্গে হৃন্দরবন অঞ্চলের উন্নয়নের জন্য যেসব বিশেষ কাজ করা হচ্ছে



চিত্রে : মমত রায় (মুখ্য কৃষি আধিকারিক), ডঃ কানাই ব্যানার্জী (কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্র নির্মাপী),
মিস্ গারনেট মেলেন (আমাদের অভিধি) ও কনককমল চ্যাটার্জীকে (প্রশিক্ষণ
আধিকারিক) দেখা যাচ্ছে।

সেগুলিও তিনি দেখেন। ঐ অঞ্চলের দু'ব
সংগঠন, মহিলা সমিতি এবং মাদ্র চাষের উন্নতির
কল্ল মেলন কাজ করা হচ্ছে তা দেখে তিনি
খুবই উৎসাহিত হন।

নিম্নলিখিত আসার আগে তিনি নামখানার
গজানগর গ্রামে একটি কৃষক পরিবারের সঙ্গে
থাকেন। গ্রামীণ পরিবেশে তিনি নিজেকে
এমনভাবে মানিয়ে নেন যে যেখানেই তিনি
থেকেছেন সেখানেই তিনি সেই ঘরের লোকদের
আপন করে নিয়েছেন। বাংলার গ্রামের ঐতিহ্য
কৃষ্টি ও মাদ্রকে অন্তর দিয়ে গ্রহণ করেছেন।

শ্রীমতী মেলেন যদিও কোন কৃষক পরিবার
থেকে আসেননি কিন্তু কৃষি ও উদ্ভিদতত্ত্ব
সম্বন্ধে তিনি আগ্রহী। গ্রামের উন্নয়ন কাজ

সম্বন্ধে তিনি যে অভিজ্ঞতা এখানে সঞ্চয় করেছেন
তা তিনি ফিরে গিয়ে অল্পত্র কাজে লাগাবেন
বলে জানানেন।

গত অগাষ্ট মাসে তিনি এ দেশে এসেছেন।
এ রাজ্যে দু' মাসের মত থেকে তিনি যাবেন,
দক্ষিণ ভারতে। সেখানেও গ্রামোন্নয়ন কাজকর্ম
দেখবেন। ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের গ্রামোন্নয়ন
কাজ দেখে ও এ সম্বন্ধে কিছু শিক্ষা নিয়ে
ডিসেম্বরে দেশে ফিরে যাবেন।

এই কার্যসূচীতে এ দেশে মোট ১১ জন
এসেছেন। এর মধ্যে আছেন ৯ জন মহিলা ও
২ জন পুরুষ। এ রাজ্যে এসেছিলেন
শ্রীমতী মেলেন ছাড়া একজন পুরুষ নাম
শ্রী ডেভিড।



হাঁস পালনও লাভজনক

গুধু মুরগী পালনই যে লাভজনক এ কথা ভাবলে কিন্তু ভুল করা হবে, কারণ একটু বুঝে শুনে লালন পালন করলে পাতিহাঁস পালনও কম লাভজনক নয়।

হাঁস পালন কেন মুরগীর থেকেও লাভজনক ব্যবসা

প্রথমত মুরগীর থেকে হাঁস পালনের খরচ অনেক কম। কারণ হাঁস সাধারণত শামুক, গুগুলি, শ্রাওলা ও নানা প্রকার জলজ পোকা-মাকড় খেয়েই জীবন ধারণ করে। তবে ভালো খোরাক হিসাবে সবুজ চারার সঙ্গে সামান্য মাত্রায় কনসেন্ট্রেট মিশিয়ে খাওয়ালে ভালো হয়। মুরগীর তুলনায় হাঁসের ডিম আকারে বড়, ওজনে বেশী এবং খোসাও বেশ

মজবুত হওয়ার কলে চালানের পক্ষেও সুবিধাজনক। পাতিহাঁস একনাগাড়ে দুই-তিন বছরে ডিম পাড়তে সক্ষম, মুরগীরা যা পারে না। এ ছাড়াও মুরগীর মাংসের মত হাঁসের মাংসও কম সুস্বাদু বা কম পুষ্টিকর নয়।

সুতরাং ছোট চাষীর পক্ষে হাঁস পালন কম লাভজনক নয়। জোঁলো জমি পড়ো ক্লে না রেখে, সেখানে হাঁস পালন করলে, ছ' পরলা বাড়তি আয় করা মোটেই শক্ত নয়। এক একর জোঁলো জমিতে প্রায় ৩০০টির মত হাঁস পালন করা যায়।

হাঁসের খামার

পুকুরে খালে বিলে, হাঁস চরে বেড়ালেও জল ছাড়াও হাঁস পালন করা চলে। তবে হাঁস

বস্তুকরা : অগ্রহায়ণ : ১৩২২

মুক্ত জীবন বেশী ভালবাসে বলে, খোলা জায়গায় তাদের চরে বেড়াতে দেওয়া দরকার। সুতরাং খোলা উঠানে ছায়াময় কয়েকটি শেড তৈরী করে দিতে হবে যাতে রাত্রিতে বা বৃষ্টিতে হাঁসদের কোনো ক্ষতি না হয়। উঠানের শেডের ভিতর বেশ অনেকগুলি দানা-পানির পাত্র তাদের জন্য রেখে দিতে হবে। প্রত্যেকটি পাত্রের ভেতর ১'২৫ থেকে ৩'৭৫ সেমি এবং ২'৫ সেমি থেকে ৭'৫ সেমি দূরত্ব রাখা দরকার।

হাঁসের জাত

ডিম ও মাংসের জন্য দেশী জাতের থেকে বিদেশী জাতের হাঁস বেশী ভালো হয়। দেশী খাঁকী কম্পবেল জাতের হাঁসই বেশী জনপ্রিয়। এ ছাড়াও (Pekin) পেকিন্ এবং মাস্করি (Muscory) জাতীয় হাঁসের মাংস দেশী জাতের তুলনায় অনেক বেশী ভালো হয়। যদিও আমাদের দেশে এখনও ভালো জাতের হাঁসের বাচ্চা সহজে পাওয়া যায় না, আর তাদের ঠিকমত লালন-পালন করার জন্য কোনো ইনকুবেটরেরও (Incubator) ব্যবস্থা নেই। তবে এই অসুবিধা দূর করার জন্য ভারত সরকার কর্ণাটক রাজ্যের হাসারা-গাটাতে Central Duck Breeding Farm নামে একটি কার্ম প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

খাদ্য

হাঁস পালনের সময় খেয়াল রাখতে হবে তাদের ভালো বাড়ির জন্য যেন সুষম খাদ্য খাওয়ানো হয়। হাঁসের দৈনিক খাদ্যে যথাযথ

মাত্রায় প্রোটিন, কার্বোহাইড্রেট, ক্যালসিয়াম, ফসফোরাস এবং ভিটামিন থাকা দরকার। নীচে একটি হাঁসের খাদ্য তালিকা দেওয়া হলো। দুই সপ্তাহ বয়সের হাঁসের জন্য খাদ্যে লতকরা ৪০ ভাগ দানা, ২০ ভাগ চালের কুঁড়া, ২'৭ ভাগ তিলের খোল, ১০ ভাগ ফিশ্ মিল, ২'৫ ভাগ মিনারেল মিশ্রণের থাকা দরকার।

দুই থেকে কুড়ি সপ্তাহ বয়সের হাঁসের জন্য উপরিউক্ত খাদ্যের ভাগ যথাক্রমে ৪৭% ভাগ, ২২'৫% ভাগ, ২০% ভাগ, ৮% ভাগ, ২'৫% ভাগ মিশ্রণ করতে হবে।

কুড়ি সপ্তাহ বয়সের পরে উপরিউক্ত খাদ্যের লতাংশ বাড়িয়ে দিতে হবে যথাক্রমে ৪০, ২৫, ২০, ১০, ২'৫ এবং ২'৫ ভাগ অনুসারে।

রোগ নির্ণয়

হাঁসের প্রধান প্রধান রোগের মধ্যে রোটো-লিজম্ রানীক্ষেত, কক্সিডিউসিস্ (Coccidiosis), ডাকপ্লেগ, বসন্ত এবং এফ্লাটক্সিকোসিস্ (Aflatoxicosis)। এই রোগসমূহ প্রতিরোধের জন্য হাঁসদের সময় মত রোগ প্রতিরোধী টীকা দেওয়া দরকার। রোগক্রান্ত মৃত হাঁসের দেহ সত্বর সংকার করা দরকার। খামারের আশ-পাশ, খাদ্য ও পানীয় যাতে পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন থাকে সেদিকে লক্ষ্য রাখা দরকার।

এই নিয়মগুলি একটু বুঝে শুনে মেনে চললে হাঁস পালনের দ্বারা অচিরেই হাঁস-পালক লাভবান হবেন।

(ফার্ম ইনফরমেশনের সৌজন্যে)

বেশী ফলন ও লাভের জন্য মাটি পরীক্ষার ডিঙিতে সার ব্যবহার করুন

মাটির নমুনা কিভাবে নেবেন :

ধান ও গমের জন্য ১৫ সে.মি. পর্যন্ত এবং আখ, পাট, আলু, ভুট্টা ইত্যাদির ক্ষেত্রে ২২½ সে.মি. পর্যন্ত গভীর করে মাটি নিন। ফসল সারিতে থাকলে দু'সারির মাঝ থেকে মাটি নিতে হবে। অবস্থান ও মাটি অনুযায়ী জমিকে ভাগ করে প্রতি ভাগ থেকে আলাদা নমুনা নিন। গাছের আওতা, সারের গর্ত, পুরানো জলাজমি বা সার দেওয়া জমি থেকে নমুনা নেবেন না।

১০/১৫ জায়গার মাটির নমুনা নিয়ে, ছায়ায় শুকিয়ে, ভাঁড়ো করে মেশান। সংগৃহীত মাটি চার ভাগ করে বিপরীত দু'টি ভাগ ফেলে দিন। বাকী দু'টি ভাগ ফের মিশিয়ে, চার ভাগ করে, বিপরীত দু'টি ভাগ ফেলে দিন। এভাবে যখন আধ কেজির মত মাটি থাকবে, তা শুকিয়ে থলিতে ভরে, প্রতিটি নমুনায় আলাদা চিহ্ন দিয়ে, নমুনার জন্য দু'প্রস্থ তালিকা পূরণ করে একটি তালিকা-থলির ভিতরে ও একটি বাইরে বাঁধুন।

নমুনার সঙ্গে কি কি জানাতে হবে :

- (১) জমিক নং ও তারিখ
- (২) কৃষকের নাম ও ঠিকানা
- (৩) মৌজা, জে, এল ও দাগ নং
- (৪) জমির অবস্থান— উঁচু/মাঝারী/নীচু
- (৫) কতো গভীরতায় মাটি নেওয়া হয়েছে
- (৬) মাটির প্রকার
- (৭) কি কি ফসলের চাষ হবে
- (৮) সেচের সুবিধা আছে কি না
- (৯) গত ৩ বছর ঐ জমিতে বিভিন্ন ফসলে কোন সার কতটা দিয়ে কত ফসল হয়েছে
- (১০) নমুনা সংগ্রহকারীর নাম



বিস্তারিত বিবরণের জন্য—

আপনার এলাকার কৃষি উন্নয়ন আধিকারিক/
কে.পি.এস. এর সাথে যোগাযোগ করুন।

কৃষি অধিকার, পশ্চিমবঙ্গ সরকার

কৃষিক্রিয়া নিয়মান্বলী

পত্রিকায় প্রকাশিতব্য বিষয়বস্তু : কৃষি বিষয়ক পত্রিকাকর্মার তথ্য, গবেষণার ফলাফল সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য তথ্যাদি, প্রবন্ধ, ছোটগল্প, নাটিকা, সাক্ষাৎকার, নক্সা, কবিতা, প্রযুক্তিগত সমস্যা ও সমাধানের সুপারিশ, প্রযোজ্য কৃষি সম্পর্কীয় সরকারী নীতি, প্রকল্প-পরিচিতি ও কাজের অগ্রগতি, কৃষি যন্ত্রপাতি, সেচ ও বিদ্যুতের ব্যবহারগত সমস্যা ও সুপারিশ, শস্য ও ফসল সংরক্ষণ, সমবায় ও কৃষিঋণ, কৃষি বিপণন, বিভিন্ন জেলার কৃষকদের অজিজ্ঞাস্তার সংবাদ ও রচনা, কৃষকদের স্থানীয় এবং সমষ্টিগত অভাব-অসুবিধার কথা, পশুপক্ষী পালন, মৎস্যচাষ, বনসম্পদ সংরক্ষণ, ভূমি সংরক্ষণ ও সম্ভাব্যহার, ভূমিসংস্কার-গত রচনা ও সংবাদ, গার্হস্থ্যবিজ্ঞান, সমাজ শিক্ষা ও উন্নয়ন, কৃষিভিত্তিক কৃষ্টির ও ক্ষুদ্রশিল্প, গ্রামীণ অর্থনীতি ও কর্ম-সংস্থানের সমস্যাাদি এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ে রেখাচিত্র, আলোকচিত্র, চিত্রকলা ইত্যাদি।

রচনার জন্য সম্মানমূল্য : কেবল নিম্নবর্ণিত ধরনের মৌলিক রচনার জন্য (প্রকাশিত হবার পর) নিম্নলিখিত হারে সম্মানমূল্য দেওয়া হবে। (ক) উচ্চমানের কৃষি প্রযুক্তিগত (টেকনিক্যাল) প্রবন্ধ : ৭৫ টাকা, (খ) সাধারণ কৃষি প্রযুক্তিগত (টেকনিক্যাল) প্রবন্ধ : ৫০ টাকা, (গ) সাধারণ কৃষি বিষয়ক প্রবন্ধ/কৃষি বিষয়ক নাটিকা : ৪০ টাকা, (ঘ) সাধারণ প্রবন্ধ ও ছোটগল্প : ৪০ টাকা, (ঙ) কবিতা (প্রকৃতি ও গ্রাম প্রাসঙ্গিক) : ২৫ টাকা।

রচনা ফুলকেপ কাগজের এক পৃষ্ঠায় (মোট ১৫০০ শব্দের অনধিক) কালি দিয়ে স্পষ্ট বাংলা অক্ষরে লিখে সম্পাদিকার ঠিকানায় (সম্পাদিকা, বসুন্ধরা, অফসেট প্রেস, ৪২ গ্রাহামস্ রোড, কলিকাতা-৪০) পাঠাতে হবে। রচনার দুইকপি পাঠান বান্ধনীয়। যথাযথ মূল্যের ডাকটিকিট দেওয়া না থাকলে অমনোনীত রচনা ফেরৎ পাঠান হবে না।

গ্রাহক হবার নিয়ম : যে কোন মাসে বসুন্ধরার গ্রাহক হওয়া যায়। কিন্তু বাংলা সনের বৈশাখ থেকে চৈত্র পর্যন্ত এক বছরের কম সময়ের জন্য গ্রাহক করা হয় না। মাসিক সংখ্যার প্রতি কপির মূল্য ২৫ পয়সা। অগ্রিম এককালীন প্রদেয় বার্ষিক চাঁদার হার ৩০০ টাকা। চাঁদার টাকা “কৃষি অধিকর্তা পশ্চিমবঙ্গ”-এর নামে লেখা রেখাক্রিত (ক্রেসড) পোষ্টাল অর্ডার অথবা রেখাক্রিত চেক-এর মাধ্যমে সম্পাদিক, বসুন্ধরা, অফসেট প্রেস, ৪২, গ্রাহামস্ রোড, কলিকাতা-৭০০০৪০-এ পাঠাতে হবে।

বিজ্ঞাপনের হার : (প্রথম প্রচ্ছদের জন্য এবং অর্থ পৃষ্ঠার কম কোন বিজ্ঞাপন নেওয়া হবে না) : প্রচ্ছদ (৪র্থ কভার) : ৫০০ টাকা, প্রচ্ছদ (২য়/৩য় কভার) : ৪০০ টাকা, সাধারণ পূর্ণ পৃষ্ঠা : ৩০০ টাকা, সাধারণ অর্ধ পৃষ্ঠা : ২০০ টাকা। বার্ষিক চুক্তিবদ্ধ বিজ্ঞাপনের অগ্রিম প্রদেয় মোট মূল্যের উপর ২০ শতাংশ হারে এবং ‘আই-ই-এন্-এস’ দ্বারা স্বীকৃত এজেন্সীকে বিজ্ঞাপনের মোট মূল্যের উপর ১৫ শতাংশ হারে কমিশন দেওয়া হয়।

ইহা একটি কৃষি-সম্পর্কিত ব্যবসায় এবং গ্রামীণ সমস্যা ও উন্নয়নমূলক যে কোন বিজ্ঞাপন (সরকারী নীতির পরিপন্থী নয়) প্রচারের কার্যকরী ও উপযুক্ত মাধ্যম। সরকারী, বিনিবন্ধ/স্বয়ংশাসিত সংস্থা অথবা বেসরকারী প্রতিষ্ঠান, ব্যাঙ্ক, সমবায় প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি সকলেই এই পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিতে পারেন।

কমিশন এজেন্ট : কলিকাতাসহ বিভিন্ন জেলায় একাধিক বিক্রয়কারী এজেন্সী তালিকাভুক্ত করা হয়। ১০০ কপির কমে এজেন্সী দেওয়া হয় না। এজেন্সীভিত্তিক ২০ শতাংশ হারে কমিশন দেওয়া হয়। এজেন্সীকে অর্ডার দেওয়া কপির মোট মূল্যের টাকা (২০%) কমিশন বাদে) অগ্রিম আদায় দিতে হয়।



সপ্তম পঞ্চবার্ষিক যোজনার ব্যাপক প্রস্তুতি

উন্নত মানের বীজ উৎপাদন ও সরবরাহের কাজে
পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বীজ নিগম-এর সম্প্রসারিত কার্যক্রম

উন্নত মানের বীজ উৎপাদন ও সরবরাহ কার্যক্রমে (পাট, ধান, গম, ডালশস্ত্র এবং তৈলবীজ)	বর্তমান পরিস্থিতি (১৯৮৪-৮৫) ৩০০০ মেঃ টন	৭ম যোজনার লক্ষ্যমাত্রা (১৯৮৯-৯০) ১৫,০০০ মেঃ টন
--	--	---

পশ্চিমবঙ্গের জলবায়ু মাটির উপযোগী এ রাজ্যেই উৎপাদিত
উন্নত মানের শংসিত বীজ ব্যবহার করুন
ফলন বাড়ান : আয় বাড়ান

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বীজ নিগম লিঃ-এর জেলা দপ্তর

ব্রাহ্মগঞ্জ	ঃ উকিলপাড়া, ব্রাহ্মগঞ্জ (পশ্চিম দিনাজপুর)
মালদা	ঃ মকদমপুর, মালদা
বহরমপুর	ঃ পঞ্চাননতলা, বহরমপুর (মুর্শিদাবাদ)
কৃষ্ণনগর	ঃ ১২, ডি. এন. রায় রোড, কৃষ্ণনগর (নদীয়া)
বর্ধমান	ঃ ৭৯, এন. এন. বসু রোড, বর্ধমান
সিউড়ী	ঃ দাঙ্গালপাড়া, সিউড়ী (বীরভূম)
বাঁকুড়া	ঃ চাঁদমারীডাঙ্গা, বাঁকুড়া
মেদিনীপুর	ঃ ৩৫/১, অরবিন্দনগর, নরমপুর, মেদিনীপুর

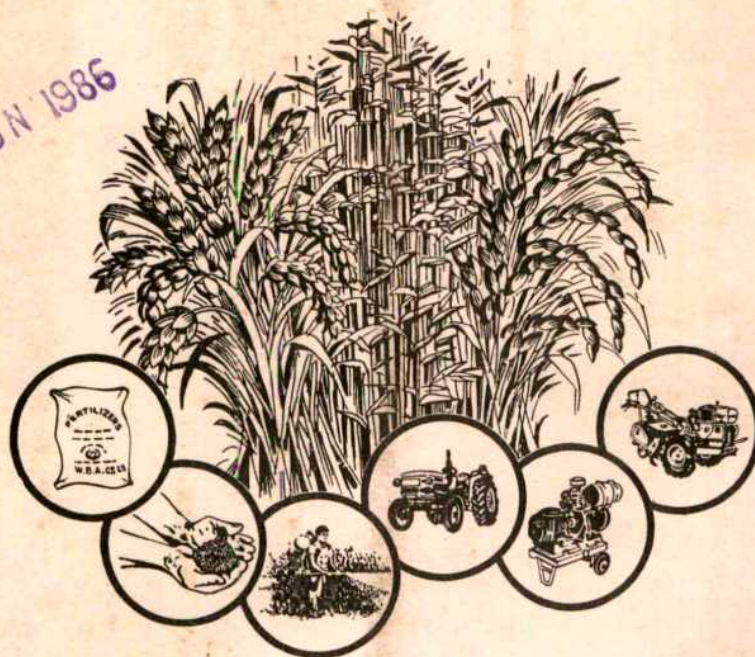
সদর দপ্তর :

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বীজ নিগম লিঃ

৪, গঙ্গাধর বাবু লেন (৬ষ্ঠ তল), কলিকাতা-৭০০০১২

GREEN REVOLUTION— our aim in West Bengal

- 5 JUN 1986



Green Revolution is our aim. The object is to modernise farming in the State. And Agro-Industries Corporation is lending a helping hand to achieve the goal. The Corporation has been supplying modern implements like Tractors, Sprayers, Threshers and Pump-sets to the farmers on hire or on hire-purchase basis.

The Corporation also supplies quality seeds, fertilisers and pesticides.

Agro-Industries Corporation also provides custom

service for cultivation of cotton/groundnut and for Small Farmers Development Agency and Marginal Farmers & Agricultural Labourers Development Project Schemes.

The Corporation has another role too—to create employment opportunities for Engineering graduates/diploma holders and Agricultural graduates in different Agro-Service centres in this State.

**Hand in hand with farmers—
Agro-Industries Corporation**

West Bengal Agro-Industries Corporation Limited

(West Bengal Govt. Undertaking)

23B, Netaji Subhas Road, (3rd Floor), Calcutta-700 001

Telegram : AGRINPUT

Telephone : 22-2314 / 23-3192

বতুন্ধরা

পৌষ ১ ১৩৯২



সূচী

সম্পাদকীয়	...	...	৩-৪	সম্পাদনা উপদেষ্টা পর্ষদ
আমন ধানের একটি উৎসব				দেবব্রত মুখোপাধ্যায়/কৃষি অধিকর্তা, পশ্চিমবঙ্গ
কাশীনাথ ঘোষ	...	...	৫-৭	স্বধাময় বিশ্বাস/অপর কৃষি অধিকর্তা
আলুর রোগ ও তার প্রতিকার	...	...	৮-১০	কল্যাণব্রত সেনগুপ্ত/যুগ্ম কৃষি অধিকর্তা (গবেষণা)
বোরো ধানের চাষ	...	...	১১-১৭	জ্যোতির্ময় বোস/উপসচিব (উন্নয়ন)
গম চাষে যত্ন ও পরিচর্যা	...	...	১৮-১৯	অমলেন্দু সরকার/মুখ্য প্রচার ও জনসংযোগ
ভারতে সার উৎপাদন ও ব্যবহারের				আধিকারিক
অগ্রগতি/শিবদাস রায়	...	...	২০-২৪	অমিয়কুমার মিত্র/জেলা কৃষিতথ্য আধিকারিক
বৃষ্টিনির্ভর জমিতে ডাল শস্যের				(সদর)
ফলন বৃদ্ধির উপায়	...	...	২৫-২৭	স্বলেখা ঘোষ/সম্পাদিকা
মটরশুঁটির চাষ	...	...	২৮-৩০	চন্দ্রানন্দ গোস্বামী/সহঃ সম্পাদক
মাঠে কৃষকের করণীয়	...	...	৩১	প্রধান সম্পাদক
				ডঃ দেবব্রত মুখোপাধ্যায়—কৃষি অধিকর্তা,
				পশ্চিমবঙ্গ

বসুন্ধরা

পৌষ—১৩৯২

কৃষি অধিকার (কৃষি তথ্য সংস্থা)

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কৃষিবিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত ও প্রচারিত

কৃষি সংবাদ

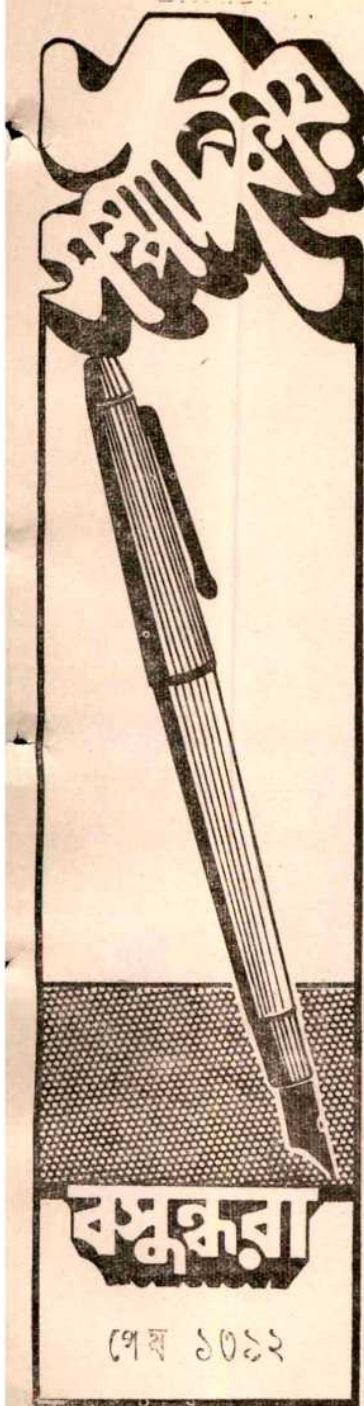
সরষের জাব পোকা দমন করুন

সরষের প্রধান কীট শত্রু জাব পোকা। এই পোকা সবুজ রংয়ের ও খুব ছোট। এরা একত্রে অনেক সংখ্যায় পাতার তলায় ডাঁটা বা গুঁটি অথবা অনেক সময় গাছের সর্বত্রই চাপ চাপ ভাবে রস চুষে খায়। জাব পোকা দেখা গেলে ১৫—২০ দিন অন্তর নীচের লেখা যে কোন একটি ওষুধ স্প্রে করুন। কিন্তু ফসল কাটার একমাস আগে ওষুধ দেওয়া অবশ্যই বন্ধ করবেন।

ওষুধের নাম	প্রতি লিটার জলে ওষুধের পরিমাণ
(১) ফসফামিডন ৮৫%	২ মিলিলিটার
(২) মিথাইল ডেমিটন ২৫%	১ ”
(৩) ডাইমিথয়েট ৩০%	১ ”

গাছের বাড় অথবা একর প্রতি ওষুধ গোলা জলের পরিমাণ ৩০০ লিটারের কম-বেশী লাগতে পারে।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার



এই পৌষে কৃষক এখন তার ক্ষেতের ফসল কেটে ঘরে তুলছেন। এখন গ্রামের ক্ষেত-খামারে রয়েছে রাশি রাশি ভরা ভরা কাটা ধান। সুফলনের নিশ্চয়ই তা প্রতীক। এ বছর নানা বাধা-বিপত্তি সত্ত্বেও ফলন মোটের উপর ভালই হয়েছে। পৌষ উৎসবের আনন্দ এখন কৃষকের ঘরে ঘরে ছড়িয়ে আছে।

খরিফ মরসুম যেমন একটি প্রধানতম কৃষি ঋতু, আবার বছরের খাত্তের সার্বিক সাফল্য নির্ভর করে রবি ও বোরো ফসল যথাযথ ভাবে ঘরে উঠলেই। এ বছর চাষের জন্ম বড় বড় জলাধারগুলি যেমন দামোদর, ময়ূরাক্ষী, কংসাবতী প্রভৃতি থেকে গত বছরের তুলনায় বেশী জল পাওয়া যাবে। তাছাড়া গভীর অগভীর নলকূপ প্রভৃতি ক্ষুদ্রসেচ ব্যবস্থার সুবিধাগুলি কাজে লাগিয়ে রবিশস্ত্রের উৎপাদন বাড়ানোর চেষ্টা করতে হবে।

আলু, গম, বোরো ধান, তৈলবীজ, ডালশস্ত্র নিয়ে রবি-গ্রীষ্মের ফসল এখন ক্ষেতে ধীরে বেড়ে উঠছে। এই শস্ত্রের এখন যত্ন ও তদারকির দরকার। যেখানে প্রয়োজন সেচের বন্দোবস্ত করা, ইত্যাদি কাজের উপর নজর দিতে হবে।

এই সময়ের ফসলের মধ্যে আলু একটি বিশেষ অর্থকরী ফসল। পৌষের মাঝামাঝি থেকে আলুতে জলদি ও নাবি ধসা রোগের আক্রমণের সম্ভাবনা থাকে। সেজন্য নিয়মিত ক্ষেত ঘুরে দেখা দরকার এবং এ রকম কোন আক্রমণ দেখলে সঙ্গে সঙ্গে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে। তাছাড়া অগ্ন্যাগ্ন ফসলের জন্ম ও তদারকির কাজ যত্ন নিয়ে করতে হবে যাতে ফসলের কোন ক্ষতি না হয়।

বোরো ধানের চাষ যারা করছেন এখন তাঁরা রোয়ার কাজ নিয়ে ব্যস্ত। ভাল ফলনের জন্ম সঠিক সংখ্যক গুচ্ছ সঠিক ব্যবধানে রোয়া করা দরকার। এ বিষয়ে কৃষকদের আশা করি নজর থাকবে।

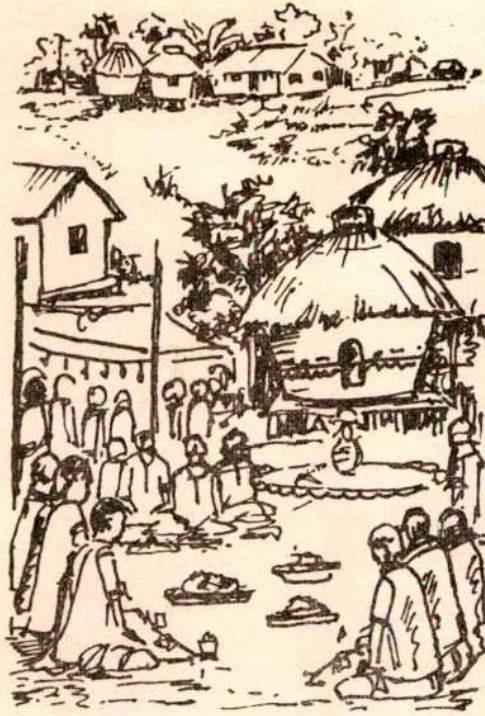
এ বছর রবি-গ্রীষ্ম ফসলের উৎপাদন বাড়ানোর জন্ম এই চাষের এলাকা বাড়ানোর উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। সেজন্য



সেচের জলের সরবরাহের দিকে যেমন নজর দেওয়া হয়েছে, তেমনি প্রয়োজনীয় সার কৃষকরা যাতে ঠিকমত পান সেদিকেও সরকার সজাগ আছেন। অন্যান্য কৃষি উপাদানের তুলনায় সারের দাম যেহেতু বেশী তাই এর ব্যবহারে কোন অপচয় যাতে না হয় তা দেখা দরকার।

রবি ফসলের যত্ন ও পরিচর্যা ছাড়া এই সময় আমগাছের দিকেও দৃষ্টি দিলে ভাল হয়। আমগাছে মুকুল আসা শুরু হয়েছে। আমের মুকুলে এই সময় শোষক পোকাকার আক্রমণের ভয় থাকে। সেজন্য মুকুল আসার সময় একবার ও গুটি ধরলে আর একবার কীটনাশক ওষুধ স্প্রে করে শোষক পোকা দমনের ব্যবস্থা নেওয়া প্রয়োজন। তাতে আমের ফলন ভাল হবে।

চাষের কোন সমস্যার মধ্যে পড়লে কৃষকরা যেন স্থানীয় কৃষিকর্মীর সঙ্গে যোগাযোগ করেন। এই পৌষে কৃষকের প্রধান কাজ শস্তের যত্ন ও তদারকির। এর উপর ভাল ফলন অনেকটা নির্ভর করে।



আমন ধানের একটি উৎসব

কাশীনাথ ঘোষ

আমন ধান বাংলার এক প্রধান ফসল। জীবন দেয়, জীবনে উৎসব রচনা হয়। তাই স্নুখ আনন্দ আশা ভরসা উৎসাহে ভোগে উৎসবে অন্নের প্রভাব তো স্বাভাবিকই। মাধুর্যে ভরা জীবন নিয়েই তো উৎসব। প্রায় অচ্ছেদ্য বন্ধনে গাঁ-বাংলার প্রায় সব উৎসব দুঃখকেও মাধুর্যে রঙীন করে উৎসবই অন্নের সঙ্গে যেন ঘন সম্পর্কিত। দিয়ে জীবনকে অনুপ্রাণিত করে। সেই আর অন্ন বলতে আমন ধান নিয়েই উৎসব জীবনকে বাঁচিয়ে রাখে কে? অন্নই তো। সংস্কৃতির ঐতিহ্য তৈরি হয়ে গেছে। আমন তাই অন্নের ভিত্তি করে জীবন। ঋষিরা ধানের ফসল প্রসঙ্গে বিচিত্র উৎসবের বিচিত্র অন্নের নামে তৈরি করেছেন। হ্যাঁ, অন্ন নাম বিভিন্ন দেশে।

কৃষি তথ্য শাখা, টালীগঞ্জ

পৌষ সংক্রান্তি বাংলার একটি ঐতিহ্যময়

বসুন্ধরা : পৌষ, ১৩৯২

শস্য উৎসব। আমি হুগলী হাওড়া মেদিনীপুর জেলার কথা বলতে গিয়ে বলব পৌষ সংক্রান্তি উৎসবের ভূমিকাটি যেন অজ্ঞান সংক্রান্তি। আঞ্চলিকভাবে অনেকে একে গুঁড়িহাত সংক্রান্তিও বলেন। এই গুঁড়িহাত সংক্রান্তির সূচনা দিন থেকে পয়লা মাঘ পর্যন্ত ফসলের উৎসবকে ঘিরে এই সব জেলায় নারী পুরুষ শিশু নির্বিশেষে মাতোয়ারা হয়ে ওঠে।

একটি শুভ দিনে অজ্ঞানে ধান কাটা ঠিক হোল। কিন্তু প্রথম কাটার দিন শুধু এক আঁটি ধান কেটে শাঁখ বাজিয়ে জলের ধারা দিয়ে মাথায় করে ঘরে এনে উঠোনে ঘরের ছাঁচে রেখে দেয়া হয়। তারপর শুরু ধান কাটা। ধান কাটা যখন প্রায় শেষ তখন আবার এক আঁটি ধান কেটে ক্ষেতে ফেলে রাখা হয়। আর তিন গুছি ধান বেঁধে মাটিতে পোঁতা অবস্থাতেই রেখে দেয়া হোল। বাকি ধান কেটে নিয়ে আসা হোল ঘরে। গাদা করা হোল। তারপর বৃহস্পতি-বার বা কোনো শুভদিনে মাঠের তিন গুছি ধান শেকড় শুদ্ধ তুলে তার সঙ্গে আগে মাটিতে কেটে রাখা এক আঁটি ধান মিশিয়ে ৭টি বাঁধ দিয়ে বাঁধা হবে এবং ঘরে নিয়ে এসে ধানের গাদার ওপরে বেঁধে রাখা হবে।

সুরু হবে বাউনি বাঁধা। পুরুষ নারী সবাই কাজ সারায় ব্যস্ত। সন্ধ্যায় হাত মুখ ধুয়ে পরিচ্ছন্ন হয়ে খড় বিচালী দিয়ে বাউনি বাঁধে। মেয়েরা পিঠে তৈরি করতে ব্যস্ত হয়। ভারি মিঠে এক পরিবেশ। হাড় কনকনে ঠাণ্ডা শীত। অথচ কাজের একটি

উত্তাপ স্নায়ুতে মর্মে। ছোটরা আগুন পোয়াচ্ছে উলুনে আর নতুন গুড় নতুন চালের গন্ধে পিঠে পায়েসের কল্লনায় ডুবে থাকে। কৃষকরা কৃষি যন্ত্রপাতি ইত্যাদিতে বাউনি বাঁধে। শাঁখ বেজে ওঠে। ছড়া আওড়ায় বৃদ্ধ-বৃদ্ধারা :

আউনি বাউনি,

তিনদিন তিনরাত কোথাও না যেও,

ঘরে বসে পিঠা ভাত খেও।

পৌষ সংক্রান্তির আগের দিন, সংক্রান্তির দিন এবং পয়লা মাঘ—এই তিনদিন শুধু উৎসব আর উৎসব।

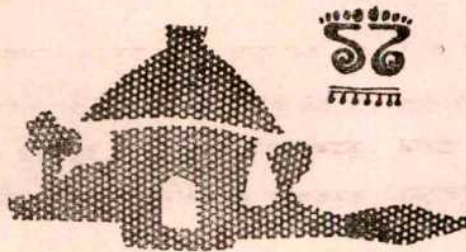
সংক্রান্তির কুয়াশা ছিন্ন করে সূর্য উঠবে। তার আগেই মকর স্নানের পালা। পুরোহিতের মন্তোচ্চারণ, উঠোনে আলপনা, পঞ্চশস্য ছড়ানো সব কিছু মিলে এক চির নতুন ভাবচিত্র। হ্যাঁ, মনসা পূজোর সঙ্গে এই উৎসবের সম্পর্ক কি তা হয়ত অনেকেই বলতে পারবেন না। কিন্তু মনসা পূজোও একটি অঙ্গ। এই পূজো সাজ করে ছোট পৌষ মেলায়। মেলায় জীবনের এক মহা-স্রোতে সঞ্জীবিত হয়ে ওঠে গ্রামবাসী। সারা বছরের একটানা জীবনের সংগ্রামের মূলধন বুকে কুড়িয়ে জমা করে রাখে মানুষ।

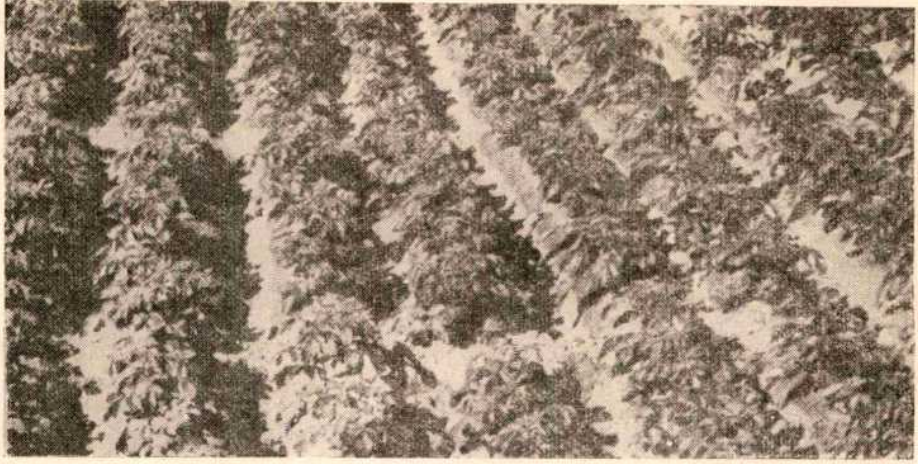
তার পরদিনই পয়লা মাঘ—বার পূজা। গৃহস্থের তিনদিনের উৎসবের শেষ মঙ্গলাহুষ্ঠান। বারপূজা মানে লক্ষ্মীপূজা। বিকেলে উঠোনে লক্ষ্মীর সাজ অর্থাৎ ঘট, আয়না, চিরুনি, শঙ্খ, ধান, নানা ফল, বাতাসা, মিঠাই, পিঠে, পায়েস সাজিয়ে দেয়া হয়। ধানের গাদার

ওপরে বেঁধে রাখা সেই শেকড় সমেত তিন আঁটি ধান আর কাটা আঁটির সাত বাঁধনের গুচ্ছ রাখা হয়। সন্ধ্যার সময় পূজোর চারধারে শ্রদ্ধায় বসে থাকে গৃহস্থ আত্মীয় স্বজন নিয়ে। অপেক্ষা করে পেঁচার আর শেয়ালের ডাকের। হ্যাঁ, এক রহস্যময় প্রহরের অপেক্ষা। পূজো সাদ্দ হয়ে গেলে সেই প্রতীক্ষার সূরু। কান পেতে থাকে সবাই। কখন হঠাৎ ঝোপঝাড় থেকে ঠিক ডেকে উঠবেই পেঁচা আর শেয়াল। স্বস্তির নিঃশ্বাস গৃহস্থের। পূজো সফল হোল বুঝি। ডাক শুনেই ছেলেরা লক্ষ্মীর আসনের চারধারে একপাক জলের ধারা ঘুরিয়ে নিয়ে ঘরের ঘাটে জল দেয়। ঘরে সঞ্চয় করা এক বস্তা ধান থাকে

ও একটি ঘাটে আত্মপল্লব দেয়া থাকে। জল ছিটিয়ে দেয় সেখানেও। এভাবে তিনবার পেঁচা আর শেয়ালের ডাকে অহুষ্ঠানের সমাপ্তি।

তারপর শুধু আনন্দ। ভোজনের আনন্দ। পিঠে-পায়েসের ছড়াছড়ি—খাও আর বিলাও। এ কয়দিন কাজে প্রায় ধর্মঘট। বিশ্রাম। পরদিন ভোরবেলা লক্ষ্মীর পর্ব শেষ করার পর বাউনি খুলে কৃষকরা কৃষিকাজে হাত দেয়। নবান্ন উৎসবের নানা ঘটনা-পট্টা নানা অঞ্চলে। এও একরকম আঙ্গিক। অজ্ঞানের সংক্রান্তি থেকে সূরু হয়ে পৌষ সংক্রান্তির মধ্য দিয়ে পয়লা মাঘের বার পূজাতে এর অবসান। নবান্ন উৎসবের এ এক অভিনব প্রকরণ হাওড়া, হুগলী, মেদিনীপুরে।





আলুর রোগ ও তার প্রতিকার

আলু আমাদের অন্যতম প্রধান খাদ্য। তগুল জাতীয় খাদ্যের পরই বলতে গেলে আলুর স্থান। আলু একটি অর্থকরী ফসলও। আলু চাষে বীজ, সার, সেচ, পরিচর্যা প্রভৃতির জ্ঞান অপেক্ষাকৃত অনেক বেশী অর্থ খরচ করতে হয়। কিন্তু রোগ ও পোকাকার আক্রমণে অনেক সময়েই ভাল ফলন পাওয়া যায় না। আলু চাষে রোগের দরুণ ক্ষতি হয় বেশী। কৃষকরা যাতে সময় মত সাবধান হতে পারেন সেজন্য আলুর কয়েকটি প্রধান রোগ ও তার দমন সম্বন্ধে এখানে আলোচনা করা হলো।

জলদি ও নাবি ধসা

এই রোগ সাধারণতঃ পৌষের মাঝামাঝি থেকে দেখা যায়। জলদি ধসা রোগের আক্রমণ প্রায় প্রতি বছরই হয়ে থাকে। সীতাসেঁতে আবহাওয়া, মেঘলা আকাশ ও

মাঝে মাঝে বৃষ্টি হলে, নাবি ধসায় ক্ষতি বেশী হয়।

জলদি ও নাবি ধসার লক্ষণ

জলদি

প্রথম অবস্থায় পাতায় ঘোর বাদামী বা কাল রঙের ছোট ছোট দাগ পড়ে, দেখতে অনেকটা কাল তিলের মত। এই দাগ গোটা পাতায় ছড়িয়ে থাকতে পারে। এই দাগ ক্রমশঃ গোলাকার ও বড় হয় এবং দেখতে কতকগুলি এক-কেন্দ্রিক বৃত্তের সমষ্টি বলে মনে হয়। পাতায় দাগ পড়ার দরুন, পাতা আস্তে আস্তে শুকিয়ে যায়; ঝড়ে পড়ে এবং গাছ স্বাভাবিকভাবে মরবার আগেই শুকিয়ে যায়। এই রোগ আলুর ডাঁটাকে সাধারণতঃ আক্রমণ করে না। তবে রোগের প্রকোপ বেশী হলে ডাঁটাতেও দাগ দেখা যায়।

নাবি

ধসা রোগের আক্রমণ শুরু হলে প্রথমে পাতার ডগা ও কিনারায় গাঢ় বাদামী ও কাল রঙের বড় বড় দাগ পড়ে। আবহাওয়া অনুকূল থাকলে অর্থাৎ আর্দ্র, ঠাণ্ডা ও স্যাঁতসেঁতে হলে গোটা পাতা আক্রান্ত হয়ে পড়ে ও পচন শুরু হয়। পাতা থেকে এ রোগ বোঁটাতেও ছড়িয়ে পড়ে এবং শেষে কাণ্ডে আসে। কচি কাণ্ড ও ডগাগুলি পচে নষ্ট হয়ে যায়। কাণ্ডেও বড় কালো দাগ পড়ে। রোগের প্রকোপ বেশী হলে দুই থেকে তিন দিনের মধ্যে নাবি ধসা রোগ গোটা মাঠের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে এবং আক্রান্ত গাছের বেশ কিছু পাতা ও ডগা নষ্ট হয়ে যায়। অনেক সময় দেখা যায় যে শুধু মূল কাণ্ড বা ডাঁটা দাঁড়িয়ে আছে। এ রোগের জীবাণু মাটির তলায় আলুকেও আক্রমণ করে। ফলে, মাটির তলায় থাকা-কালীন পচন শুরু হতে পারে এবং তাতে আলু নষ্ট হয়ে যেতে পারে।

জলদি ও নাবি ধসা রোগ থেকে আলু ফসলকে রক্ষা করতে হলে পৌষের মাঝামাঝি থেকে প্রতি লিটার জলে ২ গ্রাম ম্যানকোজেব বা জিনেব বা ৪ গ্রাম কপার অক্সিক্লোরাইড গুলে, পাতার ছুপিঠে ও ডাঁটায় ভালভাবে স্প্রে করতে হবে। একরে ৩০০ লিটার জল লাগবে। রোগের প্রকোপ বুঝে ১০—১৫ দিন অন্তর, আরও ২-৩ বার ওষুধ স্প্রে করতে হবে। শুকনো আব-হাওয়ায় সকাল ৮টা থেকে ১১টা ও

বিকেল আড়াইটা থেকে ৪টার মধ্যে স্প্রে করলে, সবচেয়ে ভাল ফল পাওয়া যাবে।

নাবি ধসা রোগে আক্রান্ত জমির আলু বীজ হিসাবে রাখা বা ব্যবহার করা উচিত নয়। কেননা নাবি ধসা রোগ—রোগগ্রস্ত আলুবীজের মাধ্যমেই প্রাথমিকভাবে ছড়ায়।

কুটে রোগ

কুটে রোগ আলুর পক্ষে খুবই মারাত্মক। যদিও কুটে রোগে গাছ মারা যায়না, তাহলেও ফলন খুব কম হয় এবং বেশী রকম এর আক্রমণ হলে লোকসান হবার সম্ভাবনা খুবই বেশী। কুটে রোগ বিভিন্ন প্রকারের হয় এবং প্রকার ভেদে আক্রমণের লক্ষণগুলিও আলাদা হয়। যেমন পাতায় হলদে সবুজের নকশা, ঘন সবুজ ও ফিকে সবুজের নকশা। পাতা ভিতরের দিকে গুটিয়ে যাওয়া, পাতা কৌঁচকানো, খস-খসে হওয়া, আকারে ছোট হওয়া এবং গাছের বৃদ্ধি ব্যাহত হওয়া প্রভৃতি।

এ রোগ দেখা দিলে, গাছ একটু বড় হওয়ার ৬—৮ সপ্তাহ পর একবার ও পরে আর একবার, জমি থেকে রোগাক্রান্ত গাছ তুলে, পুড়িয়ে বা দূরে মাটিতে পুঁতে ফেলতে হবে। রোগাক্রান্ত গাছের আলুগুলিও তুলে ফেলা দরকার।

গোড়া শুকিয়ে যাওয়া রোগ

যেসব জমিতে বছরদিন ধরে, নিয়মিত ভাবে, পর্যায়ক্রমে খারিফ খন্দে পাট ও রবি খন্দে আলুর চাষ করা হয়, সেখানে এই রোগ বিশেষ ভাবে দেখা যায়। সাধারণতঃ

বসুন্ধর : পৌষ : ১৩৯২

মরসুমের গোড়ার দিকেই প্রাকোপ বেশী হয়ে থাকে। এ রোগ অবশ্য পরেও হতে পারে। এ রোগের আক্রমণে গাছ অপেক্ষাকৃত বেশী সময়ে আস্তে আস্তে শুকিয়ে যায় (চলে পড়া রোগের মত হঠাৎ নয়)। রোগাক্রান্ত গাছে মাটির সংলগ্ন বা মাটির ঠিক নীচের কাণ্ডটি কালো হয়ে শুকিয়ে যায় এবং সরু তারের মত হয়। এ রোগের একটি বিশেষ লক্ষণ হচ্ছে যে, আক্রান্ত গাছে মাটির উপরে পাতার কোলে মটরশুঁটির মত ছোট আলু ধরে। এই রোগের লক্ষণ দেখা গেলে, প্রথম ভেলি বাঁধার সময় ১২ কেজি ব্রাসিকল ২০% গুঁড়ো দিয়ে দিন।

চলে পড়া রোগ

গাছে যখন আলু ধরতে আরম্ভ করে, সে সময় এ রোগ প্রথম নজরে আসে। পরে আস্তে আস্তে রোগের বিস্তার হয়। মাটিতে প্রচুর রস থাকা সত্ত্বেও গাছ হঠাৎ চলে পড়ে। এ রোগের আক্রমণ হলে সে জমিতে অন্তত তিন বছর আলু, টমেটো, লঙ্কা বা বেগুনের চাষ করা উচিত নয়।

এবার আলুর কয়েকটি কীটশত্রু সম্বন্ধে আলোচনা করা হচ্ছে।

কাটুই পোকা

এই পোকাকার কীড়া মাটির সংলগ্ন কাণ্ডকে আড়াআড়িভাবে এমন সুন্দরভাবে কাটে যে, মনে হবে যেন কোন ধারালো ছুরি বা ব্লেড দিয়ে কাটা হয়েছে। এই পোকাকার কীড়াকে মাটির ওপর দেখা যায় না। মাটির নীচে

থাকে, দিনের বেলা বের হয় না। রাত্রে আক্রমণ করে। অনেক সময় দেখা যায় যে সারি ধরে গাছের ক্ষতি করেছে। আক্রান্ত ক্ষেতের মাঝে মাঝে কিছু ঘাস, আগাছা ইত্যাদি সন্ধ্যাবেলা জড়ো করে রাখলে, কাটুই পোকা এতে আশ্রয় নেবে। সকালে এগুলো মেরে ফেলুন। আক্রমণ বেশি হলে ৩০০ লিটার জলে ২ লিটার হেপ্টাক্লোর ২০% বা অলড্রিন ৩০% গুলে ঝারি দিয়ে জমি ভিজিয়ে দিতে হবে।

রস চোষা শ্যামা পোকা

এ পোকা দেখতে সবুজ-হলদেটে রঙের, আকারে ছোট শ্যামা পোকা বা দেওয়ালী পোকাকার মত। মাথার দিকে দুটি এবং সামনের ডানা দুটির প্রত্যেকটিতে একটি করে কালো দাগ থাকে। এ পোকাকার কীড়া সবুজ রঙের হয়। পূর্ণাঙ্গ পোকা ও কীড়া উভয়েই পাতার নীচ থেকে রস চুষে নেয়। ফলে, আক্রান্ত পাতা হলদেটে রঙের হয়ে যায় এবং উপরের দিকে কিছুটা কুঁকড়ে যায়। অনেক ক্ষেত্রে আক্রমণের লক্ষণকে, কুটে রোগের সূচনা বলে ভুল করা হয়। কাটুই পোকা দমনের যে ব্যবস্থা বলা হয়েছে, তাই এক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।

জাব পোকা

এই পোকাকার আক্রমণ বেশি হলে বা অগ্ন্যান্ত চোষি পোকাকার আক্রমণ হলে প্রতি লিটার জলে ২ মিলি ম্যালাথিয়ন মিশিয়ে স্প্রে করুন। এই পোকা কুটে রোগের বাহক।

বোরো ধানের চাষ

আউশ ও আমনের চেয়ে বোরো ধানের গড় ফলন অনেক বেশি। সেজন্য চাষীর সব সময়েই ঝাঁক থাকে বোরো চাষের দিকে। ধানের চাষে জলের প্রয়োজন অত্যন্ত ফসলের চেয়ে অনেক বেশী। বোনার আগে জলের সরবরাহ সম্বন্ধে কৃষকদের তাই বিশেষ সজাগ হওয়া দরকার। যে সমস্ত নীচু এলাকায় বা সেচের উৎসের কাছে জল জমে থাকায় অথবা কোন রবিশস্ত চাষ করা যায় না সেখানেই বোরো ধানের চাষ করুন। সেচের

জল কবে পর্যন্ত পাওয়া যাবে তা জেনে কোন্ জাতের বোরো ধান চাষ করবেন তা ঠিক করুন; কারণ অনেক সময় জলে টান পড়ায় নাবি জাতের ধান শেষের দিকে মার খায়। একথা মনে রেখে বৈশাখ মাস পর্যন্ত যেখানে সেচের জল পাওয়া নিশ্চিত শুধু সেসব জমিতেই বোরো চাষ সীমাবদ্ধ রাখলে ফলন মার খাওয়ার কোন ভয় থাকে না। নীচে জাতগুলি সম্বন্ধে বলা হলো। যদি কার্তিকের শেষ এবং অগ্রহায়ণের

যদি সেচের জল পাওয়ার
ব্যবস্থা থাকে

বোরো ধানের জাত

৩১শে মার্চ পর্যন্ত
(চৈত্রের মাঝামাঝি)

সি-আর ১২৬-৪২-১, সি-এন-এম ২৫,
আই-ই-টি ১৪৪৪ (রসি), আই-ই-টি ২২৩৩,
আই-ই-টি ৮২৬ ও আই-আর ৫০

১৫ই এপ্রিল পর্যন্ত
(চৈত্রের শেষ)

পলমন-৫৭৯, আই-আর ৩৬,
আই-ই-টি ৪০৯৪ (ক্ষিতীশ) ও রত্না

৩০শে এপ্রিল পর্যন্ত
(বৈশাখের মাঝামাঝি)

সি-এন-এম ৩১, আই-ই-টি ২৮১৫ (শস্ত্রী)

৩০শে এপ্রিলের পরে
(বৈশাখের মাঝামাঝির পর)

আই-ই-টি ২২৫৪ (প্রকাশ), আই-ই-টি ৬১৪১
(কুস্তি), সি-এন-বি-পি ২১৭ ও সি-এন-এম ২০

বসুন্ধরা : পৌষ : ১৩৯২

প্রথম দিকে বীজতলায় বীজ ফেলা হয় এবং আনুমানিক ৪৫ দিনের মধ্যে চারা রোয়া যায় তবে সেচের জল পাওয়ার সময়সীমা অনুযায়ী উপরে বলা ধানের জাতগুলির কার্যকারিতা নির্ভর করবে। এর পরে বীজ ফেললে বা রুইলে শেষের দিকে জলের টান পড়ে, পাকতে দেরি হয় ও ফলন কম হয়।

বোরো ধানের জাত ও লাগানোর সময় এমনভাবে ঠিক করুন যাতে বৈশাখের মধ্যেই কেটে ফেলা যায়, কারণ এতে (১) জলের সাশ্রয় হবে, জলের টান পড়ায় ফসল মার

খাবার ভয় থাকবে না, (২) রোগ-পোকার আক্রমণ কম হবে এবং (৩) পাকা ফসলের অকাল বর্ষণে ক্ষতি হবার সম্ভাবনা থাকবে না (৪) বর্ষার চাষের আগে মাটিকে কিছুদিন রোদ-হাওয়া খাওয়ালে মাটির স্বাস্থ্য ও উর্বরতা ঠিকমত বজায় থাকবে।

বোরো মরসুমে যেসব এলাকায় যে যে পোকা ও রোগের উপদ্রব অপেক্ষাকৃত বেশি সেইসব এলাকায় নীচের তালিকা থেকে রোগ ও পোকার আক্রমণ প্রতিরোধ ক্ষমতাসম্পন্ন বা সহনশীল জাত বেছে নিয়ে চাষ করুন।

রোগ-পোকার নাম	প্রতিরোধ ক্ষমতাসম্পন্ন বা সহনশীল ধানের জাত
মাজরা পোকা	আই-ই-টি ২৮১৫ (শস্যশ্রী), আই-আর ৩৬ ও আই-আর ৫০
ঝলসা রোগ (ব্লাস্ট)	আই-আর ৩৬ ও আই-ই-টি ৮২৬,
ব্যাকটেরিয়া জনিত	আই-ই-টি ৮২৬,
পাতা ধসা রোগ	আই-আর ৩৬ ও সি-এন-এম ২৫
বাদামী শোষক পোকা	আই-আর ৩৬
টুংরো রোগ	আই-আর ২০, আই-আর ৩০, আই-আর ৩৬, আই-আর ৫০ ও আই-ই-টি ২৮১৫ (শস্যশ্রী)

বীজের হার

এক একর জমি রোয়ার জন্ম ১৮ থেকে ২৪ কেজি পুষ্ট ও নীরোগ বীজ দরকার। সরু ধান ১৮ কেজি, মাঝারি ধান ২১ কেজি ও মোটা ধান ২৪ কেজি লাগবে।

বীজ শোধন

বীজ বাছাই ও শোধন করে নিলে চারার রোগ কম হয়। প্রতি কেজি বীজ শোধনের

জন্ম দেড় লিটার জলে দেড় গ্রাম মিথোক্সি ইথাইল মারকিউরিক ক্লোরাইড মিশিয়ে ৮ থেকে ১০ ঘণ্টা ডুবিয়ে রাখুন। যেসব বীজ ভেসে উঠবে তা ফেলে দিন। বাকি বীজ ২ই সেমি (১ ইঞ্চি) পুরু করে ভিজে চটের ওপর বিছিয়ে দিন এবং অল্প একটি ভিজে চট দিয়ে ৩২ থেকে ৪৮ ঘণ্টা অথবা যে পর্যন্ত কল না গজায় ততক্ষণ চাপা দিয়ে রাখুন।

বসুন্ধরা : পৌষ : ১৩৯২

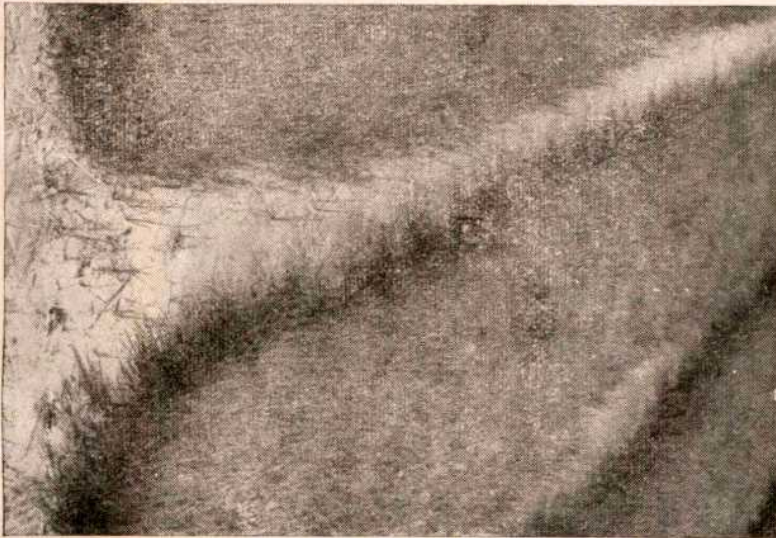
বীজ বোনার সময়

কার্তিকের মাঝামাঝি থেকে অম্বানের শেষ (নভেম্বর থেকে ডিসেম্বর মাসের মাঝামাঝি) পর্যন্ত বীজতলায় বীজ বোনার উপযুক্ত সময়।

বীজতলা তৈরি ও সার দেওয়া

এক একর জমি রোয়ার জন্য ১০ শতক (৬ কাঠা বা ৪০০ বর্গমিটার বা মোটামুটি

২০০০ বর্গহাত) জমিতে বীজতলা তৈরি করুন। সেচ ও অন্যান্য পরিচর্যা এবং চারা তোলার সুবিধার জন্য ৭'৬২ মিটার (২৫ ফুট) লম্বা এবং ১'২২ মিটার (৪ ফুট) চওড়া মাপের পাশাপাশি কতকগুলো বীজতলায় ভাগ করে নিন। প্রতি বীজতলার চারিদিকে ১০ সেমি (৪ ইঞ্চি) গভীর ও ২০ সেমি (৮ ইঞ্চি) চওড়া নালা রাখুন।



ধানের সূতিকাগার
বীজতলা।

দশ শতক বীজতলার জন্য সার

সারের প্রকার	বীজতলা তৈরির সময় (বীজ বোনার আগে)	চাপান সার	
		বোনার ৩ সপ্তাহ পরে	চারা তোলার ১ সপ্তাহ আগে
কম্পোষ্ট বা গোবর	৮০০ কেজি	—	—
নাইট্রোজেন	২ ”	১ কেজি	১ কেজি
ফসফেট	২ ”	—	—
পটাশ	২ ”	—	—

বীজতলায় বোনা, সেচ ও অগ্ন্যাগ্ন্য পরিচর্যা

- বীজতলা গভীর করে ভালভাবে চষে, আগাছা বেছে, পরিমাণমত সার দিয়ে ও সমতল করে কাদানো বীজতলায় কলানো বীজ পাতলা করে বুনুন। বীজ বোনার ২ থেকে ৩ ঘণ্টা পরে বীজতলায় সেচ দিন। ২৪ ঘণ্টা বীজতলার উপর ২.৫ সেমি (১ ইঞ্চি) জল রাখুন। পরে বীজতলায় ছিপছিপে জল রাখুন।
- চারা বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বীজতলায় জলের পরিমাণ বাড়ান।
- ৩ সপ্তাহ পরে চারার বাড় দেখে পরিমাণমত নাইট্রোজেন চাপান দিন।
- টুংরো রোগের আক্রমণ কমানোর জন্য প্রতি ১০ শতক বীজতলায় দানাদার ওষুধ ২ কেজি ফিউরাদান ৩-জি (কার্বোফুরান ১০%) ৩০ দিনের চারায় দিন। দানাদার ওষুধ ব্যবহার করার সময়ে জমিতে জল ধরে রাখুন। বীজতলায় ঝলসা রোগ (ব্লাইট) দেখা দিলে ১ মিলিলিটার হিসাবে হিনোসান, যেক্ষেত্রে হিনোসান পাওয়া যাবে না সেখানে ১ মিলিলিটার কিটাজিন বা ৩ মিলিলিটার কুমান-এল অথবা ২ গ্রাম জাইরাইড ১ লিটার জলে গুলে স্প্রে করুন। পুষ্ট বীজের ব্যবহার, বীজ শোধন এবং বীজতলায় রোগ প্রতিরোধক ব্যবস্থা ঠিকমত নিলে ফসলে রোগের

আক্রমণ বিশেষ দেখা যায় না, দেখা গেলেও প্রকোপ বেশী হয় না। প্রয়োজন হলে পোকাকার আক্রমণ প্রতিরোধের জন্য প্রতি লিটার জলে ৫ মিলিলিটার ফসফামিডন বা ১ মিলি ক্লোরপাইরিফস ২০ ইসি গুলে স্প্রে করুন। ১০ শতক বীজতলার জন্য ৩০ লিটার জল লাগবে।

- চারা তোলার এক সপ্তাহ আগে চারার বাড় দেখে প্রয়োজন হলে নাইট্রোজেন চাপান সার দিন।
- এর পর বীজতলায় ২.৫ থেকে ৫ সেমি (১ থেকে ২ ইঞ্চি) পরিমাণ জল চারা তোলার সময় পর্যন্ত ধরে রাখুন।

জমি তৈরি

রোয়ার জমি তৈরির দু'সপ্তাহ আগে আড়াআড়িভাবে চাষ করে মই দিয়ে সমান করে জল ধরে রেখে মাটি পচান দিন। চারা রোয়ার আগে ১০ থেকে ১২ সেমি (৪ থেকে ৫ ইঞ্চি) গভীর করে আড়াআড়িভাবে চাষ করে নরম কাদা তৈরি করুন। তারপর মই বা পাটা দিয়ে জমি ভালভাবে সমতল করুন। জমি অসমান থাকলে ফলন কমে যায়।

পরিমাণমত সার দিন

প্রথম চাষেই একর প্রতি ৮ থেকে ১০ গাড়ী গোবর বা কম্পোস্ট সার দিন। মাটি পরীক্ষা করা থাকলে সেই অনুযায়ী সঠিক পরিমাণ রাসায়নিক সার ব্যবহার করুন, না হয়ে থাকলে রোয়ার জমি কাদা করার সময়ে শেষ চাষের আগে

নিম্নলিখিত হারে রাসায়নিক সার পুরো জমিতে সমানভাবে ছড়িয়ে দিন এবং লান্ধল

ও মই বা পাটা দিয়ে মাটির সঙ্গে ভালভাবে মিশিয়ে জমি তৈরি করুন।

জাত	একর প্রতি সারের পরিমাণ (কেজি)		
	নাইট্রোজেন	ফসফেট	পটাশ
(ক) জলদি জাত : রত্না, পলমন-৫৭৯, আই-আর ৩৬ ইত্যাদি	১০	২০	২০
(খ) নাবি জাত : কুস্তি, প্রকাশ, সি-এন-বি-পি, সি-এন-এম ইত্যাদি	১২	২৪	২৪

ঠিক সময়ে চারা লাগান

মাঘের মাঝামাঝি পর্যন্ত (জানুয়ারীর মধ্যে)।

চারার বয়স

৫ থেকে ৬টি পাতা হলেই চারা রোয়া যায়। এরজন্ত বীজতলায় বোনার পর সাধারণতঃ ৫ থেকে ৬ সপ্তাহ মত সময় লাগে। বোরো মরসুমে উপযুক্ত বয়সের চারাই রোয়া দরকার।

চারা রোয়া

বীজতলা থেকে সাবধানে চারা তুলবেন যাতে চারার শিকড় বেশী না ছিঁড়ে যায়। ভাল চারা ২০ সেমি (৮ ইঞ্চি) দূরত্বে সারিতে এবং গুছি থেকে গুছি ১০ সেমি (৪ ইঞ্চি) দূরত্বে লাগান। প্রতি গুছিতে ২ থেকে ৩টি চারা রুইবেন। ভাল ফলন পেতে হলে প্রতি বর্গহাতে ৭০-৮০টি শীষ দরকার। রোয়ার গভীরতা যেন ৫ সেমি (২ ইঞ্চি) এর বেশী না হয়। কম গভীরে চারা লাগাবার জন্ত রোয়ার সময়

জমিতে ছিপছিপে (ই ইঞ্চির মত) জল রাখুন। কাদা কাদা অবস্থায় রোয়ার গভীরতা ঠিক রাখার সুবিধা হয়। রোয়ার পর জমির কোণে কিছু বাড়তি বিছন রেখে দিন। রোয়ার ১০ থেকে ১৫ দিন পরে যেসব জায়গায় চারা মরে গেছে সেখানে বাড়তি বিছন থেকে নতুন চারা লাগান, যাতে জমিতে কোন ফাঁক না থাকে। মনে রাখবেন ধানের ফলন জমিতে গুছির সংখ্যা ও শীষযুক্ত পাশকাঠির সংখ্যার উপর অনেকখানি নির্ভর করে। ফাঁক ফাঁক করে চারা রুইলে অথবা মরে যাওয়া চারার ফাঁকা জায়গা সমবয়সের চারা দিয়ে সময়মত পূরণ না করলে ফলন অনেক কমে যায়। তাই সঠিক দূরত্বে চারা রোয়া এবং সময়মত ফাঁকা জায়গা একই বয়সের চারা দিয়ে পূরণ করে দেওয়া উচিত।

বাদামী শোষক পোকা উপক্রান্ত এলাকায় রোয়ার সময় থেকেই এই বিষয়ে সচেতন হোন। রোয়ার সময়ে সারির দূরত্ব হবে ২০ সেমি ও চারার দূরত্ব ১৫ সেমি এবং ১২ সারি

বসুন্ধরা : পৌষ : ১৩৯২

অন্তর ১ সারি ফাঁক রেখে চারা লাগান।
এতে ক্ষেতের ভেতরে ঢুকে ক্ষেত পরিদর্শন
করা ও ভালভাবে গাছের গোড়ায় ওষুধ
দেবার ও অন্যান্য পরিচর্যার সুবিধা হবে।
এই ফাঁক রাখার জন্য ধানের ফলন তেমন
কমে যাওয়ার আশঙ্কা নেই।

পরিমাণমত সেচ দিন

- প্রয়োজনের চেয়ে বেশী সেচ দিলে
লাভের চেয়ে লোকসান বেশি। চারা
রোয়ার সময় ছিপছিপে জল রাখুন।
- তারপর থেকে জমিতে মোটামুটি ৫ সেমি
(২ ইঞ্চি) জল রাখুন। এজন্য জমিতে
প্রয়োজনমত সেচ দিতে হবে। দাঁড়ানো
জলের গভীরতা বেশী থাকা ঠিক নয়।
বেশী জল থাকলে পাশকাঠির সংখ্যা কমে

যায়, গাছ মোটা হয় না। চাপান সার
দেবার আগে সম্ভব হলে জমি থেকে জল
বার করে দিন। তবে মাটি যেন ফেটে
না যায়। এর ফলে মাটি থেকে দূষিত
বাতাস বেরিয়ে যাবে আর চারাগুলি মাটির
জৈব পদার্থ থেকে সহজে খাবার নিতে
পারবে।

- এরপর সুপারিশমত চাপান সার দিয়ে
আবার সেচ দিন। এই সময় থেকে দানা
পুষ্ট হবার সময় পর্যন্ত জমিতে অন্তত
২ই—৫ সেমি (১—২ ইঞ্চি) জল ধরে
রাখুন।

সময়মত নিড়ান দিন

মাটির ভেতরের দূষিত গ্যাস বের করা
এবং আগাছা পরিষ্কার করার জন্য মাঝে মাঝে



চারা রোয়ার সময় ক্ষেতের জলের পরিমাণ সযত্নে

সজাগ থাকতে হবে।



রোয়ার পর জমিতে
সার দেয়া হচ্ছে।

মাটি ঘেঁটে দেওয়া দরকার। এজন্য চারা রোয়ার পর ১৫ দিন অন্তর ছুইবার হাত দিয়ে মাটি ঘেঁটে দিন ও আগাছা তুলে ফেলুন। পাশাপাশি সারির মধ্যে সরু নিড়ানি যন্ত্র চালিয়েও মাটি ঘেঁটে দেওয়া যায়। নিড়ানি যন্ত্র ব্যবহার করলে সারির মধ্যে যেসব আগাছা থেকে যায় সেগুলি হাত দিয়ে তুলে ফেলুন।

পরিমাণমত চাপান সার দিন

পাশকাঠি ছাড়ার সময় একবার এবং থোড় আসার মুখে আর একবার নাইট্রোজেন সার চাপান দিন। চাপান হিসাবে একর পিছু কোন্ জাতের ধানে কখন কতটা নাইট্রোজেন দেবেন তা নীচে দেওয়া হলো। সম্ভব হলে সার চাপান দেবার আগে জল বার করে চাপান দেবার ৪৮ ঘণ্টা পরে আবার জল ঢোকান।

ধানের জাত (মেয়াদভিত্তিক)	একর প্রতি নাইট্রোজেন (কেজি)	
	পাশকাঠি ছাড়ার সময়	থোড় আসার মুখে
(ক) জলদি	২০	১০
(খ) নাবি	২৪	১২

গম চাষে যত্ন ও পরিচর্যা

গমের ফলন বাড়াবার জন্য আমাদের চেষ্টা অব্যাহত রাখা দরকার। এজন্য উন্নত পদ্ধতিতে চাষ করা দরকার। এ বছর গম উৎপাদনের যে লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে তা পূরণ করার জন্য চাষের যত্ন ও পরিচর্যা একান্ত দরকার। গম চাষে জল, ধানের চেয়ে কম লাগে, কিন্তু যেটুকু প্রয়োজন তা ঠিক সময়ে দিতে হবে। পরিচর্যার মধ্যে প্রথমেই আসে আগাছা দমন।

আগাছা দমন

গমক্ষেতের আগাছার দিকে নজর দিতে হবে। কোন আগাছা দেখলে ছোট অবস্থায় তা তুলে ফেলা দরকার। গম বোনার ২০ দিন পরে নিড়েন দিয়ে আগাছা পরিষ্কার করে দিন। প্রয়োজনে আরও ২০ দিন পরে দ্বিতীয় সেচের আগে আর একবার নিড়েন দিন।

রবি মরসুমে সাধারণ আগাছা ছাড়াও গমের ক্ষেতে কোথাও কোথাও বিশেষ ধরনের কয়েকটি মারাত্মক আগাছা দেখা যাচ্ছে— যেমন ফ্যালাঘাস, করাত ঘাস, বুনো জৈ। ফ্যালাঘাস দেখতে গমগাছের মত, তবে শীষ গমের মত নয়। এর শীষ আঙ্গুলের মত মোটা, তিন ইঞ্চি লম্বা। করাত ঘাসও শীষ আসার আগে পর্যন্ত গমগাছের মত দেখতে, তবে কিছুটা শক্ত ও সরু। এর শীষ গমের শীষ আসার আগে বের হয়। শীষের প্রতি গাঁটে ৮-৯টি ফুল কয়েকটি স্তরে থাকে; যার ফলে শীষটি করাতের মত দেখতে হয়। শীষ প্রায় ফুটখানেক লম্বা এবং শক্ত ও গমগাছ ছাড়িয়ে উপরে ওঠে ও ঝুঁকে পড়ে। শীষ প্রথমে সবুজ ও পরে কালচে হয়। এই আগাছা দেখলেই গোড়া সমেত তুলে পুড়িয়ে ফেলুন।

এছাড়াও আগাছা হিসাবে বুনো “জৈ”

গমক্ষেতে দেখা যাচ্ছে। এই গাছ শীষ আসার পর চিনতে সুবিধা হয় কারণ এর শীষে দানায় গুঁয়ো থাকে। দানার রং কালো ও খড়ের রঙের মত হয়। শীষ গম-গাছ ছাড়িয়ে ওপরে ওঠে।

সময় মত ফসল রক্ষা করুন

ভুসো রোগের আক্রমণ হলে গমগাছে শীষ সাধারণতঃ শীষ বেরোবার আগে বের হয়। এই শীষ দেখামাত্র তা ভিজ়ে চট দিয়ে মুড়ে হালকাভাবে কেটে নিয়ে পুড়িয়ে ফেলুন। যাতে শীষের কালো গুঁড়ো না ছড়িয়ে যায়। ভুসো দাগ হয়েছে এরকম জমি থেকে আবার বোনার জন্ম বীজ রাখবেন না। ফুল আসার মুখে ধসা রোগ দেখা দিলে প্রতি লিটার জলে ২ গ্রাম ম্যানকোজেব বা ৩ মিলিলিটার ডাইমিথইল ডাইথায়ো কার্বামেট ওষুধ মিশিয়ে ভালভাবে স্প্রে করুন। প্রয়োজন বোধে এরপর আরও একবার স্প্রে করুন। এক একর জমির ফসলে স্প্রে করার জন্ম মোটামুটি ৩০০ লিটার ওষুধ মেশানো জল লাগবে। মরিচা ও ধসা রোগের আক্রমণ থেকে ফসল বাঁচাতে এই রোগ প্রতিরোধক উন্নত জাতের বীজ ব্যবহার করুন। গমগাছে সাধারণতঃ পোকাকার আক্রমণ কম হয়।

ফসল তোলা

কালবৈশাখীর জলে গম যাতে নষ্ট না হয়, সেজন্য গম পাকার সঙ্গে সঙ্গে ফসল

কেটে মাড়াই করে নিন। এর জন্ম প্রয়োজন হলে মাড়াই যন্ত্র (থ্রেসার) ব্যবহার করুন। ধানের খড়ের মত গমের খড় গবাদি পশুর খাচ্ছ হিসাবে ব্যবহার করুন।

ফলন

উন্নত প্রথায় চাষ করলে একর প্রতি ১০—১২ কুইন্টাল ফলন পাওয়া যায়।

উন্নত মানের গমবীজ উৎপাদন

আপনার ক্ষেতের যে সব এলাকায় সবচেয়ে ভাল গম হয়েছে, সে সব এলাকা থেকে পরের বছরের বীজের জন্ম কাঠি পুঁতে চিহ্নিত করে রাখুন। সমস্ত আগাছা তুলে ফেলুন এবং ফসলের ভাল রকম যত্ন নিন। কাটার আগে অন্যান্য জাতের গম-গাছ দেখলে তা তুলে ফেলুন। ৩-৪ বছর অন্তর বীজ অবশ্যই পার্টে নিন।

ভাল এলাকার গম আলাদা করে কেটে আলাদা ভাবে মাড়াই ও বাছাই করে ভালভাবে রোদে শুকান। ফাল্গুনের দ্বিতীয় পক্ষ থেকে চৈত্রের প্রথম পক্ষ পর্যন্ত (মার্চ মাস) বেশীর ভাগ জেলাতে বাতাসের আর্দ্রতা খুব কম থাকে এবং রোদের তেজ বেশী হয়। কাজেই এই সময় গম শুকানো ও গুদামজাত করা উচিত। সেজন্য গমবীজ এমন সময় বুনতে ও কার্টতে হবে যাতে ওই সময়ের মধ্যে গম শুকানো ও গুদামজাত করা সম্ভব হয়।

ভারতে সার উৎপাদন ও ব্যবহারের অগ্রগতি

শিবদাস রায়

খাদ্যশস্য উৎপাদন ও সার ব্যবহারের
লক্ষ্যমাত্রা

১৯৮৩-৮৪ সালে ভারতে মোট খাদ্যশস্য উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ১৫.১০ কোটি টনের মতো। ১৯৮৪-৮৫ সালে বৃষ্টিপাত যদিও আগের বছরের মতো তেমন অনুকূল ছিল না তবু মোট খাদ্যশস্য উৎপাদন এ বছর '৮৩-৮৪ সাল থেকে কম হবে না বলে হিসেব পাওয়া যাচ্ছে।

পরপর দু'বছরের এই সাফল্য অবশ্যই সম্ভাব্যজনক। কিন্তু তা বলে খাদ্যশস্য উৎপাদন বৃদ্ধির প্রচেষ্টায় কিছুমাত্র শৈথিল্যের অবকাশ নেই। মনে রাখতে হবে ২০০০ সাল নাগাদ ভারতের জনসংখ্যা দাঁড়াবে ১০০ কোটির মতো। এই বিরাট জনসংখ্যার

ফার্টিলাইজার এসোসিয়েশন অফ ইণ্ডিয়া,
পূর্বাঞ্চলীয় শাখা, কলিকাতা।

জন্য প্রায় ২৩ কোটি টনের মতো খাদ্যশস্যের প্রয়োজন হবে। অর্থাৎ আগামী ১৫ বছরে আরও ৭-৮ কোটি টন খাদ্যশস্যের প্রয়োজন। এর জন্য কৃষি উন্নয়ন কর্মসূচীর সবদিকেই সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে। তবে জমির উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি করে একই পরিমাণ জমি থেকে আরও বেশী পরিমাণ ফলন পাওয়ার জন্য আমাদের নির্ভর করতে হবে প্রধানতঃ বিচার বিবেচনা করে সুষম সার প্রয়োগের উপর।

২০০০ সাল নাগাদ প্রয়োজনীয় পরিমাণ খাদ্যশস্য উৎপাদনের জন্য, হিসেব করে দেখা যায়, যে এখন যে পরিমাণ সার উদ্ভিদ-খাত্তের হিসাবে [নাইট্রোজেন (ন) + ফসফেট (ফ) + পটাশ (প)] ব্যবহৃত হচ্ছে তার উপর আরও প্রায় ৮০ লক্ষ টন অর্থাৎ প্রায় দ্বিগুণ পরিমাণ উদ্ভিদখাদ্য ব্যবহার

করতে হবে আগামী ১৫ বছরের মধ্যে। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে আজকের মোট ৮০ লক্ষ টন উদ্ভিদখাদ্য ব্যবহারের স্তরে আমরা পৌঁচেছি মোটামুটিভাবে ৩ দশকের প্রচেষ্টায়।

ভারতে সার উৎপাদনের ইতিবৃত্ত

ভারতে প্রথম সার কারখানাটি স্থাপিত হয় ১৯০৬ সালে, যখন ই. আই. ডি. প্যারীর তামিলনাড়ুস্থিত রাণীপেটের কারখানা থেকে স্পার ফসফেট উৎপাদন শুরু হয়। এরপর ২৫ বছরেরও বেশী সময় অপেক্ষা করতে হয় সারের দ্বিতীয় উৎপাদনকেন্দ্রের জন্য। ১৯৩৩ সালে জামসেদপুরে স্থাপিত ইস্পাত কারখানা থেকে উপজাত এমোনিয়াম সালফেটের উৎপাদন শুরু হয়। এরপর ১৯৪১ সালে মহীশূরের বেলাগুলায় নাইট্রোজেন সার কারখানার পত্তন। এবং ১৯৪৬ সালে ত্রিবাঙ্কুরে ফার্টাইলাইজার্স এণ্ড কেমিক্যালস লিঃ (FACT) এর কারখানায় সংশ্লেষণ পদ্ধতিতে এ্যামোনিয়া এবং এর থেকে এ্যামোনিয়াম সালফেট তৈরী শুরু হয়। বড় সার কারখানা হিসেবে সিল্কীতে এ্যামোনিয়াম সালফেট কারখানা থেকে উৎপাদন শুরু হয় ১৯৫১ সালে। ১৯৫১-৫২ সালে ভারতে সার উৎপাদন ক্ষমতা সাকুল্যে দাঁড়ায় ৯০,০০০ টন নাইট্রোজেন এবং ৭৮,০০০ টন ফসফেট। এর থেকে দেখা যাচ্ছে সার উৎপাদনের ক্ষেত্রে আমাদের প্রবেশ যদিও বিংশ শতাব্দীর শুরুতেই, কিন্তু এই শতাব্দীর

প্রথম ভাগে এর অগ্রগতি ছিল খুবই মন্থর।

গত তিন দশকে সার ব্যবহার ও উৎপাদনে অগ্রগতি

পরবর্তী ত্রিশ বছরে সার উৎপাদন বৃদ্ধির হার ত্বরান্বিত করার এক বিশেষ উদ্যোগ নেওয়া হয়, যার ফলে, ১৯৮৩-৮৪ সালের শেষে সার উৎপাদন ক্ষমতা দাঁড়ায় ৪০টি নাইট্রোজেন সার কারখানা থেকে ৫২ লক্ষ টন নাইট্রোজেন এবং ৫৬টি ফসফেট সার কারখানা থেকে প্রায় ১৬ লক্ষ টন ফসফেট। সারণী-১ থেকে এই বিষয়টি পরিস্কার হবে। এই সারণী থেকে আরও দেখা যাবে যে, সার উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধির পরিমাণ সবচেয়ে বেশী ছিল, ৬০ এর দশকে। এখানে স্মরণ করা যেতে পারে ঐ দশকেরই মাঝামাঝি সময়ে অধিক ফলনক্ষম জাতের খাদ্যশস্যের বীজ ব্যাপকভাবে চাষের কর্মসূচী নেওয়া হয়েছিল।

সারের উৎপাদন ক্ষমতার এই বিরাট বৃদ্ধি সত্ত্বেও, সার ব্যবহার বৃদ্ধির সঙ্গে কিন্তু উৎপাদন তাল রাখতে পারছে না। বরাবরই উৎপাদনের পরিমাণ থাকছে সার ব্যবহারের পরিমাণের নীচে। ১৯৮৩-৮৪ সালে নাইট্রোজেন ও ফসফেট উৎপাদনের মোট পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৩৪.৮ লক্ষ টন এবং ১০.৫ লক্ষ টন। এই পরিমাণ মোট উৎপাদন ক্ষমতার ৭০ শতাংশের মতো। এই বছর সার ব্যবহারের মোট পরিমাণ ছিল ৫২.৩ লক্ষ টন

বস্তুস্বরূপ : পৌষ, ১৩৯২

নাইট্রোজেন, ১৭.৫ লক্ষ টন ফসফেট এবং ৮ লক্ষ টন পটাশ। উৎপাদনের উপর যে সার ব্যবহৃত হয়েছে তা এসেছে বিদেশ থেকে আমদানী করে। পটাশের সবটুকু এসেছে বিদেশ থেকে কারণ পটাশ সারের কোন উৎস আমাদের দেশে নেই। সারণী-২ থেকে ব্যবহার, উৎপাদন ও আমদানী বিষয়ে কিছু ধারণা পাওয়া যাবে।

১৯৮৪-৮৫ সালের হিসেব এখনও চূড়ান্ত হয় নি তবে মোটামুটি হিসেব থেকে জানা যায় এ বছর ৫৬.৪ লক্ষ টন নাইট্রোজেন, ১৮.৬ লক্ষ টন ফসফেট এবং ৮.৬ লক্ষ টন পটাশ অর্থাৎ ৮৩.৭ লক্ষ টন উদ্ভিদখাদ্য ভারতের কৃষকেরা ব্যবহার করেছেন, যেখানে মোট উৎপাদন হয়েছে ৫১.৮ লক্ষ টন (৩৯.১৭ লক্ষ টন নাইট্রোজেন + ১২.৬৩ লক্ষ টন ফসফেট) ফাঁক থাকছে ৩১.৯ লক্ষ টন, যা বিদেশ থেকে আমদানী করা হয়েছে। এদিকে ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার খাদ্যচাহিদা মেটানোর জন্তে সার ব্যবহার তো ক্রমাগত আরও বাড়িয়ে যেতেই হবে। এর পরিপ্রেক্ষিতে সার উৎপাদন বৃদ্ধির ব্যাপারে কি কর্মসূচী নেওয়া হয়েছে সে বিষয়টি খতিয়ে দেখা যাক।

সার উৎপাদন বৃদ্ধির পরিকল্পনা

বস্তু হাইতে প্রাকৃতিক গ্যাসের উৎস পাওয়া যাওয়াতে নাইট্রোজেন সার উৎপাদন পরিকল্পনায় খানিকটা সুরাহা হয়েছে। এই দশকের মধ্যেই মোট ৮টি নতুন সার

কারখানা স্থাপনের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে প্রাকৃতিক গ্যাসের এই উৎসের উপর ভিত্তি করে। এর মধ্যে মহারাষ্ট্রের থাল, গুজরাটের হাজিরা, রাজস্থানের বিলোপা এবং মধ্যপ্রদেশের গুণায় ১টি করে এবং বাকি চারটি হবে উত্তর প্রদেশে। এই ৮টি ইউরিয়া কারখানার মোট উৎপাদন ক্ষমতা হবে ৩৩.৫ লক্ষ টন নাইট্রোজেন। পশ্চিম উপকূলের হাজিরা থেকে পাইপে করে প্রাকৃতিক গ্যাস নিয়ে আসা হবে গুজরাট ও মধ্যপ্রদেশের ভিতর দিয়ে। ১৭০০ কিঃ মিঃ দীর্ঘ এই পাইপ লাইন মোট ৬টি সার কারখানায় গ্যাস সরবরাহ করবে। আরও ৮টি সার কারখানা বসছে ভারতের বিভিন্ন জায়গায়। এর মধ্যে ৩টি বর্তমানে চালু কারখানাকে সম্প্রসারিত করে। এদের সম্মিলিত উৎপাদন ক্ষমতা ৭ লক্ষ টন নাইট্রোজেন এবং ৮ লক্ষ টন ফসফেট। ৭ম যোজনার শেষে পরিকল্পনা মতো এই কারখানাগুলি থেকে উৎপাদন শুরু হলে উৎপাদন ক্ষমতা বাড়বে ৪২.৫ লক্ষ টন নাইট্রোজেন এবং ৮ লক্ষ টন ফসফেট। তাহলে মোট উৎপাদন ক্ষমতা বাড়বে ১০২.৩ লক্ষ টন (না + ফ)—এখনকার তুলনায় দ্বিগুণ। সারণী-৩-এ সপ্তম যোজনায় সার উৎপাদন ক্ষমতার যে পরিকল্পনা রয়েছে তার বিবরণ দেওয়া হয়েছে।

হিসেব করে দেখা গেছে ৭ম যোজনার শেষে ভারতে রাসায়নিক সার ব্যবহারের চাহিদা হবে নাইট্রোজেন ৮১.৯ লক্ষ টন, ফসফেট ২৮.৬ লক্ষ টন এবং পটাশ ১৪.৪

বসুন্ধরা : পৌষ, ১৩৯২

লক্ষ টন—মোট ১২৪.৯ লক্ষ টন। কাজেই থেকে আমদানীর উপর নির্ভর করতে হবে।
উৎপাদন ক্ষমতা দ্বিগুণ করেও মোট সারের এর মধ্যে ১৪.৪ লক্ষ টন হবে পটাশ, যার
চাহিদা পূরণ করা সম্ভব হবে না—বিদেশ কোন জানা উৎস আমাদের দেশে নেই।

সারণী—১

সার কারখানার সংখ্যা ও সার উৎপাদন ক্ষমতা

(১৯৫১-৫২ থেকে ১৯৮৩-৮৪)

সাল	নাইট্রোজেন সার কারখানার সংখ্যা	নাইট্রোজেনের মোট উৎপাদন ক্ষমতা (হাজার টনে)	ফসফেট সার কারখানার সংখ্যা	ফসফেটের মোট উৎপাদন ক্ষমতা (হাজার টনে)
১৯৫১-৫২	৩	৯০	১২	৭৮
১৯৬১-৬২	৮	২৪৬	১৭	১০৭
১৯৭১-৭২	২০	১৫৫০	৩৪	৫৩২
১৯৮০-৮১	৩৪	৪৫৮৬	৫৪	১৩৩৪
১৯৮৩-৮৪	৪০	৫২০১	৫৬	১৫৯১

সারণী—২

সার ব্যবহার, উৎপাদন ও আমদানী (না + ফ + প)*, হাজার টনে

সাল	ব্যবহার	উৎপাদন	আমদানী	আমদানীর মোট মূল্য (কোটি টাকায়)
১৯৫১-৫২	৬৫.৬	৩৮.৭	৫২.০	—
১৯৬১-৬২	৩৮৩.৩	২১৯.৭	৩৮২.০	১৪.১২
১৯৭১-৭২	২৬৫৬.৯	১২৩৯.৫	৯৯৭.০	৮৯.৯৭
১৯৮০-৮১	৫৫১৫.৬	৩০৬২.৩	২৭৫৯.০	৯২৫.২২
১৯৮৩-৮৪	৭৭৯২.২	৪৬১৬.৯	১৩৫৫.১	৩৬৫.০৫

* নাঃ—নাইট্রোজেন ফঃ—ফসফেট পঃ—পটাশ



বসুন্ধরা : পৌষ, ১৩৯২

সারণী—৩

সপ্তম যোজনায় সার কারখানা স্থাপন ও সারের উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধির পরিকল্পনা

(ক) বম্বে হাইয়ের প্রাকৃতিক গ্যাসের উপর ভিত্তি করে

রাজ্য	স্থান	উৎপাদন ক্ষমতা (টনে)		সারের নাম
		নাইট্রোজেন	ফসফরাস	
১। মহারাষ্ট্র	খাল	৬৮৩,০০০	—	ইউরিয়া
২। গুজরাট	হাজিরা	৬৬৮,০০০	—	”
৩। মধ্যপ্রদেশ	গুণা	৩৩৪,০০০	—	”
৪। রাজস্থান	বিলোপা	৩৩৪,০০০	—	”
৫। উত্তরপ্রদেশ	আঁওলা	৩৩৪,০০০	—	”
৬। ”	জগদীশপুর	৩৩৪,০০০	—	”
৭। ”	সাজাহানপুর	৩৩৪,০০০	—	”
৮। ”	বব্বালা	৩৩৪,০০০	—	”

(খ) অন্যান্য সার কারখানা

৯। কর্ণাটক	মাদ্গালোর	২৪,৮৫০	৬৩,৫০০	ডি. এ. পি.
১০। গোয়া	গোয়া (স)	১৬,৪৩৫	৪২,০০০	”
১১। পশ্চিমবঙ্গ	হলদিয়া	২৮,৮০০	৭৩,৬০০	”
১২। আসাম	নামরূপ (স)	১৫২,০০০	—	ইউরিয়া
১৩। উড়িষ্যা	পারাদীপ	১১৭,০০০	৩০০,০০০	ডি. এ. পি.
১৪। অন্ধ্রপ্রদেশ	কাঁকিনড়া	২২৮,০০০	—	ইউরিয়া
১৫। ”	”	৫৪,০০০	১৩৮,০০০	ডি. এ. পি.
১৬। গুজরাট	পোরবন্দর	৫৯,০০০	১৫০,০০০	”
১৭। তামিলনাড়ু	টুটিকোরিগ (স)	১৮,৯০০	৪৮,৩০০	”
মোট—		৪০৫৩,৯৮৫	৮১৫,৪০০	

(স)—সম্প্রসারণ

(পরবর্তী সংখ্যায় শেষ হবে)

স্বষ্টিনির্ভর জমিতে ডালশস্যের ফলন বৃদ্ধির উপায়

এদেশে ডালশস্যের বেশির ভাগই উৎপন্ন হয় স্বষ্টিনির্ভর জমিতে, প্রধানতঃ মাটির রসে। এখন পর্যন্ত যে অবস্থা চলছে তাতে মনে হয় এইরকম ভাবে চাষ আরও অনেক বছর ধরে চলবে। কারণ যদিও সেচের সুবিধা আগের তুলনায় বেড়েছে এবং সেচপ্রাপ্ত এলাকা ক্রমশঃ বাড়ছে তবুও সেখানে ডালশস্যের চাষ বাড়ানোর সম্ভাবনা কম। কারণ সেইসব এলাকার কৃষকরা তুলসী শস্যের চাষেই বেশী আগ্রহী।

এতে হতাশ হবার কোন কারণ নেই। ডালশস্যের উৎপাদন এই অবস্থার মধ্যেও এর উৎপাদিকা শক্তি বাড়িয়ে, সাথী ফসল হিসাবে চাষ করে এবং উন্নত চাষ পদ্ধতি অনুসরণ করে বাড়ানো যেতে পারে।

ডালশস্যের গাছের শিকড়ে নাইট্রোজেন ধরে রাখার উদ্ভূত ক্ষমতা আছে। এর ফলে জমিতে নাইট্রোজেনের পরিমাণ বেড়ে জমির উর্বরতা বাড়িয়ে দেয়। এর শিকড় খুব

বসুন্ধরা : পৌষ, ১৩৯২

ভিতরে যায় তাই তুল জাতীয় শস্যের তুলনায় খরা সহ করার ক্ষমতাও বেশী। খরা প্রবণ জায়গায় তাই চাষের জন্য ডালশস্য বিশেষ উপযোগী।

ডালশস্য প্রধানতঃ বেশী উৎপন্ন হয়, উত্তর-প্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থান ও মহারাষ্ট্রে। অন্যান্য রাজ্যেও অল্পবিস্তর উৎপন্ন হয়ে থাকে। তবে এখন পর্যন্ত প্রয়োজনের তুলনায় ডালশস্যের মোট উৎপাদন কম। যে হারে বর্তমানে লোকসংখ্যা বেড়ে চলেছে তাতে ডালশস্যের চাহিদাও অন্যান্য খাদ্য-শস্যের সঙ্গে বাড়ছে। ডালশস্যের উৎপাদন তাই বাড়ানো একান্ত দরকার। এ নিয়ে চিন্তা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষাও চলছে। দেখা গেছে বৃষ্টিনির্ভর এলাকায় উন্নত চাষ পদ্ধতি গ্রহণ করে ও উৎপাদিকা শক্তি বাড়িয়ে ডালশস্যের ফলন বাড়ানো যায়। কিভাবে তা করা যেতে পারে সে সম্বন্ধে এখানে আলোচনা করা হলো।

(১) জমির রস ধরে রাখা

জমিতে বাঁধ দিয়ে এবং জমির ঢালের উল্টোদিকে লাঙ্গল দিয়ে বৃষ্টির জল জমিতে ধরে রাখার চেষ্টা করা।

(২) “রাইজোবিয়াম কালচার” দিয়ে বীজ শোধন করা

বীজ রাইজোবিয়াম কালচার দিয়ে শোধন করা একান্ত দরকার। কারণ তাতে বীজের অঙ্কুর গজাতে, মাটিতে নাইট্রোজেন ধরে

রেখে গাছের বৃদ্ধিতে সাহায্য করে ও ফলন বাড়ায়।

(৩) রোগপোকা দমনে ওষুধ প্রয়োগ

বৃষ্টিনির্ভর এলাকায় সব বীজ থেকে চারা বার হয় না তাই চারার সংখ্যা অনেক সময় কম থাকে। এরপর চারায় যদি কোন রোগপোকা ধরে তাতে চারা মরে গিয়ে সংখ্যা আরও কমে যায়। তাই বোনার আগে বীজ অবশ্যই রাসায়নিক ওষুধ যথা ক্যাপটান বা থাইরাম নির্দিষ্ট মাত্রায় দিয়ে শোধন করে নিতে হবে।

(৪) সঠিক সময়ে বোনা

ভাল ফলনের জন্য ঠিক সময়ে বোনা একান্ত প্রয়োজন। ডালশস্যের জন্য তা আরও দরকার। কারণ এর চাষ যেহেতু অসেচ এলাকায় হয় তাই দেরীতে বুনলে শেষের দিকে জমির রস শুকিয়ে ফলন কম হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

(৫) গভীরে বোনা

গভীর করে বীজ বোনা। বিশেষ করে রবি মরসুমে শিকড় গভীরে থাকায় খরা সহ করার ক্ষমতা বাড়ায়। তাছাড়া শিকড় বেশী গভীরে থাকায় মাটির যে স্তরে ফাংগাস থাকে তা গাছ এড়িয়ে যেতে পারে। গভীর করে বোনার জন্য সীডড্রিল বা লাঙ্গলে চোঙ্গা লাগিয়ে ব্যবহার করা দরকার। বীজ সব সময়েই লাইনে বুনতে হবে।

(৬) ফসফেট সারের ব্যবহার

ডালশস্ত্রের চাষে ফসফেটের ব্যবহার একান্ত প্রয়োজন। কারণ তাতে শিকড় বাড়াতে সাহায্য করে, নাইট্রোজেন ধরে রাখে, খরা সহ্য করতে পারে। বোনার সময় তাই যতটা পরিমাণ ফসফেট দেওয়া দরকার সবটাই একসঙ্গে দিতে হবে।

(৭) রাসায়নিক ওষুধের ব্যবহার

রোগপোকার আক্রমণ থেকে ফসলের অনেক সময় ক্ষতি হয়। অসেচ এলাকায় জল সব সময় পাওয়া যায় না। সেজন্য স্প্রে করে ওষুধ ছেটানো অসুবিধাজনক। সেজন্য প্রয়োজনীয় রোগপোকা দমনের ওষুধ বোনার সময়েই প্রয়োগ করতে হবে।

(৮) জলদি জাতের প্রজাতি সৃষ্টি

জলদি জাতের বীজ ঠিক সময়ে বুনতে পারলে জমির রস কমে যাওয়ার সম্ভাবনার আগেই শস্য উঠে যেতে পারে। তাছাড়া খরিফে জলদি জাতের ডালশস্ত্রের চাষ করতে পারলে দ্বিতীয় একটি ফসল তোলার পক্ষে সুবিধা হয়। যেমন জলদি জাতের মুগ (টি ৪৪, পুষা বৈশাখী, কে ৮৫-১, পি. এস ১০, পি. এস ১৬, বি. ১) উরুদ্বিন

(টি ৯, প্যান্ট ভি-১৯, প্যান্ট ভি-৩০) এবং বরবটি (ভি ১৬, পুষা ফাল্গুনী) প্রভৃতি যদি বর্ষা শুরু হওয়ার আগেই বোনা যায় তাহলে জমি এমন সময়ে খালি হয়ে যাবে যাতে রবি মরশুমে মাটিতে রস থাকাকালীন আর একটি শস্য যেমন মুসুর, ছোলা ইত্যাদি তোলা যায়।

(৯) গাছের ঝাড় কম হয় এমন জাত নির্বাচন

গাছের ঝাড় বেশি হলে জলের চাহিদাও বাড়ে। সেজন্য এমন জাতের বীজ নির্বাচন করা দরকার যে জাতের গাছে বেশী ঝাড় হয়না।

(১০) আগাছা দমন

আগাছা দমন ভাল ফলনের জন্য একান্ত দরকার। কারণ আগাছা জমির শুধু খাওয়াই নয় মাটির রসও শুষে নেয়। তাই আগাছা দমন একান্ত প্রয়োজন।

“ইণ্ডিয়ান ফার্মিং” এর ১৯৮৫র সেপ্টেম্বর সংখ্যায় প্রকাশিত শ্রী এস. লাল, গ্র্যাসিস্টেন্ট ডিরেক্টর জেনারেল এফ. এফ. সি., ভারতীয় কৃষি অধিদপ্তর পরিষদ লিখিত প্রবন্ধের সারাংশ।

মটরশুঁটির চাষ

সবুজ সতেজ বড় দানার মটরশুঁটির আদর সকলের কাছে। শীতের মরসুমে মটরশুঁটি একটি উল্লেখযোগ্য সবজি। শীত ফুরালেও এর আদর যায় না। তাই সংরক্ষিত শুকনো মটরশুঁটির ব্যবহারও এখন কম নয়। বাজারে দামও তেজী। উন্নত জাতের মটরশুঁটির চাষ করতে পারলে তা যথেষ্ট অর্থকরী সবজি। মটরশুঁটি চাষে জমির উর্বরাশক্তিও বাড়ে। চাষের জন্য উন্নত জাত বেছে নিতে পারলে ফলন ভাল পাওয়া যায়।

মটরের উন্নত জাত

জলদি—মেটিয়োর, আরকেল।

প্রধান ফসল—কৃষ্ণনগর ডোয়াফ, নিউ-লাইন পারফেকশন্, বোনি-ভেলি, জওহর মটর।

বোনার সময়

জলদি জাত—কার্তিকের প্রথম থেকে মাঝামাঝি পর্যন্ত বীজ বোনা যায়।

প্রধান ফসল—কার্তিকের শেষে বীজ বুনতে হয়। অবশ্য আশ্বিন মাস থেকে অগ্রহায়ণের প্রথম পর্যন্ত মটরশুঁটির বীজ লাগানো যায়।

বীজের পরিমাণ (হেক্টর প্রতি)

জলদি জাত ৯০—১০০ কেজি। প্রধান ফসল ৭৫—৯০ কেজি।

জীবাণুসার প্রয়োগ

যে জমিতে আগে কখনও মটরশুঁটির চাষ হয়নি, সে জমিতে বীজ বোনার আগে বীজের সঙ্গে উপযুক্ত জীবাণুসার মাখিয়ে নিতে হবে। হেক্টর প্রতি ১ কেজি ৮-৭৫ গ্রাম জীবাণুসার লাগবে। বীজ অল্প জলে মিনিট দশেক ভিজিয়ে বাড়তি জল ফেলে দিয়ে জীবাণুসার মেশাতে হবে।

বীজ শোধন

থাইরাম ঘটিত ওষুধ, যেমন থাইরাইড অথবা ম্যানকোজেব যেমন ডাইথেন-এম-৪৫, অথবা পি. সি. এন. বি. ঘটিত ওষুধ যেমন ব্রাসিকল-৭৫ তিন গ্রাম প্রতি কেজি বীজের সঙ্গে মিশিয়ে বীজ শোধন করতে হবে। জীবাণুসার ব্যবহার করলে শুধু ম্যানকোজেব (ডাইথেন এম-৪৫) দিয়ে বীজ শোধন করতে হবে।

চারার দূরত্ব

জলদি জাত—৩০ সেমি × ১০ সেমি। প্রধান ফসল—৪৫ সেমি × ১০ সেমি।

সারের নাম, পরিমাণ ও প্রয়োগের সময় (হেক্টর প্রতি)

জমি তৈরীর সময় কম্পোস্ট বা গোবর সার ১৫ টন, নাইট্রোজেন ২০ কেজি, ফসফেট ৬০ কেজি, পটাশ ৫০ কেজি। গাছের বাড় কম হলে ফুল ধরার ঠিক আগে হেক্টর প্রতি ১০ কেজি নাইট্রোজেন চাপান সার হিসাবে প্রয়োগ করলে সুফল পাওয়া যাবে।

বীজ বোনা

জমিতে রস কম থাকলে বোনার আগে সেচ দিয়ে জমি তৈরি করুন। নির্দিষ্ট দূরত্বে সারিতে সরাসরি বীজ বুনতে হবে। বীজ ২ সেমিরও (আধ ইঞ্চি) কম গভীরে বুনতে হবে। বীজ যেন সমান গভীরতায় বোনা হয়। চারা বার হলে সারিতে নির্দিষ্ট দূরত্বে চারা রেখে বাকী চারা পাতলা করে দিতে হবে।

কত দিনের ফসল

জলদি জাত—বীজ বোনার ৫০—৫৫ দিনের মধ্যে প্রথম শুঁটি তোলা যায়।

প্রধান ফসল—৭০—৭৫ দিন পরে শুঁটি প্রথম তোলা উপযোগী হয়।

রোগ, কীটশত্রু এবং তার প্রতিকার

পাউডার রোগ বা সাদা গুঁড়ো রোগ : পাউডার রোগ মটরশুঁটির একটি প্রধান রোগ। এই রোগ ছত্রাক জাতীয় উদ্ভিদের আক্রমণের ফলে হয়। এই রোগের আক্রমণ

বসুন্ধরা : পৌষ, ১৩৯২

হলে পাতার তলায়, উপরে, কাণ্ডে ও ফলের গায়ে সাদা পাউডারের ছোট ছোট দাগ দাগ মত দেখা যায়। সাধারণতঃ মটরশুঁটির চাষের শেষের দিকে এই রোগ দেখা যায়। এই রোগের আক্রমণে পাতা ক্রমশঃ হলদে হয়ে যায়। গাছের পাতা এরকম দেখলে প্রতি লিটার জলে ০.৩% সালফেক্স বা ব্যাভিষ্টিন ০.১% বা ০.২% কেলথেন দিয়ে স্প্রে করতে হবে। রোগের অবস্থা বুঝে ৭ থেকে ১৫ দিন অন্তর বার তিনেক স্প্রে করুন।

ঢলে পড়া রোগ

এক ধরনের ছত্রাক জাতীয় উদ্ভিদের আক্রমণে মটরশুঁটিতে এই “ঢলে পড়া” রোগ দেখা যায়। এই রোগে গাছের পাতা নীচের দিকে কুঁকড়ে ক্রমশঃ হলদে হয়ে যায়। শুঁটি ঠিকমত বাড়ে না। ধীরে ধীরে পুরো গাছ ঢলে পড়ে মরে যায়। জমিতে বীজ ফেলার আগে প্রতি কেজি বীজ ৩ গ্রাম মনোসান দিয়ে শোধন করুন।

ডাঁটা ছিদ্রকারী পোকা

ডাঁটা ছিদ্রকারী পোকা এক ধরনের মাছি জাতীয় পোকা। এই মাছি গাছের কাণ্ড ও কচি পাতার উপর ডিম পাড়ে এবং এর কীড়া মাটির ঠিক উপরে কাণ্ডের গায়ে ছিদ্র করে। এর ফলে চারা ও বড় মটর গাছ প্রথম দিকেই হলদে মত হয়ে শুকিয়ে যায়।

চারা অবস্থায় আক্রান্ত গাছ দেখা মাত্র তুলে নষ্ট করে ফেলা উচিত। বড় মটর গাছে আক্রমণ দেখা দিলে ফরমিথায়ন যথা এনথিও ২৫% এক লিটার জলে ২ মিলি-লিটার মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে। স্প্রে করার পর ২০ দিন গাছ থেকে মটরশুঁটি তোলা চলবে না।

ফলন

জলদি জাতে হেক্টর প্রতি ৪ থেকে ৬ টন সবুজ শুঁটি ও প্রধান ফসলে হেক্টর প্রতি ৭ থেকে ৮ টন সবুজ শুঁটি পাওয়া যাবে।

গ্রাহকদের প্রতি আবেদন

“বসুন্ধরা” মাসিক পত্রিকার ১৩৯২ সালের চাঁদার মেয়াদ যাদের শেষ হয়ে যাচ্ছে বা গেছে, নতুন বছরের জন্য চাঁদা পাঠিয়ে তাঁদের গ্রাহক হতে অনুরোধ করা হচ্ছে। বার্ষিক চাঁদার টাকা পোষ্টাল অর্ডারে বা ব্যাঙ্ক ড্রাফ্টে কৃষি অধিকর্তা, পশ্চিমবঙ্গ সমীপে, মহাকরণ, কলিকাতায়, অথবা জেলা কৃষিতথ্য আধিকারিক কৃষিতথ্য সংস্থা, ৪২নং গ্রাহাময় রোড, কলিকাতা-৪০, এই ঠিকানায় পাঠাতে হবে।

প্রধান সম্পাদক

মাঘে কৃষকের করণীয়

মাঘের ক্ষেতে নানা রবিশস্ত্র ও গম এখন তৈরি হয়ে উঠছে। যেসব রবিশস্ত্র এখন ক্ষেতে রয়েছে তার যত্ন ও পরিচর্যা প্রয়োজন। বিশেষ করে রোগ-পোকার আক্রমণ সতর্ক হওয়া বিশেষ দরকার। কোথাও এর আক্রমণ হয়েছে দেখা গেলে সঙ্গে সঙ্গে তার প্রতিকারের ব্যবস্থা নিতে হবে।

বোরো ধান

বোরো ধান এই সময়ের একটি বিশেষ শস্ত্র। রোয়ার ১৫ দিন অন্তর ২ বার হাত দিয়ে মাটি ধেঁটে দিতে হবে। সময় মত নিড়েন দিয়ে আগাছা পরিষ্কার রাখুন। পাশকাঠি ছাড়ার সময় অধিক ফলনশীল জলদি জাতে একর প্রতি ২০ কেজি, নাবি জাতে ২৪ কেজি এবং দেশী উন্নত জাতে ১৬ কেজি নাইট্রোজেন দিন।

রোগের আক্রমণ থেকে সতর্ক থাকতে হবে। প্রয়োজন হলে সঙ্গে সঙ্গে ব্যবস্থা নেওয়া দরকার।

সূর্যমুখী

এর রোগ-পোকা দমনে যত্ন নিন। সময়ে ফসল কাটুন। ফসল কাটার সময় হলে ফুলের পেছনের দিকে তামাটে রং দেখা যায়, ফুল ঝুলে পড়ে এবং মাঝখানের বীজ কালো ও শক্ত হয়।

শাকসবজি

শাকসবজির চাষ এখন যথেষ্ট জনপ্রিয়। গ্রীষ্মে তোলায় জন্ম এখন করলা, ঝিঙা, ফুটি, শশা, লাউ, বেগুন ইত্যাদির চাষ শুরু করুন। এইসব সবজির উন্নত জাত এখন বার হয়েছে। সেগুলি যতটা সম্ভব সংগ্রহ করে বুনুন, ফলন তাতে ভাল পাওয়া যাবে।

ফল

এই সময়ে আমগাছে মুকুল আসার সময়। আম একটি যেমন জনপ্রিয় ফল এর অর্থনৈতিক গুরুত্বও যথেষ্ট। এর ফলন যাতে ভাল হয় তার জন্ম এখন থেকেই সচেষ্ট হতে হবে। আমগাছের সমস্ত রোগ-পোকার মধ্যে ফলনের দিক থেকে সবচেয়ে ক্ষতিকর শোষক পোকা। সময়মত এর দমনের ব্যবস্থা নেওয়া দরকার। এর দমনের জন্ম প্রয়োজনীয় ওষুধ স্বেপ্ত করুন। এর জন্ম স্থানীয় কৃষিকর্মীর সঙ্গে যোগাযোগ করুন।

অন্যান্য ফসল

এ মাস থেকে তিল ও চীনাবাদাম বোনা যায়। আলু ও আখের এখন পরিচর্যার প্রয়োজন।

কৃষি সংবাদ

আগামী খরিফ মরশুমের জন্য প্রয়োজনীয় ধানবীজ নিজেই রাখুন

আগামী খরিফ মরশুমে আবাদের জন্য আপনার প্রয়োজনীয় ধানবীজ বিশেষ করে স্বল্প মেয়াদী উচ্চ ফলনশীল জাতের ধানবীজ নিজেই রাখুন।

- আপনার জমির যে অংশে সবচেয়ে ভাল ফসল হয়েছে, পুষ্ট দানা হয়েছে সে জায়গাটি বীজের জন্য বেছে নিন। এই অংশে যেন কোন রোগাক্রান্ত গাছ না থাকে। নির্দিষ্ট অংশে অন্য জাতের গাছ বা আগাছা থাকলে তুলে ফেলে দিন।
- এই অংশের ফসল আলাদা ভাবে কেটে ঝাড়াই মাড়াই করুন। আগাছার বীজ, মাটির টুকরো, খড়কুটো ইত্যাদি থাকলে বেছে আলাদা করুন।
- সংগৃহীত বীজ কয়েকবার কড়া রোদে সারাদিন রেখে ভালভাবে শুকিয়ে নিন। রোদে দেওয়া বীজ ছায়ায় মেলে ঠাণ্ডা করুন, পরে ঠাণ্ডা করা বীজ সংরক্ষণ করুন। পরামর্শের জন্য স্থানীয় কৃষি সম্প্রসারণ কর্মীর সঙ্গে যোগাযোগ করুন।

—পশ্চিমবঙ্গ সরকার



সপ্তম পঞ্চবার্ষিক যোজনার ব্যাপক প্রস্তুতি

উন্নত মানের বীজ উৎপাদন ও সরবরাহের কাজে
পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বীজ নিগম-এর সম্প্রসারিত কার্যক্রম

উন্নত মানের বীজ উৎপাদন বর্তমান পরিস্থিতি ৭ম যোজনার লক্ষ্যমাত্রা
ও সরবরাহ কার্যক্রমে (১৯৮৪-৮৫) (১৯৮৯-৯০)

(পাট, ধান, গম, ডালশস্য এবং ৩,০০০ ১৫,০০০
তৈলবীজ) মেঃ টন মেঃ টন

পশ্চিমবঙ্গের জলবায়ু মাটির উপযোগী এ রাজ্যেই উৎপাদিত

উন্নত মানের শংসিত বীজ ব্যবহার করুন

ফলন বাড়ান : আয় বাড়ান

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বীজ নিগম লিঃ-এর জেলা দপ্তর

- রায়গঞ্জ : উকিলপাড়া, রায়গঞ্জ (পশ্চিম দিনাজপুর)
- মালদা : মকদমপুর, মালদা
- বহরমপুর : পঞ্চাননতলা, বহরমপুর (মুর্শিদাবাদ)
- কৃষ্ণনগর : ১২ ডি. এন. রায় রোড, কৃষ্ণনগর (নদীয়া)
- বর্ধমান : ৭৯ এন. এন. বসু রোড, বর্ধমান
- সিউরী : দাঙ্গালপাড়া, সিউরী (বীরভূম)
- বাঁকুড়া : চাঁদমারীডাঙ্গা, বাঁকুড়া
- মেদিনীপুর : ৩৫/১ অরবিন্দনগর, নরমপুর, মেদিনীপুর

সদর দপ্তর :

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বীজ নিগম লিঃ

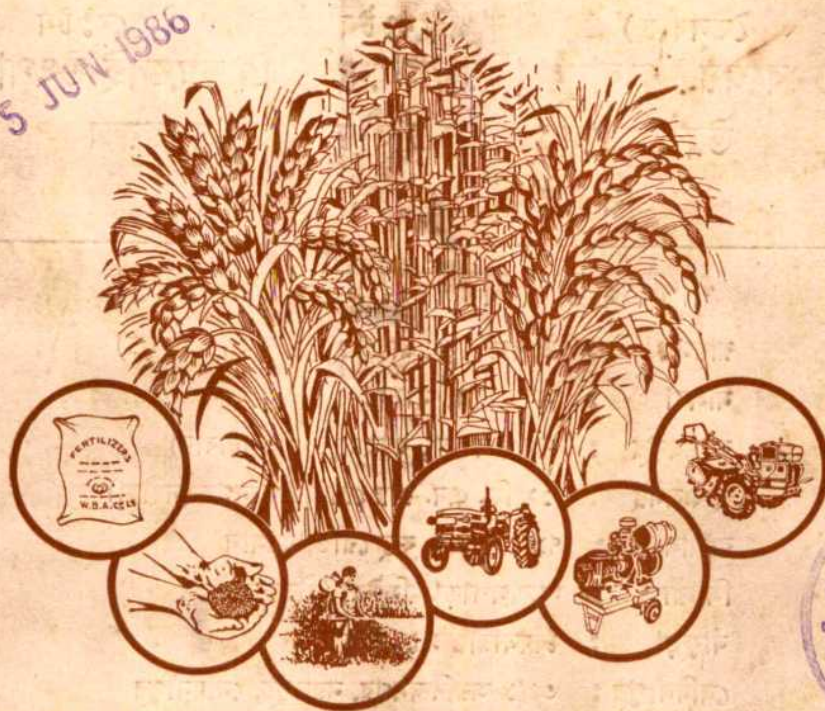
৪ গঙ্গাধরবাবু লেন (৬ষ্ঠ তল), কলিকাতা ৭০০ ০৭২

রেজিঃ নং ডব্লিউ বি/এস-৮৯

বসুন্ধরা : পৌষ : ১৩৯২

GREEN REVOLUTION— our aim in West Bengal

5 JUN 1986



Green Revolution is our aim. The object is to modernise farming in the State. And Agro-Industries Corporation is lending a helping hand to achieve the goal. The Corporation has been supplying modern implements like Tractors, Sprayers, Threshers and Pump-sets to the farmers on hire or on hire-purchase basis.

The Corporation also supplies quality seeds, fertilisers and pesticides.

Agro-Industries Corporation also provides custom

service for cultivation of cotton/groundnut and for Small Farmers Development Agency and Marginal Farmers & Agricultural Labourers Development Project Schemes.

The Corporation has another role too—to create employment opportunities for Engineering graduates/diploma holders and Agricultural graduates in different Agro-Service centres in this State.

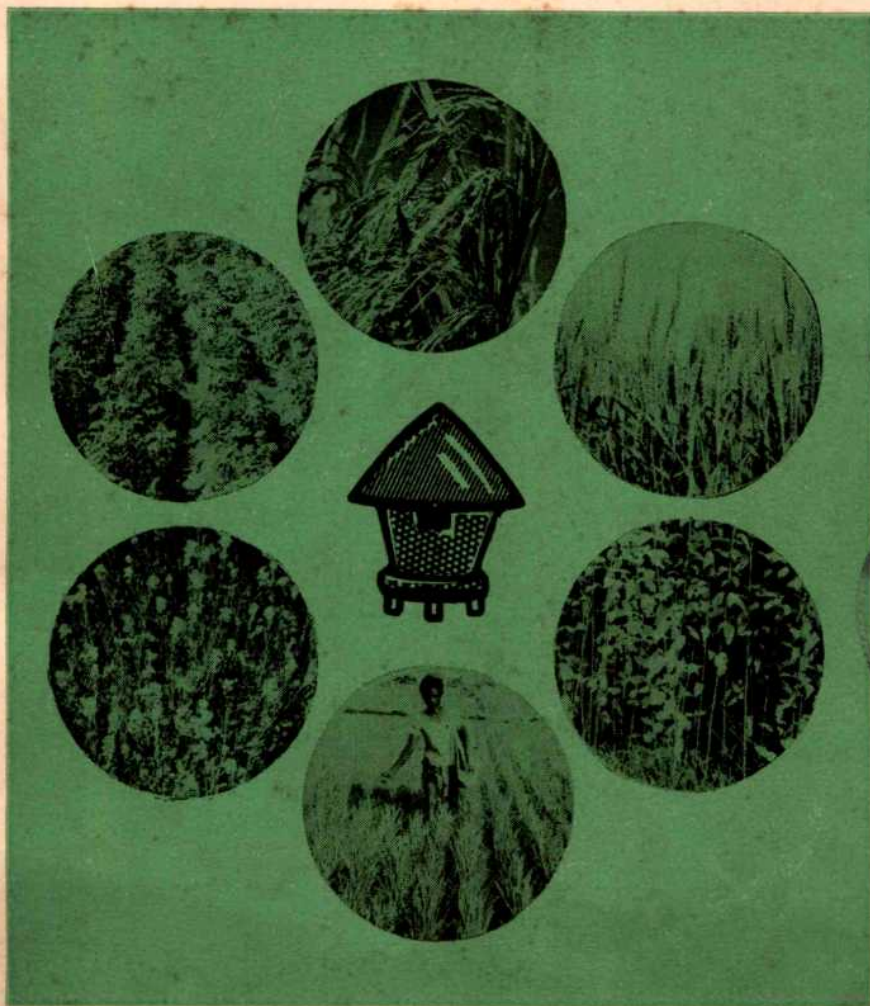
**Hand in hand with farmers —
Agro-Industries Corporation**

West Bengal Agro-Industries Corporation Limited

বঙ্গবন্ধু

সপ্তত্রিংশবর্ষ

মাঘ ৪ ১৩৯২



সূচী

সম্পাদকীয়	...	৩-৪	সম্পাদনা উপদেষ্টা পর্ষদ
ভারতে সার উৎপাদন ও ব্যবহারের			ডঃ দেবব্রত মুখোপাধ্যায়/কৃষি অধিকর্তা, পশ্চিমবঙ্গ
অগ্রগতি/শিবদাস রায়	...	৫-৭	ডঃ সুধাময় বিশ্বাস/অপর কৃষি অধিকর্তা
১৯৮৪-৮৫ সালে বোরো মরসুমে			ডঃ কল্যাণব্রত সেনগুপ্ত/ঘৃণ্য কৃষি অধিকর্তা (গবেষণা)
আই-আর ৫০, আই-আর ৩৬ ও জয়া			জ্যোতির্ময় বোস/উপসচিব (উন্নয়ন) কৃষি বিভাগ
ধানের তুলনামূলক চাষ/সঞ্জীব কাঞ্জি	...	৮-১২	অমলেন্দু সরকার/মুখ্য প্রচার ও জনসংযোগ
আমের শত্রু শোষক পোকা/			আধিকারিক
ডঃ পুণ্যব্রত চট্টোপাধ্যায়	...	১৩-১৫	অমিয়কুমার মিত্র/জেলা কৃষিতথ্য আধিকারিক (সদর)
রোগ ও পোকার আক্রমণ থেকে			স্বলেখা ঘোষ/সম্পাদিকা
বোরো ধান রক্ষা করুন	...	১৬-১৮	চিদানন্দ গোস্বামী/সহঃ সম্পাদক
স্বর্ঘমুখী নয়া ফসল/দীনেন্দু শেখর পাল	...	১৯-২২	প্রধান সম্পাদক
বারসীমের বীজ উৎপাদন পদ্ধতি	...	২৩-২৫	ডঃ দেবব্রত মুখোপাধ্যায়—কৃষি অধিকর্তা,
পেঁয়াজ একটি লাভের ফসল/			পশ্চিমবঙ্গ
স্বলেখা ঘোষ	...	২৬-২৮	
মহিলা প্রশিক্ষণ চলছে চলবে/			
কনককমল চট্টোপাধ্যায়	...	২৯-৩১	
ফাগুন মাসের করণীয়	...	৩২	

বসুন্ধরা

মাঘ—১৩৯২

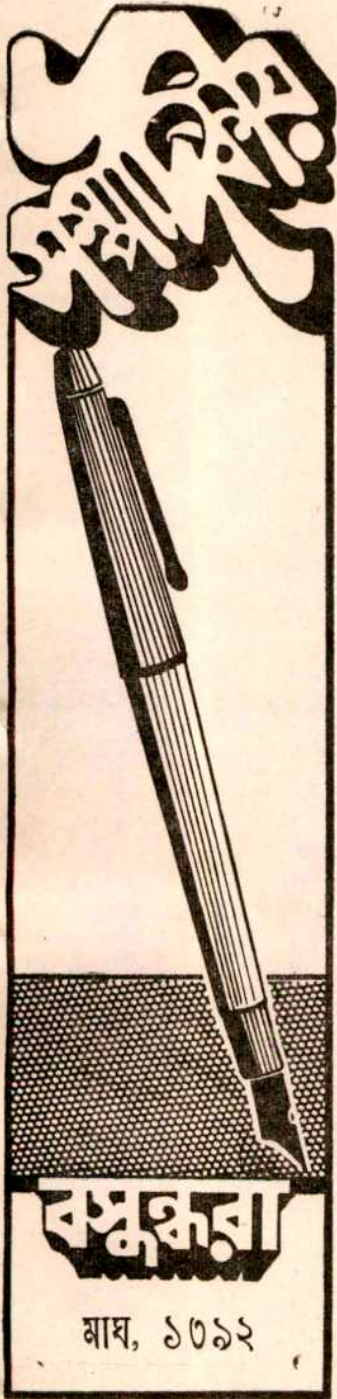
কৃষি অধিকার (কৃষি তথ্য সংস্থা)

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কৃষি বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত ও প্রচারিত

কৃষি সংবাদ

খেসারীর ডাল কিভাবে খাবেন ?

খেসারীর কয়েকটি স্থানীয় জাতে দেখা গেছে বিষাক্ত পদার্থের পরিমাণ শতকরা ০.৫ ভাগের বেশী থাকে। এই খেসারীর রুটি, বেসম বা ছাতু নিয়মিত খাওয়া উচিত নয়। তাই খেসারী এভাবে না খেয়ে এক রাত জলে ভিজিয়ে বা ফুটিয়ে সেই জল ফেলে দিয়ে ডাল রান্না করে খান। বিষাক্ত পদার্থটি জলে দ্রবণীয়। খেসারী ভেজানো জল ফেলে দিলে খেসারী আর ক্ষতিকারক হবে না। নির্মল বা এন পি-২৪ জাতের খেসারীতে বিষাক্ত পদার্থ খুব কম মাত্রায় থাকে এবং সেই খেসারী খেলে বিষক্রিয়ার আশঙ্কা থাকে না।



মাঘের ক্ষেতে নানা রবিশস্ত্র ও গম এখন তৈরি হয়ে উঠছে। শীতের হিমে ও প্রাকৃতিক অনুকূল পরিবেশে রবি ফসল পুষ্ট হয়ে ওঠে। শস্ত্রের পরিণতির মুখে জলের প্রয়োজন খুবই বেশী। তাতে শস্ত্রের ফলন ভাল হয়। এখন সেচের সুবিধা আগের তুলনায় অনেকটা বেড়েছে। তার ফলে রবি মরসুমে বিবিধ শস্ত্রও এখন চাষ করা সম্ভব হচ্ছে। তবে সেচবিহীন এলাকায় জমির রসে রবিশস্ত্রের চাষ এখনও অনেক জায়গাতেই হচ্ছে। মাঘের শেষে কিছুটা বৃষ্টি তাই শস্ত্রের ভাল ফলনের জন্য একান্তই প্রয়োজন। কৃষকের প্রার্থনাও থাকে মাঘের শেষে এক পশলা বৃষ্টির জন্য।

যেসব রবিশস্ত্র এখন ক্ষেতে রয়েছে তার যত্ন ও পরিচর্যা বিশেষ দরকার। কারণ ঠিকমত যত্ন ও পরিচর্যার উপর ফলনের ভাল মন্দ অনেকটা নির্ভর করে। ক্ষেত ঘুরে দেখা দরকার কোথাও রোগ পোকার আক্রমণ হয়েছে কিনা। ভাল ফসল হওয়ার পরও রোগ পোকার আক্রমণে অনেক সময়েই তা নষ্ট হয়ে যায়। তাই কোথাও আক্রমণ হয়েছে দেখলে সঙ্গে সঙ্গে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে। এই প্রসঙ্গে এ বছর আমন ধানের পামরি পোকার আক্রমণের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। সময়মত এই পোকা দমনের ব্যবস্থা কৃষকরা নিয়েছিলেন বলে আমন ধান ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা করা সম্ভব হয়।

বোরো ধানের চাষ শুরু হয়েছে। ইতিমধ্যেই কোন কোন অঞ্চলে বোরো ধানের বীজতলায় পামরি পোকার আক্রমণ লক্ষ্য করা গেছে। রোয়া করার পর বোরো ধানে পামরি পোকা যাতে ক্ষতি না করতে পারে, তার জন্য বীজতলা থেকেই সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে। যেসব বীজতলায় পামরি পোকার আক্রমণ দেখা গেছে তা দমনের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা সঙ্গে সঙ্গে নিতে হবে।

এই মাসে শস্ত্র রক্ষার আর একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ হলো আম গাছের মুকুলের যত্ন নেওয়া। আম এ রাজ্যের অত্যন্ত একটি প্রধান ফল। এর অর্থনৈতিক গুরুত্বও এ রাজ্যে যথেষ্ট।

এর ফলন যাতে কোনভাবে ক্ষতিগ্রস্ত না হয় তা দেখা দরকার।
আম গাছের মুকুলের সবচেয়ে ক্ষতি হয় শোষক পোকার
আক্রমণে। সময় মত এর দমনের ব্যবস্থা করতে পারলে এই
রাজ্যের বর্তমান উৎপাদন অনেকটা বাড়ানো যেতে পারে।
এই পোকা দমনের জন্য প্রয়োজনীয় ওষুধ মুকুল আসার
আগে একবার ও গুটি ধরার সঙ্গে সঙ্গে আর একবার মোট
ছবার স্প্রে করতে হবে। তবে মুকুল ফোটা অবস্থায় ওষুধ স্প্রে
করা উচিত নয়।

ভাল ফলনের জন্য এই মাসে কৃষককে সমস্ত রবিশস্ত্রের
ও বোরো ধানের বীজতলার যত্ন, তদারকি ও প্রয়োজনীয়
শস্ত্র রক্ষার ব্যবস্থার দিকে গুরুত্ব দিতে হবে। এই বিষয়ে
কোন সাহায্য ও পরামর্শের প্রয়োজন হলে কৃষকরা যেন
স্থানীয় কৃষিকর্মীর সঙ্গে যোগাযোগ করেন।

ভারতে সার উৎপাদন ও ব্যবহারের অগ্রগতি

শিবদাস রায়

ফলন বৃদ্ধিতে সারের প্রয়োজনীয়তা এবং তার ব্যবহার সম্বন্ধে শ্রীরায় তাঁর প্রবন্ধের প্রথম অংশে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। এই অংশে সার ব্যবহার বৃদ্ধিতে উৎসাহ দানের জন্য সারের মূল্যে ভরতুকী দেওয়া ও অন্যান্য ব্যবস্থা সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন।

সমস্তা শুধু সার উৎপাদনের নয়, সমস্তা সার বিতরণেরও। সপ্তম যোজনায় শেষে সার ব্যবহারের যে লক্ষ্যমাত্রা স্থির করা হয়েছে তা হলো ঐ সময়ে দেশের মোট জনসংখ্যার প্রয়োজনীয় খাত্তের পরিমাণ হিসেব করে। ঐ পরিমাণ খাত্তশস্ত্র উৎপাদনে ব্যর্থ হলে আবার খাত্তের জন্য আমাদের বিদেশের উপর নির্ভর করতে হবে যা কোনমতেই কাম্য নয়। কাজেই সার প্রয়োগের লক্ষ্যমাত্রায় আমাদের পৌঁছাতেই হবে। তবে সার প্রয়োগ কৃষকের কাছে অবশ্যই লাভজনক হতে হবে। তাই সারের বিক্রয়মূল্য কেন্দ্রীয় সরকার বেঁধে দিয়েছেন। দেশের সর্বত্র ঐ একই দামে কৃষক সার কিনতে পারবেন। (স্থানীয় কর অবশ্য আলাদা)। কিন্তু সারের

উৎপাদন ব্যয় বা যে দামে সার বিদেশ থেকে কেনা হয় এই ছুটিই সারের বর্তমান দাম থেকে বেশী। ভরতুকী দিয়ে সারের দাম কৃষকের কাছে লাভজনক পর্যায়ে রাখা হয়েছে। একটি হিসাবে দেখা যায়, বর্তমানে এই ভরতুকী দেশে উৎপন্ন সারের ক্ষেত্রে গড়ে ২,৩২৬ টাকা প্রতি টন উদ্ভিদ খাত্ত এবং আমদানী করা সারে ভরতুকী ২,০৩৩ টাকা প্রতি টন উদ্ভিদ খাত্ত। এই ভরতুকী বাবদ কেন্দ্রীয় সরকারের ব্যয় হয়েছে ১৯৮১-৮২ সালে ৩৭৫ কোটি টাকা, ৮২-৮৩ সালে ৬০৫ কোটি টাকা, ৮৩-৮৪ সালে ১,০৪২ কোটি টাকা এবং ৮৪-৮৫ সালে ১,৯৩২ কোটি টাকা।

সার ব্যবহার বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে এই ভরতুকীর পরিমাণও বাড়তে থাকবে। কারণ সারের দাম বাড়ালে সার ব্যবহার খাত্তশস্ত্রের বর্তমান মূল্যে লাভজনক হবে না। তাতে সার ব্যবহার ও সেই সঙ্গে খাত্তশস্ত্রের উৎপাদন কমে যাবার আশঙ্কা। বিক্রয়যোগ্য উদ্ভূত খাত্তশস্ত্র থাকে বড় চাষীর কাছে। সারের দাম বাড়িয়ে এই সঙ্গে খাত্তশস্ত্রের সংগ্রহমূল্য বাড়ালে এই শ্রেণীর কৃষকই কেবল

বসুন্ধরা : মাঘ, ১৩৯২

লাভবান হবেন। এই সঙ্গে খাদ্যশস্যের বিক্রয়মূল্য যদি বৃদ্ধি পায় তাহলে গ্রাম ও শহরের দুর্বলতর শ্রেণীর মানুষের কাছে তা হবে মারাত্মক। এই সব দিক দিয়ে বিচার করে সারের দামে ভরতুকি দেওয়াই যুক্তিযুক্ত বলে মনে হয়। ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষীরা তাঁদের ক্ষুধার্ত জমিতে সার প্রয়োগ করে সুফল পাবেন বেশী এবং কেন্দ্রীয় সরকারের সারের মূল্যে ভরতুকী দানের পরিকল্পনার পূর্ণ সুযোগ খুবই লাভজনকভাবে গ্রহণ করতে পারবেন। আমাদের এই পূর্বভারতেই ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষীর সংখ্যা খুব বেশী।

মাঠে সার প্রয়োগের কার্যকারিতা বৃদ্ধির জন্যও সবিশেষ সচেষ্টিত হওয়া প্রয়োজন। এর জন্য কৃষি বিজ্ঞানীদের উপদেশ নির্দেশ যেগুলি আছে সেগুলি কৃষক যাতে মাঠে যথাযথ ভাবে অনুসরণ করেন সেদিকে নজর দিতে হবে। আর বিজ্ঞানীদের গবেষণা আরও জোরদার করতে হবে, অল্প মাত্রায় সার প্রয়োগ করে আরও বেশী ফলন কিভাবে পাওয়া যায় তার উপায় উদ্ভাবনের জন্য।

সার ব্যবহার আরও বেশী জনপ্রিয় করার জন্য অগ্ন্যগ্ন প্রচেষ্টা

সার ব্যবহার বৃদ্ধির পরিমাণ যাতে ক্রমাগত বাড়তে থাকে এর জন্য যে পন্থাগুলি অবলম্বন করা হয়েছে, সেগুলি হল :

১। প্রয়োজন মতো যথাসময়ে যথেষ্ট পরিমাণে সারের সরবরাহ বজায় রাখা। দেশে উৎপন্ন সারের অতিরিক্ত যে পরিমাণ সার

প্রয়োজন হবে তা বিদেশ থেকে আমদানী করে পূরণ করা।

২। বর্তমানে সার ব্যবহার কম কিন্তু সার ব্যবহার বৃদ্ধি করে খাদ্যশস্য উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধির যথেষ্ট সুযোগ আছে এমন কতগুলি নির্বাচিত জেলায় রাজ্য সরকারের কৃষি বিভাগ ও সার শিল্পের সমবেত প্রচেষ্টায় নিবিড় সার সম্প্রসারণ কর্মসূচী রূপায়িত হচ্ছে। ১৯৮১ সালে এই কর্মসূচীতে ৬৭টি জেলা অন্তর্ভুক্ত ছিল, এখন জেলার সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১০৪-এ।

৩। আগে সারের দাম বাঁধা ছিল নিকটতম রেল স্টেশনে পৌঁছে দেওয়ার ভিত্তিতে। এখন ব্লকে ব্লকে পৌঁছে দেবার ভিত্তিতে সার সরবরাহ করা হচ্ছে—এবং এর জন্য অতিরিক্ত ব্যয় কেন্দ্রীয় সরকার বহন করছে।

৪। সার বিপণন সংস্থাগুলির কাছে সারের ব্যবসায় আরও লাভজনক করে তোলার জন্যে ১৯৮১তে সারের বিতরণ ব্যয় বাবদ ২২ শতাংশ বৃদ্ধি করা হয়েছিল। ১৯৮৩তে এই মার্জিন পুনরায় বৃদ্ধি করা হয়েছে।

৫। সার এবং অগ্ন্যগ্ন কৃষি উপকরণ কেনার জন্যে বিভিন্ন রাজ্যে স্বল্পমেয়াদী ঋণের পরিমাণ ছিল ১৯৭৯-৮০ সালে ১৩৬ কোটি টাকা—এটি বর্তমানে বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২৬০ কোটিতে।

৬। সারা ভারতে সর্বত্র কৃষক যাতে সহজে সার কিনতে পারেন তার জন্য খুচরা

সার বিক্রয় কেন্দ্র ১৯৮১ সালের ১০১১ লক্ষ থেকে বাড়িয়ে ১৯৮৩-৮৪ সালে ১০৪৭ লক্ষ করা হয়েছে।

৭। গত ২৯শে জুন ১৯৮৩তে সারের দাম ৭.৫ শতাংশ কমানো হয়েছে।

৮। সারের অধিক মূল্যের ক্ষতিকর প্রভাব কমিয়ে সার প্রয়োগ লাভজনক রাখার জন্য ফসলের সংগ্রহমূল্য বৃদ্ধি করা হয়েছে। ১৯৮২-৮৩ সালে ৪.১৯ কিলোগ্রাম ধান লাগত ১ কেজি নাইট্রোজেন কেনার জন্য। এখন ৩.৪১ কেজি ধানের দামে ১ কেজি নাইট্রোজেন পাওয়া যায়। সারের দাম কমিয়ে এবং ধানের সহায়ক মূল্য বাড়িয়ে এটা করা সম্ভব হয়েছে।

৯। ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের জন্য ২৫০ কোটি টাকার একটি পরিকল্পনা অনুমোদন করা হয়েছে—এরমধ্যে মিনিকিটের মাধ্যমে সার বিতরণ একটি গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচী।

১০। ফুড কর্পোরেশনের গুদামে রক্ষিত ছবছরের পুরাণো মজুদ সার ১০ শতাংশ দাম বাদ দিয়ে বিক্রি করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এই হ্রাস ১৯৮৩তে জুন-মাসে ঘোষিত ৭.৫ শতাংশ হ্রাসের অতিরিক্ত।

১১। খরিফ ও রবি মরসুমের আগে খরিফ ও রবি উপকরণ পক্ষ খুবই গুরুত্ব সহকারে পালন করা হচ্ছে। এই কর্মসূচীর উদ্দেশ্য হল সার, বীজ, কৃষিক্ষণ প্রভৃতি কৃষির প্রয়োজনীয় বিবিধ উপকরণ যেন যথা সময়ে কৃষকের কাছে সহজলভ্য হয়।

১২। এ ছাড়া রয়েছেন রাজ্যের কৃষি বিভাগের কৃষি সম্প্রসারণ কর্মীরা; যারা কৃষকের সাথে সরাসরি যোগাযোগ স্থাপন করে, উন্নত কৃষি পদ্ধতি ও সার প্রয়োগ সম্পর্কে তাঁদের ক্রমশঃই অধিক সচেতন করে তুলছেন। প্রশিক্ষণ ও পরিদর্শন কর্মসূচীর মাধ্যমে কৃষি সম্প্রসারণের অগ্রগতি ত্বরান্বিত হয়েছে এবং অধিকতর কার্যকরী হয়ে উঠেছে।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

১। ফার্টলাইজার নিউজ, ফেব্রুয়ারী ও মার্চ, ১৯৮৫ সংখ্যা দুটিতে প্রকাশিত শ্রী প্রতাপ নারায়ণ রচিত দুটি প্রবন্ধ।

২। ফার্টলাইজার স্ট্যাটিস্টিক্স ১৯৮৩-৮৪।

৩। সার শিল্পের উপর পার্লামেন্টারী ডাইজেষ্ট : ১৯৮৫ সালের অষ্টম, একাদশ ও দ্বাদশ সংখ্যা।

১৯৮৪-৮৫ সালে বোরো মরফুমে আই-আর ৫০, আই-আর ৩৬ ও জয়া ধানের তুলনা মূলক চাষ

সঞ্জীব কাজি

জল নিকাশী ব্যবস্থা ভাল না থাকায় আমাদের গ্রামে আমন খন্দে ধান প্রায়ই মার খায়। ভাল ফসল হলেও বিঘাপ্রতি ফলন ৬ মণের বেশী হয় না। এজন্য বোরো ধানই আমাদের ভরসা। মাত্র ৫ বিঘা ৫ কাঠা আমাদের চাষের জমি। বেশী ফলন হয় বলে আমরা জয়া ধানেরই চাষ করে করে থাকি। গত ২৩ বছর যাবৎ বাদামী শোষক পোকাকার আক্রমণ আমাদের এখানে আরম্ভ হয়েছে। বড় ক্ষতিকর পোকা। আক্রমণ হলে ধান খড় সবই নষ্ট হয়। আবার আক্রমণ হয় খোড় আসার পরে ব্লক ঠাকুরপুকুর-মেটিয়াবুরুজ, জেলা, দক্ষিণ ২৪ পরগণা

যখন ধান ফলতে থাকে। শত চেষ্টা করেও তখন পুরো ফসল বাঁচানো যায় না।

আমাদের এখানে বোরো ধানের চাষ করতে শেখান এস, ই, ডি, পি নামে সংস্থার কৃষি বিশেষজ্ঞ ও উপদেষ্টাগণ। এই সংস্থার উপদেষ্টা শ্রীচিন্তা রঞ্জন ব্যানার্জী চাষ বিষয়ে অভিজ্ঞ এবং আমাদের খুবই আস্থাভাজন। তিনি বললেন যে বাদামী শোষক পোকা এখানে বাসা বেঁধেছে এবং প্রতি বছরই এর আক্রমণ হবে। এই অবস্থা থেকে রক্ষা পেতে হলে প্রতিরোধ ক্ষমতা সম্পন্ন ধানের জাতের চাষ অথবা এমন জাতের ধানের চাষ করা যা এই পোকাকার আক্রমণ হওয়ার

আগেই পেকে যাবে বা কাটা সম্ভব হবে। সাধারণতঃ এই অঞ্চলে বাদামী শোষক পোকাকার ব্যাপক আক্রমণ শুরু হয় খোড় আসার পরে। তাই শ্রীব্যানার্জী আই, আর ৩৬ ও আই-আর ৫০ ধানের চাষ করার উপদেশ দেন। তিনি বলেন প্রথমটি অর্থাৎ আই-আর ৩৬ বাদামী শোষক পোকা সমেত বিভিন্ন রকম পোকা ও রোগের আক্রমণ প্রতিরোধে সহনশীল এবং দ্বিতীয়টি অর্থাৎ আই-আর ৫০ বাদামী শোষক পোকা ও ঝলসা রোগ বাদে অল্প সমস্ত রকম রোগ ও পোকাকার আক্রমণ প্রতিরোধে সহনশীল। তবে এটি বাদামী শোষক পোকাকার আক্রমণ হওয়ার আগেই কেটে নেয়া সম্ভব হবে। ঝলসা রোগ সময়মত দমন করতে না পারলে খুবই ক্ষতি করে। হিনোসান ওষুধ ছিটিয়ে এই রোগ প্রতিরোধ করতে হবে।

ছটি ধানই পাকতে কম সময় নেয়, তবে আই, আর ৫০ আই, আর ৩৬-এর চেয়ে কম সময় নেয়। আই, আর ৩৬-এর ফলন ক্ষমতা পলমন, রত্না ধানের মতই তবে জয়ার থেকে সামান্য কম। আই, আর ৫০ ধানের ফলন ক্ষমতা অগ্ন্যন্ত প্রচলিত অধিক ফলনশীল জাতের চেয়ে কম নয়। এবং এটি সরু ধান। অতি অল্প সময়ের মধ্যে এর ফলন ক্ষমতা আশ্চর্যজনক। এত সরলভাবে বাড়ে যে ঘন করে লাগানো যায় এবং বেশী ফলন পেতে হলে ১০ × ১৫ সেঃ মিঃ দূরত্বে লাগাতে হবে। এই ছটি ধান চাষে খরচ

অপেক্ষাকৃত কম। বিশেষ করে কীটনাশক ওষুধ ও সেচের জল কম ব্যবহার করে এই ধান চাষ করা সম্ভব।

যেহেতু বোরো ধানের চাষের উপরেই আমাদের সংসারের নির্ভর তাই বাবা আস্থা রাখতে চাননি যে এত সরু ধান জয়ার মত ফলন দেবে। গ্রামের অগ্ন্যন্ত চাষীরাও বাবার মতেই বিশ্বাসী। উপরোধে ঢেঁকি গেলার মত বাবা ১ বিঘা জমিতে আই, আর ৩৬ এবং ১ বিঘা ৫ কাঠা জমিতে আই, আর ৫০ ধান চাষে সম্মত হন। চাষীর ঘরের ছেলে হয়েও ধান চাষে আমার জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা কম। কাজেই শ্রীযুক্ত ব্যানার্জী মহাশয়ের সাথে যোগাযোগ রেখে বাবার সম্মতি সাপেক্ষে এক আধটুকু ব্যতিক্রম বাদে, তাঁর উপদেশমতই এই ধান ছটির চাষ করি। বীজ সংগ্রহ করি, এন এস সির সার্টিফিকেড জয়া ধানের বীজ সজনা বেড়িয়ার 'মুসীর হাউস' থেকে, বি, কে রায় প্রাইভেট লিঃ এর 'টুথফুলি লেবেলড্' আই-আর ৫০ এস ই ডি পি-র মারফতে এবং আই-আর ৩৬ এক চাষীর কাছ থেকে।

সংক্ষিপ্ত ও তুলনামূলক চাষ পদ্ধতি

বীজ শোধন—জয়া বীজের সাথে পাওয়া কীটনাশক ওষুধ এবং অগ্ন্যন্ত ছটি ধানে প্রতি কেজি বীজধানের জন্য ১৬ গ্রাম করে, এরিটান ৬, ১৬ লিটার জলে গুলে বীজধান তাতে ৮১০ ঘণ্টা ডুবিয়ে রেখে শোধন করে নেওয়া হয়।

বসুন্ধরা : মাঘ, ১৩৯২

বীজতলায় বীজ বোনা, জমিতে চারা রোয়া ও কাটার তারিখ

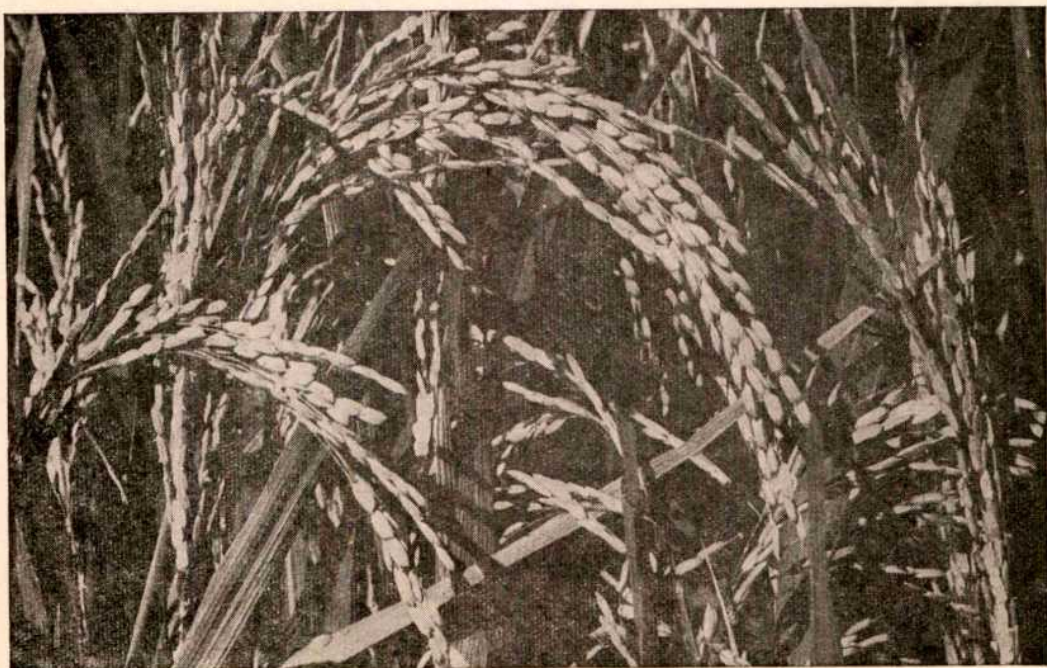
বীজতলায়	জয়া	আই, আর ৩৬	আই, আর ৫০
১। বীজ বোনার তারিখ	২৬-১১-৮৪	২১-১২-৮৪	৯-১২-৮৪
২। জমিতে চারা রোয়ার তারিখ	৩০-১২-৮৪	২০-০১-৮৫	৯-০১-৮৫
৩। ধান কাটার তারিখ	১৯-০৪-৮৫	১৭-০৪-৮৫	১৪-০৪-৮৫
৪। মন্তব্য			

(ক) বীজ পেতে দেরী হওয়ায় আই, আর ৩৬ বুনতে দেরী হয়।

(খ) অগ্নের জমিতে বাদামী শোষক পোকের আক্রমণ হওয়াতে জয়া ধান পাকা অথচ গাছ সবুজ অবস্থায় কাটা হয়।

(গ) আমি বাইরে যাওয়ায় আই-আর ৫০ খড় সম্পূর্ণ শুকনো হওয়ার পরে কাটা হয়।

(ঘ) একই কারণে আই-আর ৩৬-ও কিছু পরে কাটা হয়।



তুলনামূলক সার ও প্রয়োগ, বিঘা প্রতি কেজি হিসাবে

সারের নাম	জয়া ধান			আই-আর ৩৬ ধান			আই-আর ৫০ ধান					
	কাদানোর প্রথম চাপান দ্বিতীয় চাপান মোট			কাদানোর প্রথম চাপান দ্বিতীয় চাপান মোট			কাদানোর প্রথম চাপান দ্বিতীয় চাপান মোট					
	সময়	সার ২১	সার ৫৬	সময়	সার ২১	সার ৪৬	সময়	সার ২১	সার ৪৬			
	দিন পরে	দিন পরে	দিন পরে	দিন পরে	দিন পরে	দিন পরে	দিন পরে	দিন পরে	দিন পরে			
ইউরিয়া	১৩	১৬	১২	৪১	১৪	১৫	৮	৩৭	১৩	১০	৬	২২
সুপার												
ফসফেট	৪০	—	—	৪০	৩৭	—	—	৩৭	৩৭	—	—	৩৭
পটাশ	১০	—	৫	১৫	৬	—	৬	১২	৫	—	৫	১০

মন্তব্য—(ক) ৮৯ বছর যাবৎ চাষ হয় বলে ফসফেট কিছু কম দেয়া হয়।

(খ) এখানে মাটিতে পটাশ বেশ আছে। কিন্তু চাপান সার হিসাবে গুণ পাওয়া যায়।

হেইলর প্রতি উদ্ভিদ খাত প্রয়োগের পরিমাণ কেজি হিসাবে

ধানবীজের নাম	নাইট্রোজেন	ফসফেট	পটাশ
জয়া	১৪০	৪৮	৬৭.৫
আই-আর ৩৬	১২৬	৪৪	৫৪
আই-আর ৫০	৯৯	৪৪	৪৫

বসুন্ধরা : মাঘ, ১৩৯২

বসুন্ধরা : মাঘ, ১৩৯২

কীটনাশক ও রোগ দমন ওষুধের ব্যবহার (বিঘা প্রতি হিসাবে)

জয়া ধান :

(ক) রোয়ার ২১ দিন পরে ২৫০০ গ্রাম ফুরাডান দানাদার ওষুধ ছড়ান হয়।

(খ) এর ২০-২১ দিন পরে ১০ দিন অন্তর ৩-৪ বার ডিমেক্রন বা মেটাসিড স্প্রে করি।

(গ) পাশের জমিতে বাদামী শোষক পোকাকার আক্রমণ হওয়ায় শিষ বার হওয়ার সময় থেকে জমিতে ২-৩ দিন পরে পরে ২ বার ৫ কেজি হিসাবে ১০% গ্যামাকসিন ছড়াই ও ধান পাকার সাথে সাথে গাছ সবুজ অবস্থায় ধান কেটে নিই।

আই-আর ৩৬ :

প্রথম চাপান সারের পরে ১ বার

তুলনামূলক ফলন

ধান	মোট জমির পরিমাণ	মোট ফলন	হেক্টর প্রতি ফলন
জয়া	৩ বিঘা	৫১ ব্যাগ	৭৬০০ কেজি
আই, আর ৩৬	১ বিঘা	১৬ ব্যাগ	৭২০০ কেজি
আই, আর ৫০	১ বিঘা ৫ কাঠা	২৪৫ ব্যাগ	৮৮২০ কেজি

*এক ব্যাগ = ৬০ কেজি

মন্তব্য :

উল্লেখযোগ্য বিষয় হ'ল ধান কাটার আগে মনে হয়েছে জয়ার ফলন সবচেয়ে বেশী হবে এবং তারপরে আই আর-৩৬। সবচেয়ে কম ফলন হবে আই, আর-৫০-এর। চমক পেলাম ধান ঝেড়ে ওজন করার পরে।

মেটাসিড স্প্রে করি। দ্বিতীয় চাপান সারের পর ১ বার ডিমেক্রন ও তার ১০ দিন পরে একবার ডায়থেন এম-৪৫ স্প্রে করি। গান্ধিপোকা দেখা যাওয়াতে একবার বিঘা-প্রতি ৫ কেজি হিসাবে ১০% গ্যামাকসিন স্প্রে করি।

আই-আর ৫০ :

আই, আর ৩৬ ধানের মতই কীটনাশক ওষুধ ডিমেক্রন ও মেটাসিড ব্যবহার করি। ধানগাছের পেটে সামান্য খোড় আসার সাথে সাথে যাতে ঝলসা রোগে ক্ষতি করতে না পারে তার জন্য একবার হিনোসান স্প্রে করি।

তবে আমাদের চাষের কোন ধানেই বিশেষ রোগ বা পোকাকার আক্রমণ হয় নি।

আই-আর ৫০-এ বিশেষ কোনও চিটা ছিল না।

আমরা খেয়ে দেখেছি আই, আর ৫০-এর ভাত খুব ভাল এবং এর মুড়িও ভাল হয়। আগামী বছরে আই, আর ৫০-এর চাষ সবচেয়ে বেশী করবেন বলে আমার বাবা ঠিক করেছেন।

আমের শত্রু শোষক পোকা

ডঃ পুণ্যব্রত চট্টোপাধ্যায়

চুঁচুড়া শহরের পশ্চিম দিক দিয়ে যে রাস্তা দিল্লী রোড অতিক্রম করে চলে গেছে তা চুঁচুড়া-ধনেখালী রোড নামে পরিচিত। চুঁচুড়া রেল স্টেশন ছাড়িয়ে কিছুদূর এই রাস্তা ধরে এগুলোই পাওয়া যাবে সুগন্ধা, গোটু, পোলবা-দাদপুর প্রভৃতি গ্রাম।

পৌষ মাসের এক শীতের সকালে হাজির হয়েছিলাম সুগন্ধা গ্রামে। এখানকার চাষীদের উন্নত পদ্ধতির চাষবাসের কথা আগে থেকেই শুনেছিলাম। মূলতঃ চাষ দেখা ও তথ্য সংগ্রহের উদ্দেশ্য নিয়েই উপস্থিত হয়েছিলাম গ্রামে। আলাপ হল সুধাংশুশেখর হালদার মশায়ের সংগে। তিনি কয়েক বিঘা জমিতে ধান, শাক—সবজি চাষ করে থাকেন। চাষবাসের সমস্তার কথা উঠতে তিনি বললেন যে, বেগুনের ডগা ও ফল ছিদ্রকারী মাজরা পোকা এবং আমের শোষক পোকা নিয়ে এখানকার চাষীরা বিব্রত। সম্প্রতি সিন্থেটিক পাইরিথ্রয়েড শ্রেণীর কয়েকটি কীটনাশক ব্যবহার করে

কীটতত্ত্ববিদ, ধাতু গবেষণা কেন্দ্র, চুঁচুড়া।

ভাল ফল পাওয়া যাচ্ছে কিন্তু এ জাতীয় কীটনাশকের চড়া দামের জন্তু অনেক চাষী এগুলি ব্যবহার করতে পারছেন না। গত বছরের তেসরা ডিসেম্বর ভূপালের একটি বহুজাতিক কোম্পানীর কারখানায় মারাত্মক ধরনের দুর্ঘটনা ঘটে। সেই সংস্থার দ্বারা প্রস্তুত 'সেভিন' নামে একটি নিরাপদ কীটনাশক এই মর্মান্তিক ঘটনার পরেও কিছুদিনের জন্তু বাজারে পাওয়া যাচ্ছিল কিন্তু বর্তমানে আর পাওয়া যাচ্ছে না অথচ এই নিরাপদ কীটনাশকটি বেগুন চাষে ও আমের শোষক পোকা দমনে খুবই কার্যকরী ছিল।

ইতিমধ্যে আরও কিছু চাষী আলোচনা-স্থলে সমবেত হয়েছেন। আমি প্রশ্ন করলাম—এখানে কি কি জাতের আম চাষ হয়ে থাকে এবং শোষক পোকাই বা কখন সর্বাধিক সংখ্যায় পাওয়া যায়?

সুধাংশুবাবু বললেন—এখানে আম-বাগানের কয়েকটি প্রধান জাত হল 'সোঁরী খাস', 'বিশ্বনাথ চাটুঘো', 'হিমসাগর' ও 'লাল ফুলী'। এগুলির মধ্যে সবচেয়ে জলদি জাত

বসুন্ধরা : মাঘ, ১৩৯২

হল 'সোরী খাস'। মাঘ মাসের প্রথম দিকেই এর মুকুল দেখা যায়। অগ্ন্যাত্ম আমের জাতে মুকুল কিছুদিন পরে আসে। আমের শোষক পোকা কিন্তু বছরের প্রায় বার মাসেই আম বাগানে দেখা যায়, তবে মাঘ মাস থেকে জ্যৈষ্ঠ মাস পর্যন্ত এদের সংখ্যা সর্বাধিক হয়ে থাকে। এ সময় আম গাছের তলা দিয়ে হেঁটে গেলে অথবা কোন ডাল নাড়া দিলে শোষক পোকাদের ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ে অথবা লাফিয়ে অগ্ন্যাত্ম ডালে বা পাতায় বসতে দেখা যায়।

কথার জের টেনে আমি বলি—আপনারা বোধহয় জানেন না যে এই শোষক পোকার দেহ নিঃসৃত একরকম মিষ্টি নির্ধাস বা মধু বিন্দু যাকে ইংরাজীতে হানি ডিউ (Honey dew) বলে তা আম গাছের পক্ষে খুব ক্ষতিকর কারণ মধুবিন্দু শুধু যে ফুলের পরাগ সংযোগ ব্যাহত করে তাই নয় অনেক সময় অধিক পরিমাণে নিঃসৃত এই চট্‌চটে রসের উপর ভূষা ছত্রাক বা Sooty mould জন্মায়, ফলে গাছের সালোক সংশ্লেষ ব্যাহত হয়। সালোক সংশ্লেষ ব্যাহত হওয়ায় পরের বছর মুকুলও কম আসে।

চাষীদের কাছ থেকে প্রশ্ন আসে—আম বাগানে ছ'রকমের শোষক পোকা পাওয়া যায়; ডানায়ুক্ত পূর্ণাঙ্গ কীট এবং ডানাবিহীন কিছুটা হলদেটে রঙের বাচ্চা বা অপূর্ণাঙ্গ কীট। কারা বেশী ক্ষতি করে থাকে?

উত্তরে বলি—ছ' জনেই ক্ষতি করে থাকে, তবে বাচ্চার মুকুলের ফুলের বেশী ক্ষতি

করে থাকে। রস চুষে খাবার ফলে ফুলগুলি শুকিয়ে গিয়ে অবশেষে ঝরে পড়ে।

এবারে আমি প্রশ্ন করি—আপনারা কি কীটনাশক দিয়ে থাকেন?

উপস্থিত চাষীদের মধ্যে একজন শ্রীদিলীপ মুখার্জী বললেন—আমি কিলেল কার্বারিল তারকেশ্বর থেকে কিনে এনেছি। এই কীটনাশকটি কেরোসিন টিনে ষোল লিটার জল ভর্তি করে পঞ্চাশ গ্রাম হারে গুলে পা দিয়ে চালানো স্প্রেয়ার দিয়ে গাছে ছিটাব। আমরা সাধারণতঃ ছ'বার আম গাছে পা দিয়ে পাম্প দেওয়া স্প্রেয়ারের সাহায্যে ওষুধ ছিটিয়ে থাকি। প্রথম স্প্রে দিই মুকুল আসাকালীন এবং দ্বিতীয়বার আমের গুটি ধরার পরে। অনেকে তিনবার স্প্রে করে থাকেন, বিশেষ করে কুয়াশা হলে। এ ছাড়া অনেকে ৩৫ শতাংশ শক্তিশালী এণ্ডোসালফান ব্যবহার করে থাকে। এর মাত্রা হল ১৬ লিটার জলে ৩০ মিলিলিটার। অনেকে আবার সাইথিয়ন ৫০ শতাংশ ইসি ঐ একই মাত্রায় ব্যবহার করে থাকেন। এ ছাড়া আছে ডাইমিথোয়েট যেমন রোগার বা তারা ৯০৯ যা ৩৫ শতাংশ ই-সি হিসাবে পাওয়া যায়। এই কীটনাশকটিকেও অনেকে প্রতি ১৬ লিটার জলে ৩০ মিলিলিটার হারে জলে ব্যবহার করে থাকেন। বাগানের মুকুল বা গুটি ধরা দেখে বাগানের দর ওঠে; তাই বর্তমানে অনেকেই সাধ্যমত স্প্রে করার ব্যবস্থা করেন। অবশ্য এই সুগন্ধা অঞ্চলে আমরা নিজেরাই আম বিক্রীর ব্যবস্থা করি।

বাগান থেকেই সব আম বিক্রী হয়ে যায়।

আমি শেষ প্রশ্ন করি সুধাংশুবাবুকে—
আপনারা কি এই স্ট্রেস করার ফলে কতটা লাভ হয় তার হিসাব রাখেন?

লাভের হিসাব পাই ওর কাছ থেকে।
এক বিঘা বাগানে মোটামুটি ১০টি আম গাছ থাকে এবং প্রতিটি গাছে স্ট্রেস করতে ২০ লিটার করে অর্থাৎ ছবার স্ট্রেস করতে ৪০ লিটার জল লাগে এবং এতে মোটামুটি খরচ হয় ২০ টাকার মত। অর্থাৎ ১০টি গাছে ছবার স্ট্রেস করতে ব্যয় হয় মোট ২০০ টাকার মত। একটি গাছে সাধারণতঃ ২০০০ আম বা ৬ কুইন্টাল আম ধরে অর্থাৎ ১০টি গাছ থেকে কুড়ি হাজার বা ৬০ কুইন্টাল আম পাওয়া যায়। আমের পাইকারি বিক্রয়মূল্য ১০০ টাকা কুইন্টাল ধরলেও ৬০ কুইন্টালের মোট মূল্য দাঁড়াবে ছ হাজার টাকা, অর্থাৎ মোট ২০০ টাকা খরচ করে ৬০০০ টাকার মত পাওয়া যেতে পারে। আমের শোষক পোকার জন্ম ৬০ শতাংশ ফলন কমে যেতে

পারে। অর্থাৎ যারা আম গাছে ওষুধ দেন না তাঁরা ৬০০০ টাকার বদলে ৩৬০০ টাকা পাবেন। তাই বর্তমানে ২০০ টাকা খরচ করে লভ্যাংশ নিশ্চিত করার ব্যাপারে বেশীর ভাগ বাগিচার মালিকই উদ্বোধী হয়েছেন।

আমি সবাইকে নমস্কার জানিয়ে চলে আসার আগে শ্রীকাশীনাথ ঘোষ প্রশ্ন করেন—আচ্ছা, আমরা প্রায়ই দেখতে পাই যে বাগানে শোষক পোকা নেই, অথচ আমের গুটি বড় হয়ে ঝরে পড়ে। এর কি কোন প্রতিকার নেই?

উত্তরে বলি—আম বেশী ধরলে স্বাভাবিক কারণেই কিছু ঝরে পড়বে। আপনারা নিশ্চয়ই বাগানে অন্তত ছবার সার দিয়ে থাকেন, তাই না? যদি ঠিক মত সার, জলসেচ ও অগ্ন্যান্ত পরিচর্যা করা সত্ত্বেও গুটি বড় হয়ে ঝরে পড়ে তবে প্ল্যানোফিস্প বা সেলমোন নামে উদ্ভিদ হরমোন জলে মিশিয়ে গাছে স্ট্রেস করতে পারেন। এর মাত্রা হল প্রতি ১৬ লিটার জলে ৭ মিলিলিটার উদ্ভিদ হরমোন।



রোগ ও পোকাকার আক্রমণ থেকে বোরো ধান রক্ষা করুন

ধান রোয়ার পর ভাল ফলনের জন্ত যত্ন ও তদারকির প্রয়োজন। রোগ ও পোকাকার আক্রমণে অনেক সময় ফসলের যথেষ্ট ক্ষতি হয়। সেজন্য ক্ষেত ঘুরে দেখা ও কোথাও রোগ বা পোকাকার আক্রমণ হয়েছে দেখলে তা দমনের ব্যবস্থা নেওয়া দরকার। রোগ বা পোকাকার দমনের জন্ত কি করা দরকার সে সম্বন্ধে এখানে আলোচনা করা হলো।

রোগ

ঝলসা রোগ (ব্রাউ) : এই রোগ দমনের জন্ত ৩০০ লিটার জলে ৩০০ মিলিলিটার হিনোসান মিশিয়ে প্রতি একরে স্প্রে করুন। হিনোসানের অভাবে ৩০০ মিলিলিটার কিটাজিন বা ৯০০ মিলিলিটার কুমান-এল স্প্রে করুন।

প্রয়োজন হলে তবে রোগ দমনের ওষুধ

ব্যবহার করবেন। এজন্য নিয়মিত মাঠে গিয়ে ফসলের উপর লক্ষ্য রাখতে হবে এবং রোগের আক্রমণ দেখলে ওষুধ দিন।

পোকা

মাজরা পোকা বোরো ধানের প্রধান শত্রু। সাধারণতঃ মাঘের শেষ থেকে এদের আক্রমণ শুরু হয়। তাই নিয়মিতভাবে সপ্তাহে অন্তত দু'বার আপনার ক্ষেত দেখুন। গোছে মাজরা পোকাকার মথ (প্রজাপতি) বা ডিমের গাদা দেখলে বুঝবেন যে ক্ষেতে ঐ পোকাকার আক্রমণ শুরু হয়েছে।

সাধারণতঃ শতকরা পাঁচটি বা তার বেশী পাশকাঠি মাজরা পোকায় আক্রান্ত দেখলে অথবা প্রতি ৫০টি গোছে একটি মাজরা পোকাকার মথ বা ডিমের গাদা দেখা গেলে কীটনাশক ওষুধ দিন। এজন্য এখানে নির্দেশিত তালিকায় দেওয়া যে কোন একটি ওষুধ ব্যবহার করুন।

বসুন্ধরা : মাঘ, ১৩৯২

দানাদার ওষুধের নাম	একর প্রতি ওষুধের পরিমাণ (কেজি)
ফোরেট-১০%	
(থাইমেট-১০ জি)	৪
কার্বোফুরান-৩%	
(ফুরাডান-৩ জি)	১২

দানাদার ওষুধ ছড়ানোর পর থেকে ৫-৭ দিন পর্যন্ত ক্ষেতে ছিপছিপে জল রাখবেন ও মাটি ঘাঁটবেন না। দানাদার ওষুধ কিছু শুকনো মাটির সঙ্গে মিশিয়ে নিলে ভালভাবে ছড়ানো যায়। ধানে খোড় আসার পরে আর দানাদার ওষুধ ব্যবহার করবেন না। এর পরে, দরকার হলে তরল ওষুধ ব্যবহার করবেন।

তরল ওষুধের নাম	প্রতি লিটার জলে ওষুধের পরিমাণ (মিলিলিটার)	প্রতি একরের জন্য ৩০০ লিটার জলে ওষুধের পরিমাণ (মিলিলিটার)
		ওষুধের পরিমাণ (মিলিলিটার)
ফসফোমিডান ৮৫%	২	১৫০
মিথাইল প্যারাথায়ন ৫০%	১	৩০০
ফেনথায়ন ৫০%	১	৩০০
কুইনালফস ২৫%	১২	৪৫০
এণ্ডোসালফান ৩৫%	১২	৪৫০
বি-এইচ-সি ৫০% (জলে গোলা)	৫ গ্রাম	১২ কেজি

প্রতি একর জমিতে হাতে চালানো স্প্রেয়ারে ভালভাবে ওষুধ স্প্রে করার জন্য সাধারণতঃ ৩০০ লিটার ওষুধ গোলা জল লাগে। তবে গাছের বাড় অনুযায়ী কম বা বেশি লাগতে পারে। দরকার হলে ১০ থেকে ১৫ দিন বাদে আবার ঐ পরিমাণ তরল ওষুধ স্প্রে করুন। অত্যাঁচ পোকাকার উপদ্রব হলে উপরে বলা যে কোন একটি ওষুধ (তরল) স্প্রে করুন।

আজকাল বোরো ধানে বাদামী শোষক পোকাকার আক্রমণ দেখা যাচ্ছে। এই শোষক

পোকা গাছের গোড়ার দিকে থাকে। কাজেই পোকা দেখার জন্য গাছের গোড়ার দিকে নজর রাখুন এবং পাতার উপর ওষুধ না ছিটিয়ে গাছের গোড়ার দিকে ভালভাবে স্প্রে করুন। বোরো ধানে ফুল আসার সময় থেকে সাধারণতঃ বাদামী শোষক পোকাকার আক্রমণ দেখা যায়, তাই সে সময়ে নিয়মিত ক্ষেত ঘুরে দেখুন এবং আক্রমণ হলে গুছিতে ৬টি পোকা দেখলে উপযুক্ত ব্যবস্থা নিন। ফুল আসা ক্ষেতে বিকালের দিকে ওষুধ স্প্রে করুন।

বসুন্ধরা : মাঘ, ১৩৯২

নীচের যে কোন একটি ওষুধ দিন

ওষুধের নাম	প্রতি লিটার জলে ওষুধের পরিমাণ (মিলিলিটার/গ্রাম)	একর প্রতি ৩০০ লিটার জলে ওষুধের পরিমাণ (মিলিলিটার/গ্রাম)
মনোক্রোটোফস্ ৪০%	১ মিলি	৩০০ মিলি
ম্যালাথিয়ন ৫০%	২ ”	৬০০ ”
ডাইক্লোরভস ৭৬%	১ ”	৩০০ ”
ক্লোরোপাইরিফস্ ২০%	২ ”	৬০০ ”
বি-এইচ-সি ৫০%		
(জলে গোলা)	৫ গ্রাম	১৫০০ গ্রাম
কার্বারিল ৫০%	২ ই ”	৭৫০ ”
বি-এইচ-সি ১০% গুঁড়ো	একরে	১২ কেজি
মিথাইল প্যারাথিয়ন ২%	”	১০ ”
কার্বারিল ৫%	”	১০ ”
কুইনালফস্ ১.৫%	”	১০ ”

গন্ধী পোকা, লেদা বা শীষ কাটা লেদা পোকাকার আক্রমণ হলে ১০ শতাংশ বি-এইচ-সি গুঁড়ো একর প্রতি ১২ কেজি হিসাবে ক্ষেতে ও আলে বিকালের দিকে ভালভাবে ছড়াবেন।

ফসল তোলা

শীষ বেরুনোর একমাসের মধ্যেই দানা পুষ্ট হয়ে কাটার উপযুক্ত হয়। ধান পেকে গেলেই কেটে সঙ্গে সঙ্গে ঝাড়াই-মাড়াই করে পরে খড় ও ধান আলাদা করে ভালভাবে শুকিয়ে নিন।

দেঁরি করে কাটলে এবং কাটার পর সঙ্গে সঙ্গে ঝাড়াই-মাড়াই না করে মাঠে ফেলে রাখলে দানা ঝরে নষ্ট হতে পারে। তাছাড়া ইঁদুরে, পোকা-মাকড়ের দ্বারা এবং বাড়-বৃষ্টিতে ক্ষতি হতে পারে। এছাড়া দেঁরি করে কাটলে ধান থেকে চাল করার সময় বেশি খুদ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। ঠিক সময়ে ধান কেটে ক্ষতির সম্ভাবনা থেকে ফসল বাঁচান।

ফলন

উন্নত প্রথায় চাষ করলে একর প্রতি ২০—২৫ কুইন্টাল ধান পাওয়া যায়।

সূর্যমুখী নয়! ফসল

দীনেন্দু শেখর পাল

“ফুলের সখ তেলের স্বাদ
ছুই মিটাবে সূর্যমুখীর চাষ ॥”

বহরমপুর কিষণ মেলা আয়োজিত লোক মেলার কৃষি স্টলে একটি পোস্টারে লেখা। লেখাটি দেখেছেন অনেকক্ষণ ধরে একজন লোক। পরনে হাঁটুর নীচ অবধি ধুতি, গায়ে হাফসার্ট, পায়ে হাওয়াই চপ্পল—লাল ধূলায় ভর্তি, গায়ের রং মিশমিশে কালো—বুঝলাম রাত অঞ্চলের কোন চাষী। অনেকক্ষণ ধরে লেখাটি দেখেছেন। আর সামনে রাখা শিশি-বোতল দেখেছেন। আমিও ঐ সময় স্টলে ছিলাম। আস্তে আস্তে পাশে গিয়ে দাঁড়ালাম। সময়টা পৌষ-মাঘ হবে, বিকাল তিনটে নাগাদ। বেশ কনকনে হাওয়া ও শীত, তবে রৌদ্র ঝলমল দিন। আমিও তার মত দৃষ্টি দিলাম পোস্টারের দিকে। মনে হয় লোকটি কিছুর সন্ধান পেয়েছে। জিজ্ঞাসা করলাম কি দেখেছেন? বয়স আন্দাজ ৪৫ ছুই ছুই, বেশ দোহারা চেহারা। চটপট উত্তর দিল ‘আমারও ফুলের সখ আছে এবং তেলেরও প্রয়োজন আছে। তাই দেখছি নূতন ফসল’। ঠিকই তো সূর্যমুখীর চাষে ফুলের সখও মেটায়

জেলা কৃষি তথ্য আধিকারিক, মুর্শিদাবাদ

ও প্রয়োজনীয় তেলও পাওয়া যায়। লোকটি পকেট থেকে ডই কলম বের করে খুব ধীরে ধীরে বড় বড় হরফে লিখেছে—

- (১) সূর্যমুখী সারা বছর লাগানো যায়।
- (২) অল্প জমি বাদে সব জমিতে লাগানো চলে।
- (৩) ইহাতে প্রচুর পরিমাণে তেল পাওয়া যায়। তেলে কোলেস্টেরল-এর ভাগ কম।
- (৪) খুব কম সময়ে ফলন তোলা যায়। ৯৫—১২৫ দিনের ফসল।
- (৫) সব জমিতে যথা—মার্জিন বা সাব-মার্জিন জমিতেও লাগানো যাবে।
- (৬) তেলের গুণ ভাল।
- (৭) তেল খাওয়া ছাড়াও শিল্প ও ওষুধ কারখানায় ব্যবহৃত হয়।
- (৮) আমন চাষের পর সেচ বা অসেচ এলাকায় বোনা চলে।

লেখার সময় আমারও নজর লোকটির উপর পড়ল কারণ তিনি খুব মনোযোগ দিয়ে কথাগুলি লিখেছেন।

এবার প্রশ্ন করি কি হ’বে এসব নোট বইতে টুকে। সঙ্গে সঙ্গে উত্তর ‘কেন চাষ করবো। নতুন ফসল চাষ করতে আমি

বসুন্ধরা : মাঘ, ১৩৯২

উংসাহী'। আমার মনে হ'ল উন্নতিশীল চাষী। এবার পরিচয়ের পালা, আমার পরিচয় দিয়ে তাকে আরো কাছে আনবার চেষ্টা করলাম। এবার নিজের পরিচয় দিল। নাম হরিপদ বিশ্বাস, বাড়ী কান্দী মহকুমায় ভরতপুর ব্লকের ভরতপুর গ্রামে। পেশা চাষাবাস। ক্ষুদ্র চাষী, মোট জমির পরিমাণ ১৪ বিঘা। বেশীটাই আমনের চাষ। বাড়ীর সংলগ্ন জমিতে আলু, শাক-সবজি ও গমের চাষ। ইদানীং কিছু সরষের চাষও করেছেন। আর সব জমি রবি মরশুমে পড়ে থাকে, সেচের সুবিধা নাই বললেই চলে, একলগ্নে সব চেয়ে বড় জমি চার বিঘা। শ্রীবিশ্বাসের ছ' ছেলে ও এক মেয়ে ছাড়া সংসারে স্ত্রী ও বৃদ্ধা মা। বড় ছেলে এবার মাধ্যমিক দেবে এবং ছোট ছেলে ও মেয়ে যথাক্রমে সেভেন ও সিক্স এ পড়ে। স্বচ্ছল পরিবার না হলেও অভাব অনটনে দিন চলে যায়। ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ নিয়ে চাষাবাস করেন আবার সময় মত শোধও করেন।

এবার আসল কথায় আসা যাক। বিশ্বাস মহাশয়কে প্রশ্ন করি কেন সূর্যমুখীর চাষ করবেন? সঙ্গে সঙ্গে উত্তর আমারও ফুলের সখ আবার তেল পাওয়া যাবে এবং অসময়ে বিনা সেচে চাষ করা যায়। আমারও আগ্রহ বেড়ে গেল। সূর্যমুখীর চাষের খুঁটিনাটি বুঝিয়ে দিলাম, নূতন চাষ। সঙ্গে একটি সূর্যমুখী চাষের প্রচার পত্রও দিলাম। বিশ্বাস মহাশয় স্টল থেকে বের হওয়ার সময় এক বোতল সূর্যমুখীর তেল ও এক প্যাকেট বীজ নিতে ভুললেন না। আরও বুঝিয়ে দিলাম

ভরতপুর কৃষি খামারে সূর্যমুখীর চাষ হয়। প্রয়োজনে ফার্মের সাহায্য আপনি পাবেন। সুখের কথা তার চার বিঘা জমি কৃষি সম্প্রসারণ আধিকারিক করণের সামনে—থুব কাছে।

বেশ কিছু দিন পরের কথা। আমিও ভুলে গেছি অসংখ্য চাষীর মত হরিপদ বাবুর কথা। এপ্রিল মাসের প্রথম দিকে ভরতপুর ব্লকের কৃষি সম্প্রসারণ আধিকারিক শ্রী ভট্টাচার্য মহাশয় একদিন অফিসে বললেন স্থার অমুক দিন শ্রী বিশ্বাসের জমিতে কৃষক দিবস, আপনাকে যেতে হ'বে। কি জন্ত কৃষক দিবস? 'নতুন ফসল নূতন জোয়ার—সূর্য-মুখীর চাষ' হেঁয়ালী ছন্দে ভট্টাচার্য্যর উত্তর শুনে প্রায় চার মাস আগে ফেলে আসা কোন এক ছপুরের কথা মনে করিয়ে দিল। প্রশ্ন করি 'কেন বিশ্বাস'? কেন আপনি কি ভুলে গেলেন শ্রীহরিপদ বিশ্বাসের কথা? আপনারই পরামর্শে চার বিঘা সূর্যমুখীর চাষ করেছেন এবং তা সবার দৃষ্টি কেড়ে নিয়েছে। আপনাকে যেতে হবে এ অনুরোধ বিশ্বাস মহাশয়েরও। ফেলতে পারিনি সে অনুরোধ আর কৃষক দিবসে যাওয়া ত আমার কাজ।

তারিখটা মনে নেই। ঠিক ছপু হুঁটোর আগেই পৌঁছে গেলাম কৃষি সম্প্রসারণ আধিকারিকের করণে। সামনে ম্যারাপ বাঁধা। মাইকের স্বর 'এসো মা লক্ষী বসো মা লক্ষী'। ওখানেই আজকের কৃষক দিবস।

মণ্ডপে যেতে বেঁটে খাটো সেই লোকটি সহাস্ত্রে হাত জোর করে নমস্কার জানিয়ে

প্রশ্ন করলো “আর চিনতে পারছেন—
আপনার পরামর্শ মত চার বিঘা জমিতেই
সূর্যমুখীর চাষ করেছি”। আবছা আবছা মনে
পড়লো হরিপদবাবুর কথা। কয়েকখানা
ফটোও তুললাম। এবার একান্তে ডেকে
তার সাফল্যের কারণ জানবার চেষ্টা করি।

মেলা থেকে ফিরে এসে বিশ্বাস মহাশয়
ধানের জমিতে জো অবস্থায় ৪ খানা চাষ
দেন এবং মই দিয়ে জমি সমান করে রাখেন।
ঠিক জোতে বিঘে প্রতি ১২ কেজি হারে
সূর্যমুখীর বীজ বোনে। অর্থাৎ সূর্যমুখী
বোনার উপযুক্ত সময় পৌষ-মাঘ, এবং একর
প্রতি বীজ বোনা ৪-৫ কেজি। জাত ছিল ইসি
৬৮৪১৪। মেলা থেকে নেওয়া বীজ ছাড়াও
স্থানীয় কৃষি খামার থেকে বীজ সংগ্রহ করেন
শ্রীবিশ্বাস। ইসি ৬৮৪১৪ জাতটি লম্বায়
১২০—১৪০ সেমি, একটি ফুল হতে সময় নেয়
৯৫—১২৫ দিন। তেলের ভাগ শতকরা
৪০—৪৫। তাছাড়া আর একটি জাত হ’ল
মরডেন। গাছ বেঁটে ৯০—১২০ সেমি, সময়
নেয় ৮০—৯০ দিন। ঝড়ে ক্ষতি করে না।
তেলের ভাগ শতকরা ৪০—৪৩। আগেই
বলা হয়েছে অল্প জমি ছাড়া সব জমিতেই
সূর্যমুখীর চাষ করা যাবে। বিশ্বাসের জমি
অল্পও নয় আবার ক্ষারও নয়।

এবার শ্রীবিশ্বাস জানান চারা প্রচুর
বেরিয়ে ছিল। বোনার ২০ দিন পর একবার
নিড়ানী দিয়ে পাতলা করে দিই। মেলাতে
নেওয়া পরামর্শ অনুযায়ী শ্রীবিশ্বাস দূরত্ব
দিয়েছেন ৪৫×৩০ সেমি। একটু ঘন

হয়েছে। দূরত্ব ইসি ৬৮৪১৪ এর বেলায়
৬০×৩০ সেমি, আর বেঁটে জাতের বেলায়
৪৫×৩০ সেমি। কথায় কথায় জিজ্ঞাসা করি
সার কি দিয়েছেন? আপনারই পরামর্শ
মত বোনার সময় একরে ৬ কেজি নাইট্রোজেন,
৮ কেজি ফসফেট ও ৮ কেজি পটাশ দিয়ে
লাগাই। এর ২০ দিন পর নিড়ানী দিয়ে ও
গাছ পাতলা করে একর প্রতি আরো
৬ কেজি নাইট্রোজেন চাপান দিই। অবশ্য
আপনার পরামর্শ উপেক্ষা করে ৩ কেজি
অতিরিক্ত নাইট্রোজেন আরো একমাস পরে
দিই। সেচ সেবিত চাষে একর প্রতি ২৪
কেজি নাইট্রোজেন, ১৬ কেজি ফসফেট ও ১৬
কেজি পটাশ দেওয়া যেতে পারে।

শ্রীবিশ্বাস অবশ্য নিয়মিত সেচ দিতে
পারেন নি। আর বিনা সেচেও চাষ করেন
নি। চাপান দেওয়ার পর একবার বৃষ্টি হয়ে
যায় তাতেই বিশ্বাসের সুবিধা। যদিও
সূর্যমুখী বিনা সেচের ফসল তবুও সেচ দিলে
ভাল ফলন পাওয়া যায়। লম্বা জাতের
বেলায় তিনটি ও বেঁটে জাতের বেলায় দুটি
সেচই যথেষ্ট। বোনার ২০—২১ দিন পর
প্রথম সেচ এবং এক মাস অন্তর অন্তর বাকী
সেচ।

হ্যাঁ, আমারই পরামর্শ মত শ্রীবিশ্বাস প্রতি
কেজি বীজ বোনার আগে তিন গ্রাম
ডায়াথেন-এম ৪৫ দিয়ে বীজ শোধন করে
নেন এবং উই পোকা দমনের জন্ত বোনার
আগে বিঘা প্রতি ৪ কেজি অলড্রিন ৫০
শতাংশ ব্যবহার করেন। শ্রীবিশ্বাসের

বসুন্ধরা : মাঘ, ১৩৯২

জমিতে আর কোন রোগ পোকা দেখা যায় নি।

সাধারণতঃ সূর্যমুখী চাষে রোগ পোকা কম দেখা যায়। তবে লেদা পোকা বা বিছা পোকাকার আক্রমণ হতে পারে এবং ধসা রোগও ধরতে পারে। পোকা দমনের জন্ত প্রতি লিটার জলে দু' মিলি থায়োডান বা দেড় মিলি একালাক্স মিশিয়ে একর প্রতি ২৫০—৩০০ লিটার জল স্প্রে করতে হবে। ধসা রোগ দমনের জন্ত প্রতি লিটার জলে দু' গ্রাম ডায়াথেন এম ৪৫ বা এক গ্রাম ডাই ফোলাটন মিশিয়ে একর প্রতি ২৫০—৩০০ লিটার স্প্রে করতে হবে। একমাত্র শত্রু টিয়া পাখি। বিশ্বাসের জমিতে টিয়া পাখি দেখা গেলেও খুব ক্ষতি করে নি কারণ বিশ্বাসের জমি রাস্তার পাশে এবং সব সময় বাস, গাড়ী-ঘোড়ার যাতায়াতের শব্দে টিয়া পাখি বসতে পারে নি।

ক্ষেত ঘুরে ঘুরে উপস্থিত চাষীরা দেখছেন আর নানান প্রশ্ন ছুঁড়ে দিচ্ছেন শ্রীবিশ্বাসের দিকে। হাসিমুখে বিশ্বাস যথাযথ উত্তর দিচ্ছেন। এবার আসল কথায় আসা যাক ফলন কেমন হবে। নতুন ফসল। কারো কোন ধারণা নেই। কৃষি খামারের সহকারী ক্ষেত্রপাল মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করি—“কেমন বুঝছেন?” অভিজ্ঞ ক্ষেত্রপাল চটপট উত্তর দেন—বিঘা প্রতি এক কুইন্টাল ত বটে। অর্থাৎ একরে তিন কুইন্টাল। হ্যাঁ, ভাল

ফলনই বলতে হবে। সেচ দিলে একরে ৫—৬ কুইন্টাল আর বিনা সেচে ৩—৪ কুইন্টাল ফলন মন্দ কি?

আমন ধান কাটার পর জমি ফেলে না রেখে ‘জো’ বুঝে সূর্যমুখীর চাষ বেশ লাভজনক, তাছাড়া সূর্যমুখী তেল খাওয়া যায়। ডাক্তার সেনের কথা সূর্যমুখী তেলে রক্তের কোলেস্ট্রল কমিয়ে আনে অর্থাৎ হার্টের অসুখে যারা ভুগছেন তাদের পক্ষে খুব ভাল আর যাদের হার্টের অসুখ নেই তাদের পক্ষেও ভাল ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে।

মুর্শিদাবাদ জেলায় সূর্যমুখীর চাষ প্রসারের ভাল সম্ভাবনা আছে। এ জেলার জলবায়ু ও মাটি চাষের উপযোগী। ৫-৬ বছর আগেও চাষ ভালই হ'ত কিন্তু বাজার না পাওয়ায় চাষ দিন দিন কমে যায়। উপযুক্ত দাম পেলে এ জেলার মানচিত্রে সূর্যমুখী স্থান করে নেবে। রবি মরশুম ছাড়া খরিফ মরশুমেও উচু জমিতে এর চাষ করা যায়। এরকম জমির অভাব নেই এজেলায়। উপযুক্ত প্রচার ও বিক্রীর ব্যবস্থা করতে পারলে সম্ভবনাময় একটা দিক খুলে যাবে। পশ্চিমবঙ্গে ঘাটতি তেলের খানিকটা সুরাহা হতে পারে। আরো সুবিধা এ জেলার বহরমপুর শহরে পূর্ণাঙ্গল তৈলবীজ ও ডালশস্য গবেষণাগারটি স্থাপিত। তারও সুযোগ সুবিধা এ জেলার চাষীরা পেতে পারে।

বারসীমের বীজ

উৎপাদন পদ্ধতি

সবুজ শাক-সবজি মানুষের স্বাস্থ্যের জন্ত যেমন প্রয়োজনীয় তেমনি গরু মহিষের পক্ষেও সবুজ ঘাস জাতীয় খাদ্যের একান্ত দরকার। এতে গরু মহিষের ছুধের পরিমাণ বাড়ে ও গরু মহিষের স্বাস্থ্যও ভাল থাকে। তাই সবুজ খাদ্য হিসাবে বারসীম ও অন্যান্য সবুজ গোখাণ্ডের চাষ বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। বারসীমে সবুজপাতার বৃদ্ধি খুব বেশী হয়। গরুকে খাওয়ানোর জন্ত খুবই ভাল। শীতকালের পক্ষে এটি একটি প্রয়োজনীয় গোখাণ্ড। এর চাষ বাড়াতে পারলে গোখাণ্ডের অভাব অনেকটা মেটানো যায়। কিন্তু অনেক সময় বারসীমের ভাল বীজ সময় মত কৃষকরা সংগ্রহ করতে পারেন না। সেজন্ত হয় চাষ করেন না অথবা নিম্নমানের বীজ ব্যবহার করেন, তাও বেশী দাম দিয়ে কিনে। তাতে ভাল গাছও হয় না। উন্নত জাতের বীজ কৃষকরা যাতে পেতে পারেন সেজন্ত তাঁরা

নিজেরাই এর বীজ উৎপাদন করে নিতে পারেন। এখানে বীজ উৎপাদন পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করা হলো।

জমি

এমন জমি বারসীমের বীজ উৎপাদনের জন্ত নির্বাচন করা উচিত যেখানে অন্ততঃ দু বছর বারসীমের চাষ হয় নি এবং যদি হয়েও থাকে লক্ষ্য রাখতে হবে জাত যেন ভিন্ন না হয় এবং বীজ শংসিত হয়। জমিটি আগাছামুক্ত হবে এবং কোন কম্পোস্ট যেন ব্যবহার করা না হয়। জমিটিতে জল নিষ্কাশনের ভাল বন্দোবস্ত থাকবে। উর্বর দোআঁশ জমি বারসীমের বীজ উৎপাদনের পক্ষে ভাল। তবে বারসীম কিছুটা নোনা সহ্য করতে পারে।

বীজের জন্ত যে চাষ করা হবে তা যেন খুব সময়ে আলাদা ভাবে করা হয় যাতে

বসুন্ধরা : মাঘ, ১৩৯২

এক জাতের বীজের সঙ্গে অন্য জাতের বীজের কোন সংমিশ্রণ হতে না পারে। সেজন্য বিভিন্ন জাত থেকে যথেষ্ট দূরত্ব রেখে চাষ করতে হবে।

চাষ পদ্ধতি

জমি তৈরি : বীজ বোনার আগে জমিটি ভাল করে লাঙ্গল দিয়ে তৈরি করতে হবে। জমিটি যেন সমান ভাবে তৈরি করা হয় যাতে বীজ বোনার পর চারা সমানভাবে বার হতে পারে এবং চারার বাড়ও সমানভাবে হতে পারে।

বোনার সময়

বারসীম আশ্বিন মাসে বোনার উপযুক্ত সময়।

বীজ

উন্নত মানের উৎকৃষ্ট শংসিত বীজ অনুমোদিত বীজসংস্থা থেকে সংগ্রহ করতে হবে। বারসীমের বেশ কয়েকটি উন্নত জাত আছে যা বিভিন্ন অঞ্চলে চাষের উপযুক্ত। বর্ধন জাতটি সারা দেশেই চাষ করা যেতে পারে।

বারসীম প্রথম চাষ করতে হলে বীজ অবশ্যই রাইজোবিয়াম কালচার মাখিয়ে নিতে হবে। কিভাবে রাইজোবিয়াম কালচার ব্যবহার করতে হবে তা প্যাকেটের গায়ে লেখা থাকে।

বীজের হার

হেক্টর প্রতি ২০ থেকে ২৫ কেজি বীজ লাগবে। বীজ বোনার আগে জমিটি

একবার সেচ দিয়ে নিতে হবে এবং জমিতে দাঁড়ানো জলে বীজ ছিটিয়ে বুনতে হবে। বোনার আগে লক্ষ্য রাখতে হবে যেন আবহাওয়া শান্ত থাকে, যাতে বীজ ছড়ানোর সময় বীজ এলোমেলো ভাবে না পড়ে। বীজ বোনার আগে অবশ্যই হুনজলে ফেলে ভাল বীজ বাছাই করে নিতে হবে।

সার প্রয়োগ

বোনার আগে হেক্টর প্রতি ২৫ কেজি নাইট্রোজেন ও ৭০ কেজি ফসফেট জমিতে দিতে হবে যদি সেই জমিতে বারসীম কেটে ধান বা তুলু শস্যের চাষ করা হয়। সমস্ত সারটি বীজ বোনার আগে দিতে হবে।

সেচ

সমানভাবে যাতে গাছ বাড়তে পারে সেজন্য প্রথম সেচটি খুবই প্রয়োজনীয়। হাক্কা মাটিতে বোনার তিন থেকে পাঁচ দিনের মধ্যে প্রথম সেচটি দিতে হবে। ভারী মাটিতে আট থেকে দশ দিনের মধ্যে প্রথম সেচ দেওয়া দরকার। আবহাওয়া বুঝে এর পর ১৫ থেকে ২০ দিন অন্তর সেচ দিতে হবে। ফসল কাটার তিন সপ্তাহ আগে সেচ দেওয়া বন্ধ করতে হবে।

আগাছা দমন

অবাঞ্ছিত শাখা এবং আগাছা তুলে ফেলতে হবে যাতে কোন আগাছার বীজ এর সঙ্গে না মিশে যায়, বিশেষ করে গাছে ফুল আসার আগে। ফসল কেটে তোলার

আগে ক্ষেতের সব আগাছা যেন অবশ্যই তুলে পরিষ্কার করে নেওয়া হয়।

শস্যরক্ষা

বীজ বোনার পর বা অঙ্কুরোদগম হওয়ার আগে কালো পিপড়ে অনেক সময় এইসব বীজ নিয়ে নষ্ট করে। অলড্রিন বা বি-এইচ-সি জলে গুলে পিপড়ের আস্তানাগুলিতে দিয়ে পিপড়ে ধ্বংস করতে হবে। কাণ্ড পচা রোগ কাণ্ডের নীচের অংশে আক্রমণ করে, ফলে কাণ্ড পচে যায়। রোগ যেখানে আক্রমণ করেছে সেই জায়গা দেখে, সেই অংশটি কেটে সেখানে রোদ লাগাতে হবে। তাছাড়া শতকরা ২ ভাগ ব্রাসিকল জলে গুলে মাটিতে মিশিয়ে দিতে হবে।

ফসল কাটা

শুকনো অঞ্চলে মার্চের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে এবং অন্য অঞ্চলে মার্চের তৃতীয় সপ্তাহের মধ্যে পশুখাত্তের জন্য পাতা কেটে নিতে হবে। এর পর পাতা আর কাটা

চলবে না। শেষবার যখন কাটা হবে তখন যেন কোনমতেই দেরী না হয় কারণ শুকনো ও গরম আবহাওয়ায় পরাগমিলন হতে না পারায় বীজ ভাল জন্মায় না। তেমনি বেশী আগে যদি শেষবার কাটিং করা হয় তাহলে গাছের বেশী বাড় হয়ে গাছ মাটিতে পড়ে যায়, তাতে বীজ ভাল জন্মাতে পারে না। সেজন্য শেষবারের কাটিং এবং বীজের পরিণত হওয়ার মধ্যে অন্ততঃ ১০ সপ্তাহ সময় যেন থাকে। শুঁটির তিনভাগের দুভাগ যখন বাদামী রঙের হয়ে উঠবে তখন ফসল কাটতে হবে। কাটার পর তিন থেকে চার দিন ফসল ক্ষেতেই থাকবে তারপর বীজ ভালভাবে শুকিয়ে গেলে ঝেড়ে নিতে হবে। ঝেড়ে নেওয়ার পর সেই বীজ ভাল করে পরিষ্কার করে এবং শুকিয়ে নিয়ে উপযুক্ত পাত্রে সংরক্ষণ করতে হবে।

[“ইণ্ডিয়ান ফার্মিং” এর ১৯৮৪র সেপ্টেম্বর সংখ্যায় প্রকাশিত শ্রী টাদগি রাম, সি. এস. ত্যাগী, ওঙ্কর সিং ও আর. কে. সারদানা কর্তৃক লিখিত প্রবন্ধের সারাংশ]



পেঁয়াজ একটি লাভের ফসল

সুলেখা ঘোষ

পেঁয়াজ একটি জনপ্রিয় ও প্রয়োজনীয় অর্থকরী ফসল। এর চাহিদা সারা বছর। পশ্চিমবঙ্গে এর উৎপাদন চাহিদার তুলনায় কম। তাই এর উৎপাদন বাড়ানোর উপর নজর দেওয়া বিশেষ দরকার। এর জন্ম উন্নত জাত যেমন বেছে নিতে হবে, তেমনি উন্নত পদ্ধতিতে এর চাষ করতে হবে।

উন্নত জাতের পেঁয়াজের মধ্যে পুসারটনার, নাসিক রেড, পুসারেড ও রেডগ্লোব। জাত নির্বাচনের সময় খেয়াল রাখতে হবে যাতে নির্দিষ্ট স্থানের উপযুক্ত অধিক ফলনশীল জাত বেছে নেওয়া হয়।

বোনা বা রোয়ার সময়

কার্তিক মাসে বীজ বুনে অগ্রহায়ণের মাঝামাঝি থেকে পৌষের মাঝামাঝি পর্যন্ত চারা লাগাতে হবে।

বীজের পরিমাণ

হেক্টর প্রতি ৮—১০ কেজি বীজ লাগবে।

জমি তৈরি

ভালভাবে জমি তৈরি করতে হবে। জমির ঢাল, সেচের ও জল নিকালের সুবিধা বুঝে সমস্ত জমি কয়েকটি ছোট ছোট খণ্ডে ভাগ করে নিতে হবে। এতে সেচের যেমন সুবিধা হবে তেমনি সার ধুয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা কম থাকে।

চারা তৈরি

সুস্থ, সবল ও নীরোগ চারা ভাল ফলনের জন্ম একান্ত প্রয়োজন। এর জন্ম বোনার আগে বীজ শোধন করে যেমন নিতে হবে, আবার বীজ বোনার পর বীজতলার ভালভাবে পরিচর্যা করা দরকার। ৬—৭ সপ্তাহ বয়সের চারা লাগাবার পক্ষে উপযুক্ত।

সময়মত রোয়া করা

পেঁয়াজের ফলন কন্দের আকারের উপর নির্ভর করে। কন্দ যদি কোন কারণে ক্ষীত

না হয় তাহলে ফলন কমে যাবে। দেখা গেছে কন্দের ক্ষীতি নির্ভর করে প্রধানতঃ আলোর কাল বা দিনের দৈর্ঘ্য, আবহাওয়ার তাপমাত্রার উপর। লম্বা দিন ও গরম আবহাওয়া কন্দ ক্ষীতির বিশেষ সহায়ক। তাই সেইভাবে স্থানীয় আবহাওয়ার উপর নির্ভর করে সঠিক সময়ে চারা রোয়া করা দরকার।

সঠিক দূরত্বে চারা লাগাতে হবে। দূরত্ব বেশী হলে চারার সংখ্যা কমে যাবে, ফলনও কম হবে। চারা কখনও ২ই থেকে ৩ সেমির বেশী গভীরে লাগাবেন না। চারা থেকে চারার দূরত্ব ১০ সেমি আর সারি থেকে সারির দূরত্ব ১৫ সেমি রাখলে ভাল হয়।

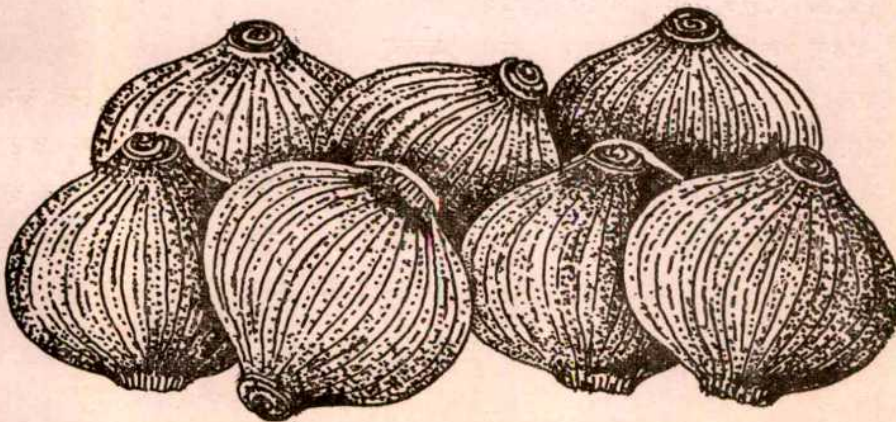
সেচ

সময়মত সেচ দিতে হবে। পেঁয়াজে

সেচ বেশী দরকার। তবে সেচ এমনভাবে দেওয়া দরকার যাতে করে জমি থেকে জল উপচিয়ে না যায়। এতে সারের অপচয় হয় ও গাছেরও ক্ষতি হয়। আবার ক্ষেত শুকিয়ে গেলেও খারাপ। তাই সময়মত, পরিমাণমত ও সঠিক পদ্ধতিতে সেচ দিতে হবে।

সার

মাটি পরীক্ষা করে সারের পরিমাণ ঠিক করা দরকার। মোটামুটি ভাবে হেক্টর পিছু ভাল পচা জৈব সার অন্ততঃ ১৫ টন, ১০০ কেজি নাইট্রোজেন, ৫০ কেজি ফসফেট ও ১০০ কেজি পটাশ দরকার। জৈব সার—সবটাই জমি তৈরির সময় ছড়িয়ে চাষ দিয়ে মাটির সাথে ভালভাবে মেশান দরকার। মূল সার হিসাবে অর্ধেক নাইট্রোজেন, পুরো ফসফেট ও পুরো পটাশ জমি তৈরির



বসুন্ধরা : মাঘ, ১৩৯২

সময় দিতে হবে। চাপান সার হিসাবে বাকী ৫০ কেজি চারা রোয়ার ১ মাস পরে দিতে হবে। সার সমস্ত জমিতে ছড়িয়ে না দিয়ে চারার ২ই সেমি দূরে ও ৫ সেমি নীচে সারিতে প্রয়োগ করলে সারের অপচয় কম হয়।

আগাছা দমন

আগাছা সময়মত তুলে নিড়েন দেবেন। চাপান সার দেওয়ার আগে আগাছা অবশ্যই পরিষ্কার করতে হবে।

রোগপোকা দমন

রোগ :

পাতা ঝলসানো রোগ : এটি এক ধরনের ছত্রাক ঘটিত রোগ। ইহা পেঁয়াজের পাতা, বীজ, কাণ্ড ও বাস্র আক্রমণ করে। আক্রান্ত পেঁয়াজের পাতার উপরে প্রথমে ছোট ছোট সাদাটে ভেজা ভেজা গোলাকার দাগ দেখা যায়। এই দাগের মধ্যবর্তী অংশে বেগুনী রঙের ছোট দাগ থাকে। এই বেগুনী রংএর দাগটি পরে বড় হয়ে যায়। পাতা থেকে গাছের অস্থান অংশও আক্রান্ত হয়। পাতাগুলি এবং গাছের যে অংশে বীজ থাকে তা শুকিয়ে পড়ে যায় ও মরে যায়।

এ রোগ দমনের জন্য থাইরাইড যেমন থাইরাম—০.২৫%-এর সাহায্যে বীজ

শোধন করে লাগান প্রয়োজন। এ ছাড়া প্রতিবেধক হিসাবে ম্যানকোজেব যেমন ডাইথেন-এম ৪৫ বা জিনেব যেমন ডাইথেন-জেড ৭৮ প্রতি লিটার জলে ২.৫ হিসেবে মিশিয়ে স্প্রে করা যেতে পারে।

পোকা :

চাষী পোকা : পেঁয়াজের সবচেয়ে ক্ষতিকারক শত্রু হলো চাষীপোকা। এগুলি দেখতে খুব ছোট ও হলদে রঙের। আক্রান্ত গাছের পাতায় সাদা সাদা প্রায় গোলাকার দাগ দেখা যায়। পাতার ডগা বাদামী হয়ে শুকিয়ে যায়। পাতা মুড়ে নলের মত আকার ধারণ করে।

চাষী পোকার আক্রমণ হলে প্রতি লিটার জলে ১ই মিলি হিসাবে ডাইমিথয়েট যেমন রোগর-৩০ ই.সি অথবা মিথাইল ডিমেটন যেমন মেটাসিস্টক্স-২৫ ই.সি. অথবা ২ মি.লি. ম্যালাথিয়ন যেমন সাইথিয়ন ৫০ ই.সি মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে।

ফলন

পেঁয়াজ চার থেকে পাঁচ মাসের ফসল। পাতার ডগা হলদে হয়ে ঢলে পড়লেই পেঁয়াজ তোলায় সময় হয়েছে বুঝতে হবে। ঠিকমত চাষ করতে পারলে হেক্টর প্রতি ১৫—২৫ টন ফসল পাওয়া যেতে পারে।



মহিলা প্রশিক্ষণ চলছে চলবে

কনক কমল চট্টোপাধ্যায়

পশ্চিমবঙ্গে শহরের তুলনায় গ্রামের সংখ্যা প্রায় তিনগুণ। নারী-পুরুষের সংখ্যা বিচারে সমগ্র ভারতের নারীর সংখ্যা পুরুষের প্রায় সমান। দেশের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে গ্রামগুলিও এগিয়ে চলেছে। সেই সঙ্গে মাঠের কৃষকভায়েরাও দেশের অগ্রগতির কাজে এগিয়ে এসেছেন। আবার কৃষক-ভায়েরদের কাজে সাহায্য করবার জন্য কৃষক মা-বোনদের প্রচেষ্টারও অন্ত নেই। ঘর গৃহস্থালীর কাজের পাশাপাশি মা-বোনেরা কৃষির বিভিন্ন কাজে সাহায্যও করছেন বাড়ীর পুরুষদের।

যুগ ও সমাজের প্রয়োজনে আজকের দিনে মহিলারাও ঘর সংসারের কাজের বাইরেও নিজেদের নিয়োজিত করতে চান।

জেলা প্রশিক্ষণ আধিকারিক, দঃ ২৪ পরগণা

সামাজিক পরিবর্তনের সঙ্গে নিজেদের মানিয়ে নিয়ে অর্থনৈতিক চাপের সঙ্গে খাপ খাওয়াতে চেষ্টা করছেন। তাই কৃষির বিভিন্ন কাজে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে তাঁরা বিশেষ আগ্রহী। পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় সরকারী কৃষি বিভাগের উদ্যোগে যে মহিলা প্রশিক্ষণ দানের ব্যবস্থা করা হয়েছে তাতে যোগ দিতে গ্রামের মহিলারা যথেষ্ট আগ্রহী।

এই সব শিবিরের মাধ্যমে বীজ, খাচ্ শস্ত্রের সংরক্ষণ, গৃহসংলগ্ন সবজি বাগান, হাঁস-মুরগী গো-পালন, পুষ্টি ও পুষ্টিকর খাবার, সয়াবীনের দুধ ও বিভিন্ন উপজাত খাচ্ তৈরী, ফল-সবজি সংরক্ষণ ইত্যাদি বিষয় বিশদ আলোচনা ও হাতে কলমে শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়।

দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলায় তিনদিনের



মাটির নমুনা সংগ্রহ পদ্ধতি
শেখানো হচ্ছে

মহিলা প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা এ বছর অর্থাৎ ১৯৮৫ থেকেই শুরু হোল। জুন মাসে প্রথম শিবির খোলা হয় কাকদ্বীপ ব্লকের ভুবননগর গ্রামে। এরপর দ্বিতীয় শিবির ফলতা ব্লকের শহরার হাটে, তৃতীয় শিবির বজবজ এক নং ব্লকের পূজালী অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয়ে এবং আগষ্ট মাসে চতুর্থ শিবির খোলা হয় জয়নগর দু নং ব্লকের ব্যবস্থাপনায় নীমপীঠের কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রের হল ঘরে। প্রতিটি শিক্ষণ শিবিরে উপস্থিত মহিলাদের উৎসাহ ও উদ্দীপনার তারিফ না করে পারা যায় না। প্রত্যেকটি শিবিরে প্রশিক্ষণ প্রকল্প

অনুযায়ী পঁচিশজন শিক্ষার্থী যোগদান করেন। শিবিরের শেষদিনে মূল্যায়নের মাধ্যমে জানা যায় যে প্রত্যেকেই চান এ ধরনের প্রশিক্ষণ শিবির প্রতিটি গ্রামে করা হলে স্থানীয় কৃষক পরিবারের মা-বোনেরা উপকৃত হবেন।

সুন্দরবনের কাকদ্বীপ ব্লকের ভুবননগর গ্রামে অনুষ্ঠিত প্রশিক্ষণ শিবিরে মহিলাদের হাতে কলমে জমির মাটি সংগ্রহ করে পরীক্ষাগারে পাঠানোর পদ্ধতি বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া হয় তা মহিলাদের ক্ষেত্রে এই প্রথম। ফলতা, বজবজ এক নং, জয়নগর দুই নং ব্লক আয়োজিত প্রশিক্ষণ শিবিরে সয়াবীনের ছধ-

ছানা-দই ও অগ্ন্যাগ্ন খাবার তৈরী হাতে কলমে শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। পূজালী গ্রামে অস্থিতিত প্রশিক্ষণ শিবিরে বজবজ এক নং ব্লকের উন্নয়ন আধিকারিক শ্রীমতী শুভশ্রী সেন নিজে উপস্থিত থেকে সহযোগিতা করেন। সয়াবীনের দুধ-ছানা-দই ও অগ্ন্যাগ্ন খাবার তৈরীর ব্যাপারে নিজেই কাজে নেমে শিক্ষার্থিনীদের যথেষ্ট উৎসাহিত করেন।

শিক্ষার্থিনীদের একজন শ্রীমতী শুভা মণ্ডল। শ্রীমতী মণ্ডল স্বামীর পাশে থেকে মাঠের কাজও করে থাকেন। তিনি জানান তাঁদের সাড়ে তিন বিঘা জমিতে জয়া, সীতা, রত্না জাতের ধানের চাষ খালের জলে সেচ দিয়ে করেন। গত বোরোতে সময়মত ধান লাগান। তাতে ফসল রোগপোকার কবলে পড়েনি। যথাসময়ে 'ধান' কেটে গোলায় তুলতেও পেরেছেন। উচ্চ মাধ্যমিক পাশ করা উমা হালদারও জানান তিনিও বাড়ীর পুরুষের সঙ্গে তাঁদের চার বিঘা জমিতে চাষাবাদ করে থাকেন। তাঁরও ঐ

এক কথা বোরোতে সময় মত ধান লাগিয়ে রোগ পোকার আক্রমণে পড়তে হয়নি। ফলতা ব্লকের দক্ষিণ বাসুর হাটের কাজল দাস, ঈশ্বরীপুর গ্রামের রীণা সামন্ত, কাশী-রামপুরের নিবেদিতা মণ্ডল ও কাকদ্বীপ ব্লকের ভুবননগর গ্রামের সুদীপা মণ্ডল, রীতা নন্দর, শান্তি দাস এবং বজবজ এক নং ব্লকের কালিকাপুর গ্রামের বিজলী পাল, রামচন্দ্রপুর গ্রামের রেণুকা দাস, কালীপুর গ্রামের শিখা মান্না প্রমুখ প্রশিক্ষণ শিবিরে উপস্থিত থেকে ধানের রোগ পোকা, গৃহসংলগ্ন জমিতে সবজি চাষ, ইছুর দমন, সার গর্ত তৈরী ইত্যাদি বিষয়ে জেলা মুখ্য কৃষি আধিকারিককে যে ভাবে প্রশ্ন করেন তা সত্যিই প্রশংসনীয়।

মহিলাদের শিক্ষার প্রয়োজনীয়তার কথা চিন্তা করে এ বছরের ডিসেম্বর মাস থেকে আগামী বছরের ফেব্রুয়ারী মাসের মধ্যে এই জেলার নামখানা, ফলতা, বিষ্ণুপুর এক নং, বারুইপুর, বজবজ এক নং ও ডায়মণ্ডহারবার দু'নং ব্লকে তিন দিনের মহিলা প্রশিক্ষণ শিবির খোলার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

ফাল্গুন মাসের করণীয়

ফাল্গুনের আগমন যেমন শীত মরসুমের সমাপ্তি জানায় সেই সঙ্গে কৃষকের ক্ষেতেও চাষের কাজে আনে পরিবর্তন। প্রাক-খরিফের চাষের শুরু এখন থেকেই। এ মাসে তরাই অঞ্চলে বোনার উপযুক্ত অধিক ফলনশীল জাত আই-ই-টি ১৪৪৪ (রসি) ও ২২৩৩, পলমন ৫৭৯ এবং সি-আর ১২৬-৪২-১ এবং স্থানীয় উন্নত জাত ছলার ও এম-সি— ১৬১৬। বোনার আগে বীজ সব সময়েই শোধন করে বোনা দরকার।

গম :

গম চাষে ধানের তুলনায় জলের পরিমাণ কম লাগে। কৃষকরা গম চাষে অনেকেই আগ্রহী। ভাল ফলনের জন্য গমের ক্ষেতে নির্দিষ্ট সময়ে সেচ দেওয়া দরকার। এই সময়ে একবার সেচ দিন। সেচ এমন ভাবে দেবেন জমিতে যেন জল না দাঁড়ায়। জমিতে জল বেশী জমলে গাছ হলদে হয়ে যাবে। তাতে গমের ফলন কম হবে। কালবৈশাখীর

জলে গম যাতে নষ্ট না হয় সেজন্য গম পাকার সঙ্গে সঙ্গে ফসল কেটে মাড়াই করে নিন। ধানের খড়ের মত গমের খড় গবাদি পশুর খাওয়া হিসাবে ব্যবহার করুন।

পাট :

উত্তর বঙ্গে অল্প রষ্টি এলাকায় উচু জমিতে এ মাসের শেষ থেকে মিঠে পাট চৈতালি (জে-আর-ও ৮৭৮) এবং নিচু জমিতে তেতো পাট সোনালী (জে-আর-সি ৩২১) বুহুন।

তিল :

এ মাসে তিল বুহুন। তিলের উন্নত জাত বি-৬৭, বি-১৪, বি-৯ ইত্যাদি। বোনার আগে মূল সার হিসাবে একর প্রতি ১০ কেজি নাইট্রোজেন দিন।

অগ্ন্যান্য ফসল :

এ মাসের মাঝামাঝি থেকে মুগ ও কলাই বুহুন।



সপ্তম পঞ্চবার্ষিক যোজনার ব্যাপক প্রস্তুতি

উন্নত মানের বীজ উৎপাদন ও সরবরাহের কাজে
পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বীজ নিগম-এর সম্প্রসারিত কার্যক্রম

উন্নত মানের বীজ উৎপাদন বর্তমান পরিস্থিতি ৭ম যোজনার লক্ষ্যমাত্রা
ও সরবরাহ কার্যক্রমে (১৯৮৪-৮৫) (১৯৮৯-৯০)

(পাট, ধান, গম, ডালশস্য এবং তৈলবীজ) ৩,০০০ মেঃ টন ১৫,০০০ মেঃ টন

পশ্চিমবঙ্গের জলবায়ু মাটির উপযোগী এ রাজ্যেই উৎপাদিত

উন্নত মানের শংসিত বীজ ব্যবহার করুন

ফলন বাড়ান : আয় বাড়ান

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বীজ নিগম লিঃ-এর জেলা দপ্তর

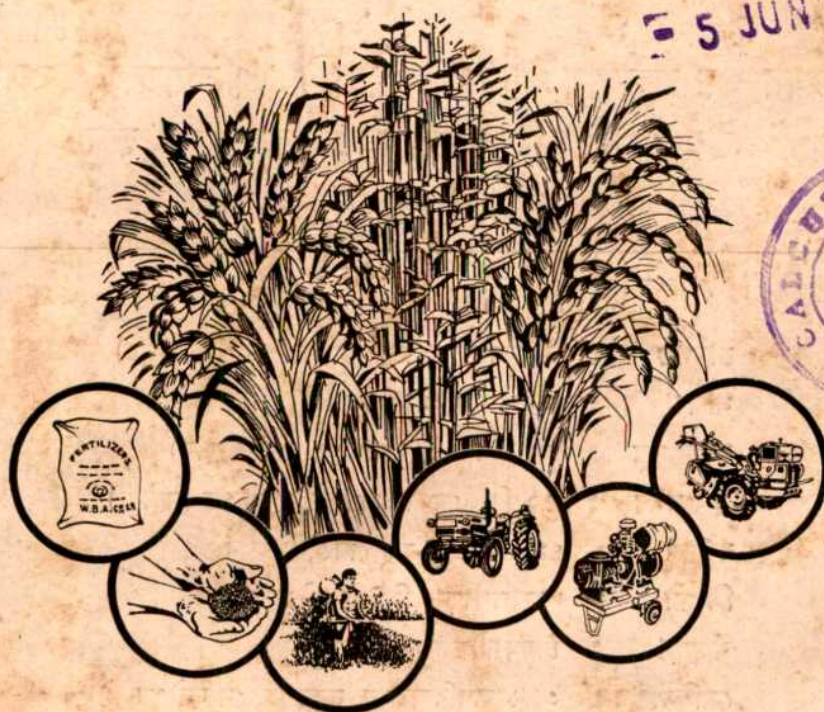
- রায়গঞ্জ : উকিলপাড়া, রায়গঞ্জ (পশ্চিম দিনাজপুর)
মালদা : মকদমপুর, মালদা
বহরমপুর : পঞ্চাননতলা, বহরমপুর (মুর্শিদাবাদ)
কৃষ্ণনগর : ১২ ডি. এন. রায় রোড, কৃষ্ণনগর (নদীয়া)
বর্ধমান : ৭৯ এন. এন. বসু রোড, বর্ধমান
সিউরী : দাঙ্গালপাড়া, সিউরী (বীরভূম)
বাঁকুড়া : চাঁদমারীডাঙ্গা, বাঁকুড়া
মেদিনীপুর : ৩৫/১ অরবিন্দনগর, নরমপুর, মেদিনীপুর

সদর দপ্তর :

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বীজ নিগম লিঃ

৪ গঙ্গাধরবাবু লেন (৬ষ্ঠ তল), কলিকাতা ৭০০ ০৭২

GREEN REVOLUTION— our aim in West Bengal



Green Revolution is our aim. The object is to modernise farming in the State. And Agro-Industries Corporation is lending a helping hand to achieve the goal. The Corporation has been supplying modern implements like Tractors, Sprayers, Threshers and Pump-sets to the farmers on hire or on hire-purchase basis.

The Corporation also supplies quality seeds, fertilisers and pesticides.

Agro-Industries Corporation also provides custom

service for cultivation of cotton/groundnut and for Small Farmers Development Agency and Marginal Farmers & Agricultural Labourers Development Project Schemes.

The Corporation has another role too—to create employment opportunities for Engineering graduates/diploma holders and Agricultural graduates in different Agro-Service centres in this State.

**Hand in hand with farmers —
Agro-Industries Corporation**

West Bengal Agro-Industries Corporation Limited

বসন্ধি

বসন্ধি

সপ্তদশ বর্ষ



ফাল্গুন • ১৩৩২
চৈত্র



সূচী

সম্পাদকীয় ...	৩-৪
আউশের উন্নত জাত ...	৫-৬
টমেটো সংরক্ষণের একটি নতুন পদ্ধতি	
“টমেটো ফ্রাশ” ...	৭-৯
ভিলক বন্মোপাধ্যায়	
পশ্চিমবঙ্গে কৃষির অগ্রগতি ...	১১-১৬
বিষ্ণু মণ্ডল	
চীনাবাদামের চাষ ...	১৭-১৯
প্রাক-খরিখে মুগের চাষ লাভজনক	২০-২২
রবি ফসলের বীজ সংগ্রহ ও সংরক্ষণ	২৩-২৪
হুলেখা ঘোষ	
বৈশাখ মাসে কৃষকের করণীয় ...	২৫
কাকদ্বীপে কিশাণ মেলা (সংবাদ) ...	২৭
বর্ণানুক্রেমিক সূচী ...	২৮-৩১

সম্পাদনা উপদেষ্টা পর্ষদ

ডঃ দেবব্রত মুখোপাধ্যায়/কৃষি অধিকর্তা, পশ্চিমবঙ্গ
ডঃ স্বধাময় বিশ্বাস/অপর কৃষি অধিকর্তা
ডঃ কল্যাণব্রত সেনগুপ্ত/মুখ্য কৃষি অধিকর্তা (গবেষণা)
ধূর্জটী মুখার্জী, মুখ্য কৃষি অধিকর্তা (সম্প্রসারণ)
জ্যোতির্ময় বোস/উপসচিব (উন্নয়ন) কৃষি বিভাগ
অমলেন্দু সরকার/মুখ্য প্রচার ও জনসংযোগ
আধিকারিক
অমিয়কুমার মিত্র/জেলা কৃষিতথ্য আধিকারিক (সদর)
হুলেখা ঘোষ/সম্পাদিকা
চিদানন্দ গোস্বামী/সহঃ সম্পাদক
প্রধান সম্পাদক
ডঃ দেবব্রত মুখোপাধ্যায়—কৃষি অধিকর্তা,
পশ্চিমবঙ্গ

বহুসংস্করণ

ফাল্গুন-চৈত্র ১৩৯২

কৃষি অধিকার (কৃষি তথ্য সংস্থা)

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কৃষি বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত ও প্রচারিত



গ্রাহকদের প্রতি আবেদন

‘বসুন্ধরা’ মাসিক পত্রিকার ১৩৯২ সালের চাঁদার মেয়াদ ঝাঁদের শেষ হয়ে যাচ্ছে বা গেছে, নতুন বছরের জন্ম চাঁদা পাঠিয়ে তাঁদের গ্রাহক হতে অনুরোধ করা হচ্ছে। বার্ষিক চাঁদার টাকা পোস্টাল অর্ডারে বা ব্যাঙ্ক ড্রাফ্টে কৃষি অধিকর্তা, পশ্চিমবঙ্গ সমীপে, অথবা জেলা কৃষিতথ্য আধিকারিক (সদর) ৪২, গ্রাহামস্ রোড, কলিকাতা-৪০, এই ঠিকানায় পাঠাতে হবে।

বসুন্ধরা পত্রিকা প্রসঙ্গে চিঠিপত্র লেখার সময় জবাবের জন্ম চিঠির সঙ্গে স্ট্যাম্প বা পোস্টকার্ড পাঠানোর প্রয়োজন নেই প্রয়োজন-বোধে সব পত্রের উত্তর দেওয়া হয় এবং সরকারী চিঠিপত্রের সার্ভিস ডাকটিকিটই কেবল ব্যবহার করা চলে।

প্রধান সম্পাদক

সংবাদ



অনিবার্য কারণে এ বছর ফাল্গুন ও চৈত্র সংখ্যা যুক্তভাবে প্রকাশ করতে হলো। পরবর্তী মাসিক সংখ্যাগুলি যাতে সময়মত প্রকাশ করা যায় সেজন্য এই সাময়িক ব্যবস্থা নেওয়া হলো। আশা করা যায় এজন্য গ্রাহক, কৃষক ও পৃষ্ঠপোষকদের সহায়ভূতি থেকে আমরা বঞ্চিত হবো না। এই যুক্ত সংখ্যায় ছমাসের প্রয়োজনীয় তথ্য যতটা সম্ভব সংযোজন করার চেষ্টা করা হয়েছে এবং এজন্য এই যুক্ত সংখ্যাটি কিছু বর্ধিত আকারে প্রকাশ করা হলো।

রবি মরসুম শেষ হয়ে এলো। কৃষক ইতিমধ্যে রবি ফসল যেমন ছোলা, মুগ, তাছাড়া আলু ইত্যাদি যেমন ক্ষেত থেকে তুলেছেন সেইসঙ্গে তার স্ফায়ণ সংরক্ষণের ব্যবস্থাও আশাকরি করেছেন।

বর্ষচক্রে চৈত্র বছরের শেষ মাস। এই সঙ্গে একটি বছরের প্রস্থান ও নতুন বছরের প্রবেশ। যদিও বর্তমানে সেচের সুবিধা বাড়ার ফলে সারা বছরই কিছু কিছু ক্ষেতে চাষের কাজ চলে তবুও কৃষিবর্ষ রবিচাষ দিয়েই শুরু। কালবৈশাখী এই সময় রুদ্ররূপে দেখা দেয়। কিন্তু এই কালবৈশাখীর জলেই কৃষক প্রাক-খরিকের চাষ হিসাবে পাট ও আউশ ধানের চাষ শুরু করেন।

আউশ ধানের চাষ যারা করছেন তাঁরা নিশ্চয়ই নিজের জমির অবস্থান অনুযায়ী উপযুক্ত জাতের ধান বেছে নিয়ে বীজ সংগ্রহ করেছেন। যারা পাটের চাষ করছেন তাঁরা উপযুক্ত জাতের পাট-বীজ নিশ্চয়ই সংগ্রহ করেছেন। এই বিষয়টি মনে রাখা দরকার যে বিভিন্ন জাতের পাটের বোনার সময় বিভিন্ন পাট বোনার আগে কৃষকদের এ বিষয়ে যেন লক্ষ্য থাকে। কারণ নির্দিষ্ট সময়ের আগে পাট বুনলে অসময়ে গাছে ফুল এসে যায় এবং তাতে ফলন ভাল হয় না।

এখন সেচের সুবিধা আগের তুলনায় বেড়েছে। এর ফলে একই জমি থেকে বছরে একাধিক ফসল অনেকেই উৎপন্ন করছেন। তবে একই জমি থেকে বছরে একাধিক ফসল উৎপাদন করতে গেলে এখন থেকে সারা বছরের শস্য চাষের একটি পরিকল্পনা তৈরি করে নেওয়া ভাল। তাতে ফল অনেক ভাল পাওয়া যায়। শস্য পর্যায় ঠিক করার সময় লক্ষ্য রাখতে হবে যাতে নির্দিষ্ট ফসলচক্র বার বার অনুসরণ করা না হয়। তাতে অনেক সময় রোগ-পোকার আক্রমণ

বেড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা দেখা যেতে পারে। বর্তমানে রোগ-পোকার আক্রমণের সমস্যা বেড়েছে। তাই সময় থাকতে এ বিষয়ে সব রকম সাবধানতা নেওয়া দরকার।

এই মরশুমে সবজি চাষ খুবই লাভজনক। কম খরচে অতি সহজেই গ্রীষ্ম, বর্ষায় নানা সবজি চাষ করা যায় : যেমন ঢেঁড়স, বরবটি, লাউ, ঝিঙ্গে, করলা, ডাঁটা ইত্যাদি। তাছাড়া ডাল ও তৈলবীজে এ রাজ্যে ঘাটতি রয়েছে। এ সময় কিছু কিছু ডাল ও তৈলবীজ যেমন মুগ, অড়হর ও চীনাবাদামের চাষ করে বাড়তি আয় করা যায়। আমাদের সর্বদাই উদ্দেশ্য থাকবে একদিকে বেশী উৎপাদন করা ও সেইসঙ্গে আয় বৃদ্ধি করা। এইসব উৎপাদন কার্ঘ্যসূচী রূপায়িত করার জন্য যদি সাহায্য ও পরামর্শের প্রয়োজন হয় তাহলে কৃষকরা যেন স্থানীয় কৃষিকর্মীদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন।

আউশের উন্নত জাত

এখন কৃষকরা উন্নত অধিক ফলনশীল জাতের ধান সম্বন্ধে খুবই আগ্রহী। সুখের বিষয় গত কয়েক বছরে ধানের বেশ কয়েকটা অধিক ফলনশীল জাত আবিষ্কৃত হয়েছে। উন্নত পদ্ধতিতে এইসব অধিক ফলনশীল জাতের ধান চাষ করে ফলন যে অনেক বাড়ানো যায় রাজ্যের কৃষকরা এ বিষয়ে সজাগ। এইসব অধিক ফলনশীল জাতের ধানের চাষ সময়মত শুরু করলে পরবর্তী ফসল চাষের জটিলও যথেষ্ট সময় পাওয়া যায়।

পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলের মাটি, আবহাওয়া, জমির অবস্থান বিভিন্ন রকম। সব জাতের ধান সব জায়গায় ভাল হবে না। সেজন্য প্রাকৃতিক আবহাওয়া, জমির অবস্থান, সেচের সুযোগ সুবিধা অনুযায়ী উপযুক্ত জাতের

ধান বেছে নিতে হবে। ভাল ফলনের জন্য জমির উপযোগী উপযুক্ত ধানটি বেছে নেওয়া একান্ত দরকার।

কোথায় কি জাতের ধান চাষ করা যাবে সে সম্বন্ধে এখানে আলোচনা করা হলো।

(১) খরাপ্রবণ কাঁকুরে মাটি অঞ্চল—এই অঞ্চলের মধ্যে পড়ে পুরুলিয়ার সমগ্র অঞ্চল। তাছাড়া বাঁকুড়া জেলা এবং মেদিনীপুর, বর্ধমান ও বীরভূমের পশ্চিমাঞ্চল।

এই অঞ্চলের উপযোগী অধিক ফলনশীল জাতের ধান হলো আই-ই-টি ৮২৬ ও ১৪৪৪ (রসি), পলমন ৫৭৯ ও সি-আর ১২৬-৪২-১ এবং স্থানীয় জাত তুলার। এই জাতগুলি বোনা ও রোয়ার উপযোগী। তবে যারা রোয়া করে বুনতে চান তাঁদের রোয়ার উপযোগী ধান



হ'ল রত্না, সি-এন-এম ৬ (লক্ষ্মী) এবং ২৫, (লক্ষ্মী), আই-ই-টি ১৪৪৪ (রসি) ও ৪০৯৪ আই-ই-টি ২২৩৩ ও ৪০৯৪ (ক্ষিতীশ) এবং (ক্ষিতীশ)।
আই-আর-৩৬।

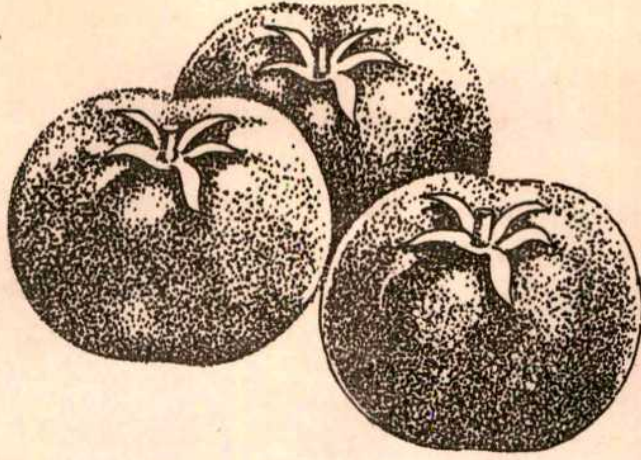
২। পলিমাটি অঞ্চল—পলিমাটি অঞ্চলের মধ্যে পড়ে মালদহ, মুর্শিদাবাদ, নদীয়া, ২৪ পরগণা, হাওড়া, জগলী, পশ্চিম দিনাজপুর (ইসলামপুর মহকুমা বাদে) এবং বীরভূম, বর্ধমান ও মেদিনীপুর জেলার পূর্বাঞ্চল।

এই অঞ্চলে বোনা ও রোয়ার উপযোগী ধানের জাত হলো পলমন ৫৭৯, সি-এন-এম ২৫, সি-আর ১২৬-৪২-১, আই-ই-টি ২২৩৩ ও আই-আর-৩৬, স্থানীয় জাত হলো ছলার এবং এন-সি ১৬২৬।

যারা ধান রোয়া করে বুনবেন, তাঁদের জমি উপযোগী জাত হলো রত্না, সি-এন-এম-৬

৩। তরাই অঞ্চল—এই অঞ্চলের মধ্যে পড়ে কোচবিহার, জলপাইগুড়ি, দার্জিলিং জেলার শিলিগুড়ি ও পশ্চিম দিনাজপুর জেলার ইসলামপুর মহকুমা। কেবল বোনার উপযোগী জাত হলো আই-ই-টি ১৪৪৪ (রসি) ও ২২৩৩, পলমন ৫৭৯ এবং সি-আর ১২৬-৪২-১। স্থানীয় জাত হিসাবে ব্যবহার করতে পারা যায় ছলার ও এন-সি ১৬২৬।

আউশ মরসুমে উঁচু ও মাঝারি অবস্থানের যে কোন দো-আঁশ জমি চাষের পক্ষে উপযুক্ত। যদিও অধিকাংশ জায়গায় বৃষ্টির উপর নির্ভর করে আউশ ধানের চাষ করা হয় তবু জমিতে সেচ ও জল নিকাশের ব্যবস্থা থাকলে ফসলের ফলন ভাল হয়।



টমেটো সংরক্ষণের একটি নতুন পদ্ধতি "টমেটো ফ্রাশ"

তিলক বন্দ্যোপাধ্যায়

যে কোন রান্নায় ছ'চার টুকরো টুকটুক লাল টমেটো যদি উকিঝুঁকি দেয় তাতে কার না ভাল লাগে। তার ওপর যদি এমনটি ঘটে যখন টমেটো বাজারে পাওয়া যায় না বা দাম তখন প্রায় সাধারণের নাগালের বাইরে। সারা বছর রান্নায় ব্যবহারের জন্য কিভাবে অতি সহজে নামমাত্র খরচে টমেটো ঘরেই সংরক্ষণ করে রাখা যায় তারই উপায় নিয়ে এখানে আলোচনা করা হলো।

এরজন্য প্রয়োজনীয় জিনিস যা লাগবে তা হলো :—

১। টমেটো। ২। এসেটিক এসিড। ৩। পটাশিয়াম মেটা-বাই-সালফাইট বা কে,এম,এস। ৪। সোডিয়াম বেনজোয়েট।

কিভাবে প্রস্তুত করবেন

সম্পূর্ণ লাল রঙের টাটকা শাঁসাল ভাল টমেটো বাছাই করে পরিষ্কার জলে ভালভাবে ধুয়ে নিন। অতিরিক্ত পাকা এবং সবুজ ও হলুদ অংশযুক্ত টমেটো নেবেন না। অবশ্য আংশিক সবুজ টমেটো ছ'একদিন ঘরে রেখে সম্পূর্ণ লাল হয়ে উঠলে তা ব্যবহার করতে পারেন। বোঁটার অংশটুকু কেটে বাদ দিয়ে ছই বা চার টুকরো করুন। টমেটো কাটার জন্য স্টেনলেস স্টীলের ছুরিই ব্যবহার করতে হবে।

কাটা টমেটো একটি এলুমিনিয়াম ডেকচিতে নিয়ে আগুনের উপর বসান। জল একেবারেই মেশাবেন না। এবার নাড়তে থাকুন যাতে টমেটো ডেকচির তলায় ধরে না যায়। অল্পক্ষণের

বস্তুকরা : ফাল্গুন-চৈত্র : ১৩৯২

মধ্যেই দেখবেন টুকরোগুলি নরম হয়ে তা থেকে রস বার হচ্ছে। টুকরো সহ এই রসের ঘনত্ব যখন প্রথম অবস্থার তুলনায় প্রায় দ্বিগুণ হয় তখন আগুন থেকে নামান। তারপর খোসা, বিচি ও রসসহ এই টমেটো ওজন করুন অথবা লিটার মগে মেপে নিলেও চলবে। সেই মাপ অনুযায়ী অগ্ন্যাগ্নি উপাদানগুলি নিতে হবে।

উপাদান তালিকা

ফোটানো টমেটো ৫ কিঃ গ্রাঃ অথবা ৫ লিঃ মগ
এসেটিক এসিড ২৫ মিঃ লিঃ ” ৫ চা-চামচ
কে,এম,এস ২ গ্রাম ” $\frac{1}{2}$ ”
সোডিয়াম বেনজোয়েট ১ গ্রাম ” $\frac{1}{2}$ ”

যে চামচে ঠিক ১১০ ফোঁটা জল ধরে সেটিই প্রকৃত চা-চামচ বলে ধরবেন। কালি তোলা এরকম পরিষ্কার ড্রপারের সাহায্যে এই ফোঁটার মাপ দেখে নেবেন। এক চা-চামচ উপাদান সাদা কাগজে ঢেলে সমান পাঁচ ভাগ করলে প্রতি ভাগ হবে $\frac{1}{5}$ চা-চামচ ও ছ’ ভাগ নিলে হবে $\frac{1}{5}$ চা-চামচ। উপাদানের মাথা কেটে চামচের মাপ নেবেন।

ফোটানো টমেটো মাপা হলে তা পুনরায় ঐ ডেকচিতেই রাখুন। তালিকা অনুযায়ী অগ্ন্যাগ্নি উপাদানগুলিও আলাদা করে মেপে নিন। আগেই কিছুটা পরিষ্কার জল ফুটিয়ে ঠাণ্ডা করে রাখবেন। এখন তা থেকে এককাপ মত নিয়ে ছ’ ভাগ করে ছ’টি কাপে ঢেলে তাতে কে,এম,এস এবং সোডিয়াম বেনজোয়েট আলাদা করে চামচের সাহায্যে সম্পূর্ণ দ্রবীভূত করুন।

এইবার টমেটোশুদ্ধ ডেকচি পুনরায় আগুনের উপর বসান এবং ফুটে শুকু করলেই আগুন থেকে নামিয়ে নিন। এসেটিক এসিড,

দ্রবীভূত কে,এম,এস এবং সোডিয়াম বেনজোয়েট যোগ করে হাতার সাহায্যে খুব ভালভাবে মিশিয়ে খুব তাড়াতাড়ি যথেষ্ট গরম থাকতে থাকতেই তা জীবাণুমুক্ত চওড়া-মুখ বোতলে মুখ অবধি ভর্তি করে সঙ্গে সঙ্গে ঢাকনা খুব ভালভাবে আটকে বায়ুরুদ্ধভাবে বন্ধ করে দিন। এই উৎপাদিত দ্রব্যটির নাম ‘টমেটো ফ্রাশ’।

এইভাবে সংরক্ষিত টমেটো সারা বছর রান্নায় ব্যবহারের পক্ষে বিশেষ উপযোগী। বিশেষতঃ খোসা ও বিচি থাকায় টমেটোর স্বাভাবিক উৎকর্ষ সংশ্লিষ্ট খাদ্যদ্রব্যকে সবদিক থেকে অত্যন্ত আকর্ষণীয় করে তোলে।

প্রয়োজনীয়তা

টমেটোজাত দ্রব্যগুলির মধ্যে নবতম সংযোজন এই ‘ফ্রাশ’। এর উৎপাদন ও সংরক্ষণ পদ্ধতি সবচেয়ে সহজ এবং ব্যবহারিক উপযোগিতাও অতি স্বচ্ছন্দ ও সাবলীল। সুতরাং কি গ্রামে কি সহরে ‘ফ্রাশ’ এর ব্যাপক প্রচার ও প্রসারের স্বর্ণ সুযোগ অত্যন্ত সম্ভাবনাপূর্ণ। নিশ্চিতভাবে বলা যায় ক্ষেত্র বিশেষে টমেটোর অতিরিক্ত উৎপাদনজনিত বাৎসরিক সমস্যা সমাধানে নিরুদ্বেগ ও নিৰ্ব্বাট পথ প্রস্তুত করতে পারে এই ‘টমেটো ফ্রাশ’।

সাবধানতা

বোতলকে জীবাণুমুক্ত করার জন্য তা ভালভাবে পরিষ্কার করে আধ ঘণ্টা জলে ফুটিয়ে নেবেন তারপর জল ঝরিয়ে রাখবেন। ঢাকনাও ফুটন্ত জলে ভাল করে ধুয়ে নেবেন। সবচেয়ে জরুরি বিষয়টি হ’ল—ঢাকনার ভিতর যেন ভাল মোটা ওয়াশার বা চাকতি থাকে যাতে বোতল-জাত ‘ফ্রাশ’কে নিশ্চিতরূপে সম্পূর্ণ বায়ুরুদ্ধ

বসুন্ধরা : ফাল্গুন-চৈত্র : ১৩৯২

অবস্থায় বন্ধ করা যায় এবং টমেটো কোনমতেই টমেটো কোন প্রকারেই যেন লোহার প্রত্যক্ষ চাকনার প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে আসতে না পারে। সংস্রবে না আসে। গরম অবস্থাতেই 'ক্রাশ' লক্ষ্য রাখতে হবে উৎপাদন ও সংরক্ষণকালে পাঁত্রে ভরতে হবে।

খরচের হিসাব (৫ কিঃ গ্রাঃ 'ক্রাশ' উৎপাদনের জন্ত)

বিষয়	পরিমাণ	মূল্য
টাটকা টমেটো	৮ কিঃ গ্রাঃ	৪.০০ টাঃ
এসেটিক এসিড	২৫ মিঃ লিঃ	১.০০ ”
কে, এম, এস	২ গ্রাম	০.১৮ ”
সোডিয়াম বেনজোয়েট	১ ”	০.০৭ ”
জালানি		০.৫০ ”
		মোট—৫.৭৫ টাঃ

ঘরোয়া উৎপাদনের ক্ষেত্রে বোতলের দাম না ধরাই উচিত কারণ একবার যোগাড় করতে পারলে তা বারবার ব্যবহার করা যাবে। ঠিক যেমন সংসারের চা-খরচের হিসাব-খাতায় কাপের দাম থাকে না।

রাসায়নিক দ্রব্যের নাম শুনে প্রথমেই মন পিছিয়ে যায়। কারণ যোগাড় করা সমস্ত। তাই কোথায় এগুলি পাওয়া যাবে সে সম্বন্ধে এখানে বলা হলো।

রাসায়নিক দ্রব্য তিনটি কলকাতায় লাল-বাজারের পিছনে এজরা স্ট্রিটে পাবেন অথবা

স্থানীয় ওষুধের দোকানে যোগাযোগ করে আনিয়েও নিতে পারেন। একটা কথা—কাজের জন্ত এগুলির প্রয়োজন অল্প পরিমাণে হলেও দোকানে কিন্তু ৫০০ গ্রামের প্যাক ছাড়া সাধারণতঃ পাওয়া যায় না। সুতরাং ৪-৫ জনে মিলে কিনে ভাগ করে নিলে আর সমস্ত থাকে না। এগুলির ৫০০ গ্রাম প্যাকের মূল্য যথাক্রমে ২০ টাঃ, ৪৫ টাঃ ও ৩৫ টাঃ মত। এসেটিক এসিড—ঝাঁঝাল তরল; কে, এম, এস—ঝাঁঝাল সাদা গুঁড়ো ও সোডিয়াম বেনজোয়েট—সাদা গুঁড়ো।

Mechanix-ET/TH 1/86 Ben 625

পশ্চিমবঙ্গে কৃষির অগ্রগতি

বিষ্ণু মণ্ডল

ভারতের ২.৭ শতাংশ ভূমি নিয়ে গঠিত পশ্চিমবঙ্গে দেশের ৮ শতাংশেরও বেশী মানুষ বাস করেন। স্বাধীনতা লাভের সময়ের পশ্চিমবঙ্গে জনসংখ্যা আড়াই কোটি থেকে বেড়ে এখন ৬ কোটির মত হয়েছে। ১৯৪৭-৪৮ সালে ৩৯ লক্ষ টন খাদ্যশস্য উৎপাদন হতো। ১৯৮৪-৮৫ সালে ৯৩ লক্ষ টনের কাছাকাছি এসে পৌঁছেছে। এ রাজ্যের কৃষি উৎপাদনের ইতিহাসে এটি একটি সর্বকালীন রেকর্ড। পাট, আলু ও সবজি উৎপাদনে এ রাজ্য শুধু স্বয়ম্ভুর নয়, রাজ্যের বাইরেও রপ্তানি হয়ে থাকে। স্বাধীনতা লাভের পর পশ্চিমবঙ্গে পাটের উৎপাদন ছিল ৬.৫ লক্ষ বেল, এখন তা ১০ গুণেরও বেশী বেড়েছে। আলুর উৎপাদন তখন হ'ত ৩ লক্ষ টনের মত, এখন তা ১০ গুণেরও বেশী বেড়ে ৩১ লক্ষ টন হয়েছে। স্বাধীনতা প্রাক্কালে গমের উৎপাদন কিছুই ছিলনা বললে চলে, এখন ৮ লক্ষ টনের বেশী উৎপাদন হয় এবং ফলনের হারও পাঞ্জাব, হরিয়ানার পরেই। তৈলবীজের উৎপাদন গত কয়েক বছর আগেও যা ছিল এখন তার চারগুণ বেশী উৎপাদন হচ্ছে এবং আরও অনেক বেশী উৎপাদনের সম্ভাবনা আছে। সবজি উৎপাদনও প্রায় তিনগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে।

উপদেষ্টা, কৃষি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ।



বঙ্গদ্রা : ফাল্গুন-চৈত্র : ১৩৯২

উৎপাদনের ঘাটতি

এইসব বৃদ্ধি সত্ত্বেও আমাদের আত্মসন্তুষ্টির অবকাশ নাই। এখনও তুল্য জাতীয় খাচ্ছে প্রায় ১০ শতাংশ, ডালশস্যে ৫০ শতাংশ এবং তৈলবীজে ৭৫ শতাংশের ঘাটতি রয়ে গেছে। এগুলির প্রয়োজনের তুলনায় ঘাটতি আরও অনেক বেশী ছিল। তবে পশ্চিমবঙ্গের পরিবেশে যে সম্পদ রয়েছে সেগুলির উন্নয়ন সাধন করলে এবং উপযুক্ত পরিকাঠামো সৃষ্টি করে বিজ্ঞান-ভিত্তিক চাষ আবাদের আরও সম্প্রসারণ করলে এই ঘাটতি পূরণ করা সম্ভব।

প্রতিকূল পরিবেশ

কৃষি উৎপাদন আশানুরূপ বৃদ্ধির প্রধান অস্ত্রায় হচ্ছে প্রাকৃতিক প্রতিকূল পরিবেশ। এ রাজ্যের কৃষি এখনও অনেকাংশে প্রকৃতি-নির্ভর। খরা, বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, শিলাবৃষ্টি প্রভৃতি প্রাকৃতিক দৈব দুর্বিপাক পশ্চিমবঙ্গে কৃষির প্রগতিকে মন্থর করেছে। রাজ্যের উত্তর ও পশ্চিমভাগের অল্প এবং ক্ষয়িষ্ণু এবং দক্ষিণবঙ্গের নোনা মাটির সংশোধন এবং সংরক্ষণ প্রয়োজন। মধ্যভাগের উৎকৃষ্ট গাঙ্গেয় এবং বিক্ষ্য সমভূমি অঞ্চলের ভূপৃষ্ঠ এবং ভূগর্ভস্থ জলসম্ভার ব্যবহার করে চাষের নিবিড়তা এবং বিজ্ঞানভিত্তিক চাষ বাড়িয়ে একর প্রতি উৎপাদন অনেক বেশী বাড়ানোর সম্ভাবনা রয়েছে।

চাষের নিবিড়তা

আবাদি জমির নিট পরিমাণ বৃদ্ধি করে ফসলের উৎপাদন বাড়ানোর আর কোনও সম্ভাবনা নাই। বরং নাগরিক উন্নয়নের কারণে নিট আবাদি জমির পরিমাণ ক্রমশঃ কমছে। তাই প্রতি খণ্ড জমি থেকে সর্বোচ্চ ফলন

পাওয়ার জন্য একই জমিতে একাধিক ফসল এবং প্রতিটি ফসলের একর প্রতি উৎপাদন বৃদ্ধির প্রচেষ্টা চলছে। এতে আমরা যতটুকু সফল-কাম হয়েছি তা হ'ল, ১৯৪৭-৪৮ সালে পশ্চিমবঙ্গে শস্য চাষের নিবিড়তা ছিল ১১২ শতাংশ। ১৯৬৬-৬৭ সালে হয়েছিল ১২০ শতাংশ। বর্তমানে এই নিবিড়তা দাঁড়িয়েছে ১৪৪ শতাংশ। সপ্তম যোজনায় শেষে লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে ১৫৫ শতাংশ। ভূপৃষ্ঠ এবং ভূগর্ভের যে জলের সংস্থান রয়েছে তার সুষ্ঠুভাবে উন্নয়ন এবং ব্যবহার করতে পারলে শস্য নিবিড়তা ২০০ শতাংশে আনা অসম্ভব নয়। বর্তমানে মাত্র ৩০ শতাংশ আবাদি জমিতে ফসলের সেচের বন্দোবস্ত করা হয়েছে। সপ্তম এবং অষ্টম যোজনাকালে এর দ্বিগুণ করা সম্ভব। সেচের প্রসার এবং চাষের নিবিড়তা ও কৃষক ও কৃষি শ্রমিকের কর্মসংস্থান অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত রয়েছে। বর্তমানে ডি. ভি. সি, ময়ূরাক্ষী, কংসাবতী এবং অগ্রা মাঝারি প্রকল্প থেকে প্রায় ১০ লক্ষ হেক্টরে সেচ দেওয়া সম্ভব হচ্ছে। সপ্তম যোজনা-কালে উত্তরে তিস্তা প্রকল্প এবং দক্ষিণে সুবর্ণরেখা থেকে আরও কয়েক লক্ষ হেক্টরে সেচের পরিকল্পনা আছে। এছাড়া প্রায় ৩০০০ গভীর নলকূপ, ৩০০০ নদী জল উত্তোলন প্রকল্প এবং আড়াই লক্ষাধিক অগভীর নলকূপ থেকে জমিতে সারা বছরে সেচের বন্দোবস্ত হয়েছে। এই মাঝারি ও ক্ষুদ্র সেচের প্রকল্প দ্বিগুণ করা সম্ভব। এছাড়াও কয়েক লক্ষ পুষ্করিণী সংস্কার ও উন্নয়ন করে সেচের প্রসার এবং জলের সদ্যবহারের প্রকল্প চালু আছে এবং আরও সম্প্রসারণের প্রস্তাব রয়েছে।

সারের ব্যবহার

সেচের জলের ব্যবহারের উৎকর্ষ বাড়িতে হলে সারের ব্যবহার অপরিহার্য। স্বাধীনতার প্রাক্কালে রাসায়নিক সারের ব্যবহার ছিলনা বললেই চলে। ১৯৮৪-৮৫ সালের উদ্ভিদ খাতের হিসাবে নাইট্রোজেন, ফসফেট এবং পটাশ মিলিয়ে রাসায়নিক সারের মোট ব্যবহার ৪ লক্ষ ৬ হাজার টন। এটা পশ্চিমবঙ্গের সর্ব-কালীন রেকর্ড এবং কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির প্রত্যক্ষ প্রমাণ। শুধু তাই নয় সুষম সার ব্যবহার হিসাবে হেক্টর প্রতি গড় ৩২ কেজি নাইট্রোজেন, ১২ কেজি ফসফেট এবং ৮ কেজি পটাশ এবং চার : দেড় : এক (৪ : ১'৫ : ১) এই অনুপাত ভারতের যে কোন রাজ্যের তুলনায় উৎকৃষ্ট এবং বিজ্ঞানসম্মত।

মাটি পরীক্ষার জন্ত রাজ্যে ৯টি পরীক্ষাগার চালু আছে এবং আরও তিনটি এবছরের শেষে চালু হবে। এছাড়া ৬টি ভ্রাম্যমাণ মাটি পরীক্ষাগারের সাহায্যে বিভিন্ন গ্রামে গিয়েও কৃষকের জমির মাটি পরীক্ষার বন্দোবস্ত হয়েছে। এই অভিযানে হিন্দুস্থান ফার্টিলাইজার কর্পোরেশন এবং অগ্রাগ্র সংস্থা সরকারী কৃষি কর্মীদের সাথে একযোগে কাজ করে সারের ব্যবহারের বৃদ্ধি এবং উৎকর্ষ বাড়ানোর কাজ করে যাচ্ছে। সারের মান ও গুণাগুণ নির্ণয়ের জন্ত কলকাতা ও বহরমপুরে দুটি পরীক্ষাগার স্থাপিত হয়েছে। জীবাণু এবং জৈব সারের উৎপাদন ও ব্যবহার সুরু হয়েছে। জৈবসারের ব্যবহার বৃদ্ধির জন্ত নানারকম সরকারী অনুদানের ব্যবস্থা রয়েছে। তাছাড়া ভূমি ও জল সংরক্ষণ, মাটি সংশোধন ইত্যাদির কাজ

জোরদার করা হয়েছে। আরও অনেক বেশী করার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

অধিক ফলনশীল জাতের সম্প্রসারণ

ফসল উৎপাদন বৃদ্ধিতে অধিক ফলনশীল জাতের ও উন্নত মানের বীজের ব্যবহারের ব্যাখ্যার কোনও প্রয়োজন নাই। উন্নত মানের শংসিত বীজ সময়মত সরবরাহের জন্ত রাজ্য স্তরে একটি বীজ নিগম স্থাপিত হয়েছে। এর ফলে এ রাজ্যে কৃষকদের বীজের জন্ত অগ্র রাজ্যের উপর নির্ভরশীলতা কিছুটা কমেছে এবং আরও অনেক কমবে। ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক, বর্গাদার ও পাট্টাদার কৃষকদের মধ্যে অধিক ফলনশীল শস্যের চাষের দ্রুত প্রসারের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন ফসলের বীজ মিনিকিটের মাধ্যমে লক্ষ লক্ষ কৃষকদের বিতরণ করার প্রকল্প চালু রয়েছে। রবিতন্দ্রে প্রায় সব চাষাই গম ও অধিক ফলনশীল ধানের চাষ করেন। খরিফ খন্দেও প্রায় শতকরা ৩৫ ভাগ জমিতে অধিক ফলনশীল ধানের চাষ করা হয়ে থাকে। খরিফ খন্দে শতকরা ৬০ ভাগ জমিতে অধিক ফলনশীল ধানের আবাদ করে অনেক বেশী ফলন বাড়ানো সম্ভব। এই সঙ্গে নীচু জমিতে দেশী উন্নত ধানের চাষ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে করতে পারলে ধান উৎপাদনে এ রাজ্য ভারতের সমস্ত রাজ্যের থেকে এগিয়ে থাকতে পারবে।

ধানের উৎপাদন

ধান আমাদের প্রধান ফসল। খাদ্যশস্যের মোট উৎপাদনের প্রায় ৮৫ শতাংশ আসে ধান থেকে। ১৯৮৪-৮৫ সালে আমন চালের হেক্টর প্রতি গড় ফলন ১৫০৪ কেজি যা এ পর্যন্ত আমাদের সর্বাপেক্ষা বেশী ফলন। বোরো

বসুন্ধরা : ফাল্গুন-চৈত্র : ১৩৯২

খন্দের চালের ফলন হেক্টর প্রতি প্রায় ৩ টনের কাছাকাছি। এটিই আমাদের ধান উৎপাদনের সর্বাপেক্ষা ভাল মরশুম। অপেক্ষাকৃত নিচু এলাকায় শীত ও গ্রীষ্মকালে সেচের জলের ব্যবস্থার সাথে সাথে বোরো চাষের প্রসার লাভ করবে এবং এইভাবে বোরো ধানের উৎপাদনও দ্বিগুণ বৃদ্ধি করা সম্ভব হবে। ধানের উৎপাদনের উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধির জন্য ৭০টি ব্লকে ভারত সরকারের অর্ধাংশ আর্থিক আনুকূল্যে এ বছর থেকে বিশেষ প্রকল্প নেওয়া হয়েছে এবং ইতিমধ্যেই আশাপ্রদ ফলও পাওয়া যাচ্ছে।

শস্য রক্ষা

১৯৪৭-৪৮ সালে এ রাজ্যে শস্য রক্ষা সম্বন্ধে চাষীরা তেমন সচেতন ছিলেন না। বর্তমানে তাঁরা এ বিষয়ে যথেষ্ট সতর্ক হয়েছেন এবং প্রয়োজন ভিত্তিক সুপারিশমত শস্য রক্ষার ব্যবস্থা গ্রহণ করছেন। কীটনাশক ওষুধের মান ও গুণাগুণ নির্ণয়ের জন্য মেদিনীপুরে একটি সুসংহত পরীক্ষা এবং গবেষণাগার স্থাপিত হয়েছে। রোগ ও কীটনাশক মহামারী আকারে দেখা দিলে ক্ষেত্র বিশেষে বিনামূল্যে ৭৫ বা ৫০ শতাংশ অনুদানে রোগ ও কীটনাশক ওষুধ বিতরণের ব্যবস্থা রয়েছে। গত খরিফ মরশুমে ব্যাপকভাবে আমন ধানে প্রায় ৪ লক্ষ হেক্টর জমিতে পাম্বুরী পোকের আক্রমণ হয়েছিল। চাষীভাই, কৃষি সংস্থার কর্মীবৃন্দ, কৃষি সম্প্রসারণ কর্মী ও কৃষি উপকরণ ব্যবসায়ীগণের যৌথ প্রচেষ্টায় এই আক্রমণ বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই দমন করা সম্ভব হয়েছে।

কৃষি ঋণ

১৯৪৭-৪৮ সালে এই রাজ্যে কৃষি ঋণের

ব্যবস্থা খুবই নগণ্য ছিল। পরবর্তীকালে কৃষি ঋণের সুযোগ সুবিধা অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। বর্গাদাররাও যাতে সহজে কৃষি ঋণ পেতে পারেন সেজন্য প্রশাসনিক ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। এ ব্যাপারে সমবায় এবং বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলি এগিয়ে এসেছেন।

গবেষণা ও সম্প্রসারণের সমন্বয়

এ রাজ্যে কৃষি সম্প্রসারণ এবং গবেষণাকে সম্যক গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। সম্প্রতি এর কার্যক্রমের পুনর্বিচাচা করা হয়েছে। কৃষি জলবায়ু ভিত্তিতে বিভিন্ন ফসলের উপযোগী জাত উদ্ভাবন এবং নির্বাচন, বিজ্ঞানভিত্তিক সার প্রয়োগ, প্রয়োজন ভিত্তিক রোগ ও কীটনাশক ব্যবহার ও ফসলের উন্নত প্রযুক্তিগত বিষয়ের সূচু প্রচলনের উদ্দেশ্যে ৬টি আঞ্চলিক পরীক্ষা কেন্দ্র, ৬টি পণ্যশস্যের গবেষণা কেন্দ্র এবং মহকুমাস্তরে ৪৫টি উপযোগী পরীক্ষা কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। এ ছাড়া জলের সূচু ব্যবহার সম্পর্কে গবেষণা ও সম্প্রসারণ কার্যক্রমেরও পুনর্বিচাচা করা হয়েছে। রুটিনিভার চাষের প্রযুক্তিগত বিষয় এবং মাটি ও জল সংরক্ষণেরও সদ্যবহারের জন্য বাঁকুড়া, পুর্কুলিয়া ও মেদিনীপুরে তিনটি পরীক্ষা কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে।

উন্নত জাতের উদ্ভাবন

চুঁচুড়া ধান গবেষণা কেন্দ্র থেকে অনেকগুলি অধিক ফলনশীল এবং উন্নত জাতের ধান এবং বহরমপুর ডালশস্য ও তৈলবীজ গবেষণা কেন্দ্র থেকে অনেকগুলি উন্নত জাত উদ্ভাবিত হয়ে সর্বভারতীয় স্তরে স্বীকৃতি লাভ করেছে। এমনকি মালদা ও বর্ধমান কেন্দ্র থেকে কয়েকটি ভাল গমের জাতের উদ্ভাবন করে পূর্ব ভারতের

বিভিন্ন এলাকায় চাষীর জমিতে অশ্রান্ত অধিক ফলনশীল জাতের সাথে যাচাই করে দেখা হচ্ছে। ফল ও সবজির ক্ষেত্রেও কৃষকগণ উত্থান গবেষণা কেন্দ্র কয়েকটি নতুন জাতের সন্ধান দিয়েছে।

এলাকা উন্নয়ন

উত্তরবঙ্গের জলপাইগুড়ি, কোচবিহার এবং দার্জিলিং জেলার শিলিগুড়ি মহকুমার কৃষি, সেচ এবং ভূমি সংরক্ষণের জন্ত এলাকাভিত্তিক সামগ্রিক উন্নয়নের একটি বিশেষ কর্মসূচী হাতে নেওয়া হয়েছে। এ ছাড়া স্বন্দরবন উন্নয়ন প্রকল্প, সামগ্রিক অঞ্চল উন্নয়ন প্রকল্প, ভারত-জার্মান সার প্রশিক্ষণ প্রকল্প, ভারত ব্রিটিশ সার প্রশিক্ষণ প্রকল্প ও বিভিন্ন রাষ্ট্রায়ত্ত্ব ব্যাক্তের তত্ত্বাবধানে বহু এলাকায় কৃষি উন্নয়ন প্রকল্প চালু হয়েছে।

শস্যবীমা

প্রাকৃতিক দুর্যোগে অর্থনৈতিক বিপর্যয় থেকে কৃষককে বাঁচাতে রাজ্যের বিভিন্ন এলাকার আউশ, আমন, আলু ও বোরো ধানে শস্যবীমা চালু আছে। এই প্রকল্পে ভাগচাষী, ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের প্রদেয় প্রিমিয়ামের ৫০ শতাংশ রাজ্য সরকার বহন করে।

বার্ধক্য ভাতা

গত পাঁচ বছর ধরে দরিদ্র কৃষক ও কৃষি শ্রমিকদের বার্ধক্য ভাতা দেওয়া হচ্ছে। সামগ্রিক নিরাপত্তা বিধান এটি একটি বিশেষ পদক্ষেপ।

কৃষি বিপণন

ফড়ে ও অসামু্য ব্যবসায়ীদের হাত থেকে কৃষককে বাঁচাতে বাজারগুলিকে ক্রমে ক্রমে নিয়ন্ত্রণ আইনের আওতায় আনা হচ্ছে। গ্রাম থেকে বাজার পর্যন্ত পণ্য চলাচল উপযোগী রাস্তা

নির্মাণ করা হচ্ছে। ১৯৪৭-৪৮ সালে এ রাজ্যে একটাও হিমঘর ছিল না। এখন প্রায় ২৫০টি হিমঘরে প্রায় ১২ লক্ষ টন আলু সংরক্ষিত হচ্ছে। আলুর উৎপাদন ও রপ্তানি বৃদ্ধির জন্ত আরও ৭টি হিমঘরের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

আবহাওয়া বিজ্ঞানের প্রয়োগ

কৃষি উৎপাদন পরিকল্পনা এবং রূপায়ণে আবহাওয়া বিজ্ঞানের প্রয়োগের উদ্দেশ্যে কৃষি বিভাগে একটি আবহাওয়া শাখা গঠন করা হয়েছে। প্রতিটি কৃষি মহকুমার বিশেষ আবহাওয়া পর্যবেক্ষক কেন্দ্র এবং রাজ্যের বিভিন্ন খামারে মিলে মোট ১৩৭টি কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। আকাশবাণীর মাধ্যমে কৃষকগণকে আবহাওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন কৃষি কার্যক্রমের সুপারিশ প্রচার করা সম্ভব হচ্ছে।

কৃষি তথ্য প্রচার

কৃষি তথ্যের ব্যাপক প্রচার পুস্তিকা, পত্র-পত্রিকা, সংবাদপত্র, আকাশবাণী ইত্যাদি গণ-প্রচার মাধ্যমের সাহায্যে কৃষি প্রযুক্তিগত তথ্য এবং সরকারী নীতি নির্দেশ প্রচারের ব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছে। কৃষি অধিকারের মাসিক পত্রিকা 'বহুজ্ঞান'র মাধ্যমেও প্রযুক্তিগত নানা বিষয় এবং বিভাগীয় নীতি প্রচার করা হয়। প্রতি জেলায় কৃষি তথ্য কেন্দ্র স্থাপন এবং কৃষি প্রযুক্তির আরও বেশী প্রসারের প্রয়োজনীয়তা আছে।

প্রশিক্ষণ

১৯৪৭-৪৮ সালে এ রাজ্যে কৃষি শিক্ষার কোন ব্যবস্থাই ছিল না। বর্তমানে তিনটি কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে কৃষি বিষয়ে উচ্চ শিক্ষার ব্যবস্থা রয়েছে। সম্প্রতি উত্তরবঙ্গেও বিধান চন্দ্র কৃষি



বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি শাখা কোচবিহারে স্থাপন করা হয়েছে। এ ছাড়া ৭টি কৃষক প্রযুক্তি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ও ১৭টি জেলা কৃষক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে বিভাগীয় কর্মী ও কৃষককে উন্নত কৃষি পদ্ধতিতে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা হয়েছে। গ্রামস্তর পর্যন্ত কৃষি প্রযুক্তির প্রশিক্ষণ এবং প্রদর্শনের বিস্তার করে সরাসরি কৃষকগণের সাথে যোগাযোগের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

কৃষি পরিসংক্ৰণ এবং মূল্যায়ন কার্যক্রম

কৃষিউন্নয়ন প্রকল্প রচনা, রূপায়ণ ও মূল্যায়নের জ্ঞান সঠিক সময়ে কৃষি পরিসংখ্যান বিশ্লেষণ ও প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহের গুরুত্ব অনেক বেশী। এজন্য ১৯৮০ সালে কৃষি পরিসংখ্যান ও অর্থনীতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কৃষি অধিকারের

সমাজ অর্থনীতি ও মূল্যায়ন শাখার পুনর্বিভাগ করা হয়েছে।

উপসংহার

সংক্ষেপে বলা যায়, পশ্চিমবাংলায় কৃষি উন্নয়নে কেবল গবেষণা ও সম্প্রসারণ, সেচ ও সারের স্তর ব্যবহার, সুসংহত উপায়ে ফসল, বীজ, শস্য সংরক্ষণ ও বিপণন এবং ভূমি সংরক্ষণের উপরই জোর দেওয়া হয়নি, কৃষকদের সামাজিক নিরাপত্তা ও সামঞ্জস্য বিধানও সমহারে জোর দেওয়া হয়েছে। বিজ্ঞানী, কৃষি প্রযুক্তিবিদ, কৃষক ও অসচ্ছিন্ন জনসাধারণের সক্রিয় সহযোগিতায় কৃষি উৎপাদন বাড়িয়ে অচিরে পশ্চিমবাংলাকে স্বয়ংসম্পূর্ণ করে তুলতে পারবে, এই আশা রাখি।

চীনাবাদামের চাষ

পশ্চিমবঙ্গে তৈলবীজের ঘাটতি মেটাতে অগ্ৰাণ্য তৈলবীজের সঙ্গে চীনাবাদামের উৎপাদন বাড়ানোর ওপরও গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। কারণ চীনাবাদামের হেক্টর প্রতি ফলন বেশী এবং এতে তেলের পরিমাণও বেশী। তেলের ভাগ এতে আছে শতকরা ৪৫ থেকে ৫০ অংশ। পশ্চিমবঙ্গে চীনাবাদামের চাষ বাড়ানোর যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে। গত পাঁচ বছরে দেখা গেছে পশ্চিম-বঙ্গের কয়েকটি জেলায় চীনাবাদামের চাষ বেশ দ্রুতগতিতে বাড়ছে। এই চাষের আর একটি সুবিধা হলো খরিফ ও রবি দুই মরসুমেই এর চাষ করা যায়। বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, মেদিনীপুর (পশ্চিম), বর্ধমান প্রভৃতি জেলার উচু জমির লাল ও কঁকুরে মাটিতে যেখানে ধান চাষ ভাল হয় না সেসব অঞ্চলে খরিফে লাভজনকভাবে চীনাবাদামের চাষ করা যায়। বর্তমানে খরিফে পুরুলিয়া, বাঁকুড়া এবং মেদিনীপুর (পশ্চিম) জেলায় এর চাষ ক্রমশঃ বাড়ছে। গ্রীষ্ম মরসুমে মেদিনীপুর (পূর্ব), জগলী, নদীয়া ও মুর্শিদাবাদেও এর চাষ হচ্ছে। এছাড়া সুন্দরবন ও অগ্ৰাণ্য সমুদ্র উপকূলবর্তী অঞ্চলে আমন ধান কাটার পর জমির রসে বিনা সেচে রবি ফসল হিসাবে এর চাষ করা যায়, পশ্চিমবঙ্গে চীনাবাদামের চাষ বাড়ানোর সম্ভাবনা থাকায় এবছর একটি বিশেষ প্রকল্পও এজ্ঞা নেওয়া হয়েছে যাতে এর ফলন বাড়ানো যায়।



শুধু প্রকল্প নিলেই হবে না, ভাল ফলনের জন্য চাষও ঠিকমত করা দরকার। কিভাবে চাষ করলে ভাল ফলন পাবেন এ সম্বন্ধে এখানে আলোচনা করা হলো।

জমি

উচু ও মাঝারি বেলে দো-আঁশ এবং দো-আঁশ মাটি বাদাম চাষের পক্ষে উপযোগী। অল্প জমিতে পরিমাণ মত চুন দিয়ে বাদাম চাষের উপযোগী করে নেওয়া যায়।

জমি তৈরি ও সার দেওয়া

বাদামের শুঁটি মাটির নীচে বাড়ে, তাই সোজা হুজি ও আড়া আড়াভাবে বারে বারে চাষ দিয়ে মাটি ভালভাবে ঝুরঝুরে করে তৈরি করুন। মাটি ঝুরঝুরে ও আলগা হলে বাদামের আকার বড় এবং ফলন বেশী হয়। জমি তৈরি করার সময় হেক্টর প্রতি ২০ থেকে ২৫ গাড়ী পচা গোবর সার বা কম্পোষ্ট ভাল করে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিন। শেষ চাষের সময় হেক্টর পিছু ১০ কেজি নাইট্রোজেন, ৩০ কেজি ফসফেট এবং ৪১ কেজি পটাশ ছড়িয়ে দিয়ে মাটির সঙ্গে ভাল করে মিশিয়ে দিন। জমিতে উই পোক

বঙ্গবন্ধু : ফাল্গুন-চৈত্র : ১৩৩২

উপগ্রহ থাকলে জমি তৈরির সময় হেক্টর প্রতি ৩০ কেজি অলট্রিন (৫%) বা হেপ্টাক্লোর (৫%) বা ক্লোরডেন (৫%) মিশিয়ে দিন।

জাত

জাত হিসেবে বাদামকে দু' ভাগে ভাগ করা হয়।

(ক) খাড়া বা গুচ্ছ জাতীয়।

(খ) লতানো বা ছড়ানো জাতীয়।

পশ্চিমবাংলার পরিস্থিতি ও অবস্থা অনুযায়ী গুচ্ছ জাতের বাদামই ভাল।

গুচ্ছ জাত

(১) টি-এম-ভি ২ : জলদি জাতের, ২০ থেকে ২৫ দিনে পাকে। হালকা গোলাপী ছোট দানা, তেল আছে শতকরা ৫৩ ভাগ।

(২) টি-এম-ভি ৭ : খরা সহনশীল। ১০৫ দিনে পাকে। মাঝারি দানা। তেল শতকরা ৪২ ভাগ।

(৩) জে-১১ : মাঝারি জাতের, ১১০—১১৫ দিনে পাকে। মাঝারি দানা। তেল ৫১%।

(৪) এ-কে ১২-২৪ : ১১০—১১৫ দিনে পাকে। মাঝারি দানা। তেল শতকরা ৫০ ভাগ।

(৫) এম্-এইচ ২ : বেঁটে জাত। মাঝারি আকারের দানা। ১১৫—১২৫ দিনে পাকে। তেল শতকরা ৫১ ভাগ।

(৬) ফুলে প্রগতি (জে-এল ২৪) জলদি জাত। ১০০—১১০ দিনে পাকে। তেল শতকরা ৫০ ভাগ। খরিফ মরসুমে চাষের উপযোগী।

বীজের হার

হেক্টর প্রতি ১০০—১১০ কেজি।

বীজ শোধন

বোনার এক সপ্তাহ আগে খোসা ছাড়ানো

প্রতি কেজি নীরোগ ও পুষ্ট বীজে ৩ গ্রাম ব্রাসিকল বা ৪ গ্রাম থাইরাম জাতীয় ওষুধ ভালভাবে মিশিয়ে শোধন করে নিন।

বোনার সময়

প্রাক-খরিফ, খরিফ ও রবি মরসুমে বাদামের চাষ করা যায়। তবে প্রাক-খরিফ ও খরিফে চাষই প্রধান। খরিফে সাধারণতঃ সেচের দরকার হয় না, রবি ও প্রাক-খরিফে দরকার হয়। যে সব অঞ্চলে কার্তিকের শেষ থেকে মাঘ মাস পর্যন্ত মাটিতে ভাল রস থাকে সেখানে বিনা সেচেও চাষ করা যায়, কিন্তু ফসল তুলতে সময় বেশী লাগে। খরিফে বোশেখ থেকে আষাঢ় এবং রবিতে কার্তিকের শেষ থেকে অশ্বিন এবং প্রাক-খরিফে মাঘ—ফাল্গুন বীজ বোনার উপযুক্ত সময়। লালমাটি অঞ্চলের ডাঙ্গা জমিতে বর্ষা শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বীজ বোনা দরকার।

বীজ বোনা

মাটিতে ঠিকমত 'জো' এলে প্রতি খুপীতে একটি করে শোধন করা পুষ্ট বীজ ৫ সে.মি (২ ইঞ্চি) গভীরে বুনুন। গুচ্ছ জাতে সারি থেকে সারির দূরত্ব হবে ৩০ সে.মি, এবং সারিতে বীজ থেকে বীজের দূরত্ব হবে ১০ সে.মি (৪ ইঞ্চি)। এম্-এইচ ২ জাতের বেলায় সারি থেকে সারির দূরত্ব ১৫ সে.মি, হবে।

পরিচর্যা

বাদামের ফলন অনেকটা নির্ভর করে যথাযথ পরিচর্যার উপর। বীজ থেকে কল বের হওয়ার দু' সপ্তাহের মধ্যে চাকা-বিদার সাহায্যে ক্ষেতের আগাছা পরিষ্কার করুন। দু' সপ্তাহ পরে দ্বিতীয়বার চাকা-বিদা চালান। গাছের সারির মাঝের আগাছা হাত নিড়ানির সাহায্যে তুলে

দিন। প্রথম ফুল আসার ৩ থেকে ৪ দিনের মধ্যে মাথায় গাছের গোড়ায় মাটি টেনে ফেলি বেঁধে দিন। মাটি আলগা থাকলে ফুল ভালভাবে মাটিতে ঢুকতে পারে এবং বাদাম ধরতেও অনেকটা সুবিধা হয়। এবার লেটের কথায় আসা যাক।

খরিফ মরসুমে ত্রিকমত বৃষ্টি হলে সেটের দরকার নেই। বৃষ্টি না হলে ২০ থেকে ২৫ দিন অন্তর ছালকা সেচ দেওয়া দরকার। প্রাক-খরিফে ও রবি মরসুমে মাটি, বৃষ্টি ও ফলনের অবস্থা অনুযায়ী ২ থেকে ৪ বার সেচ দিন।

রোগ	প্রতিকার
(১) টিক্কা	প্রতি লিটার জলে ২৫ গ্রাম জিনের কম্পাউন্ড (যেমন ডাইথেন এম-৪৫ ইত্যাদি) বা ১ গ্রাম ফলটন (যেমন ডাইফোলেটান ইত্যাদি) বা ৭ গ্রাম কপার অক্সিক্লোরাইড (যেমন ব্রাইটজ ইত্যাদি) জলে গুলে স্প্রে করুন।
(২) মরচে রোগ	প্রতি লিটার জলে এক গ্রাম বেনলেট ৫০ বা ব্যাজিট্রিন গুলে স্প্রে করুন।
(৩) ঢলে পড়া রোগ	প্রতি লিটার জলে ১ গ্রাম হিসাবে ফলটন (যথা ডাইফোলেটান ইত্যাদি) গুলে কেবল আক্রান্ত জায়গায় গাছের গোড়ায় মাটি জিজিয়ে স্প্রে করুন।
পোক	
লাল শুঁয়োপোকা	প্রতি লিটার জলে ১ মিলিলিটার হিসাবে মিথাইল প্যারাবিথিয়ন (যেমন মেটাসিড ৫০ ই-সি ইত্যাদি) বা এণ্ডোসালফান (যেমন থায়োডান ৩৫ ই-সি ইত্যাদি) গুলে স্প্রে করুন।

এক হেক্টরে রোগ-পোকা দমনের ওষুধ ছেঁটতে মোটামুটি ৭৫০ লিটার জল লাগে।

ফসল তোলা

গুচ্ছ জাতের গাছের পাতায় অনেক ডাড়াডাড়া হলে রং ধরে। বীজ বোমার ১১৫ থেকে ১২০ দিনের পরে মাঠের ৪ থেকে ৫ জায়গা থেকে কয়েকটি গাছ তুলে যদি দেখা যায় (ক) অল্প চাপে বাদামের খোসা ভেঙে যাচ্ছে, (খ) খোসার ভেতরে গিরাগুলিতে কালচে রং ধরছে, (গ) বীজের উপরকার পাতলা খোসাতে রং ধরেছে তাহলে বুঝতে হবে বাদাম তোলার সময় হয়েছে। প্রাক-খরিফ ও খরিফ মরসুমের চেয়ে রবি মরসুমে বাদাম পাকতে ৩০ থেকে ৪৫ দিন সময় বেশী লাগে। মাটি ফিল্ডে থাকলে গাছ টেনে অথবা লালল দিয়ে তুলে বাদাম ছাড়িয়ে নিন। বাদাম তুলে সঙ্গে সঙ্গে ভালভাবে শুকিয়ে নিন।

প্রাক খরিফে মুগের চাষ লাভজনক

ডালশস্য উৎপাদনে পশ্চিমবঙ্গ একটি ঘাটতি রাজ্য। এই ঘাটতি যতটাসম্ভব পূরণ করার জন্য ডালশস্যের উৎপাদন বাড়াবার উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকারও ডালশস্যের উৎপাদন বাড়াবার উপর যথেষ্ট গুরুত্ব দিচ্ছেন। সেইমত এ বছর ডালশস্যের উৎপাদন বাড়াবার জন্য খরিফে ও রবিতে কার্যসূচীও নেওয়া হয়েছে। এই ঘাটতি পূরণে প্রাক-খরিফে মুগের চাষ একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারে। এই সময়ে মুগের চাষ করলে তা লাভজনকও হয়। স্বল্পমেয়াদী উন্নত জাত উদ্ভাবনের ফলে সেচসেবিত অঞ্চলে সরষে, গম ও আলুর পর এবং পাট, আউশ ও আমন ধান লাগাবার আগে একটি ৬০—৭০ দিনের মুগের চাষ করে নেওয়া যায়। এই চাষে জমির উর্বরতাও বাড়ে আবার পরের ফসলের জন্য তা লাভজনকও হয়।

মুগের ভাল ফলন পেতে গেলে যে বিষয়গুলির উপর গুরুত্ব দেওয়া দরকার সেগুলি সম্বন্ধে এখন আলোচনা করা হচ্ছে।



উন্নত মানের বীজ ব্যবহার করা

হেক্টর প্রতি ফলন বাড়তে গেলে প্রথমেই যেটি দরকার তা হলো উন্নত জাতের বীজ ব্যবহার করা। বহরমপুরের ডাকশস্য ও তৈলবীজ কেন্দ্র থেকে মুগের কয়েকটি উন্নতজাত পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলে চাষের জন্য সুপারিশ করা হয়েছে। যেমন মুগ বি-১, বি-১০৫, টি-৫১ ও টি-৪৪। এ ছাড়া সম্প্রতি কে-৮১, পি-এস-১৬ ও পদ্ম মুগ-২, এই তিনটি পরীক্ষিত স্বল্পমোয়াদী মুগের উন্নত জাতও পশ্চিমবঙ্গে ভাল ফল দিয়েছে।

এই জাতগুলির মধ্যে মুগ বি-১০৫ (পান্না) ৫৫—৬০ দিনে পাকে। হেক্টর প্রতি ফলন ৮—১০ কুইন্টাল। মুগ বি-১ (সোনালী) সোনালী রঙের ছোট দানা। ৬০—৬৫ দিনে পাকে। হেক্টর প্রতি ফলন ৮—৯ কুইন্টাল। মুগ টি-৪৪ ও টি-৫১ : ৬০—৭৫ দিনে পাকে। হেক্টর প্রতি ফলন ৮—১০ কুইন্টাল। কে-৮৫১ : ৬০—৬৫ দিনে পাকে। হেক্টর প্রতি গড় ফলন ৮—১০ কুইন্টাল। পি-এস ১৬ : ৬০—৭০ দিনে পাকে। হেক্টর প্রতি গড় ফলন ৮—১০ কুইন্টাল। পদ্ম মুগ-২ : ৬০ দিনে পাকে। হেক্টর প্রতি ফলন ৭—৮ কুইন্টাল।

বীজ বোনা

উন্নত জাতের বীজ হলেই হবে না, তা ঠিকমত বোনাও দরকার। সময়মত বীজ বোনা ও সঠিক হারে বীজ বুন হেক্টর প্রতি উপযুক্ত সংখ্যক গাছ রাখা, এই বিষয়ে বিশেষ নজর রাখা দরকার। ঠিক সময়ে বীজ না বুনলে ফলন অপেক্ষাকৃত কম হয়। পরীক্ষা করে দেখা গেছে ফাল্গুন-চৈত্র মাসে একটি সেচ দিয়ে মুগ

বি-১ বুনলে হেক্টর প্রতি ১০—১২ কুইন্টাল অবধি ফলন পাওয়া যায়। বোনার আগে জমিটি দুই তিনটি চাষ দিয়ে তৈরি করে নিতে হবে।

হেক্টর প্রতি উপযুক্ত সংখ্যক গাছ রাখতে গেলে সঠিক হারে সারিতে বীজ বোনা দরকার। প্রাক-খরিফে মুগ প্রতি হেক্টরে ৩০—৩৫ কেজি হারে সারিতে ২০×৫ সে.মি, দূরত্বে বুনলে উপযুক্ত সংখ্যক গাছ থাকবে এবং ফলনও ভাল হবে। ছিটিয়ে বুনলে প্রতি বর্গমিটারে অন্ততঃ ১০০টি গাছ রাখা দরকার।

সেচ ও পরিচর্যা

মুগে সাধারণতঃ সেচের প্রয়োজন হয় না। বীজ বোনার সময় মাটির অবস্থা বুঝে বীজ বোনার আগে একটি হালকা সেচ দেওয়া দরকার। ফুল আসার সময় একটি হালকা সেচ দিলে ফলন পাওয়া যায়, তবে মাটিতে যথেষ্ট রস থাকলে এই সেচের প্রয়োজন নেই। ডালের ক্ষেতে পরিচর্যা সাধারণতঃ করা হয় না। তবে ভাল ফলন পেতে হলে আগাছা পরিষ্কার করা একান্ত দরকার।

সার ও জীবাণু সারের ব্যবহার

মুগ একটি গুঁটি জাতীয় ফসল। এর শিকড়ে এক বিশেষ ধরনের রাইজোবিয়াম জীবাণু গুটি বাঁধে ও বাতাস থেকে নাইট্রোজেন সংগ্রহ করে গাছকে সরবরাহ করে। যতদিন পর্যন্ত শিকড়ে রাইজোবিয়াম জীবাণু গুটি বেঁধে তা কার্যকরী হচ্ছে ততদিন সারের চাহিদা মেটানোর জন্য হেক্টর প্রতি ১০—১২ কেজি নাইট্রোজেন সার দিতে হবে। বীজ বোনার আগে মুগের জন্য নিদিষ্ট জীবাণু সার নিদিষ্ট প্রথায় বীজের সঙ্গে

বসুন্ধরা : ফাল্গুন-চৈত্র : ১৩৯২

মিশিয়ে নিতে হবে।

ফসফেট ঘটিত সার ডালশস্ত্রের জন্য বিশেষ প্রয়োজনীয়। উর্বরতা বিশেষে হেক্টর প্রতি ৪০—৫০ কেজি ফসফেট দেওয়া একান্ত দরকার। শস্তরক্ষা

রোগপোকার আক্রমণ থেকে শস্তরক্ষা করার জন্য বীজ বোনার আগে বীজ অবশ্যই শোধন করে নিতে হবে। বোনার সাতদিন আগে ১ কিলোগ্রাম বীজে ১৫ গ্রাম থাইরাম ও ১৫ গ্রাম ত্রাসিকল ৮০ মিশিয়ে বীজ শোধন করে নিলে চারা অবস্থায় রোগের আক্রমণ প্রতিরোধ করার শক্তি জন্মায়।

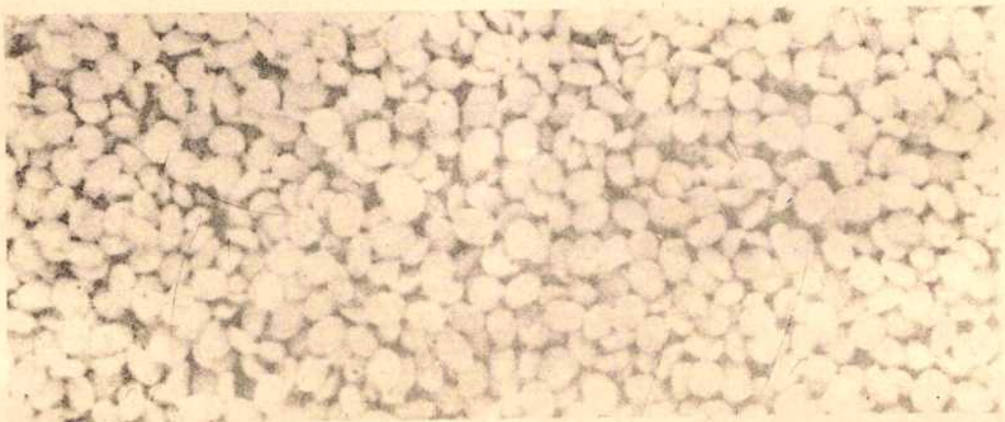
প্রাক-থরিফ মরহুমের মৃগ গাছে রোগপোকার আক্রমণ কম হয়। তবে রোগের মধ্যে প্রধান হলো কুটে রোগ। এই রোগ জীব পোকার মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে। এই রোগ দমন করতে হলে রোগ সহনশীল প্রজাতির চাষ করা দরকার। রোগ দেখা দিলে প্রথম অবস্থায় রোগাক্রান্ত গাছগুলি তুলে ফেলতে হবে। রোগ বহনকারী জীব পোকা দমনের জন্য মিথাইল ডেমিটন ঘটিত

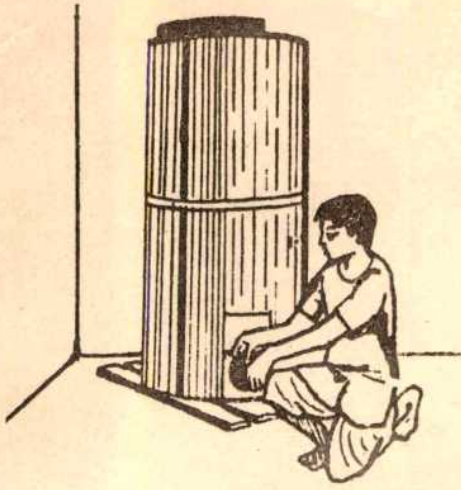
ওষুধ যেমন মেটাসিস্টক্স বা ডাইমিথোয়েট ঘটিত ওষুধ যেমন রোগের প্রতি লিটার জলে এক মিলি লিটার মিশিয়ে ছিটাতে হবে। এরছাড়া একর প্রতি ২৫০—৩০০ লিটার মিশ্র জ্বল লাগবে।

মৃগে বিছা বা লোদা পোকার আক্রমণও হতে পারে। এই পোকা দমনের জন্য মিথাইল প্যারাথিয়ন ঘটিত ওষুধ যেমন মেটাসিস্টক্স প্রতি লিটার জলে ১৫ মিলিলিটার পরিমাণমত মিশিয়ে ছিটাতে হবে। এরছাড়া মিশ্র জ্বল একর প্রতি ২৫০—৩০০ লিটার লাগবে। রোগ-পোকার আক্রমণ প্রতিহত করতে মাঠ ঘুরে দেখা দরকার এবং প্রয়োজনীয় পরিমাণ ওষুধ প্রয়োগ করা দরকার।

ফসল কাটা

ভাল ফলন ও উন্নত মানের বীজ পেতে হলে উপযুক্ত সময়ে ফসল কাটা দরকার। জাত ভেদে বোনার ৫০—৬০ দিনের মধ্যে প্রথমবার তোলার মত হয়ে যায়। এরপর ১০-১৫ দিনের মধ্যে বেশিরভাগ গুটিই পেকে যায় এবং তখন ফসল কেটে নিতে হয়।





শুলেখা ঘোষ

রুবি ফসলের বীজ সংগ্রহ ও সংরক্ষণ

রুবি ফসলের বীজ সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করার কথা এখনই আমাদের ভাবতে হবে। সরষে উঠেছে। গম ও বিভিন্ন ডালশস্য শীতের ঘরে উঠবে। কাজেই আগামী মরশুমে চাষের জন্য এইসব শস্যের বীজ এখনই সংগ্রহ করতে হবে এবং আগামী মরশুমে তা যাতে ব্যবহার করা যায় সেজন্য তা ভালভাবে সংরক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে।

সংরক্ষণের জন্য কি ধরনের বীজ সংগ্রহ করতে হবে তা আগে জানা দরকার। ভাল ফলনের জন্য পুষ্ট, পক, নিটোল, নিরোগ বীজের দরকার। ফসল কাটার আগে, জমির যে অংশে ফসল ভাল হয়েছে, অর্থাৎ দানা পুষ্ট ও পক হয়েছে সেই অংশটুকু আলাদা করে নিতে হবে। অবশ্যই সেখানকার গাছ যেন রোগ-পোকার আক্রমণমুক্ত হয়। যে অংশটি বীজের জন্য চিহ্নিত করা হয়েছে, দেখতে হবে সেখানে যেন অন্য জাতের গাছ না থাকে। যদি কোন

আগাছা থাকে তাহলে তা তুলে ফেলতে হবে। যাতে আসল বীজের সঙ্গে এইসব আগাছার বীজ মিশে না যায়।

যে অংশ থেকে বীজ সংগ্রহ করা হবে স্থির হয়েছে সেই অংশের ফসল ভালভাবে পাকলে আলাদা করে কেটে, আলাদা করে ঝাড়াই করে নিতে হবে।

বীজ সংগ্রহের কাজ শেষ হলে তা সংরক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। সংগৃহীত বীজের প্রধান শত্রু হলো চারটি।

- (১) পোকা মাকড়।
- (২) সঁতানো
- (৩) অত্যাধিক গরম
- (৪) ইঁদুর

প্রথমেই ধরা যাক পোকা মাকড়। শুষ্ক ও পরিষ্কার বীজে রোগ-পোকা কম লাগে। কাজেই বীজ সংগ্রহের পর তা ভালভাবে ঝেড়ে পরিষ্কার করে নিতে হবে। তারপর রোদে তিন চার

বন্ধকরা : ফাল্গুন-চৈত্র : ১৩২২

বার শুকিয়ে ছায়াতে ঠাণ্ডা করে নিতে হবে। শস্যের দানা ঠিকমত শুকিয়েছে কিনা তা বোঝার জন্য দাঁতে কেটে দেখতে হবে। যদি দাঁতে কাটার সময় কট করে শব্দ হয় তবে বুঝতে হবে বীজ ভালভাবে শুকিয়েছে। এই বীজ ভাল পাত্রে রাখলে তাতে রোগপোকার আক্রমণ কম হয়। যে ঘরে বীজ রাখা হবে সেটা অবশ্যই ভালভাবে পরিষ্কার করে নিতে হবে। আগের কোন বীজ বা অপরিষ্কার জিনিস যেন সেখানে জমা না থাকে। সম্ভব হলে ঘরটির মেঝে এবং দেওয়ালের চার ফুট পর্বন্ত সাইথিয়ন বা ক্যালথিয়ন প্রাতিলিটার জলে ২ মি.লি, হারে মিশিয়ে স্প্রে করে নিলে আগের কোন পোকা থাকবে না। ঘরটি পরিষ্কার ও কীটমুক্ত হবে।

গ্রীষ্মকালে গরমে বীজ অনেক সময় ভেপে যায়, তাতে বীজের ক্ষতি হয়। সেজন্য গ্রীষ্মকালে বীজ মাঝে মাঝে নেড়ে চেড়ে রাখলে ভিতরের গরম বাতাস বেড়িয়ে যায় ও ঠাণ্ডা হাওয়া ঢুকে তাপমাত্রা ঠিক রাখে।

বেশী গরমে সংরক্ষিত বীজ যেমন ভেপে যেতে পারে আবার বর্ষায় জলীয় আবহাওয়ায় বীজ অনেক সময় সঁতিয়ে যায়। বীজের মধ্যে জলের ভাগ বেড়ে যায়। ফলে বীজ নরম হয়ে যায়, পোকা সহজেই বীজ আক্রমণ করতে পারে। সেখানে তাদের বংশবৃদ্ধিও সহজ হয়। বীজের মধ্যেও তারা বাসা বাঁধে। এমন ঘরে বীজ রাখতে হবে যেখানে আলো বাতাস খেলে এবং ঘরটি সব সময় শুষ্ক থাকে। বীজ-

ধারের দিকেও নজর দিতে হবে। সাধারণ কৃষকরা মাটির জালা, বড় টিন, বীজ রাখার জন্য ব্যবহার করে থাকেন। অনেক সময় খড়ের মোটা দড়ি পাকিয়ে পাত্র তৈরি করে, তাতে শস্য রাখেন। এইসব পাত্রের অস্থবিধা হলো এর মধ্যে সহজেই বাতাস ঢুকে পড়ে। ফলে বীজ সঁতিয়ে নরম হয়ে যায়। পোকা বাসা বাঁধে। বীজ ভালভাবে রাখার জন্য খাতব পাত্রই সবচেয়ে ভাল। এগুলি বাতাস ও জলীয় হাওয়া রোধ করতে পারে। কৃষকের এই পাত্র কিনতে যাতে অস্থবিধা না হয় সেজন্য কৃষককে সরকার থেকে ভরতুকীও দেওয়া হয়।

ইঁহুর অনেক সময় বীজের ক্ষতি করে। তাই যে ঘরে বীজ রাখা হয়েছে মধ্যে মধ্যে সেই ঘর ভাল করে দেখা দরকার, সেখানে কোন ইঁহুরের গর্ত হয়েছে কিনা। ইঁহুরের উৎপাত দেখলেই সঙ্গে সঙ্গে তা দমনের জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা নিতে হবে।

সমস্ত যত্ন তদারকির পরও যদি দেখা যায় যে বীজে পোকা লাগছে তাহলে বীজগুলি কড়া রোদে শুকিয়ে, ছায়ায় ঠাণ্ডা করে বেড়ে বেছে আবার পাত্রে রাখতে হবে। তারপর বিষাক্ত বড়ি যেমন সেলফস বীজের মধ্যে রেখে পাত্রের মুখ ভালভাবে বন্ধ করে দিন। এই বড়ি যেহেতু খুব বিষাক্ত তাই বীজ বার করার সময় খুব সতর্ক থাকতে হবে। গ্যাস যেন কোনমতে মুখে নাফে না ঢোকে। খোলা জায়গায় বীজধার নিয়ে সবরকম সাবধানতা অবলম্বন করে বীজ বার করতে হবে।



বৈশাখ মাসে কৃষকের করণীয়

বৈশাখের প্রধান চাষ হলো পাট ও আউশ ধান।

আউশ

আপনার জমির অবস্থান অনুযায়ী উপযুক্ত বীজ বেছে নিন। পলিমাটি অঞ্চলের জন্য উপযোগী অধিক ফলনশীল জাত পলমন ৫৭৯, সি-এন-এম ২৫, সি-আর ১২৬-৪২-১, আই-ই-টি-২২৩৩ ও আই-আর ৩৬ ও ৫০। সরাসরি বোনার আগে বা শুকনো বীজতলায় বীজ ফেলার আগে প্রতি কেজি বীজের সঙ্গে তিন গ্রাম শুকনো গুঁড়ো ইথাইল মারকিউরিক ক্লোরাইড বা ফিনাইল মারকিউরিক গ্র্যাসিটেট মিশিয়ে বীজ শোধন করে নিন।

জমি তৈরির জন্য তিন-চার বার লাঙ্গল ও মই দিয়ে মাটি খুবখুরে করে ভালভাবে আগাছা বেছে ফেলুন। একরে ৮—১০ গাড়ী গোবর বা কম্পোস্ট সার দিন। শেষ চাষের আগে একরে ১০ কেজি করে ফসফেট ও পটাশ দিন এবং রোয়া ধানে নাইট্রোজেন শেষ চাষের আগে

৫ কেজি এবং বাকী ১৫ কেজি চাপান হিসাবে ছবারে দিন। বোনা ধানে নাইট্রোজেন সবটাই চাপান হিসাবে তিনবারে দিন।

পাট

বৈশাখের মাঝামাঝি পর্যন্ত তেতো পাট সবুজ সোনা ও শ্যামলী বুনুন। নির্দিষ্ট সময়ের আগে পাট বুনবেন না। তাতে অসময়ে ফুল এসে ফলন কমে যাবে।

মুগ

যারা ফাল্গুন-চৈত্র মাসে মুগ বুনছেন তাদের এখন ক্ষেতে পরিচর্যা ও রোগপোকা দমনের জন্য যত্ন নিতে হবে।

অন্যান্য ফসল

এই মরসুমে সবুজি চাষ খুবই লাভজনক। ঢেঁড়স, বরবটি, বেগুন, লাউ, ঝিঙ্গে, করলা, ডাঁটা, পুঁই প্রভৃতির চাষ করে আপনার আয় বাড়ান। অড়হড়, চীনাবাদাম প্রভৃতির চাষ করেও বাড়তি আয় করা যায়।

ফরম—৪
রুল নং—৮
“বসুন্ধরা” মাসিক পত্রিকা

কেন্দ্রীয় সংবাদপত্র রেজিস্ট্রেশন নিয়মাবলীর (১৮৫৬) ৮ ধারা অনুযায়ী নিম্নলিখিত জাতব্য বিষয় প্রকাশিত হইল।

১। প্রকাশ স্থান—	৪২, গ্রাহামস্ রোড, কলিকাতা-৭০০০৪০
২। প্রকাশ কাল—	মাসিক
৩। মুদ্রাকরের নাম—	তারাপদ রায়চৌধুরী
জাতি—	ভারতীয়
ঠিকানা—	৪২, গ্রাহামস্ রোড, কলিকাতা-৭০০০৪০
৪। প্রকাশকের নাম—	কৃষি অধিকারের কৃষি তথ্য সংস্থা
জাতি—	—
ঠিকানা—	—
৫। প্রধান সম্পাদকের নাম—	ডঃ দেবব্রত মুখার্জী
জাতি—	ভারতীয়
ঠিকানা—	রাইটার্স বিল্ডিংস, কলিকাতা-৭০০০০১

আমি শ্রী দেবব্রত মুখার্জী, এতদ্বারা ঘোষণা করিতেছি যে, উপরোক্ত তথ্যগুলি আমার জান ও বিশ্বাস মতে সত্য।

স্বাঃ—দেবব্রত মুখার্জী
প্রধান সম্পাদক, বসুন্ধরা

সংবাদ

ককদ্বীপে কৃষক মেলা

গত ২৪শে ফেব্রুয়ারী '৮৬, ডায়মণ্ডহারবারের
হুমা কৃষি আধিকারিক রুস্তুনীরমণ
কায়েতের ব্যবস্থাপনায় একদিনের কৃষক
মেলা আয়োজন করা হয় আঞ্চলিক উপযোগী
কৃষক কেন্দ্র ককদ্বীপ এর প্রশিক্ষণ হলে।
এখানে দেড়শো কৃষকসহ কৃষিকর্মী ও বিশেষজ্ঞরা
গমন করেন। একটি প্রদর্শনীরও ব্যবস্থা করা
হয়। এতে অংশ নেয় হিন্দুস্থান ফারটিলাইজার
করপোরেশন লিমিটেড, ইন্দোফিল ক্যামিক্যালস্
লিমিটেড, ইষ্টার্ন ক্যামিক্যালস্ ইণ্ডাস্ট্রিস্,
সিটিসাইডস্ ইণ্ডিয়া প্রমুখ সংস্থাগুলি।
আলোচনা সভার প্রারম্ভে গবেষণা কেন্দ্রের
কৃষিবিদ ডঃ পঙ্কজ মাইতি কৃষকভায়েদের
কেন্দ্রের চাষবাস ঘুরিয়ে দেখান। কৃষকভায়েরা
লালা, তুলো, সূর্যমুখী, সুগার বীট, তরমুজ ও
সুগার চাষ লক্ষ্য করেন। তাঁরা ৭ একরের
মানাস্কায়া জাতের সুগার বীট, মর্ডেন জাতের
সুগার বীট একরে সূর্যমুখী ও ৭৫ শতক জমিতে বিভিন্ন
জাতের লক্ষ্য চাষ দেখে খুশী হন। লক্ষ্য

জাতগুলি হোল সাগরহুন্দরী, জোহালা ও সিতি।
পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কৃষি বিভাগের ভ্রাম্যমান
মুক্তিাগার মারফৎ কৃষকদের আনিত প্রায়
পঞ্চাশটি মাটির নমুনা পরীক্ষা করা হয়। এরপর
নামখানা ব্লকের নাদাভাঙ্গা গ্রামের কৃষক প্রকৃতি
রঞ্জন গুচ্ছাইতের সভাপতিত্বে আলোচনা সভা
শুরু হয়। মহকুমা কৃষি আধিকারিকের স্বাগত
ভাষণের পর, দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলা প্রশিক্ষণ
আধিকারিক বনক কমল চট্টোপাধ্যায় “কৃষক
মেলা উদ্দেশ্য”, রাজ্য কৃষি বিভাগের মুক্তিকা
রসায়নবিদ মনীষা দে “মাটি পরীক্ষা কেন”,
হিন্দুস্থান ফারটিলাইজার করপোরেশনের কৃষিবিদ
ডঃ হেমন্ত হালদার “জৈব ও রাসায়নিক সারের
প্রয়োগ ও কার্যকারিতা”, রাজ্য কৃষি বিভাগের
শস্ত্র রোগ গবেষণা আধিকারিক যতুনন্দন লাহা
“শস্ত্র রোগ” বিষয়ে আলোচনা করেন। এরপর
কৃষকভায়েদের নানান প্রশ্নের জবাব দেন
কৃষি বিশেষজ্ঞগণ।

বসুন্ধরার লেখকদের বর্ণানুক্রমিক সূচী : ১৩৯২

অ		
অনিল সরকার মল্লা চাষে আগ্রহী বিপ্তবাবু	(বৈশাখ)	
অমলেন্দু সিংহ মহাপাত্র পুরুলিয়া চাষীর বারোমাস্তা (কবিতা)	(")	
আবুল মালেক মঞ্জুল বোলপুরে কিয়ান মেলা	(")	
অজিত কুমার মজুমদার এক একটি গাছ ওরা (কবিতা)	(জ্যৈষ্ঠ)	
অনাদিনাথ পাণ্ডা যুদ্ধ রোপণ করে ভূমির নালীক্ষয় রোধ	(আষাঢ়-শ্রাবণ)	
মঃ আজিজুল হক অধিক ফলনশীল জাতের বেগুন (যুগ্ম)	(")	
অরুণ কুমার মিত্র প্রগতির পথে মহেশপুর গ্রাম	(ভাদ্র)	
ম নেমা শাল ধানের কয়েকটি রোগ ও তার প্রতিকার	(")	
ক		
ডঃ কল্যাণব্রত সেনগুপ্ত বিতর্কিত ডালশস্তা : খেসারি (যুগ্ম)	(অগ্রহায়ণ)	
কাশীনাথ ঘোষ আমন ধানের একটি উৎসব	(পৌষ)	
কনক কমল চট্টোপাধ্যায় মহিলা প্রশিক্ষণ চলছে চলবে	(মাঘ)	
গ		
অধ্যাপক ডঃ গোপেন্দ মুখোপাধ্যায় অম্বুবাচী ও কৃষিকেন্দ্রিক সংস্কৃতি	(আষাঢ়-শ্রাবণ)	
গৌর দাশ মাঠে যেতে (কবিতা)	(আশ্বিন)	
চ		
চিদানন্দ গোস্বামী আমি আলো জ্বালাতে পারতাম	(আষাঢ়-শ্রাবণ)	
জ		
ডঃ জ্যোতিরঞ্জন লাহিড়ী মেদিনীপুরের ফুল চাষীরাও প্রশিক্ষণ ও		
পরিদর্শন কর্মসূচীর সামিল	(বৈশাখ)	
জাগরণ সোম প্রাশ্নোত্তর	(বৈশাখ)	
ত		
তুষার কান্তি দে পুরুলিয়া জেলায় মাঠ কুঁড়োর জলে চাষ পরিকল্পনা	(বৈশাখ)	
তিলক বন্দ্যোপাধ্যায় পেয়ারার জেলি ঘরেই করুন	(ভাদ্র)	
তিলক বন্দ্যোপাধ্যায় টমেটো সংরক্ষণের একটি নতুন পদ্ধতি		
'টমেটো ক্রাশ'	(ফাল্গুন-১)	

দ

দেবব্রত চট্টোপাধ্যায় | ধানের কীটনাশক দমনের উপায় (ভাদ্র)

দীনেন্দু শেখর পাল | সূর্যমুখী নয়! ফসল (মাঘ)

প

ড: পরিতোষ ভট্টাচার্য | বাইজোবিয়াম প্রযুক্তি মুর্শিদাবাদে ডালচাষ
আরও বাড়াবে (আশ্বিন)

ড: প্রদীপ কুমার চট্টোপাধ্যায় | পঃ বঙ্গে কলা চাষের সমস্যা ও সমাধান (")

প্রমোদনাথ রায় | পয়রা চাষের ভূমিকা (কার্তিক)

ড: পরিতোষ ভট্টাচার্য | বিতর্কিত ডালশস্য খেসারি (যুগ্ম) (অগ্রহায়ণ)

প্রবাল গুপ্ত | সরষে চাষে প্রদর্শনী ক্ষেতের ভূমিকা (")

ড: পুণ্যব্রত চট্টোপাধ্যায় | আমের শত্রু শোষক পোকা (মাঘ)

ব

বিষ্ণুপদ মণ্ডল | সপ্তম যোজনাকালে পশ্চিমবঙ্গে ধাতোৎপাদন
বৃদ্ধির সম্ভাবনা (আষাঢ়-শ্রাবণ)

বিষ্ণুপদ মণ্ডল | পশ্চিমবঙ্গে ১৯৮৫-৮৬ সাল গম উৎপাদনের পরিকল্পনা (কার্তিক)

বিষ্ণুপদ মণ্ডল | পশ্চিমবঙ্গে কৃষির অগ্রগতি (ফাল্গুন-চৈত্র)

ভ

ড: ভরতেন্দু দেবশর্মা | পশ্চিমবঙ্গে বিভিন্ন অঞ্চলে ধানের কিছু নতুন
রোগ ও তার প্রতিকার (আষাঢ়-শ্রাবণ)

র

ড: রাধাগোবিন্দ মাইতি | চারা তৈরি পশ্চিমবঙ্গের একটি
সম্ভাবনাময় কৃষিশিল্প (আষাঢ়-শ্রাবণ)

ড: রাধাগোবিন্দ মাইতি | পশ্চিমবঙ্গে কৃষি অগ্রগতির স্বার্থে
চারা শিল্পের উন্নতি চাই (ভাদ্র)

ড: রাধাগোবিন্দ মাইতি | পটলের চাষ (আশ্বিন)

ড: রাধাগোবিন্দ মাইতি | ধনের চাষ (কার্তিক)

শ

শচীন্দ্রনাথ দাস | অধিক ফলনশীল জাতের বেগুন (যুগ্ম) (আষাঢ়-শ্রাবণ)

শিশির কুমার ঘোষ | পশ্চিমবঙ্গে মুসুরি উৎপাদনে গবেষণা ও
তার অগ্রগতি (কার্তিক)

ড: শক্তিপদ সরকার | গমের চাষ ও বেশী ফলন (অগ্রহায়ণ)

বসুন্ধরা : ফাল্গুন-চৈত্র : ১৩৯২

শিবরাস রায় | ভারতে সার উৎপাদন ও ব্যবহারের অগ্রগতি
স

(পৌষ ও মাঘ)

মুলেখা ঘোষ | ফুল কেবল ঘরের শোভাই নয়, ঘরের
লক্ষ্মীও হতে পারে

(বৈশাখ)

মুশীল কুমার বিশ্বাস | জলের কেন এত অপচয়

(জ্যৈষ্ঠ)

মুলেখা ঘোষ | রবি ফসলের বীজ সংগ্রহ ও সংরক্ষণ

(ফাল্গুন-চৈত্র)

সুরদাস মুখোপাধ্যায় | তৈলবীজ উৎপাদন বৃদ্ধির গবেষণা

(অগ্রহায়ণ)

মুলেখা ঘোষ | পেঁয়াজ একটি লাভের ফসল

(মাঘ)

সঞ্জীব কাজি | ১৯৮৪-৮৫ সালে বোরো মরশুমে আই-আর ৫০,

আই-আর ৩৬ ও জয়া ধানের তুলনামূলক চাষ

(মাঘ)

হ

হীরেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত | পার্বত্য উত্তরাঞ্চলে বড় এলাচ একটি অর্থকরী ফসল

(আশ্বিন)

অন্যান্য রচনা :

আমন ধানের চাষ

(বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ)

আষাঢ়ে কৃষকের করণীয়

(জ্যৈষ্ঠ)

আলুর চাষ

(আশ্বিন)

আশ্বিন মাসে কৃষকের করণীয়

(ভাদ্র)

অগ্রহায়ণ মাসে কৃষকের করণীয়

(কার্তিক)

আলুর রোগ ও তার প্রতিকার

(পৌষ)

আউশের উন্নত জাত

(ফাল্গুন-চৈত্র)

উত্তরবঙ্গ তরাই অঞ্চলের উন্নয়নে বিশেষ প্রকল্প

(জ্যৈষ্ঠ)

উত্তরবঙ্গে আনারস চাষের উন্নত পদ্ধতি

(জ্যৈষ্ঠ)

কৃষক প্রশিক্ষণ চলছে (সংবাদ)

(আশ্বিন)

কার্তিক মাসে কৃষকের করণীয়

(আশ্বিন)

গ্রীষ্মের কয়েকটি সবজি ও তার চাষ পদ্ধতি

(জ্যৈষ্ঠ)

গম চাষে যত্ন ও পরিচর্যা

(পৌষ)

চীনাবাদামের চাষ

(ফাল্গুন-চৈত্র)

ছোলা-মুহুরের চাষ

(কার্তিক)

জ্যৈষ্ঠ মাসে কৃষকের করণীয়

(বৈশাখ)

ধাতোৎপাদনের বিশেষ প্রকল্প (১৯৮৫-৯০)

(জ্যৈষ্ঠ)

বহুসংখ্যক : ফাল্গুন-চৈত্র : ১৩৯২

উৎপাদনের বিশেষ প্রকল্প (১৯৮৫-৯০) কার্যধারা	(আষাঢ়-আবণ)
চাষ	(জ্যৈষ্ঠ)
খনিয়াম বিযাক্ত আগাছা ও তার দমন	(ভাদ্র)
পান্ডুর	(আশ্বিন)
মবঙ্গে ১৯৮৫-৮৬ সালে ডাল উৎপাদন বৃদ্ধির কার্যসূচী	(")
মবঙ্গে তৈলবীজ উৎপাদন কার্যসূচী	(অগ্রহায়ণ)
ম বিশ্ব খাদ্য দিবস	(আশ্বিন)
মবঙ্গের গ্রামে জর্জিয়ার কল্যাণ শ্রীমতী মেলেন	(অগ্রহায়ণ)
জুন মাসের চাষ	(মাঘ)
রসীমের বীজ উৎপাদন পদ্ধতি	(মাঘ)
ঐ নির্ভর জমিতে ডালশস্যের ফলন বৃদ্ধির উপায়	(পৌষ)
রো ধানের চাষ	(পৌষ)
র শুঁটির চাষ	(পৌষ)
ক-খরিফে মুগের চাষ লাভজনক	(ফাল্গুন-চৈত্র)
রষে চাষের উন্নত প্রথা	(কার্তিক)
াগ ও পোকাকার আক্রমণ থেকে বোরো ধান রক্ষা করুন	(মাঘ)

৭৭৩৪৫

কৃষিক্রান্তি

নিয়মান্বলী

পত্রিকায় প্রকাশিতব্য বিষয়বস্তু : কৃষি বিষয়ক পরিকল্পনার তথ্য, গবেষণার ফলাফল সম্বন্ধে তথ্যাদি, প্রবন্ধ, ছোটগল্প, নাটিকা, সাক্ষাৎকার, নক্সা, কবিতা, প্রযুক্তিগত সমস্যা ও সমাধানের সুপারিশ, প্রমোডর, কৃষি সম্পর্কীয় সরকারী নীতি, প্রকল্প-পরিচিতি ও কাজের অগ্রগতি, কৃষি যন্ত্রপাতি, সেচ ও বিদ্যুতের ব্যবহারগত সমস্যা ও সুপারিশ, শস্য ও ফসল সংরক্ষণ, নম্যায় ও কৃষিক্ষেত্র, কৃষি বিপণন, বিভিন্ন জেলার কৃষকদের অভিজ্ঞতার সংবাদ ও রচনা, কৃষকদের স্থানীয় এবং সমষ্টিগত অভিযোগ-অসুবিধার কথা, পশুপক্ষী পালন, মৎস্যচাষ, বনসম্পদ সংরক্ষণ, ভূমি সংরক্ষণ ও সত্যাবহার, ভূমিসংস্কার-গত রচনা ও সংবাদ, পাহাড়বিভাগ, সমাজ শিক্ষা ও উন্নয়ন, কৃষিভিত্তিক কুটির ও ক্ষুদ্রশিল্প, গ্রামীণ অর্থনীতি ও কর্ম-সংস্থানের সমস্যাদি এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ে রেখাচিত্র, আলোকচিত্র, চিত্রকলা ইত্যাদি।

রচনার ক্ষমতা সম্পন্নমূল্য : কেবল নিম্নবর্ণিত ধরনের মৌলিক রচনার জন্য (প্রকাশিত হবার পর) নিম্নলিখিত হারে সম্প্রদানমূল্য দেওয়া হবে। (ক) উচ্চমানের কৃষি প্রযুক্তিগত (টেকনিক্যাল) প্রবন্ধ : ৭৫ টাকা, (খ) সাধারণ কৃষি প্রযুক্তিগত (টেকনিক্যাল) প্রবন্ধ : ৫০ টাকা, (গ) সাধারণ কৃষি বিষয়ক প্রবন্ধ/কৃষি বিষয়ক নাটিকা : ৪০ টাকা, (ঘ) সাধারণ ও ছোটগল্প : ৪০ টাকা, (ঙ) কবিতা (প্রকৃতি ও গ্রাম প্রাসঙ্গিক) : ২৫ টাকা।

রচনা ফুলফোল্ড কাগজের এক পৃষ্ঠায় (মোট ১৫০০ শব্দের অনধিক) কালি দিয়ে স্পষ্ট বাংলা অক্ষরে লিখে সম্পাদিকার ঠিকানায় (সম্পাদিকা, বসুন্ধরা, অফসেট প্রেস, ৪২ গ্রাহামস্ রোড, কলিকাতা-৪০) পাঠাতে হবে। রচনার দুইকপি পাঠান বান্ধনীয়। যথাসম্ভব মূল্যের ডাকটিকিট দেওয়া না থাকলে অমনোনীত রচনা ফেরৎ পাঠান হবে না।

গ্রাহক হবার নিয়ম : যে কোন মাসে বসুন্ধরার গ্রাহক হওয়া যায়। কিন্তু বাংলা সনের বৈশাখ থেকে চৈত্র পর্যন্ত এক বছরের কম সময়ের জন্য গ্রাহক করা হয় না। মাসিক সংখ্যার প্রতি কপির মূল্য ২৫ পয়সা। অগ্রিম এককালীন প্রদেয় বার্ষিক চাঁদার হার ৩০০ টাকা। চাঁদার টাকা “কৃষি অধিকর্তা পশ্চিমবঙ্গ”-এর নামে লেখা রেখাঙ্কিত (ক্রেসড) পোস্টাল অর্ডার অথবা রেখাঙ্কিত চেক-এর মাধ্যমে সম্পাদিক, বসুন্ধরা, অফসেট প্রেস, ৪২, গ্রাহামস্ রোড, কলিকাতা-৭০০০৪০-এ পাঠাতে হবে।

বিজ্ঞাপনের হার : (প্রথম প্রচ্ছদের জন্য এবং অর্থ পৃষ্ঠার কম কোন বিজ্ঞাপন নেওয়া হবে না) : প্রচ্ছদ (৪র্থ কভার) ৫০০ টাকা, প্রচ্ছদ (২য়/৩য় কভার) : ৪০০ টাকা, সাধারণ পূর্ণ পৃষ্ঠা : ৩০০ টাকা, সাধারণ অর্থ পৃষ্ঠা : ২০০ টাকা। বার্ষিক চুক্তিবদ্ধ বিজ্ঞাপনের অগ্রিম প্রদেয় মোট মূল্যের উপর ২০ শতাংশ হারে এবং ‘আই-ই-এন্-এস্’ দ্বারা স্বীকৃত এজেন্সীকে বিজ্ঞাপনের মোট মূল্যের উপর ১৫ শতাংশ হারে কমিশন দেওয়া হয়।

উহা একটি কৃষি-সম্পর্কিত ব্যবসায় এবং গ্রামীণ সমস্যা ও উন্নয়নমূলক যে কোন বিজ্ঞাপন (সরকারী নীতির পরিপন্থী নয়) প্রচারের কার্যকরী ও উপযুক্ত মাধ্যম। সরকারী, বিধিবদ্ধ/স্বতঃস্ফূর্ত সংস্থা অথবা বেসরকারী প্রতিষ্ঠান, ব্যক্তি, সমন্বিত প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি সকলেই এই পত্রিকার বিজ্ঞাপন দিতে পারেন।

কমিশন এজেন্ট : কলিকাতাসহ বিভিন্ন জেলার একাধিক বিতরণকারী এজেন্সী ভাগিকাত্তর করা হয়। ১০০ কপি কমে এজেন্সী দেওয়া হয় না। এজেন্সীগুলিকে ২০ শতাংশ হারে কমিশন দেওয়া হয়। এজেন্সীকে অর্ডার দেও কপির মোট মূল্যের টাকা (২০% কমিশন বাদে) অগ্রিম আদায় দিতে হয়।



সপ্তম পঞ্চবার্ষিক যোজনার ব্যাপক প্রস্তুতি

উন্নত মানের বীজ উৎপাদন ও সরবরাহের কাজে
পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বীজ নিগম-এর সম্প্রসারিত কার্যক্রম

৬. মানের বীজ উৎপাদন ৪ সরবরাহ কার্যক্রমে	বর্তমান পরিস্থিতি (১৯৮৪-৮৫)	৭ম যোজনার লক্ষ্যমাত্রা (১৯৮৯-৯০)
গাট, ধান, গম, ডালশস্য এবং তৈলবীজ)	৩০০০ মেঃ টন	১৫,০০০ মেঃ টন

পশ্চিমবঙ্গের জলবায়ু মাটির উপযোগী এ রাজ্যেই উৎপাদিত
উন্নত মানের শংসিত বীজ ব্যবহার করুন
ফলন বাড়ান : আয় বাড়ান

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বীজ নিগম লিঃ-এর জেলা দপ্তর

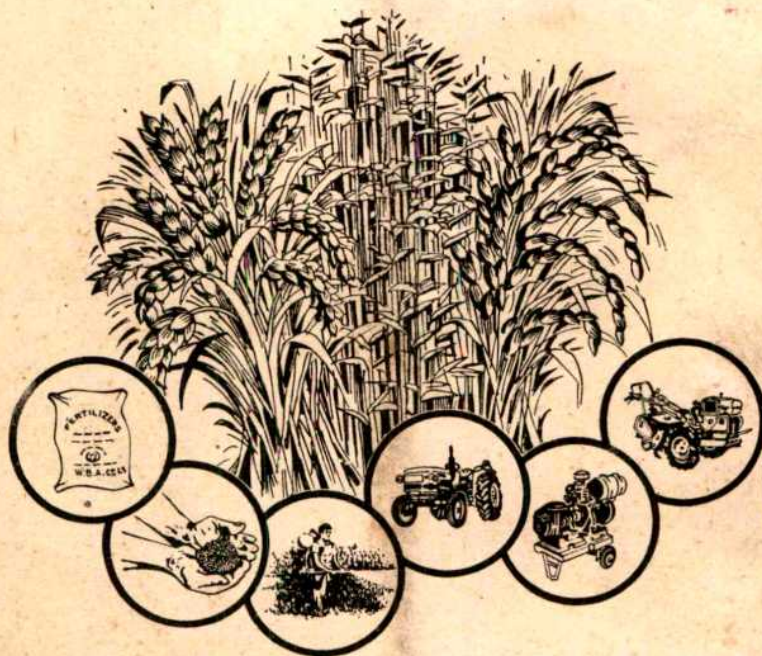
ব্রাহ্মগঞ্জ	ঃ উকিলপাড়া, রায়গঞ্জ (পশ্চিম দিনাজপুর)
মালদা	ঃ মকদমপুর, মালদা
বহরমপুর	ঃ পঞ্চাননতলা, বহরমপুর (মুর্শিদাবাদ)
কৃষ্ণনগর	ঃ ১২, ডি. এন. রায় রোড, কৃষ্ণনগর (নদীয়া)
বর্ধমান	ঃ ৭৯, এন. এন. বসু রোড, বর্ধমান
সিউড়ী	ঃ দাঙ্গালপাড়া, সিউড়ী (বীরভূম)
বাঁকুড়া	ঃ চাঁদমারীডাঙ্গা, বাঁকুড়া
মেদিনীপুর	ঃ ৩৫/১, অরবিন্দনগর, নরমপুর, মেদিনীপুর

সদর দপ্তর :

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বীজ নিগম লিঃ

৪, গঙ্গাধর বাবু লেন (৬ষ্ঠ তল), কলিকাতা-৭০০০১২

GREEN REVOLUTION— our aim in West Bengal



Green Revolution is our aim. The object is to modernise farming in the State. And Agro-Industries Corporation is lending a helping hand to achieve the goal. The Corporation has been supplying modern implements like Tractors, Sprayers, Threshers and Pump-sets to the farmers on hire or on hire-purchase basis.

The Corporation also supplies quality seeds, fertilisers and pesticides. Agro-Industries Corporation also provides custom

service for cultivation of cotton/groundnut and for Small Farmers Development Agency and Marginal Farmers & Agricultural Labourers Development Project Schemes.

The Corporation has another role too—to create employment opportunities for Engineering graduates/diploma holders and Agricultural graduates in different Agro-Service centres in this State.

**Hand in hand with farmers—
Agro-Industries Corporation**

West Bengal Agro-Industries Corporation Limited
(West Bengal Govt. Undertaking)

23B, Netaji Subhas Road, (3rd Floor), Calcutta-700 001

Telegram : AGRINUT

Telephone : 22-2314 / 23-3192